বাক্‌-সাহিত্য/
প্রাইভেট লিমিটেড/
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা - ৭
চৌরঙ্গী * মানচিত্র/ শংকর
হসন্তী/ * শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
* মসিরেখা/ জরাসন্ধ
গল্প সম্ভার/ বিমল মিত্র
প্রণয় পাশা/ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
* অহল্যা রাত্রি/ নমিতা চক্রবর্তী
কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী/ সত্যেন্দ্র
নাথ দত্ত * অপ্রকাশিত রচনাবলী/
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * ভবঘুরে ও
অন্যান্য/ সৈয়দ মুজতবা আলী
বিশ্ববিবেক/ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত
* আমার জীবন/ মধু বসু
রবীন্দ্রায়ন ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড/
পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
নাটক •
দাবী · শর্মিলা · সীমা/ দেবনারায়ণ গুপ্ত
লেবেডেফ্‌/ ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
একক দশক শতক • সাহেব বিবি গোলাম/
বিমল মিত্র • শরৎ নাট্যসংগ্রহ ১ম·২য়·৩য়
খণ্ড/ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্রাট/ রতন কুমার ঘোষ

পঞ্চম বর্ষ ভাদ্র : : ১৩৭৮

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক

প্রচ্ছদপট—বাদল দাস

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

কালি ও কলম-এর নিয়মাবলী

কালি ও কলম প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সাধারণ সংখ্যার দাম ১'০০।

গ্রাহকদের সডাক ছ'মাসের জন্য ৬'০০ ও এক বছরের জন্য ১২'০০ অগ্রিম দিতে হয়। মনি অর্ডারে অগ্রিম মূল্য পাঠালে সাধারণ ডাকে পাঠানো হয়। ডাকের গোলযোগে কোন সংখ্যা নিরুদ্দিষ্ট হলে আমরা দায়ী নই। রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠাতে হ'লে পৃথক খরচ দিতে হয়।

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

রচনার নকল রেখে পাঠানো নিয়ম। সাধারণ ডাকে পাঠালে বা অন্যভাবে রচনা নষ্ট হলে আমরা দায়ী নই। সঙ্গে ডাক টিকিট থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না।

রচনা পাঠাবার ছ'মাসের মধ্যে যদি প্রকাশিত না হয় তখন সংবাদ নেবেন। তার পূর্বে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত জানান সম্ভব নয়। পত্রের উত্তর পেতে হ'লে সঙ্গে ডাক টিকিট থাকা দরকার।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

কমপক্ষে পাঁচখানি পত্রিকা নিতে হবে।

পাঁচ টাকা আমাদের কাছে জমা থাকবে।

কাগজ ভি. পি. ডাকে পাঠানো হবে।

কোন সংখ্যা ফেরত এলে জমা টাকা থেকে ডাকব্যয় বাদ যাবে এবং একাধিকবার ফেরত এলে এজেন্সী বাতিল হয়ে যাবে।

অন্ততঃ দশখানি নিলে ডাকব্যয় বহন করা হবে।

॥ পঞ্চম বর্ষ ॥
॥ প্রথম সংখ্যা ॥
॥ ভাদ্র, ১৩৭৮ ॥

আমাদের কথা

সাহিত্যে উপন্যাসের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। অথচ উপন্যাসের যুগ শেষ একথা আমরা বহুদিন ধ'রেই শুনে আসছি। ধীর ছন্দে চলা জীবন যেদিন থেকে দ্রুতগতিতে চলা শুরু করল সেদিন থেকেই নাকি উপন্যাসের দিন শেষ হ'য়েছে। আবার কারো কারো মতে, ধনতন্ত্রের যুগে উদীয়মান বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের জন্যই শুধু উপন্যাস রচিত হ'য়েছিল; ধনতন্ত্র যখন সমাজতন্ত্রে পরিণত হ'তে চলেছে তখন উপন্যাসের প্রয়োজনও কমতে বাধ্য। কখনও কখনও আবার শোনা যায়, উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব অনুপ্রবেশ করার পর থেকেই উপন্যাসের চরিত্র এমনই পালটে গেছে যে, ফর্ম হিসাবে উপন্যাস একরকম মৃত। কার্যত অবশ্য দেখা যাচ্ছে এঁদের সমস্ত তত্ত্ব নস্যাৎ ক'রে দিয়ে নতুন নতুন উপন্যাস লেখা হ'চ্ছে; অত্যন্ত সার্থক ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাস রচনা করছেন।

বর্তমান যুগে সমাজ-সচেতনতা উপন্যাস রচনার বিশেষ অঙ্গীকার। একালের উপন্যাসে যদি নিছক প্রেম ও রোমান্টিক তন্ময়তার বাহুল্য দেখা যায় তবে একথা নিশ্চয় বলা যাবে না যে, আমরা এক অস্থির সময়ে বাস ক'রে সমাজ-সচেতনভাবে উপন্যাস রচনা করছি। তাই বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজের অস্থিরতা, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা একালের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে; তাঁদের রচনায় সমাজ-সচেতনতার যথেষ্ট আভাস মিলছে।

আজ পশ্চিম বাঙলার আকাশ দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন; আত্মকলহে এ-দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত। পশ্চিম বাঙলার প্রতিটি মানুষ আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। রাষ্ট্র থাকলে রাজনীতিও থাকবে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই রাজনীতির সৃষ্টি, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হবার জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন: "...সকলের স্মরণ রাখা উচিত, ধর্ম যেমন ঈশ্বরের, রাজনীতিও তাঁরই, শয়তানের নয়। 'অসাম্য', 'হতাশা', 'দারিদ্র্য'

প্রভৃতি কয়েকটি সাজানো কথার আবরণে পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দলগত স্বার্থকে যতই গোপন রাখবার চেষ্টা করুক না কেন, তাদের দলীয় কোন্দলের কালো ধোঁয়ায় আজ ছেয়ে গেছে ছোট-বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এমন কি হাসপাতালের ওয়ার্ড পর্যন্ত। এক রাজনৈতিক দলের দ্বারা সমর্থিত নাশকতামূলক কার্যকলাপ অন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক ধিক্কৃত হ'চ্ছে। আবার সে কাজই যখন শেষোক্ত রাজনৈতিক দলের স্বার্থে অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে তখন আবার তা অকুণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছে। এইভাবেই রাজ-নৈতিক দলগুলি দিনের পর দিন তাদের দলীয় আত্মপ্রবঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজা রামমোহনের ভাষায় পশ্চিম বাঙলার রাজনীতি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে নির্বাসিত হ'য়ে আজ শয়তানের রাজ্যে বাসা বেঁধেছে। পশ্চিম বাঙলার যুবক ও কিশোরের রক্তে আজ সেই শয়তানের নিত্য পূজা। দেশের এই নিদারুণ বাস্তব পটভূমিকায় এখনও কিন্তু কোন সার্থক উপন্যাস রচিত হ'ল না। যাঁরা রিয়ালিজিমের কথা বলেন তাঁদের মতে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হ'ল সত্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া। শুধুমাত্র রিয়ালিজিমের খাতিরে নয়, পশ্চিম বাঙলার রাজনীতি-সর্বস্ব অবক্ষয়ী বাঙালী সমাজের এক নতুন এবং সুস্থ মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্যও আজ বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের এক নতুন সমাজ-সচেতনতা নিয়ে কলম ধরতে হবে। অবশ্য এই নতুন সমাজ-সচেতনতার অর্থ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে আত্মসমর্পণ নয়। যেহেতু উপন্যাস সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা, তাই বাঙালী ঔপন্যাসিকদের দায়িত্ব বোধহয় আজ সবচেয়ে বেশী।

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী

সাংবাদিক মধুসূদন দত্ত

(মাইকেল জীবনীর বিস্মৃত অধ্যায়)

....

মধুসূদন দত্ত সাধারণত কবি হিসেবেই খ্যাত। কিন্তু দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা করেছেন। শুধু তাই নয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর এই সাংবাদিক জীবনের কোন সংবাদই আজ আর আমাদের জানা নেই। চরিতকারগণও এ বিষয়ে কোন সাহায্য করতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ মধুসূদনের সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়েছিল মাদ্রাজে। মহাকবির মহাপ্রয়াণের প্রায় ষাট বছর পরে নগেন্দ্রনাথ সোম এ সকল তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মধুসূদনের কয়েকটি ইংরেজী কবিতা ছাড়া তিনি বিশেষ কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি। দীর্ঘদিন অনুসন্ধান চালিয়ে মাইকেল জীবনীর এই বিস্মৃত অধ্যায়ের অনেক তথ্য পেয়েছি। সাংবাদিকরূপে মধুসূদনের আত্মপ্রকাশের বিষয়টি এই প্রবন্ধে বলব।

১৮৪৮ খৃঃ মধুসূদন মাদ্রাজে চলে যান একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। এর আগে যখন তিনি কলকাতায় ছিলেন তখন অবশ্য কলকাতা ও বিলেতের কয়েকটি পত্র পত্রিকায় তাঁর ইংরেজী কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। মাদ্রাজের উপকণ্ঠে খ্রীষ্টানদের পল্লীতে তিনি একটা আশ্রয় পেলেন। সেখানে একটা স্কুলে কাজও পেলেন। সামান্য কটা টাকা, এতে ত আর রাজনারায়ণ দত্তের পুত্রের চলতে পারে না। তাই তিনি নানা পত্র পত্রিকায় কবিতা ও দুএকটি প্রবন্ধ লিখে আয় বাড়াতে শুরু করলেন। এই বছর শেষের দিকে রেবেকা নামে একজন ইংরেজ মহিলাকে তিনি বিয়ে করলেন। তারপর সংসারে এল একটি কন্যা। তাই আয় বাড়াবার জন্যে তাঁকে শিক্ষকতার সঙ্গে সাংবাদিকতাও করতে হ'ত। কবিতাগুলিতে ছদ্মনাম থাকত, প্রবন্ধগুলিতে কারো নাম থাকত না। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে কোন লেখককে কেউ তখন চিনত না। ১৮৪৯ সালে "Captive Ladie" প্রকাশিত হবার পর আর তাঁর পরিচয় গোপন রইল না।

মধুস্থদনের সাংবাদিকতা সম্বন্ধে চরিতকারগণ বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারেন নি। 'মধুস্মৃতি'র লেখক ৺নগেন্দ্র নাথ সোম লিখেছেন—

"মধুস্থদন মাদ্রাজে Madras circulator and General Chronicle, Spectator এবং Athenaeum নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষোক্ত "এথিনিয়ম" সংবাদপত্রের তিনি প্রধান সম্পাদক হইয়া যথেষ্ট সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। মধুস্থদন পূর্ব্বোক্ত ইংরেজীপত্রগুলি ব্যতীত "হিন্দু ক্রনিকল" নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র কিছুদিনের জন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

শ্রীএইচ এম ব্যানার্জী লিখেছেন—

"His best English writings were published in *Madras Spectator* and *Athenaeum*. These writings were very frequently reprinted in Bengal Hurkaru and Englishman".

আর একজন লেখক বলেছেন—

"He edited a paper which he called for the Hindu Chronicle, prominent for its good English.

প্রসন্নকুমার ঘোষ লিখেছেন—

"মধুস্থদন দত্ত মাদ্রাজে "এথীনিয়ম" নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া এমন স্থচারুরূপে কার্য্যনির্বাহ করিয়াছিলেন যে, সম্পাদক স্বদেশে গমনকালে তাঁহারই হস্তে পত্রখানির সম্পাদন ভার অর্পণ করিয়া যান। কবিবর দক্ষতার সহিত এই গুরুকার্য্য সম্পাদন করিয়া যশো লাভ করিয়াছিলেন।"

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মধুস্থদন মাদ্রাজে অন্ততঃ তিনখানি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে "এথীনিয়ম" ও "স্পেক্টেটর" কোন সময়ে তিনি সম্পদনা করেছেন তার কোন নির্দেশ নেই। অথবা সমসাময়িক সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র "স্পেক্টেটর" সম্বন্ধে মধুস্থদনের নিজের লেখা ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ফলে এ সময়কার তাঁর সবগুলি লেখা বেছে বার করা সম্ভব নয়। "সার্কুলেটর" এ প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা নগেন্দ্রনাথ সোম উদ্ধার করেছেন। "হিন্দু ক্রনিকেল" এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মধুস্থদন। পত্রিকায় অবশ্য তাঁর নাম থাকত না। এই সাপ্তাহিকটির ফাইল দুষ্প্রাপ্য। এবং কোন লেখক তা দেখেছেন বলে আজ পর্যন্ত দাবী করেননি। ফলে এ

নিয়েও কোন আলোচনাই হয়নি। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে এ পত্রিকা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এর কয়েকটি সংখ্যাও দেখবার সুযোগ হয়েছে।

এই সাপ্তাহিক সম্বন্ধে ৺ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"মধুসূদন *Hindu Chronicle* নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে *Hindu Chronicle* প্রথম প্রকাশিত হয়।"

ব্রজেনবাবু গৌরদাস বসাকের দুখানি পত্রের উপর নির্ভর করে এই তথ্য প্রচার করেছেন। কিন্তু এটা ভুল। মধুসূদন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু প্রকাশক ছিলেন না। আর এই সাপ্তাহিকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নয়।

কিন্তু এ চারখানা ছাড়া মধুসূদন মাদ্রাজের আরো দুখানি পত্র পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ দুটি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন লেখকই কিছু বলতে পারেননি। এর মধ্যে একটির নাম "ইউরেশীয়ান"। এখানে মধুসূদনের কবিতা ছাপা হ'ত, কিন্তু তাঁর নাম থাকত না। আর একটির নাম "ক্রিমেণ্ট"। এই শেষোক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মালিকের তিনি সাংবাদিকতার প্রধান সহযোগী ছিলেন বলে মাদ্রাজের সংবাদপত্রে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে মধুসূদন মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। এর পরেও কলকাতার Citizen ও Hindoo Patriot* এর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। প্যাট্রিয়টের লেখাগুলি অধিকাংশই সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু Citizen এর ঐ সময়কার ফাইল দুষ্প্রাপ্য।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মধুসূদনের Captive Ladie গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতার সংবাদপত্রগুলি এর বিরূপ সমালোচনা করে। কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক Bengal Hurkara লিখলেন—

"These verses of M.M.S.Dutt are very fair amataur poetry ; but if the power of making has deluded the author into a reliance on the exercise of his poetical abilities for

* অনেকের ধারণা তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এটা ভুল। টাকার বিনিময়ে মধুসূদন প্যাট্রিয়টে প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতেন মাত্র। তখন সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করব।

fortune and reputation, or tempted him to turn up his nose at the more common place uses of the pen, the delusion is greatly to be regretted.**

We like not the visions so well as the "Tale". The "fragment" is in blank verse neither very powerful nor very musical."

—*Bengal Hurkaru* Page 549 dated 19.5.1849.

বাঙ্গালী পরিচালিত *Hindu Intelligencer* লিখলেন—

"From the above selections, it will appear that our author is not devoid of those characteristics which constitute a true poet, and if he continues to take proper advantage of that turn of mind with which he has been gifted by Nature, we do not entertain the least doubt of his being able to raise himself to a higher rank in the poetical world, in which our best wishes are in his favour."

—*Hindu Intelligencer* Page 173, dated 28.5.1849.

Calcutta Review খুব ভাল সমালোচনা করেছেন বলে কোন কোন লেখক লিখেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। মধুসূদনের উৎসাহিত হবার মত কোন বস্তু এই সমালোচনায় নেই।

অন্যদিকে মাদ্রাজের সংবাদপত্রগুলি এই বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফলে মাদ্রাজে মধুসূদনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বন্ধু হিসেবে পেলেন নর্টন সাহেব ও সীড সাহেবের মত লোককে। আরো অনেক পরে পেলেন শিক্ষাবিদ্ ডাঃ পাওয়েল-কে।

Captive Ladie প্রকাশিত হবার পর মধুসূদন রিজিয়া নামে একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রনাথ সোম ও এ যুগের মধুসূদন গবেষক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন যে এ গ্রন্থ পাণ্ডুলিপিতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এটা সত্য নয়। ইউরেশীয়ান পত্রিকায় এই নাটকটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ২৪. ১১. ৪৯ তারিখ থেকে মোট সাতটি পর্যায় প্রথম অঙ্কের নবম দৃশ্য পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃ ১২ই জানুয়ারী নবম দৃশ্য প্রকাশিত হয়। এর পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবারই নাটকের মাথায় এই কটি কথা লেখা থাকত।

DRAMTIC LITERATURE

RIZIA—Empress of Inde

(A Dramatic Fragment)

আর উৎস হিসেবে বলা হয়েছে—"Vide Ferishta—translated by Alexander Dow". লেখকের নাম কখনও প্রকাশ করা হয় নি। যে অংশটি এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার সামান্য একটু অংশ ছাড়া, আর কোন অংশই কোন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় নি। মধুসূদন-ভক্তদের কাছে নিঃসন্দেহে এটা একটা আনন্দের সংবাদ। এবং নতুন সংবাদও বটে।

এরপর ১৮৫০ সালের মার্চ মাসে স্ত্রী রেবেকা একমাত্র শিশু কন্যাকে নিয়ে উত্তর ভারতে বেড়াতে চলে যান। কবিকে একা মাদ্রাজে বিরহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মধুসূদন একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর বিরহ ব্যথা ও গভীর ভগবৎপ্রেমের পরিচয় মেলে। এই কবিতাটির লেখকের কোন নাম নেই, শুধু বলা হয়েছে যে রিজিয়ার লেখক এটি লিখেছেন। কবিতাটি এ পর্যন্ত কোন গ্রন্থে স্থান পায়নি অথবা কোন লেখকও এটির সন্ধান দিতে পারেন নি। তাই এই কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি—

POETRY

(ORIGINAL SONNET)

(On the Departure of my wife and child for the upper provinces)

(By the author of "Rizia".)

My home is lonely—for I seek in vain
For them who made its star-light : there's cry
Of anguish fiercely wrung by untold pain
E'en from my heart of hearts : Hear it on high
Our Heavenly Father ;—though to whom we fly,
Not in soft hours of gladness when the strain
Of pleasure swells to madden and to chain
The ravish'd soul with gay captivity—
But when dark sorrow as a curse—a blight
Comes o'er the heart to wither : her and heal

O Mercy throned—thou, whose eyes of light
A ye beam with sleepless love—to them I kneel
For them—the lov'd—the living !—yes to thee
O Lord !—Our God of glorious majesty !

—*Madras 1850.*

পুরনো সংবাদপত্র থেকে এই সময়ে প্রকাশিত মধুসূদনের আর একটি অজ্ঞাত কবিতা উদ্ধার করেছি। এই কবিতাটি ১৮৪৩ খৃঃ লেখা। মধুসূদন তখন বিশপ্‌স্‌ কলেজের ছাত্র। অসুস্থ অবস্থায় কোন এক মহিলার এ্যালবামে এই কবিতাটি লিখেছিলেন। দীর্ঘদিন বাদে মাদ্রাজে তা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই মহিলাটি কে তা জানা যায় নি।*

এই কবিতাটিও এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

POETRY

LINES (WRITTEN IN A LADY'S ALBUM DURING SICKNESS)

By the Author of "Rizia"

O for a Welling fount of thoughts—to fill
This desart-heart with murmurs sweet and still
Whose echos-borne on soft Expression's wing,
Could charm her gentle ears, who bids me sing !-
Could on this virgin page build me a tomb
Far from the tall-yew'd church-yard's charnel gloom
Where-when within my nameless grave I sleep,
And foes to smile and friends forget to weep
My lonely ghost might sometimes cease to sigh
Sunn'd by the pensive rays of Beauty's eye !
But vain the wish ! for when the heart's green how'r
Is as a waste of wither'd leaf and flow'r,
When, like the dream simoom, the breath of care
Hath wrought fierce ruin and destruction there,

* মধুসূদনের আর একটি কবিতা পেয়েছি। এটিতে তাঁর কর্মজীবনের কথা বলা হয়েছে। এবং একজন বান্ধবীর কথা উল্লেখ আছে। এই দুই মহিলা এক ব্যক্তি কিনা বলা শক্ত।

What fount can spring to gladden once again
The haunt of anguish and unutter'ed pain ?

—*Calcutta, 1843.*

এর পর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মধুসূদনকে আমরা MADRAS HINDU CHRONICLE নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক রূপে দেখতে পাই। কিন্তু বেশ কিছুদিন সম্পাদকের নাম গোপন থাকে। এই আত্মগোপনকারী সম্পাদককে নিয়ে সে যুগে মাদ্রাজ, কলকাতা ও শ্রীরামপুরে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিছুদিন পরে অবশ্য মধুসূদন ধরা পড়ে যান।

সাংবাদিক হিসেবে মধুসূদন যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা মূলত এই সাপ্তাহিকটিকেই কেন্দ্র করে। মধুসূদন সম্বন্ধে সে যুগে মাদ্রাজের এথীনিয়ম বলেছিলেন—"He writes as no other Hindu can write, and thinks as but few Englishmen can think." তাঁর সম্বন্ধে হরকরা লিখেছেন—"It is highly creditable to him to be able to edit an English paper for English readers and make such use of foreign dictons as leaves very little indication of the place of his birth". এই কাগজ আর একবার লিখেছিলেন যে ভদ্রলোক এত সুন্দর ইংরেজী লেখেন যে বিশ্বাসই করা যায় না যে ইংরেজের সাহায্য ছাড়া কোন ভারতীয়ের পক্ষে ঐরকম ইংরেজী লেখা সম্ভব।

এই সব পত্রপত্রিকায় বিশেষ করে হিন্দু ক্রনিকেলে মধুসূদনের লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি থেকে মধুসূদনের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভূমি-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারা যায়। এ বিষয়ে পৃথক একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। এখানে শুধু সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলা হচ্ছে। শিক্ষা সম্বন্ধে মধুসূদনের ছিল এক বলিষ্ঠ নীতি। রাজা রামমোহন রায়ের পর সর্বপ্রথম মধুসূদনই ভারতে ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের দাবী জানান। তিনি বলেছিলেন এর ফলে যদি কোন দিন ইংরেজকে ভারতের মাটি ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলেও শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। খৃষ্টান হয়েও তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি হিন্দু। খৃষ্টধর্ম নিয়ে তাঁকে বার বার খৃষ্টধর্মালম্বীদের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম তাঁকে বার বার ব্যথিত করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও তিনি স্তিমিত আলোর শিখা দেখেছেন। ইংরেজের জীবনীশক্তি দিয়ে তিনি এই

মৃতপ্রায় হিন্দুজাতিকে পুনর্জীবিত করবার কথা বলেছেন। অথচ নৈতিক দিক থেকে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি কখনও স্বীকার করেন নি। ফলে মাদ্রাজের খৃষ্ট সমাজে তাঁকে হেয় হতে হয়েছিল। জোর করে হিন্দুদের খৃষ্টান করা অথবা সে যুগে স্কুল কলেজে যে প্রতিদিন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান হ'ত তিনি তারও প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষ মন যাঁদের, একমাত্র তাঁদেরই ধর্মান্তরিত করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ভণ্ডামীবিহীন খাঁটি হিন্দুদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। কৃষিকর্মের উপর মধুস্থদন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তাঁর মতে এখানে শ্রম বিফল হয় না। ভূমি সংস্কারের উপরও তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সকল প্রবন্ধ থেকে তাঁর দেশবিদেশের কৃষি ও ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাগরণ তিনি চেয়েছিলেন। সুদূর আরবের মরুভূমি থেকে আরম্ভ করে চীন দেশ পর্যন্ত একদা যারা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সে মুসলমানদের জড় অবস্থা কবিকে ব্যথিত করেছে। সে যুগের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ও অন্য অঞ্চলের নবাবগণ এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি এ কথা লিখতেও তিনি ভীত হন নি। মধুস্থদন অবশ্য এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে ভারতের মাটির দোষ। এখানে যে আসবে সেই জড় হয়ে যাবে। ভারতবাসীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে কোন কোন খৃষ্টান সংবাদপত্র বলেছিলেন যে, এর কারণ হ'ল হিন্দুদের দেশপ্রেমের অভাব। মধুস্থদন এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, হিন্দুদের একটি মাত্রই সম্পদ আছে, আর তা হ'ল দেশপ্রেম। দেশদ্রোহীকে হিন্দুধর্ম ক্ষমা করে না। তাই দেশপ্রেম এই ধর্মের অঙ্গ। মধুস্থদনের লেখার ছত্রে ছত্রে তাঁর গভীর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। তিনি বার বার বলেছেন ভারত একটি মহান দেশ, তার বিরাট ঐতিহ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশের পুরনো সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করবে তা তিনি সমর্থন করেন নি। অবশ্য তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমর্থন করে ও রাধাকান্তদেবের গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে হিন্দু আইন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বে মধুস্থদনের মত এত বলিষ্ঠ ভারতীয় কোন সাংবাদিকের সাক্ষাৎ মেলে না। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম দেশ-প্রেমিক-সম্পাদক।

হিন্দু ক্রনিকেল-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩রা

অক্টোবর। প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে মাদ্রাজের "Price current Press" থেকে প্রকাশিত হ'ত। প্রিণ্টারস লাইনে লেখা থাকত।

"Printed and published for the proprietors by C. M. Pereyra, at the Price current press, No 61 Armenian Street, where all communications to the Editor are to be addressed."

এই মিঃ পেরেরাই ছিলেন এর মালিক। অন্যান্য সমসাময়িক সংবাদপত্রেও তাঁকে হিন্দু ক্রনিকেলের মালিক বলা হয়েছে। সম্পাদকীয় দপ্তরও ছিল ঐ প্রেসে। এর ঠিকানা হ'ল ৬১ নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট। এখানে এই পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি।

The Madras Hindu Chronicle

IS PUBLISHED AT THE

PRICE CURRENT PRESS

No 61, *Armenian Street*

MADRAS

EVERY THURSDAY MORNING

Subscription 8 *As per* mensem

এই সাপ্তাহিকের আকার ছিল ২৭½ × ২০ সেণ্টিমিটার। প্রথমে সপ্তাহে ৮ পৃষ্ঠা করে থাকত। কাগজের সৌষ্ঠব অতি সাধারণ। ১৮৫২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। গেটআপও খুব চমৎকার হয়। মাসিক চাঁদা বৃদ্ধি করে এক টাকা বা বাৎসরিক বারো টাকা করা হয়। অন্যান্য সংবাদপত্রের অনুরোধ সত্ত্বেও মধুসূদন আর মূল্য বৃদ্ধি করতে রাজী হন নি। কারণ তিনি ভারতের মত গরীব দেশে সস্তা সংবাদপত্র প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একটি সম্পাদকীয়ও লিখেছিলেন। এই কাগজের এজেণ্ট ছিলেন পি. ডি. মুদালিয়র। তিনিই ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ-কর্ম দেখাশুনা করতেন।

বিজ্ঞাপনের হারও খুব কম ছিল। ব্যবসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রতি লাইন ৪ আনা শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়। অন্যান্য বিজ্ঞাপন একটি হলে প্রতি লাইন ৪ আনা, দুবার হলে ৩ আনা, ৩ বার বা তার বেশি হলে প্রতি লাইন মাত্র ২ আনা করে। কোন ধর্মীয় বা বদান্য প্রতিষ্ঠানের প্রথম বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপান হ'ত।

প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটে করে কলম থাকত। সাধারণত প্রথম দু' পৃষ্ঠায় সাড়ে তিন কলম থাকত "Summary of weekly News"। এর পর থাকত তিনটি অথবা চারটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায়। মাদ্রাজের অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি থাকত "LOCAL" এ-সাধারণত ৪র্থ ও ৫ম পৃষ্ঠায়। ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় থাকত INDIAN PRESS। এখানে মাঝে মাঝে CALCUTTA বলেও একটা সাবসেক্‌সন থকত। সপ্তম পৃষ্ঠায় থাকত Indian Intelligence ও Europe. শেষ পৃষ্ঠায় থাকত বিজ্ঞাপন ও Fort St George Gazette. ইংরেজী ও তামিল দুরকম বিজ্ঞাপনই ছাপা হ'ত।

প্রতি সংখ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় আরম্ভ হবার পূর্বে এই কথাগুলি লেখা থাকত—"*The prevolence or scarcity of Newspapers in a country affords a sort of index to its sound state : where journals are numerous, the people have power, intelligence, and wealth ; where journals are few, the many are really slaves*".

এই লাইন কটি থেকে সাংবাদিক হিসেবে মধুসূদনের আদর্শ বোঝা যায়। তাঁর মতে যে সমাজে সংবাদপত্রের সংখ্যা কম তারা দাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, মধুসূদন স্বাধীন নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবাদ-পত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। দাসসুলভ মনোবৃত্তি তিনি সহ্য করতেন না।

আগেই বলেছি মধুসূদন কোনদিনই হিন্দু ক্রনিকেলএর মালিক ও প্রকাশক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এই সাপ্তাহিকটির বেতনভুক প্রথম সম্পাদক। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম এই পত্রিকাটির উল্লেখ দেখতে পাই। মধুসূদন বাংলাদেশের কোন সংবাদপত্রকে তাঁর কাগজ পাঠাতেন না। কারণ এরা তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেন নি। তাঁর captive Ladie-র বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। মাদ্রাজের কাগজগুলি হিন্দু ক্রনিকেল থেকে বাছাই করা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন, আর কলকাতা ও শ্রীরামপুরের কাগজগুলি সেগুলি তাঁদের কাগজে পুনর্মুদ্রিত করতেন। এ ছাড়া, মধুসূদন কতকগুলি বাংলা শব্দের প্রচলন করেছিলেন তাঁর কাগজে। (যেমন ছি ছি, পূজা, তামাসা প্রভৃতি)। কয়েকটি ইংরেজী শব্দের হিন্দু কলেজের বৈশিষ্ট্য বহনকারী বানানও তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রচলন করেছিলেন। এগুলি পড়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মনে হ'ত যে কাগজের সম্পাদক তাঁদের প্রিয় বন্ধু মধু। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল কিছু পরে।

১৮৫০ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মাদ্রাজের বিখ্যাত "এ্যাথেনীয়ম" হিন্দু ক্রনিকেল থেকে DAYS OF CASTE NUMBERED শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করেন। এই প্রবন্ধটি কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক 'হরকরার' বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৯, ১১, ১৮৫০ তারিখে হরকরা এটি পুনর্মুদ্রিত করে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন যে হিন্দু ক্রনিকেল-এর সম্পাদক ভারতীয় কি না তা তাঁরা জানেন না। তবে ইংরেজী ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দখল আছে। আর বাক্‌রীতির দিক থেকে তাঁর লেখা শুধু বিশুদ্ধই নয়, শক্তিশালী ও প্রাঞ্জল। রামগোপাল ঘোষ অথবা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিন এধরণের বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখেছেন বলে তাঁদের জানা নেই। এই সম্পাদকীয় থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

"We do not know whether the paper······is edited by a native as its name would imply but if it is, his mastery over the English language is extraordinary, for the production is not merely idiomatically accurate but forcible and eloquent. We do not think that we have ever seen any English composition from the pen of the Reverend Krishna Mohun Banerjea, well as he generally writes, or even from that of Ramgopal Ghosh who is greatly superior to the revered gentleman, equal to the article we are referring to. The sentiments expressed are worthy of the language in which they are clóthed."

—*Bengal Hurkaru* dated 9.11.1850, page 526.

মাত্র এক বছর আগে যে হরকরা বাঙ্গালী বলে মধুসূদন দত্তের Captive Ladie পছন্দ করেন নি, এমনকি তাঁর ইংরেজী ব্যাকরণের ভুল ধরেছেন, সেই মধুসূদনের প্রশংসায় আজ তাঁরা পঞ্চমুখ, অবশ্য অজ্ঞাতসারে। এতেও কিন্তু মধুসূদনের মন ভিজল না। তিনি কোনদিনই হরকরাকে কাগজ পাঠান নি।

১৪ই নভেম্বর তারিখে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত সাপ্তাহিক *Friend of India* ও মধুসূদনের প্রবন্ধের অংশবিশেষ ছেপে মন্তব্য করলেন যে, যদিও মনে হচ্ছে যে প্রবন্ধটি কোন ভারতবাসীর রচনা তবুও কোন ইউরোপীয় দিয়ে যে তা সংশোধন করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এদের ভাষায়—

"Although the paper is supposed to be edited and

published by Natives we cannot but think that this article has been revised by a European pen. There is vigour about the style, which is far removed from the bombast that so often destroys the effect of the productions of educated natives ; and a happy allusion to Mokanna's Veil" is strongly indicative of a European origin. If it be really the composition of a native, he is far beyond the majorty of his countrymen, in his knowledge of the Engliih language as well as the vigour of his conceptions."

—*Friend of India*, dated 14. 11. 1850.

২৮শে নভেম্বর তারিখের ক্রনিকেল-এ মধুসূদন 'হরকরার 'সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃথকভাবে প্রকাশ করেন। আর সম্পাদকীয় মন্তব্যে Friend of India-র মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে লিখলেন—

"An article, which we wrote some issues back on the subject of caste, seems to have found favour in the eyes of some of the most distinguished of our palatial contemporaries. What the *Hurkaru* has said, our readers will find in another column ; but we give prominency to the remarks of the Friend of India, not that we set a higher value, on the commendations of the Serampore journalist but because, we wish to undeceive him of an error into which he has fallen:"

—*Madras Hindu Chronicle*, Vol 1, No. 9, dated 28.11. 1850.

এরপর 'ফ্রেণ্ড' এর মন্তব্য সম্বন্ধে খুব রহস্য করে বললেন যে আমরা কে তা বলব না। তবে তাঁরা জেনে রাখুন যে হিন্দু ক্রনিকেল এর সঙ্গে ইউরোপীয়দের কোন সম্পর্ক নেই এবং ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গেও তাদের যোগ নেই। এর দোষগুণ সবই আমাদের। তবে আমরা কে সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। এর উত্তরে হরকরা লিখলেন যে 'The Friend is wrong, the *Hindu chronicle* is not published by Natives' কিন্তু এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। মধুসূদনের রসিকতাটি এখানে পুরো উদ্ধৃত করছি।

'Like the Ghost in Hamlet, We are not desirous to tell

the secret of our prison house : We shall therefore simply let the friend know that the *Hindu Chronicle* has no connection whatever with Europeans, and that there is not a single thought of European connection. All its faults and beauties proceed from us, but who are we ?-aye, that is the question.'

—*Hindu chronicle*, Nov-28, 1850, Vol I No 9.

মধুসূদনের বহু বিতর্কিত ও উচ্চ প্রশংশিত এই রচনাটি কোথাও সংকলিত হয় নি ; তাই এখানে পুরো উদ্ধৃত করছি। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম এবং প্রথম শ্রেণীর যে কোন ইংরেজী রচনার সঙ্গে একাসন পাবার দাবী রাখে। মধুসূদনের বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর।

THE DAY OF CASTE NUMBERED

Delenda est carthago.

Of the various institutions which have hitherto longued themselves to stand as a wall of adamant in order to repeal the encroachment of that spirit of innovation, which is daily triumphing in other lands, there is more so formidable as-caste. Fable has ascribed to this tremendous evil, a divine origin : but like all fables which grow and flourish during ages of spiritual thraldom, and mental imbecility, the tale of the four patriarchs of the human race, springing forth simultanesously from the mouth, the arms, the thighs and the feet of Brahma, is literally built on a sandy foundation—the preistly tribe who reared it—for reasons too obvious to need even the least explication, having, as we opine, little dreampt of the rude and undermining assaults of the daring scepticism peculiar to those days when kings and warriors bowed to him in lowly submission, when nations listened to his voice as the oracle of the Deity ; when the incense of adoration intoxicated

him into the impious belief that he belonged to a loftier order of existence ; could the Bramin picture to himself that the children of the postrate worshippers before him should one day audaciously set at nought his claims to honours all but divine, and regard him as a fellow child of the clay ? We trow not. But time has an inveterate relish for the tricks of a fantastic character it makes and mars; the veil which it weaves to-day with the web of beauty to adorn and conceal the hineous brow of a Mokanna, it never scruples to rend tomorrow.

It is not our purpose to enter into a discussion with reference to the antiquity of this acursed system : it would be an unprofitable as well as an unpleasant labour to grope through the dreary and dark void of the past, to the first of innumerable series of years during which it has shed over our country the combined influence of all the most mali-grant stars with which the gloomy imagination of the chaldean astrologer overpeopled the glorious heaven above us ; nor are we disposed to test its merits as a religious ordinance—for, it would be an insult to the majesty of Reason to permit such a contemptible inposer to stand before its tribunal and claim the hallowed name of truth it has the indelible brand of Falsehood on its forehead. But let us contemplate for a time its tendencies in a social and moral point of view ; let us see how it alienates man from man ; how it quenches the God-lit ray of the intellect ; how it chains down the aspiring mind to grove on the earth, and traces. as it were, a wizard-ring around it to check the development of its varied capacities ; how it reconciles the heart to every feeling of degradation, and teaches it to fly to an unmanly sense of resigntion to seek consolation for

the bitterness of the lot it assigns to many ; and then let us ask ourselves, calmly and dispassionately, if such a system can be conducive to the good of the human race, and if it be an unjust and an unrighteous hatred which would inscribe on its brow in characters of quenchless fire Delenda Estcarthago ?

—*Madras Hindu Chronoicle*, October 17, 1850 Vol 1. No. 3

কলকাতার কাগজগুলি নাজেহাল হল। বহু চেষ্টা করেও তারা হিন্দু ক্রনিকেল এর সম্পাদকের নাম জানতে পারল না। কিন্তু মধুসূদনের ঐ সম্পাদকীয়ের উত্তর দিলেন মাদ্রাজের একখানি সাপ্তাহিক Eastern Guardian. তাঁরা বললেন যে Hindu Chronicle এর সম্পাদক Captive Ladieর লেখক এবং এই বইটির কিছুদিন পূর্বে হরকরাতে ভাল সমালোচনা বের হয়েছে ।

এই সংবাদ পেয়ে ৫.১২.১৮৫০ তারিখে হরকরা লিখলেন যে হিন্দু ক্রনিকেল এর সম্পাদকের নাম M. M. S. Dutta. ইনি কলকাতার বিখ্যাত দত্তদের একজন। স্বেচ্ছায় মাদ্রাজে নির্বাসিত। তিনি খৃষ্টান এবং কলকাতার বিশপ কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন। লেখাটি উদ্ধৃত করছি ।

'Not long ago we copied and commended an article which had originally appeared in the *Hindu chronicle*, a Madres newspaper conducted, as we inferred from its title, by a native. The beauty and vigour of the English struck us as being almost marvellous in the composition of a foreigner writing in a strange tongue, as the sentiments embodied appeared to us as truly English, as the style. Another Madras paper, the *Eastern Guardian*, now inform us that the Editor of the *Hindu Chronicle* is one who was sometime ago favourably noticed by us as the author of a poem entitled 'The captive ladie' and we may add, one to whom in conjunction with the poetical Duttas of calcutta, he being a Dutt self-exciled from Bengal—the *Calcutta Review* has since given a small European reputation, M. M. S. Dttta was

educated at Biships College here, and certainly that institution has no reason to be ashamed of him. He is a christian, and while describing the evils of caste so eloquently in the article which attracted our notice, he wrote, we suspect with all the feeling of a victim to its tyrany. We are glad, however, to be abe to infer that he no longer feels the pressure of the "want and sorrow" to the distractions of which he attributed some of the imperfections of his poetry."

—*Bengal Hurkaru*, dated Dec. 5, 1859.

এ সংবাদ প্রকাশ হবার পর Friend of Indiaও নীরব রইলেন না। ১২.১২.১৮৫০ তাঁরা লিখলেন—

"—We lately quoted from a paper Called *Hindu Chronicle* an article on caste which appeared to us to be written with too much idiomatic force to be the production of a native pen. We are now informed by the *Hurkaru* that the Editor of the *Madras Hindoo* Chronicle is one of the "poetic Duts" whose remarkable power of English versification have brought themfrequently before the public. The young man is a Christian and we are hnppy to hear in good circumstances"

—*Friend of India*, dated 12. 12. 1850, page 787.

এইভাবে সারা দেশে জানাজানি হয়ে গেল যে মাদ্রাজের হিন্দু ক্রনিকেল-এর সম্পাদক হলেন বাঙ্গালী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সাংবাদিক মধুসূদনের জীবনের-এর পরবর্তী ঘটনা আরো চমকপ্রদ। পরবর্তী কোন সংখ্যায় তা আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

প্রভাত দেবসরকার

স্ত্রৈণ, না—?

....

সুচারু হাতের লেখাটা টি-পয়ের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল; কেমন যেন উৎকর্ষ আর আতঙ্কিত হ'য়ে ঘরের চারদিক চেয়ে দেখল।

ওদিকে সোফায় গা এলিয়ে খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে যে লোকটি বসে আছে তার যেন কোন খেয়ালই নেই। সুচারু জানে ওকে এখন সচেতন করতে গেলে হয় কানের কাছে ঢাক নিয়ে পিটতে হ'বে নয় তো স্পর্শ ক'রে কি খোঁচা দিয়ে বলতে হ'বে, ওগো শুনছো?

আশ্চর্য, মানুষটার কোন কিছুতে যেন খেয়াল নেই, নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে থাকতে পারে! সুচারু ঠিক জানে না, এই জন্যেই লোকটিকে তার স্বামী বলে' ভাল লাগে কিনা, ভালবাসাটা তার স্বামীর নিরুপদ্রবতার জন্যে কি না! কিন্তু দিন দিন বড় বেশি যেন চুপচাপ হ'য়ে যাচ্ছে সুধাংশু।

ভয়ে ভয়ে সিলিং-এর দিকে চোখ তুলে দেখল সুচারু—মাথার ওপর শব্দটা বেশ জোরে জোরে হ'চ্ছে, মনে হ'চ্ছে ভারি একটা জিনিষকে যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হ'চ্ছে, এদিক ওদিক—দুপ্ দাপ্ শব্দ হ'চ্ছে সিলিং-এর ওপর।

হঠাৎ শব্দটার সঙ্গে একটা আর্তচীৎকারের রেশও কানে এসে বাজে। সুচারু মুখে ইস্-স্ বলে' ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল, উর্ধ্বমুখ হ'য়ে সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা ক'রলে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার সিঁড়ির মাথায় একটি মহিলাকে দেখা গেল—মুখের আর্তচীৎকারে আর বেশবাসের বিস্রস্ততায় মনে হয় গৃহস্থ-কর্তৃক সদ্য নিপীড়িতা মার্জ্জারী যেন!

সুচারু কি ক'রবে ভাবতে না পেরে যেন খানিক থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে মহিলাটি সিঁড়ির দু তিন ধাপ নেমে এসেই পড়ি কি মরি ক'রে ওপরে উঠে যে পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল। সিঁড়ির সামনে দোতলার ফ্লাটের দরজাটা দড়াম ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল।

সুচারু সিঁড়ির তলায় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে, বউটা অমন ক'রে ঘরের বাইরে এসে আবার ছুটে ফিরে গেল কেন। ঘরে কি ডাকাত

পড়েছে না, সত্যি কোন বিপদ আপদ ঘটেছে? এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হিসাবে তাদের এ সময় সাহায্য করা উচিত—

সুচারু ত্রস্ত পায়ে নিজের ঘরে এসে ততোধিক ব্যস্ত হ'য়ে সুধাংশুকে ঠেলা দিয়ে বললে, আঃ কি কাগজ পড়ছ, ওপরে কি হ'চ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? বোধ হয় কোন বিপদ-টিপদ—ছাখো ছাখো—

সুধাংশু কিছুমাত্র ব্যস্ত হল না, মুখের ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে সোজা হ'য়ে বসে' বললে, কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না, কার বিপদ, কোথায় বিপদ?

তেমনি ব্যস্ত হ'য়ে সুচারু বললে, শুনতেও পাওনি কিছু? এতক্ষণ কি কাণ্ড হচ্ছিল ওপরে—

উত্তরে সুধাংশু স্ত্রীর মুখের দিকে এমন ক'রে চাইলে সুচারু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে তেমনি বিহ্বল, ভয়-চকিত দৃষ্টিতে বার বার ওপরের দিকে চাইতে লাগল।

না, আর কোন সাড়া শব্দ নেই, অনুজ্জল সিঁড়িপথটা বাসি মড়ার মত কাঠ হ'য়ে আছে; দোতলা, তেতলা আর কতদূর যেন ওপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা খাড়া হ'য়ে।

আস্তে আস্তে ওপরে উঠে দেখবে নাকি, দোতলা ফ্ল্যাটের মহিলাটিকে ডেকে বলবে নাকি—কি হ'য়েছে ভাই—গোলমাল কিসের, অমন ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে কেন?

না, সুচারু তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, কি করবে না করবে ভাবতে পারলে না। ঠিক বুঝতে পারছে না এখন ওপরে উঠে গিয়ে পড়শীর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দেওয়া উচিত হ'বে না। মুখের ওপর উনি যদি বলেন—

ঘরে এসে সুচারু দেখলে, সুধাংশু তেমনি নির্বিকার, কাগজে মুখ ডুবিয়ে আছে, আরো যেন আরাম করে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

সুচারু টি-পয়ের ওপর থেকে সেলাইটা তুলে নিয়ে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা ক'রলে। সন্ধ্যে রাত্তিরে মনে হয় যেন কত রাত হ'য়ে গেছে, সে যেন সেলাই-ফোঁড়াই-এর নাম ক'রে কার প্রতীক্ষায় বসে আসে।

ওপরেও আর কোন সাড়াশব্দ নেই। কে বলবে এই কিছুক্ষণ আগেও ওপরের ভাড়াটেদের ঘরে একটা মহামারি হ'য়ে গেছে। সব চুপচাপ—বড় অস্বস্তিকর। এর চেয়ে যেন—

হঠাৎ নিজের মনে বিরক্তির সুরে সুচারু চীৎকার করে উঠলো, কি? কি!

সুধাংশু কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু-কণ্ঠে বললে, কিছু বললে?

না! সুচারু বেশ ক্ষেপে উঠলো, বাড়িতে এসেও যার স্ত্রীর সঙ্গে দুটা কথা বলার সময় হয় না তাকে আবার কি বলবো!

তেমনি স্মিত মুখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে সুধাংশু বললে, তার মানে?

সুচারু ঝট্ করে উঠে পড়ে হাতের সেলাইটা ছুঁড়ে দিয়ে গর গর ক'রতে ক'রতে বসবার ঘর থেকে ভেতরে চলে গেল।

সুধাংশু অপ্রস্তুতের মত স্ত্রীর গমনপথ লক্ষ্য ক'রে নিজের মনে বললে, যাঃ বাবা! আমার দোষটা কি?

তারপর সোফা থেকে উঠে পর্দা ঠেলে সুধাংশু বাইরে এসে করিডরে সিঁড়ির তলায় এদিক-ওদিক লক্ষ্য ক'রে যেন বিষয়টা সম্যক অনুধাবন করবার চেষ্টা করলে। সুচারু খানিক আগে এখানে এসে কি দেখে গেল যার জন্যে স্বামীর ওপর অযথা বিরক্ত হ'য়ে উঠলো—কি যেন বলতে গিয়ে বলতে না পেরে শুধু শুধু রেগে গেল?

ওপরে ওঠার বা ওপরে যাবার সিঁড়িতে এখন আবছা-আবছা ছায়া, যে আলোটা জ্বল্‌ছে তার মুখে বোধ হয় সাতপুরু ধুলো জমে আছে, কেবল সিঁড়ির ধাপগুলো দেখা যাচ্ছে, যেন বহুকাল আগের একটা পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাট, আরোহণ-অবরোহণের চিহ্ন নিয়ে জেগে আছে।

তিন ঘর ভাড়াটে থাকে এবাড়িতে, একতলা তিনতলা। এক তলায় এরা স্বামী-স্ত্রী, দোতলায়ও তাই, তিনতলায় কারা যেন থাকে, এখনো বিশেষ খোঁজ খবর রাখে না সুধাংশু।

আর তা ছাড়া সুধাংশুর সে-অবকাশ বা ইচ্ছাও নেই, ভাড়াটেরা কে কেমন কি পরিচয়, জানবার। ও কাজ সুচারুর, সারাদিন বাড়িতে থেকে আর কি কাজ!

নতুন বাসায় এসে প্রথম দিনই বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে সুচারু স্বামীকে বলেছিল, ওপরের ভাড়াটেও আমাদের মত, বেশ!

সুধাংশু বলেছিল, বেশ মানে?

ঘর গুছতে গুছতে সুচারু চোখ-মুখ ইঙ্গিতপূর্ণ ক'রে বললে, মানে কোন ঝামেলা নেই।

সুধাংশু না বোঝার ভান ক'রে বললে, অর্থাৎ?

মুখ ঘুরিয়ে যেন ঝাপ্‌টা মেরে সুচারু বললে, স্বামী আর স্ত্রী, কেবল দুটি প্রাণী!

সুধাংশু আর কিছু বলেনি। কিন্তু সুচারু শেষ করেনি, মাথার ওপরে যারা আছে ভাড়াটে হিসেবে তারা যে কত অভিপ্রেত স্বামীকে সুচারু বুঝিয়ে দিয়েছিল: বেশ নির্ঝঞ্ঝাট, ছেলেপুলে নেই, কোন গোলমালও নেই—আমরা যেমন শান্তি ভালবাসি ওরাও তেমনি, যে-যার সে-তার নিয়ে চুপ চাপ আছে। মনে নেই আগের বাড়িতে রাতদিন কি অশান্তি গোলমাল চেঁচামেচি, হৈ-হৈ, ছেলেমেয়েগুলো কি অসভ্য ছিল বলতো! উঃ এ বাড়িতে এসে যেন বেঁচেছি!

সুধাংশু অবশ্য কোন মন্তব্য করেনি। বাড়ী বদলের জন্যে সুচারুর খুব একটা যে আগ্রহ ছিল, তাও মনে পড়ে না। সুচারু যে এতটা শান্তিপ্রিয় নিরিবিলি পছন্দ করে তাও কোনদিন মনে হয়নি।

আজ তুলনায় পুরনো ভাড়াটে বাড়ীর পরিবেশটা যে একান্ত অনভিপ্রেত ছিল সুচারু কুটিয়ে কুটিয়ে বলেছিল, পাশে আভাদির এক কাঁড়ি ছেলেমেয়ে, সামনে একটা গ্যারেজ, রাতদিন খট্ খট্ ঠক্ ঠক্ দুম-দাম, কান ঝালাপালা; তারপর যত আজে-বাজে লোকের আনাগোনা আমাদের শোয়ার ঘরের জানালার সামনে দিয়ে, জানালা খোলবার উপায়ই ছিল না।

সুধাংশু প্রশ্ন করেছিল, দরজা-জানালায় পর্দা ছিল না?

পর্দাতে কি ক'রবে, একটু ফাঁক পেলেই—আহা তুমি যেন দেখনি, পর্দা শুদ্ধ জানালাটা রাতদিন বন্ধ ক'রে রাখতে হ'তো! দক্ষিণ দিকের জানালা—সুচারু আক্ষেপের সুরে বললে, সে তুলনায় এতো স্বর্গ! বেশ শান্তিতে আছি।

স্বর্গ না, পাতাল পুরী? দিক্‌বিদিকের কোন দরকার নেই, চারদিক বন্ধ! সুধাংশু বলেছিল।

তা হোক। এ বাবা বেশ আছি, নিজের ঘরে নিজের মত, কেউ দেখতে আসছে না, বলতে আসছে না! প্রায় প্রতিদিন গুছন ঘরকে আবার গুছিয়ে সুচারু বলতে থাকে। সুধাংশু খেয়াল করে না।

তবে এটা ঠিক, এবাড়ীতে উঠে এসে সুধাংশুর অনেক সুবিধে হ'য়েছে—শুধু কলেজ কাছেই নয়, পড়াশোনার পক্ষে আস্তানাটা বেশ নিরুপদ্রব। পাড়াপড়শীর ভিড় নেই, আত্মীয় স্বজনের আসা যাওয়া নেই, কি গোলমাল কিছু নেই! বাড়ীটা অনেক চেষ্টা ক'রে সন্ধান ক'রতে হ'য়েছে, সেলামীও বেশ কিছু বেশি দিতে হ'য়েছে।

কিন্তু যতটা নিশ্চিন্ত আর নিরিবিলিতে বাস করবার সুযোগ পেয়ে সুচারু উল্লসিত বা খুসী হ'য়েছিল, দু'দিনে তার উচ্ছ্বাস উবে গেছে। সুচারু খুঁত খুঁত ক'রতে আরম্ভ করেছে, প্রতিদিন প্রায় বাড়ীটার নানান অসুবিধার কথা উত্থাপন ক'রেছে।

সুধাংশু অত খেয়াল করেনি। স্ত্রীর স্বভাব তার জানা আছে—যে অসুবিধার কথা ও আজ বলছে, কাল আর তার কথা বলবে না। আর একটা নতুন কিছু আবিষ্কার ক'রবে। নেহাৎ অতিষ্ঠ হ'লে তখন দেখা যাবে।

একদিন সুচারু বললে, আমার কিন্তু একলা-একলা ভয় করে। সারাদিন—

সুধাংশু বললে, ভয়ের কি আছে—ওপরে দুঘর ভাড়াটে আছে, দরকার হ'লে—

তা নয়। একলা থাকা আমার অভ্যেস আছে। সুচারু উৎসুক দৃষ্টি মেলে বললে।

তা হ'লে? সুধাংশু স্ত্রীর কল্পিত ভয়ের কারণটা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে।

বাড়ীতে সুধাংশু চুপচাপ থাকে; যতক্ষণ থাকে তার কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। হয় নীরবে পড়াশোনা করে কি কলেজের খাতাপত্র দেখে। সুচারুর কথাবার্তায় যা বোঝা যায়, ঘরে কেউ আছে—

সুধাংশু বলেছিল, একলা-একলা যদি ভাল না লাগে ওপরের ভাড়াটে বউটির সঙ্গে ভাব ক'রতে পার। দু'জনে মিলবে ভাল, ছেলে-পুলে নেই, স্বামী—স্ত্রী—

সুচারুর মনঃপূত হয়নি, রাগ ক'রে বলেছিল, আমার বয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই—

কাজ না থাক, সময় তো কাটান চাই! সুধাংশু স্ত্রীর মনোগত ভাবটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কেন না আগের বাড়ীতে সুচারু অনেককে ডেকে এনেছিল মেলামেশার জন্যে। সুচারুকে সেই রাত দশটার আগে কখনো একলা পাওয়া যেত না, আভাদি, নিভা মাসী, প্রভাত বৌদি নানা জন আসা-যাওয়া ক'রে তার একাকীত্ব ঘোচাত। মুখে যতই বলুক আভাদির এক কাঁড়ি ছেলে মেয়ে, তারাই ওকে সব সময় ব্যস্ত ক'রে রাখতো। ঠিক একলা থাকার জন্যে ভয়ের কথা কোনদিন বলেনি সুচারু!

এর পর হঠাৎ একদিন অনুযোগ ক'রে সুচারু বললে, তাড়াতাড়ি বাড়ী

ফিরতে পার না? রোজ তোমার কলেজে এত কি কাজ থাকে যে, এত রাত ক'রে ফের?

হাতের বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে বেশ অবাক হ'য়ে সুধাংশু বললে, তার মানে, কত রাত হ'য়েছে? সবে তো রাত আট্‌টা, এখনো বোধ হয় স্থানীয় সংবাদ বল্‌ছে—.

সুচারু রাগ ক'রে বললে, আট্‌টাই বা হ'বে কেন! কলেজ তো বন্ধ হ'য়ে যায় পাঁচটায়!

সুধাংশু বললে, লাইব্রেরীতে গেছলুম!

তেমনি রাগ ক'রে সুচারু বললে, সেখানেই থাকতে পারতে, বাড়ী ফেরার দরকার ছিল কি!

সুধাংশু আর দ্বিরুক্তি করলে না। জামা-কাপড় ছেড়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল।

সুচারু আরো রেগে গেল, চট্‌ ক'রে সুধাংশুর মুখের ওপর থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে ভগ্নস্বরে বললে, এত পড়েও হয়নি, আবার বাড়ীতে এসে পড়তে বসেছ! যাও যাও যেখানে ছিলে সেখানেই গিয়ে পড় যত খুশী।

সুধাংশু তেমনি নিরুত্তর, বুঝি মনে মনে কৌতুক বোধ করে স্ত্রীর ইচ্ছা প্রকাশে।

সুচারু গর গর ক'রে বললে, জান, ওপরের উনি কটার সময় বাড়ী ফেরেন? চারটে বাজতে না বাজতেই চলে আসে!

সুধাংশু ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, হয়তো ভদ্রলোকের কোন কাজ নেই, কি থাকলেও নিজের ইচ্ছাধীন, স্বাধীন!

সুচারু ফুৎকার দিয়ে বললে, সবাই স্বাধীন আর উনি পরাধীন! ওঁর কাজ রাত দশটার আগে শেষ হয় না! মনে করেন আমি কিছু বুঝি না!

তর্ক ক'রলে অনেক কিছু বলা যায়, কার্যগতিকে কর্তা ব্যক্তিদের কার কখন বাড়ী ফেরার সময় তারও একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্ঘণ্ট দেওয়া যায়। কিন্তু সুধাংশুর যা স্বভাব, ও সবের মধ্যেই সে গেল না। নিক্ষিপ্ত কাগজ খানা মেজের ওপর থেকে তুলে নিতে মাথা নিচু ক'রলে।

সুচারু আরো যেন ক্ষেপে গেল। যেন হাতে-নাতে ধরা পড়েও ফের স্বীকার করছে না। খবরের কাগজখানা স্বামীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আসবার ইচ্ছে নেই তাই বল! বাইরে থাকতেই তোমার ভাল লাগে!

এতক্ষণে সুধাংশু একটু বিরক্তি প্রকাশ করে, কি মুশকিল! বাইরে আবার রইলুম কখন? দুপুর বেলা কলেজ যাওয়া ছাড়া সব সময়ই তো বাড়ীতে আছি।

হঠাৎ সুচারু যেন কেঁদে ফেললে, না না, তুমি কখনো আমাকে একলা রেখে যাবে না।

সুধাংশু কি করবে না করবে ভেবে পেল না। ঠিক এই ধরণের ব্যবহার সে কোনদিন সুচারুর কাছ থেকে আশা করেনি!

রাত আটটা নটার সময় কতদিনতো বাড়ী ফিরেছে। সুচারু কোন অভিযোগ করেনি, বরং তার জন্যে শান্তশিষ্ট ভাবে অপেক্ষা করেছে, বাড়ী ফিরলে খুশী হ'য়ে স্বামীর সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করেছে। আজ আবার একি ওর মাথায় ঢুকলো! মিছি মিছি অশান্তি করছে—বেশ তো শান্তিপ্রিয় ছিল!

তারপর কয়েকদিন অবশ্য সুচারু আর কিছু বলেনি, সুধাংশু চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে পারেনি। সঙ্কোচ থাকলেও সুচারুর ব্যবহারে কোন ইতর বিশেষ হয়নি। যেন স্বামীর সকাল সকাল বাড়ী ফেরায় তার কোন মাথা ব্যথা নেই। স্বামী-স্ত্রীর নিরপদ্রব জীবন যেন উভয়ের অভিপ্রেত, প্রয়োজন ছাড়া প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু কেউ কারো কাছে প্রত্যাশাও করে না—ভদ্র, সুস্থ, স্বাভাবিক—

একদিন কথাটা সুচারুই তুললে। খাবার টেবিলে খাবার সজিয়ে সুধাংশুর মুখোমুখি বসে সুচারু বললে, আচ্ছা, আজকাল ভদ্রলোকেরা কি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, মানে মার-ধোর করে?

সুধাংশু বললে, সে আবার কি, কে বললে?

সুচারু গম্ভীর হ'য়ে বললে, মার-ধোর করে কি না বল না!

তা কি ক'রে বলবো? শুনিনি তো কখনো—সুধাংশু স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলে, ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

তোমার বন্ধুরা কেউ কখনো তাদের স্ত্রীদের—হঠাৎ সুচারু নিজের মনে হেসে উঠলো।

আমার বন্ধুদের কি এতই জানোয়ার ভাব? সুধাংশুও হাসবার চেষ্টা করলে।

সুচারু খানিক চুপ করে থেকে বললে, না তাই জিজ্ঞেস করছি!

তারপর মুখে অক্ষমতার ভাব ক'রে বললে, কি করে বউগুলো সহ্য করে

অবাক কাণ্ড! তারও পরে একদিন রসিয়ে রসিয়ে সুচারু স্বামীকে ঘটনাটা বললে। ক্রোধ, ক্ষোভ, অক্ষমতা, অনীহা তার মুখে চোখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা ওপরের ভাড়াটে দম্পতিকে নিয়ে। সুচারুর নতুন অভিজ্ঞতা, বলতে বলতে সুচারু মুখচোখের ভাব এমন করছিল যেন একটা দুঃস্বপ্নের কথা সে কিছুতে ভুলতে পারছে না।

সেদিন সুচারু নিজের চোখে দেখেছে, ঘরের মধ্যে থেকে মারতে মারতে দোতলার বিমলবাবু না কে লোকটা বউটাকে সিঁড়ির মাথায় এনে ফেলে দেয় আর কি ভাগ্যিস সুচারু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, না হ'লে কি যে হত বলা যায় না। ইস্-স্ দুপুর বেলা সেদিন ঘরের মধ্যে কি ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি, কামড়াকামড়ি; ঘরদোর সব উল্টে যায় আর কি! ছি ছি!

তারপর লোকটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে কতক্ষণ পরে সুচারু সমবেদনা বশে চুপি চুপি ওপরে উঠে গিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছিল। মনে করেছিল বউটা বোধ হয় আধমরা হ'য়ে পড়ে আছে কি মরেই গেছে। আহা!

কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার কথা এখন বলতে সুচারুর গা-টা কেমন ক'রছে, ছি ছি! কি বেহায়া আর নির্লজ্জ বউটা! এত মার খেয়েও লজ্জা নেই, এমন ব্যবহার ক'রলে যেন কিছুই হয়নি, যেন তার বড় সুখ হ'য়েছে, বড় আরাম পেয়েছে স্বামীর হাতে মার খেয়ে! কে জানে বাবা কুকুর-বেড়াল নাকি! সব থেকে আশ্চর্য, বউটা স্বামীর হাতের নির্যাতনের চিহ্নগুলো সুচারুর চোখের উপর তুলে ধরেছিল। চোখে চোখ পড়তে বাহাদুরী ক'রে হেসেছিল। কি বেহায়া, কি নির্লজ্জ, মাগো! এতটুক যদি ঘেন্না থাকে! চোখের কোণটা কেটে গেছে, বুকের কাছটা—

সুচারু দুম করে বললে, আমি হ'লে কোন্‌দিন গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম! স্বামী না শয়তান!

সুধাংশু চুপ ক'রে শুনে গেল, কোন মন্তব্য ক'রলে না। হয়তো বিষয়টা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাছাড়া পরের ঘরের ব্যাপারে মাথাব্যথা না করাই ভাল। (হয়তো এই কারণেই সুচারুর একলা থাকতে ভয় করে।)

সুচারু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, ছোটলোকের কাণ্ডকারখানা! না বাপু এখানে থাকা চলবে না! কোন্‌দিন—

কথাটা সম্পূর্ণ না ক'রে সুচারু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে আশ্চর্য, মানুষটার কোন বিচার নেই! সে বকছে তো বকছেই।

হঠাৎ সুচারু স্বামীকে সচেষ্ট ক'রতে হাত ধরে টেনে বললে, হ্যাঁ গো, তুমিও কোন্‌দিন আমাকে অমন ক'রে মারবে নাকি? কি চুপ করে আছ কেন, বল মনের কথাটা স্পষ্ট করে, শুনি—মতলবটা কি?

সুধাংশু একথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। আর কি কথায় কি! ম্লান হাসলে কেবল।

সুচারু স্বামীর হাত ছেড়ে যেন গম্ভীর হ'য়ে বললে, তা হ'লে কিন্তু আমাকে আর দেখতে পাবে না! স্বামী নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে লোকের সামনে বেহায়ার মত হাসতে পারবো না। জেনেশুনে বলতে পারবো না, ও কিছু না, কলতলায় যেতে গিয়ে—

হঠাৎ সুচারুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি, কি যাতা বলছে। সত্যি সে সুধাংশুর সম্বন্ধে এই সব আজকাল ভাবছে নাকি! সুধাংশু স্ত্রীকে কাছে টেনে আদর ক'রে বললে, এত ইতর পশু ভাব তুমি আমাকে?

বিগলিত সুচারু খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে বললে, বউটার কথা তুমি যদি শুনতে—মার খেয়ে কত যেন সুখ, কত আরাম হ'য়েছে! মাগো—ঘেন্না নেই!

কিন্তু এরপর সুচারুর ভাবান্তর লক্ষ করা যায়। সুধাংশু যে সময়টুকু বাড়ী থাকে, সুচারু আর তেমন কথাবার্তা বলে না। সব সময় নিজের কাজে মগ্ন হ'য়ে থাকে। সুধাংশু আলাপ করবার চেষ্টা করে দেখেছে, ঠিক আগের মত যেন বাজে না। কাটা কাটা, ছাড়া-ছাড়া উত্তর দেয়। কারণ জিজ্ঞেস ক'রে সুধাংশু কোন স্পষ্ট উত্তর পায়নি। অবশ্য সে খেয়ালও করেনি, ভেবেছে শরীর টরীর খারাপ মেয়েদের যেমন হয় মাঝে মাঝে। আবার ঠিক হ'য়ে যাবে।

কিন্তু না, সুচারু দিন দিন যেন আরো বেশি গম্ভীর আর আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে যাচ্ছে। আগের মত স্বামীর বাড়ী-ফেরা কি, বাড়ী থেকে বেরন নিয়ে অনুযোগ করে না। যেন সর্বক্ষণ একলা থাকতেই সে চায়। একাকীত্বের ভয় আর যেন নেই।

অবস্থাটা সুধাংশুর ভাল লাগে না। সে নিজে যাই হোক, স্ত্রীও যে তার মত নিঃশব্দচারিনী হ'বে এটা সে চায় না। বেশ মুশকিলে পড়ে সুধাংশু!

মাথার ওপরে ওঁদের খবর কি? স্ত্রী নির্যাতনের কথা জানা-জানি হ'য়ে কি ওরা লজ্জা পেয়েছে, তাই চুপচাপ আছে। সুচারু যখন আর কোন কথা বলে না তখন নিশ্চয়ই ওরা সাবধান হ'য়েছে, বউটি বোধহয় আর বেহায়াপনা করে না।

কথাটা উত্থাপন ক'রে স্ত্রীকে উদ্দীপ্ত করতে সুধাংশু সুচারুকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে, কি খবর গো? আর কিছু—

যেন বিরক্ত হ'য়ে একান্ত অনিচ্ছাভরে সুচারু বলেছে, কিসের কি খবর ?

সুধাংশু হেসেছে, ঐ ওপরের ওঁদের, মানে মারামারি, ঝাপটাঝাপটি ? তেমনি ম্লান হেসে সুচারু বলেছে, কি জানি।

সুধাংশু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, যাক, বাঁচা গেছে! এতেও সুচারুকে বিশেষ উৎসাহিত করা গেল না।

কিন্তু অত সহজে বুঝি বাঁচা গেল না। ঠিক তখুনিই মাথার উপর দুপ-দাপ্ শব্দে উভয়েই সচকিত হ'য়ে উঠলো। তারপর হৈ-হৈ, আর্তনাদ, চীৎকার! আবার বুঝি—

সুধাংশু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়াল। দোতলায় দরজা-জানালা, খাট-আলমারী যেন উল্টে পাল্টে কেউ ভাঙছে কি টান মেরে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ফেলছে, নারী কণ্ঠের বিলাপ যেন রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটছে।

রাগে সুধাংশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠে। ছি ছি ওপরের ভাড়াটেটা কি, পশু না কসাই, নিজের স্ত্রীকে এমনি—

দুধাপ সিঁড়িতে উঠতেই সুধাংশু বাধা পেল; সুচারু কখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সুধাংশুর জামা ধরে টানলে। সুধাংশু ফিরে তাকাবার আগেই দোতলার বউটি ওপরে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে—বিবস্ত্রা ভীতা সন্ত্রস্তা, নিপীড়িতা…

সিঁড়ির আলোটা অন্য দিনের চেয়ে যেন আজ অধিক উজ্জ্বল। সুধাংশু বউটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সদ্য নির্যাতনের চিহ্ন ছাড়া আর যা দেখলে তাতে তার দেহ-মন যেন শির শির ক'রে উঠলো। ইস্-স গর্ভিনী স্ত্রীকে—

মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি সুচারুকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেই সুধাংশু এক বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হ'লো। হঠাৎ সুচারু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে-কামড়ে একাকার ক'রে দিলে।

সুধাংশু স্ত্রীর অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে স্ত্রীকে জোরে ঠেলে দিলে। সুচারু সামলাতে না পেরে মেজের ওপর আছড়ে পড়ল।

নিজের ব্যবহারে সুধাংশু যেন হতভম্ব হ'য়ে গেল। আজ একি করলে সে, সত্যি সত্যি স্ত্রীর গায়ে হাত তুললে? শেষটা সেও—

না, সুচারুর আঘাত বোধ হয় গুরুতর হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে স্বামীকে ঠেলে নিয়ে সোফার ওপর উঠে, হৈ-হৈ ক'রে বললে, মার! মার যত খুশী পার মার! আমি কিছু বলবো না।

মুখে অদ্ভুত একটা আশ্লেষের শব্দ ক'রতে লাগল।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ

"ঠাকুর নিজে একজন কত বড় Artist (শিল্পী) ছিলেন ?" —স্বামী বিবেকানন্দ।

"বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল, কেউ চিনলে না।" —শ্রীরামকৃষ্ণ।

কবিকে চিনতে পারেন কবি। শিল্পীই বোঝেন আর এক শিল্পীর সত্তা। নরেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ চিনেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ।

আত্মপরিচয় ও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী পরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বাউলের দলের উপমাটি দিয়েছিলেন। বাউলদলের আত্মতন্ময় গান যাঁরা শুনেছেন, গাইতে গাইতে কখনো তাদের সর্বদেহে ভাবের জোয়ার নৃত্যের ঘূর্ণিতে পরিণত, কখনো তাদের পা দুটি মাটি ছুঁয়ে আছে, কখনো শূন্যে উঠে যাচ্ছে, আবার দ্রুত পদক্ষেপে সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ফিরে একতারাতে, খঞ্জনীতে ডুগীর শব্দে এক ভাবতন্ময় আবহ সৃষ্টি করে চলেছে—এ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই জানেন, বাইরের জগৎকে নিঃশেষে ভুলে গিয়ে অন্তরের গহনে জ্বলা শিখার আভাস কেমন করে বাউল চোখেমুখে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি আবার বাউলের বেশে আসবেন।

তাই তো স্বাভাবিক! বাউলের মতো জাতশিল্পী দুনিয়ায় বিরল। সহজ না হলে তো সহজকে চেনা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণজীবননাট্যে যে বাউলের দল দুনিয়ার আসরে নেচে গেয়ে চলে গেছেন, কজন তাঁদের চিনতে পেরেছিল, আজও বা ক'জনে তাঁদের মর্ম জানে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় সেই চোর চোর খেলার গল্প মনে পড়ে—বুড়িকে ছুঁয়ে দিলে আর তো খেলা থাকে না! চেনা অচেনায় সেই খেলাতেই নিত্যের লীলারূপ।

আবার তিনিই তো বলেছেন—'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতে হবে! আসতেই হবে!' কারণ, তাঁরই ভাষায়—তিনি খুব কান খড়কে, সব শুনতে পান গো! যত ডেকেছ সব শুনছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন।'

জগতের সব শিল্প, সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য—কলাবিদ্যার সমস্ত রূপে রেখায়

সেই আনন্দঘন রসো বৈ সঃ—যিনি রসস্বরূপা, তাঁর উদ্দেশ্যে যাত্রা। তাই তো বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্যের মতো ব্যক্তিদের ঘিরে এতো গান, এতো উন্মাদনা, এতো শিল্প, সাহিত্য, সৌন্দর্যের যুগে যুগে অভিব্যক্তি রসরূপ। জীবনের নিহিত শিল্পচেতনার আলোকে নিখিল বিশ্বের আত্মদর্শন।

ছবি ও গান, কথা ও কাহিনী রেখা ও মূর্তি—ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ সব কলাবিদ্যাতেই পারঙ্গম। কিন্তু সবার সেরা শিল্প যে ভাবলোকের কথা, সে জগতেও মুহুর্মুহু তাঁর রূপ ও অরূপের লীলা। একাধারে তিনি শিল্প ও শিল্পী। যেখানে শিল্প সেখানে জগজ্জননী তাঁর এই সন্তানটিকে কতো না ভাবে সমাধিতে নৃত্যে গীতে সমাধির তুরীয় লোক থেকে অনুভূতি সঞ্চারের আনন্দলোক অবধি বিশ্বজনের নয়নগোচর করেছেন; আর যেখানে শিল্পী সেখানে আপন দিব্য-জীবনবীণাটি পরমরাগিণীতে বাজাবার সাধনায় অনুক্ষণ তন্ময়। সে বীণাধ্বনি আবার নিখিল অনুরাগীবৃন্দের প্রাণে ধ্বনিত হয়ে বিশ্বহৃদয়ে এক মহাসংগীত ধ্বনিত করে চলেছে।

চারিত্রপূজা গ্রন্থে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্যপ্রকাশ ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্যপ্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্যপ্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশী দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয়, এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।"

সব শিল্পের উপরে তাই জীবনশিল্প। শিল্প জীবনকে পূর্ণতা দেয়, এবং জীবনশিল্পকে প্রবুদ্ধ করে। তবু এক একজন যুগমানবের হৃদয়কেন্দ্রে নিত্যকালের প্রেরণাশক্তি থাকে, কালের সীমা পার হয়েও যার স্পন্দন অনাহত। বিশেষ যুগের প্রয়োজন তাঁদের আবির্ভাবের পটভূমিমাত্র। আসলে তাঁদের আবির্ভাব মানুষের সত্যানুসন্ধানের চিরন্তনতায়।

কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন—'এবার গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেইরকম।' তাই বুঝি বাইরের রূপ তিনি সংহরণ করেছিলেন। ধন জন লোকমান্য সম্পূর্ণ পরিহার। বাইরের কোনো অস্ত্র নয় সজ্জা নয় কিন্তু সত্য ত্যাগ পবিত্রতা ও ঈশ্বরোপলব্ধির আনন্দ-ঘন একালে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারে নিমেষে আলোকস্বরূপ।

তবু মানবদেহ মানবমন নিয়ে এ আলোর জন্য তাঁকে তিলে তিলে সাধন পন্থায় অগ্রসর হতে হয়েছে। সে সাধনা বিশ্বজনের কল্যাণে তো বটেই। সেইসঙ্গে মানবজীবনে ঈশ্বর চেতনার স্তরপরম্পরাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যও বটে। সাধারণতঃ শিল্পীরা আপন সৃষ্টিরহস্য সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু জীবনশিল্পীর কাজ যে জীবনের প্রতিটি কথায়, কর্মে, আচরণে, ধ্যানে সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত অনন্তের অনুভব সঞ্চার করা। তাই লোকচক্ষু তাঁকে যতটা দেখতে পায় তার আড়ালেও তাঁর জীবনটি অনুক্ষণ সেই মহত্তম আদর্শের প্রকাশ হয়ে থাকে।

শ্রেষ্ঠ কীর্তি আর তুচ্ছতম কাজ—জীবনশিল্পীর কাছে কোনোটিই তাৎপর্য-হীন বা অসুন্দর হতে পারে না। কিন্তু সে তাৎপর্য বা অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন তেমনি শিল্পচেতনা সম্বন্ধে একটি মন! কোনো সন্দেহ নেই যে, এক রাধাই রাধাকে কল্পনায় আনতে পারেন। একজন যীশুখৃষ্টই আর একজন যীশুখৃষ্টকে উপলব্ধির যোগ্যতা রাখেন। বিবেকানন্দও জীবনের শেষ দিনটিতে স্বগতভাষণে বলেছিলেন 'যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকতো!' তিনি তো চিনেছিলেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণরই শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বিবেকানন্দ।

সে মহাশিল্পের প্রকরণব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—'মনের বাইরের জড়শক্তিগুলোকে কোনো উপায়ে আয়ত্ত করে কোনো একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙ্গত পিটত গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার (Miracle) আমি আর কিছুই দেখি না।'

এ-দেশের রসশাস্ত্রীরা কাব্যরসকে বলেছেন অলৌকিক। বস্তুসত্তাকে অতিক্রম না করে কোনো শিল্পই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একদিকে শিল্প যেমন অলৌকিক, আর একদিকে সেই কারণেই তা কালাতীত। বস্তুকে অবলম্বন করেই রসের জগতে উত্তরণ, কালের সীমা থেকেই অসীমকালে প্রয়ান।

জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে স্বামীজীর কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের স্বক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। নিপুন শিল্পী যেমন বহুদিনের অভ্যাসে ও প্রযত্নে আপন শিল্প বিদ্যাটি আয়ত্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনেও তেমনি যখন যে পন্থায় তিনি সাধনা করেছেন সেই পন্থার সব উপাদান, উপকরণ ও ভাব সম্ভার তিনি আপন জীবনে প্রযোগ করে তবেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর

বাণীতে যেমন ভাবসৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির অমোঘ নির্দেশ কার্যকর, তাঁর জীবনেও তেমনি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্লান্ত সাধননিষ্ঠা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের আবির্ভাবের মতো আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছু ঘটে নি। নতুন ভারত গঠনে তাঁদেরই প্রাণসত্যের সঞ্জীবনী স্পর্শ জাতির মর্মসত্যকে জাগ্রত করেছে—শুধু ব্যক্তি গোষ্ঠীজীবনে নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনের আধারশক্তিরূপে তাঁদের জীবনবেদ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সার্থকতার আধুনিকতম রূপায়ন। জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পময় জীবন তাই আমাদের স্মরণীয়। অতীত স্মৃতিচারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত।···

"পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম। আর ছোট ছোট ঠাকুর গড়তে পারতুম।"

"সদাব্রত, অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম ; গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শুনাতুম।"

"আমি এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম (ভক্তিমূলক গান—দাশরথি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির)। এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়াদমন যাত্রার দলে ছিলাম।"

সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয়—এসবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত শিল্পরুচি। এ সব বিষয়ে বিশেষ কারু শিষ্যত্ব তিনি করেন নি বলেই মনে হয়। অথচ তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এ সব বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক নৈপুণ্যের শতমুখে প্রশংসা করেছেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিল্পী প্রতিভার পরিচায়ক এই গল্প দুটিতে তাঁর কৈশোর যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয়—(ভাষান্তরে ঘটনা দুটি এরকম—

বালক গদাধর একদা তার ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে কুমোরের মূর্তিগড়া দেখতে এসেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠলো—'এ কি হয়েছে ? দেবতার চোখকি এমন হয় ? এই ভাবে আঁকতে হয়'—এই বলে দেবতার চোখে যে 'অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের" একত্র সমাবেশ হয়ে মূর্তিগুলিকে জীবন্তদেবভাবাপন্ন করে তোলা প্রয়োজন, সেকথা বালক গদাধরে ব্যাখ্যায় এমনভাবে ফুটে উঠলো যে আর সবাই তো শুনে অবাক !

আর একদিন সঙ্গী খেলুড়েদের নিয়ে পুজোর খেলায় তিনি আরাধ্য দেবতার ছবি এত সুন্দর এঁকেছিলেন যে, লোকে ভেবেছিল বুঝি বা সে ছবি বিশিষ্ট কোনো পটুয়ার আঁকা।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথায়'—লিখেছেন যে, কাশীপুরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ "একদিন একটি ছোট কাঠি লইয়া দেয়ালের বালির উপর একটি পাখি বসিয়া আছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে আঁকিলেন। পাখিটি জীবন্ত পাখীর ন্যায় দেখিয়া আমি অবাক হইয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন ; 'আমি ছেলেবেলায় সব পোটোকে ছবি এঁকে অবাক করে দিতাম।" [আমার জীবনকথা : পৃঃ ৮২]

এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসুর ভাবলোকে অবনীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যতখানি, রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের প্রভাব ততখানি তো বটেই, বরং তারও বেশি। দক্ষিণেশ্বরে দেয়ালের গায়ে আঁকা রামকৃষ্ণদেবের দুটি ছবির নকল আমরা নন্দলালের মারফৎ দেখতে পেয়েছি।

"জাহাজ" এবং "আতা গাছে তোতা পাখি"—ছবি দুটিতে রেখার নৈপুণ্য বিস্ময়কর।

ভারতশিল্পের মূল প্রেরণা ভক্তি। তাই মনুষ্যদেহের অবয়বসংস্থানের সৌন্দর্যের চেয়ে ভাবসৌন্দর্যই ভারতীয় শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। যদিচ প্রতি অঙ্গের লাবণ্য সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পীর রূপদৃষ্টিও অতন্দ্র। সেদিক থেকে দেবপূজার সার্থকতা সম্পাদনে উপাসকের ভক্তির সঙ্গে প্রতিমার সৌন্দর্যও যে বিশেষ প্রয়োজন—এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁর আরাধিতা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনী-বিগ্রহটির মতো অনিন্দ্যসুন্দর কালীমূর্তি কলকাতার আশে পাশে খুব কমই চোখে পড়ে। যদুলাল মল্লিকের বাড়ীতে যে সিংহবাহিনীমূর্তি তিনি দর্শন করতে যেতেন, বাংলা শিল্পকলার তা এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নিজের পূজার জন্য স্বহস্তে তৈরী শিবমূর্তির সৌন্দর্যই মথুরামোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রাণী রাসমণির সঙ্গে যোগাযোগের কারণ। মূর্তিশিল্পে এই পটুতার ফলেই পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের বিষ্ণুমন্দিরের কৃষ্ণ-মূর্তিটির ভাঙা পা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই সুকৌশলে জোড়া দিতে পেরেছিলেন। এমন জোড়াদেওয়া মূর্তিটি পূজো করার বৈধতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁদের যে সকৌতুক জবাবে তিনি নিরস্ত করেছিলেন সেকথা সুবিদিত। কিন্তু এর পিছনে একটি শিল্পীর অনুরাগও ক্রিয়াশীল ছিল, সন্দেহ তাই—যে শিল্পী

ভাবের দৃষ্টিকেই বড়ো করে দেখে, বস্তুর দৃষ্টিকে নয়। জমিদার জয়নারায়ণের প্রশ্নের উত্তরে এই মহাশিল্পীরই উক্তি—"অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি তিনি কি কখনো ভাঙা হন?"

জয়নারায়ণ ঘটনার বস্তুগত সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু ভাবের জগতে তো অখণ্ড দৃষ্টিরই গভীরতম সত্যবোধ!

স্বভাবশিল্পী গদাধর ছোটবেলায় যাত্রার আসরে শিবের বেশে দাঁড়িয়ে যে ভাবস্থ হয়েছিলেন, সেকথা আমরা জানি। ঠিক এমনি ভাবাবেশের কথা আছে চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের বাল্যলীলাবর্ণনায়। লক্ষ্মণের শক্তিশেল বিষয়ক অভিনয়ে শিশু নিতাই সত্যি সত্যি শেলাহতের মতো মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সে অভিনয়ে দর্শকেরা এমন আশ্চর্য অভিনয় দেখে পরস্পর বলাবলি করছিলেন প্রাচীন বাংলাদেশের সেই অজ্ঞাতনামা অভিনেতার কথা। দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে যিনি—'রাম বনবাসী শুনি এড়ে কলেবর।'

চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ীতে মহাপ্রভুর লক্ষ্মীদেবীর ভূমিকাভিনয়ও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহাপ্রভুর জীবনে মাতৃভাবের দিব্য আবেশ ওই একবারই দেখা যায়। আর এযুগের শিশু গদাই' বড়ো হয়ে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'র (এ নাটকও মূলতঃ 'চৈতন্যভাগবতে'র নাট্যরূপ) অভিনয় দেখতে গিয়ে বলেছিলেন —'আসল নকল এক দেখলুম।' অথচ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবন-যাপন পদ্ধতি তাঁর অজানা ছিল না। ভাবগ্রাহী তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চকে যে সম্মান ও আভিজাত্য দিয়ে গেলেন, বাংলার নাট্য আন্দোলনে আজও তা স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার রঙ্গমঞ্চের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা যদি কেউ থাকেন তিনি গিরিশগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ।'[১]

[ক্রমশঃ]

---

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচারে ৩রা মার্চ ১৯৭১ এ প্রদত্ত তারাপ্রসাদ খৈতান বক্তৃতামালার চতুর্থ বক্তৃতা। মূল বিষয়ের নাম—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা-সাহিত্য।"

সুজিতকুমার ভট্টাচার্য

দৃষ্টি

আমি অফিস থেকে ফিরতেই ব্রততী আমার হাতে পোষ্টকার্ডখানি তুলে দিয়ে বলল : ত্রিবেণী থেকে তোমার কে এক মায়াদি লিখেছেন।

আমি সাগ্রহে পোষ্টকার্ডখানিতে চোখ রাখলাম। এবং পড়া শেষ করে ব্রততীর দিকে তাকিয়ে দেখি তার জিজ্ঞাসু চোখ আমার মুখে নিবদ্ধ।

আমি ছোট করে হাসলাম : তুমি পড়েছ?

—মায়াদির চিঠি বলেই পড়েছি। মায়ার হলে পড়তাম না।

ব্রততীর চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি।

এবার আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম : আরে না, না, আমি সেকথা বলছি না। আর তাছাড়া সেরকম চিঠি পোষ্টকার্ডেও আসে না। তার জন্যে খাম আছে—নিদেনপক্ষে ইন্‌ল্যান্ড।

একটু থেমে ব্রততীর দিকে তাকালাম : আমি জানতে চাইছি চিঠিখানা পড়ে তুমি বুঝলে কিছু?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রীম্ মাখছিল ব্রততী। আয়নায় চোখ রেখেই উত্তর দিল : কিছু কিছু বুঝলাম বৈকি।

—যথা?

—আমি অফিসের পোশাক···ছাড়তে সুরু করলাম।

ব্রততী আয়না থেকে চোখ ফেরাল। এবং উজ্জ্বল হেসে আমার দিকে তাকাল : তোমার মায়াদি আমাকে দেখেন নি। বিয়ের সময় আসতে পারেন নি। তুমি তাঁকে কথা দিয়েছিলে আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবে। প্রায় বছর ঘুরতে চলল আমাদের বিয়ে হয়েছে—কিন্তু তোমার আর সময় হল না তাঁকে তোমার 'বৌ' দেখাবার। তাই—

—মায়াদির অভিমানে ভরা এই পত্রাঘাত।

ব্রততীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলাম। এবং লুঙ্গিটা পরে একটি সিগারেট ধরালাম :

অত্যন্ত ভাল মেয়ে এই মায়াদি। আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করে।

—চিঠির ভাষা দেখেই তা বোঝা যায়।

ব্রততী সযত্নে কুমকুমের টিপটা কপালে আঁকল। আমি মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকালাম: চমৎকার—অপূর্ব লাগছে তোমাকে।

আমার কথায় লাল হল ব্রততী: অসভ্য কোথাকার!

বলে মিষ্টি হাসল: চল না একদিন ত্রিবেণী বেড়িয়ে আসি।

আমি সিগারেটের ছাই ঝাড়লাম: গেলে মন্দ হয় না।

—কবে যাবে?

ও যেন লাফিয়ে উঠল।

—কবে যাব—

আমি ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ রাখলাম: সামনের রবিবারই চল না!

—বেশ, চল।

ব্রততীর চোখ-মুখ খুশীতে চকচক করে উঠল। এবং একটু থেমে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলে উঠল: যাও তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস। তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

ব্রততী ব্যস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে আবার মায়াদি-প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম আমরা। ব্রততীকে সব বললাম: লতায় পাতায় কেমন এক দূর সম্পর্কের ক্ষীণ আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে মায়াদির সঙ্গে—মায়াদির বিয়েতে বাস রিজার্ভ করে কেমন হৈ হৈ করে ত্রিবেণীতে সবাই বৌ-ভাত খেতে গিয়েছিলাম—বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মায়াদির স্বামী কেমন করে একদিন হঠাৎ ফ্যাক্টরির মেসিনে কাজ করতে করতে প্রাণ হারাল—এই সব গল্প।

—আহা রে!

ব্রততীর দুঃখিত-গলা।

আমি সিগারেটে দীর্ঘ টান দিলাম: হ্যাঁ, বড়ই ট্র্যাজিক-লাইফ্ মেয়েটির।

নিশ্চুপ ব্রততী আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে।

—তোমার স্যুট্‌কেস গুছিয়ে নাও। মাঝে তো আর মাত্র তিনটে দিন।

আমি গুমোট পরিবেশটাকে হাল্‌কা করতে চেষ্টা করলাম।

…নির্দিষ্ট দিনে মায়াদির বাড়ির দরজায় আমাদের সাইকেল-রিক্সা দাঁড়াল।

আমাদের দেখতে পেয়ে মায়াদি ছুটে এল : আসতে পারলে তা'হলে ?

কথাগুলো অবশ্যই আমাকে উদ্দেশ্য করে এবং আমি কি একটা উত্তর দিতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি মুখ খোলবার আগেই ব্রততী কলকল করে উঠল : আজও আসছিল না দিদি, আমিই জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

বলে তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল।

আমার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না যে, ব্রততী আমাকে নিয়ে একটু মজা করতে চাইছে।

মায়াদি সুন্দর হাসল : তা আমি জানি। ওই কুঁড়ের বাদশাকে আমার চিনতে বাকী নেই।

আমাদের পেয়ে মায়াদির সে কী আনন্দ! কোথায় বসাবে—কি খাওয়াবে—যেন ভেবেই পাচ্ছে না। পাড়ার লোককে ডেকে ডেকে ব্রততীকে দেখাতে লাগল : আমাদের রঞ্জনের বৌ।

রঞ্জন, অর্থাৎ আমি তাদের সকলেরই পরিচিত। তারা আমাকে ঘিরে ধরল সবাই : কেমন আছ—আর যে এদিকে আসাই হয় না—বিয়ে করে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে নাকি—ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন তারা আমার দিকে ছুঁড়তে লাগল।

মোট কথা, আমাদের নিয়ে মায়াদির বাড়িতে যেন রীতিমতন উৎসব সুরু হয়ে গেল।

...বিকেলে মায়াদি আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুল। ব্যান্ডেল থারমো-প্ল্যান্ট—টিস্যু মিল—গঙ্গার ধার।

—তোমার দাদা প্রায়ই আমাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে আসত। বসতাম ওই দিকটায়—ভাঙ্গাঘাটের কাছে।

আমার অথবা ব্রততীর, যার উদ্দেশ্যেই হোক, কথাগুলো বলল মায়াদি।

আমরা নিশ্চুপ—পলকহীন চোখে মায়াদির মুখের দিকে তাকিয়ে।

মায়াদি আত্মস্থ ভঙ্গীতে বলে চলল : সেবার তোমার দাদার কী খেয়াল হল, বলল—চল নৌকো চাপব। বলে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা নৌকোয়—গঙ্গার মাঝ বরাবর খানিকটা ঘুরে এলাম।

একটু থামল মায়াদি। খুব সম্ভব অতীতের ধুলোভরা ছবিগুলো একটু ঝেড়ে মুছে নিল : ও খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারত। বেশ মনে আছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও সেদিন আবৃত্তি করেছিল গঙ্গার বুকে। আর আমি গেয়েছিলাম একটি রবীন্দ্রসংগীত।

তাকিয়ে দেখি মায়াদির চোখে মুখে কিশোরীর লজ্জা।

—চল তোমাদের আর একটা জায়গা দেখিয়ে আনি। বলে চলতে সুরু করল মায়াদি।

বাক্‌রুদ্ধ আমরা যন্ত্রচালিতের মতন তার অনুসরণকারী।

শ্মশানে এসে দাঁড়াল মায়াদি। এবং অদূরের একটি জ্বলন্ত চিতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল: তোমার দাদাকে ঠিক ওই জায়গাটাতে রেখে গেছি।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। ব্রততীও। ঝাপসা চোখে আমরা শুধু সেই জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—চল, এবার বাড়ি ফিরি।

মায়াদির গলা।

সারাটা পথ আমরা অপরিচিতের মতন পাশাপাশি হেঁটে এলাম—কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না—আমরা তিনজনেই যেন মূক।

রাতে খেতে বসে মায়াদির মুখে কেবলই স্বামীর গল্প: কি কি খেতে ভালবাসত—কোন্ মাছটা বেশী পছন্দ করত—ভাতের শেষে চাটনি একটু চাই—তা আমই হোক আর আমড়াই হোক—বইয়ের পোকা ছিল—দিনরাত বই মুখে দিয়ে বসে থাকত—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এবং খাওয়ার শেষে আমার হাতে পান গুঁজে দিয়ে বলল: তোমার দাদার পানের ডিবে সব সময় ভর্তি রাখতে হত।

…পরদিন সকাল। বসে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি, এমন সময় ব্রততীর আবির্ভাব: মায়াদি সব সময় আমার মুখের দিকে হাঁ করে অমন করে কি দেখছে বল তো?

আমার জিজ্ঞাসু চোখ ব্রততীর মুখে। —কেমন ফ্যাল্-ফ্যাল্-চোখে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে।

ব্রততীর গলায় অস্বস্তি। একটু থেমে অনুচ্চকণ্ঠে যোগ করল: আমার এখানে ভাল লাগছে না। চল আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।

—আর দু' একদিন থাকব না?

আমার কথায় ব্রততী তার দুটি বাহুর বন্ধনে আমাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অস্থির গলায় বলে উঠল: না, না, আর নয়, আর নয়। আজই ফিরে চল। আমার কেমন যেন ভয় করছে। আমি চিত্রার্পিত।

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

সাহিত্যশিল্পী সমারসেট মম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

....

চার

"The story should be coherent and persuasive with a beginning, a middle and an end which follow one another in natural consequence. The episodes should have probability. The characters should have individuality. The narrative passages should be vivid, to the point and as brief as possible. The writing should be simple enough for any one with a fair education to read with ease, a novel should be entertaining."—মম

১৮৯২ সাল থেকে মম নোট বই লিখতে সুরু করেন। ১৯৪১ সালে নোট বইয়ের সংখ্যা পনেরটিতে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি খণ্ডই আকারে বেশ বড় ছিল। মম নোট বইগুলিতে বিভিন্ন ঘটনার কথা টুকেছেন, বিভিন্ন মানুষের কথা লিখেছেন। তিনি নোট বইগুলিতে যেসব কথা লিখে রেখে ছিলেন, তাই তিনি গল্প উপন্যাস নাটক লেখার কাজে লাগিয়ে দেন। মম বলেছেন, I meant my note books to be a storehouse of materials for future use and nothing else.

মম নিয়মিত নোট বই লিখেছেন। মমের নোট বই সাহিত্য নয়। জার্নালও নয় কিন্তু এই নোট বইয়ের সাহায্যে তিনি বলিষ্ঠ, সার্থক সাহিত্যের জন্ম দিতে পেরেছেন। মম পরম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন নোট বই লিখেছেন, তিনি যতদিন সাহিত্যচর্চা করেছেন, ততদিন তিনি নিয়মিত নোট বই লিখে গেছেন। মম বাইশ বছর বয়সে নোট বইতে লিখেছেন, There are times when I look over the various parts of my character with perplexity. I recognize that I am made up of several

persons and that the person which at the moment has the upper hand will inevitably give place to another. But which is the real me? All of them or none?

মম ব্রিজ খেলতে খুব ভালবাসতেন। সিগারেট ছিল তাঁর খুব প্রিয়। তিনি মন দিয়ে ব্রিজ খেলেছেন কিন্তু সিগারেট খাওয়া তাঁর কখনও বন্ধ হয় নি। মম গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাহিত্যচর্চা সুরু করেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, একদিন না একদিন তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক হবেন। মম মনে মনে প্রচুর অর্থ উপার্জনের কথা ভেবেছেন, এর কারণ, তিনি মনে করতেন, অর্থই একমাত্র তাঁকে স্বাধীনতা দিতে পারে, উপযুক্ত অর্থ হাতে থাকলে জীবনে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মমের একটি গল্প গ্রন্থের নাম 'দি ট্রেম্বলিং অফ এ লীফ'। এই বইয়ের সবচেয়ে সেরা গল্পটির নাম 'রেন'। প্রথমে অনেকগুলি পত্রিকার সম্পাদক 'রেন' গল্পটি অমনোনীত করেন। শেষ পর্যন্ত একটি ছোট সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক 'রেন' মনোনীত করেন এবং গল্পটি প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা, মম যতগুলো গল্প লিখেছেন, তাদের মধ্যে 'রেন' গল্পটি শ্রেষ্ঠ।

১৯২১ সালে 'দি ট্রেম্বলিং অফ এ লীফ' প্রকাশিত হয়েছে। মম বলেছেন সবসময় গল্পের কোন চরিত্রকে বড় করে লিখলেই সার্থক গল্প সৃষ্টি হতে পারে না। গল্পের জন্যে উপযুক্ত কাহিনী চাই। মমের বেশীর ভাগ গল্পের মধ্যে সুন্দর একটি কাহিনী রয়েছে। মম যে শুধু সুন্দর সুন্দর কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা নয়, তিনি তাঁর প্রতিটি গল্প উপন্যাসে নায়কের চরিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'Maugham's greatest achievement as a fiction writer is not the stories he tells—not plot—but the characters in them. His characters are vivid, believable and although not particularly subtle—for he is more concerned with their outer than their inner lives—remarkably individualized. They have a past as well as a present, and a life is independent of the plot. They belong to and are influenced by a specific time, place and social class."

মম জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। তিনি তাঁর গল্পের জন্যে প্রচুর অর্থ দাবী করতেন এবং তিনি তা পেতেন। তিনি লিখে চার মিলিয়ান ডলারের ওপর অর্থ উপার্জন করেছেন। মম একবার তাঁর কয়েকটি গল্পের

রেকর্ড করার জন্যে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে এক চুক্তিতে সই করেছিলেন। একথা স্বীকার করতেই হবে, মম পরম নিষ্ঠা নিয়ে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। তিনি ভাল লিখে সুনাম অর্জন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নাটক লিখেও প্রচুর আয় করেছেন।

ফ্রান্স ছিল মমের কাছে এক স্বপ্নের জগৎ। তিনি জীবনের অনেক সময় ফ্রান্সে এসে কাটিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "It was France that educated me, France that taught me to value beauty, distinction, wit and good sense, France that taught me to write.

প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে। মম বাতি জালিয়ে কামানের আওয়াজ শুনতে শুনতে অফ হিউম্যান বণ্ডেজের প্রুফ দেখে চলেছেন। অফ হিউম্যান বণ্ডেজ প্রকাশিত হল। মমকে বলা হল, তিনি যেন বইটির প্রথম পরিচ্ছেদটি পড়ে শোনান। মম প্রথমে আপত্তি তুললেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পড়তে রাজী হলেন। তিনি পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তাঁর দুচোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি আর পড়তে পারলেন না। মম এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "I was moved, not because the chapter was particulary moving but because it recalled a pain that the passage of more than sixty years has not dispelled.

ফ্লবেয়ারের সেরা সৃষ্টি কোনটি? এর উত্তর 'মাদাম বোভারী'। বাল্‌জাকের সেরা সৃষ্টি কোনটি? এর উত্তর 'ওল্ড গোরিও'। টলস্টয়ের সেরা সৃষ্টি কোনটি? এর উত্তর 'ওয়ার অ্যানড্ পীস'। চার্লস ডিকেন্সের সেরা সৃষ্টি কোনটি? এর উত্তর 'ডেভিড কপারফিল্ড'। সমারসেটের মমের সেরা সৃষ্টি কোনটি। এর উত্তর 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ'।

পাঁচ

'I am a writer of fiction': মম

মম 'মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স' উপন্যাস লেখার জন্যে তাহিতিতে বেড়াতে যান। তিনি ফিজিতে যান, টোঙ্গাতে যান, তাহিতিতে যান। পল গগ্যাঁ তাহিতিতে থাকতেন। মম ঠিক করে রেখেছিলেন, পল গগ্যাঁর জীবনী অবলম্বনে এক উপন্যাস লিখবেন। আর এই জন্যেই তিনি তাহিতিতে বেড়াতে যান। মম তাহিতিতে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন, সেখানকার অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি উপন্যাস লিখতে

সুরু করেন। মম 'দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স' প্রথম মহাযুদ্ধের পরই লেখেন। তিনি অনেকদিন লেখা বন্ধ করে রেখেছিলেন। এরপর তিনি এই উপন্যাসটি লিখতে সুরু করেন।

মম ইটালী ভাষা শিখতে ফ্লোরেন্সে যান। তিনি ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিস ভাষা বেশ ভালভাবে শেখেন। সাহিত্যের প্রতি যেমন ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ, ছবি আঁকার প্রতি ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ।

মম প্রথম নাটকটি লেখেন ১৮৯৮ সালে। চার বছর পরে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কিন্তু চলে মাত্র দু দিন। তিনি নিরুৎসাহ না হয়ে নাটক লিখে যান কিন্তু তাঁর জীবনে সাফল্য আসে না। তিনি দশ বছরে দশখানা পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখলেন। কিন্তু তিনি নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন না। তিনি হতাশ হয়ে ঠিক করলেন, তিনি জাহাজের ডাক্তার হয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবেন।

একদিন এক থিয়েটারের ম্যানেজার মমের কাছ থেকে একখানা নাটক চাইলেন। মম একখানা নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠালেন। নাটকটির নাম লেডি ফ্রেডরিক। ম্যানেজার নাটকটি মনোনীত করলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হল। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে চলতে লাগল। এবার অন্য থিয়েটারের ম্যানেজাররা মমের কাছ থেকে নাটক চেয়ে বসলেন।

মমের চারখানা নাটক বিভিন্ন থিয়েটারের হলে চলতে লাগল। মমের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এল। এরপর তিনি একটানা দু বছর কোন নাটক না লিখে 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' লেখায় ব্যস্ত রইলেন, এরপর তিনি লিখলেন 'দি আন অ্যাটেনেবল' নাটক।

মম প্রবন্ধশিল্পী, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। মম বহু ছোট গল্প লিখেছেন। তিনি বলেছেন, I have never pretended to be anything but a story-teller. It has amused me to tell stories and I have told a great many.

মম স্মরণীয় জীবনশিল্পী, বরণীয় জীবন-দার্শনিক, তিনি জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছেন, হাসপাতালে কাজ করতে করতে নিচের তলার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছেন, তিনি বহু দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি দেখেছেন বিভিন্ন মানুষের বহু বিচিত্র জীবনধারা। তিনি যে অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন, তাঁর যেসব ঘটনা ভাল লেগেছে, তিনি সেসব কথা সুন্দরভাবে লিখে গেছেন তাঁর 'দি সামিং আপ' গ্রন্থে।

মম একবার এক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটি ইংরেজী ও আমেরিকার সাহিত্যের ওপর লেখা। আমেরিকায় এই গ্রন্থটি প্রচুর বিক্রী হয়েছিল।

মমকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' উপন্যাসের নায়ক ফিলিপের আচার আচরণ, ধরণ ধারণ, শিক্ষা দীক্ষা, চিন্তাধারা যেন তাঁর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়—এটা কি সত্যি? মম স্বীকার করে বলেছেন, অনেকটা, তবে সবটা নয়। অনেক সময় কল্পনার আশ্রয়ও নিতে হয়েছে। মম অফ হিউম্যান বণ্ডেজ উপন্যাসটি দু বছর ধরে লিখেছিলেন। তিনি উপন্যাসটি লিখছেন, প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হল। তিনি তখন ফ্লাণ্ডার্সে। এক ছোট গ্রামের মধ্যে থেকে তিনি রাত্রিবেলায় বাতি জ্বালিয়ে লেখার কাজ করেছেন। অফ হিউম্যান বণ্ডেজ প্রকাশিত হল। মম বলেছেন, I wrote that book to free myself of an intolerable absession, to rid myself of ghosts. From that point of view it was successful. After I corrected the proofs. I found that all the ghosts were laid. They never troubled me or crossed my mind again.

মম জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু তিনি বলে গেছেন, প্রথম দশ বছর একটানা লিখে গেছি, সে সময় আমার আয় বছরে পাঁচশো ডলারের বেশী হয়নি।

মম শিল্পী পল গগ্যাঁর কথা শুনেছেন। গগ্যাঁ তাহিতিতে থাকেন। মম তাহিতিতে বেড়াতে যান। মম পল গগ্যাঁর অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি গগ্যাঁর চিত্রাবলী অতি আগ্রহ নিয়ে দেখেন। গগ্যাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছ থেকে অনেক কথা জানতে পারেন। মম অনেক বেশী দাম দিয়ে গগ্যাঁর আঁকা কয়েকখানা ছবি কেনেন।

পল গগ্যাঁর জীবনী অবলম্বনে মম লিখলেন দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স। মমের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি তাহিতিতে চরম দুঃখ কষ্ট ভোগ করে গগ্যাঁর জীবনের ঘটনা সংগ্রহ করেছেন। তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হননি। তিনি পরম নিষ্ঠা নিয়ে এই নিপুণ চিত্রশিল্পীর জীবনের ঘটনা সংগ্রহ করেছেন। জীবন-শিল্পী মম পল গগ্যাঁর জীবন কাহিনী সামনে রেখে যে বলিষ্ঠ উপন্যাস রচনা করেন তারই নাম দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স।

ছয়

Liza is as charming as a wild flower and as easily crushed. She is the first and sweetest of the many women Maugham created. লিজা মমের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ল্যামবেস এলাকার ভেরা স্ট্রীটে লিজা তার মায়ের সঙ্গে থাকে। লিজা এক কারখানায় কাজ করে। টম নামে একটি ছেলের সঙ্গে লিজার আলাপ হল। দুজনে ছুটিতে পিকনিক করতে যায়। জিম ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে আলাপ হয় লিজার। লিজার ভাল লাগে জিম ব্ল্যাকস্টোনকে। সে ভালবাসে জিমকে। শেষ পর্যন্ত লিজা মারা যায়। "The picture is real····The book is also the novel of a medical student.

'লিজা অফ ল্যামবেস' অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। প্রকাশকরা মমকে অনুরোধ করলেন, বস্তীর পটভূমিকায় আর একখানি উপন্যাস তিনি যেন লেখেন। মম সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, I had a feeling. I do not know where I got it, that you must not pursue a success, but fly from it.

মমের 'দি হিরো' উপন্যাসটির কাহিনী অতি সাধারণ। মিসেস ক্রাডক উপন্যাসের এক বহু বিচিত্র নায়িকা মিস লে। The story is sad, with a spice of wit, but no humour.

জর্জ বার্নাডশ যেমন দিনের পর দিন নিয়মিত ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, সাহিত্যশিল্পী মমও নিয়মিত ব্রিটিশ মিউজিয়মে গেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশোনা করে কাটিয়েছেন।

মম নিজে বলেছেন, 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। "It is the story of his life and his search for truth about human life······The story is told in 122 chapters······This is the simplest way of writing a very long Novel. It is the way of Tolstoy. ফিলিপ কেরী বাবা মাকে হারিয়ে কাকার বাড়ীতে আসে। কাকা এক পল্লী যাজক। মমও বাবা মাকে হারিয়ে কাকার কাছে আসেন। কাকাও এক পল্লী যাজক। ফিলিপ তেরো বছর বয়সে টারকানবেরীর কিংস স্কুলে গেছে, আর তেরো বছর বয়সে ক্যানটারবেরীর কিংস স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। এখানে উপন্যাসের নায়ক ফিলিপের সঙ্গে মমের জীবনের অনেক মিল।

মম ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছেন। এই পর্যায়ের প্রথম রচনার নাম দি ল্যাণ্ড অফ দি ব্লেশেড ভার্জিন। ১৯০৬ সালে মম এটি রচনা করেন। তিনি স্পেনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। স্পেনের পটভূমিকায় এটি লেখা। পরের বইয়ের নাম অন এ চাইনীজ স্ক্রীন। ১৯৩০ সালে মম লিখলেন দি জেণ্টেলম্যান্ ইন দি পারলার।

মমের প্রিয় লেখক ৺মোপাসা এবং চেকভ। তিনি বলেছেন, I have never pretended to be anything but a story-teller. It has amused me to tell stories and I have told a great many. এ কথা স্বীকার করতেই হবে সমারসেট মম একজন বলিষ্ঠ ছোট গল্পকার।

মম বেশী লোকের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হতেন না। এর কারণ, তাঁর কথা বলতে কষ্ট হত। তিনি যখন কোন উপন্যাস লেখা শেষ করে ফেলতেন, তিনি অন্ততঃ এক সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে লেখার সময় বদল করতেন। তিনি প্রতিদিন প্রচুর চিঠিপত্র লিখতেন। মমের মতে হেমিংওয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক। "Hemingway is a first class Novelist."

সাত

অ্যালান সিরেল মমের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি মমের সবসময়ের সঙ্গী ছিলেন। মম যখন তখন অ্যালানকে ডেকে পাঠাতেন, অনেক সময় তিনি নিজেই অ্যালানের ঘরে চলে যেতেন। একদিন রাত দুটোর সময় মমের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অ্যালানের ঘরের দরজা ঠেললেন, অ্যালান দরজা খুলে দিলেন। মম অ্যালানের ঘরে বসলেন, সিগারেট খেলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন। এইভাবে বসে গল্প করে তিনি বাকী রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

মম কিংস স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। স্কুলের পাশেই ছিল ক্যাণ্টারবেরী ক্যাথিড্রল। মম মারা যাবার আগে বলে যান তাঁকে যেন ক্যাণ্টারবেরী ক্যাথিড্রেলের গ্রেভইয়ার্ডে শুইয়ে দেওয়া হয়।

মমের শোবার ঘরখানি ছিল বিরাট। তিনি যে খাটে শুতেন, তার ঠিক পাশেই একটি বই রাখার শেলফ থাকত, তাঁর কোন বইয়ের দরকার পড়লে তিনি বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়েই নিতে পারতেন। মমের বাড়ী নিখুঁতভাবে সাজান ছিল। তাঁর লেখাপড়া করার ঘরটি ছিল একেবারে ছাদের ওপর।

মম 'দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্সের' পাণ্ডুলিপি সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। মম প্রতিদিন সকাল আটটার সময় ঘুম থেকে উঠতেন, কিছু খেয়ে নটার সময় লিখতে বসে যেতেন, একটানা তিনঘণ্টা লিখতেন। তিনি লেখার পর দুপুরের খাওয়া খেতেন, এরপর একটু বিশ্রাম নিতেন। তিনি বিকেলের দিকে পড়াশোনা করতেন, বন্ধুবান্ধব এলে গল্পগুজব করতেন।

মম প্রথমে জার্মানীতে নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর নাটকের নাম 'শিপ রেকড়'। বার্লিনে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কিছুদিন পরে এই নাটকটি লণ্ডনে অন্য নামে প্রকাশিত হয়। নাটকটির নাম হয় ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন।

মম তখনও সাহিত্যিক হননি, প্রতিদিন তিনি নির্দিষ্ট সময়ে লিখতে বসেছেন, পাতার পর পাতা লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের লেখা পছন্দ হয়নি। এরপর মম ঠিক করলেন, তিনি নামকরা লেখকদের লেখা পড়ে দেখে দেখে খাতায় লিখবেন ; এভাবে লিখে গেলে তিনি লেখার স্টাইল জানতে পারবেন। তিনি হেনরী ফিল্ডিং, চার্লস ডিকেন্স, উইলিয়াম হ্যাজলিট, ট্রলপের লেখা ভাল ভাল বই পড়ে লিখে গেলেন। এসময় তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন।

মম স্পেনে বেড়াতে গেছেন। তিনি এক নামকরা হোটেলে উঠলেন। মম দুরাত্রি থাকার পর বিদায় নিলেন। তিনি হোটেলের বিল ক্লার্ককে বিল দিতে অনুরোধ করলেন। বিল ক্লার্ক মমকে জানালেন, তাঁর নামে কোন বিল তৈরী করা হবে না। মালিক এই নির্দেশ দিয়েছেন। মম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বিল ক্লার্ক জানালেন, মালিক বলেছেন, আপনার মত সাহিত্যিক যে এই হোটেলে এসে উঠেছেন, এটাই যথেষ্ট, এর জন্যে হোটেলের সুনাম বাড়বে, মালিক আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মম বিল ক্লার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

বিলি বার্ক একজন নামকরা অভিনেত্রী। বিলি বার্ক মমের অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। তিনি মমের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, Mr. Maugham is still a very handsome man. He was known and is known now as a British writer, but to me he has always seemed French.

জর্জ কুকর মমের দি র‍্যাজর্স এজ বইটি নিউইয়র্কে পরিচালনা করবেন। জর্জ চিত্রনাট্য তৈরী করতে গিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়লেন। মম

কালিফোর্নিয়াতে এসেছেন। তিনি জর্জের সঙ্গে দেখা করলেন। জর্জ তাঁর নিজের অসুবিধার কথা মমকে জানালেন। মম সব শুনে বললেন, তিনি নিজে চিত্রনাট্য লিখবেন। মম চিত্রনাট্য লিখে ফেললেন। জর্জ চিত্রনাট্য পড়ে অত্যন্ত খুশী হলেন। মম হাতে লেখা চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপিখানি ভাল করে বাঁধিয়ে জর্জের সেক্রেটারীকে উপহার দিলেন। মম এই চিত্রনাট্য লেখার জন্যে কোন পারিশ্রমিক নিলেন না।

মমের তখন একাশি বছর চলছে। ডাক্তার তাঁকে জানালেন, প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে বিশ্রাম নিতে হবে। মম জানালেন, প্রতি শনিবার আর রবিবার তিনি বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করবেন।

মমের ধারণা, 'A novel is not history. It is a story.'

সমারসেট মম ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, তিনি একজন বলিষ্ঠ ছোট গল্পকার। সমারসেট মমকে 'The Greatest Living short-story writer' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

অশোক হালদার

অভব্য

....

ধনুক-বাঁকা মেরুদণ্ডে পিঠটা যেন এক সুদীর্ঘ কমা চিহ্ন। পা দু'টো হাঁটু থেকে ভাঁজ হয়ে বুক পর্যন্ত উঠে এসে তেরচা ভাবে নেমে গেছে। শরীরটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধের দিকে চেয়ে নন্দিতার তাই মনে হলো। চিৎ করে শোয়ানো যাচ্ছেনা কিছুতেই। কাত হয়ে পড়ে থাকা দেহটার আড়ালে বুকের ওঠা-নামা নজরে পড়ছে না। হঠাৎ দেখলে তাই মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে জগদ্বল্লভ বিশ্বাসের বিরাশী বছরের জরাজীর্ণ শরীর-টা চুপসে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, শব পড়ে রয়েছে জীবিতদের বোঝা হয়ে চিতার অপেক্ষায়।

হেমন্তের বিষণ্ণ দুপুরে বসে বসে ভারি হয়ে ওঠা কোমরের আরামের জন্য দেয়ালে হেলান দিলো নন্দিতা। চোখ রাখলো জানলায়। দেখলো উড়ন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে, ঝাঁঝাল দুপুর আর নেই। কম রোদ কম আলো ছোট্ট বিকেল যেন ওরই মত ক্লান্ত, অবসন্ন। ম্লান আবছা আলো মুমূর্ষু বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চোখে নেমে এলো। কুঁকড়ে শুয়ে থাকা বৃদ্ধের ওষ্ঠাধর কেঁপে কেঁপে উঠতে দেখলো নন্দিতা। বৃদ্ধের ঠোঁটে কামড়ে থাকা মাছিটা পরম নিশ্চিন্তে সুখে ভর করে পাখনা কাঁপাচ্ছে। মাছিটাকে তাড়াবার জন্য হাতপাখা তুলে নিলো ও। নাড়তে থাকলো। কিন্তু মাছিটা সেই যে শুকনো ছাল ওঠা ঠোঁট কামড়ে বসেছিলো, যাচ্ছিলো না কিছুতেই। তাই ও-কে সন্তর্পণে আঙুল ছোঁয়াতে হলো মাছিটাকে তাড়াবার জন্য। আঙুলের ডগা ওষ্ঠের হিমশীতলতায় চিনচিন করে উঠলো। চরম উত্তেজনায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে এবার ও বৃদ্ধের হাতটা তুলে নিলো। শিরা খুঁজতে হলো না। কোঁচকানো চামড়া ঠিকরে শিরা উপশিরাগুলো ফুলে উঠেছিলো। ধুকধুক করে ওঠা-পড়া করছিলো নাড়ি। নন্দিতার অনামিকায় তা ধরা পড়লো। বৃদ্ধের নিঃশ্বাস পড়লো একটু দীর্ঘ কিন্তু খুব মৃদু, তার বায়বীয় ফুৎকার ওর কানে এলো। শরীর নিস্পন্দ, মুখ ভাবলেশহীন। পঁচা ডোবার মত নিথর ঘোলাটে চোখের পাতা দুটো শুধু দু'একবার কেঁপে কেঁপে উঠলো।

সদরের কড়া নড়ে উঠলো, নন্দিতা শুনলো। অনুচ্চকণ্ঠে পিসীকে ডাকলো। দূর সম্পর্কীয় এক অনাথা বিধবাকে জগদ্বল্লভ সংসারে ঠাঁই দিয়েছেন। বিধবাও বাপ-মা-মরা শিশুকে মায়ের যত্নে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর পঁচিশ ছাব্বিশ-টা বছর কেটে গেছে। বছর দুই আগে দিদিমা মারা গেল, দাদু সেই যে শহরতলির বাসা ছাড়লেন সেই থেকে কলকাতা। বার দুই বাসা বদল করে এই বাসাতে উঠে এসেছে ওরা মাস চারেক আগে। নন্দিতার আপিস যাতায়াতের সুবিধের কথা ভেবেই নন্দিতা নিজেই এ-অঞ্চলটা পছন্দ করেছিলো।

আবার কড়া নড়ে উঠলো। এবার একটু জোরে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পিসী আগেই গিয়েছিলো। এখন দরজার কাছে এসে বললো—তোকে ডাকছে রে নন্দ।

নন্দিতা ভুরু কুঁচকে পিসীর মুখে তাকালো।

—আমাকে! কে…?

নিরুত্তর পিসীর মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে উঠে পড়লো।—আচ্ছা, আমি দেখছি। তুমি একটু দাদুর কাছে বসো।

সদরের দিকে চলে গেলো নন্দিতা। দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো এক পাশে। জায়গা পেয়ে বছর কুড়ি বয়সের যে ছেলেটি চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা ভেতরে রেখে দাঁড়ালো, তাকে চিনতে পারলো নন্দিতা। মোড়ের সুধা-কেবিনে দেখেছে।

ছেলেটি ধীরে ধীরে নীচু-গলায় বললো—জগৎবাবু কেমন?

নন্দিতার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো—আপনি তো একা। কিন্তু ভাববেন না, আমরা আছি।

এবারে কিন্তু হঠাৎ-ই নন্দিতার মুখোমুখি হয়ে বললে—চলুন। এগিয়ে চললো ভিতরে। নন্দিতা-কেও অগত্যা ও-র পিছু নিতে হলো।

ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে চেয়ারে বসতে বলে নন্দিতা বসলো দাদুর বিছানার ধারে মেঝেতে। তারপর কি করবে ভেবে না পেয়ে বৃদ্ধের কব্‌জিতে হাত ছোঁয়ালে। নাড়ি ধিকিধিকি চলছে। বৃদ্ধ চোখ বুজে শুয়েছিলেন। চোখ মেলে তাকালেন হঠাৎ। নন্দিতাকে অবাক করে দিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন—ও কেন?

নন্দিতা কী বলবে বুঝতে পারলো না। ছেলেটির দিকে তাকালো শুধু।

বৃদ্ধ এবার ব'ললেন—ও-ই তো সর্দার…সাকরেদগুলো আমাকে…

কথা শেষ করতে পারলেন না। হাঁফাতে থাকলেন।

নন্দিতা ভয় পেলো। বললো—তোমায় আর কিছু ব'লতে হবে না, দাদু।

ততক্ষণে বৃদ্ধ কিছুটা সামলে নিয়েছেন মনে হলো। ঠোঁট কয়েকবার থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। অস্ফুটস্বরে বললেন—জল।

নন্দিতা ঝিনুক ভরে গঙ্গাজল দিলো বৃদ্ধের মুখে। স্বস্তিতে একবার 'আ' ব'লে বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল ক'রে দেখতে লাগলেন ছেলেটিকে।

—ওঁ-কে কথা বলতে বারণ করুন। কষ্ট পাচ্ছেন খুব। ছেলেটি নীচু গলায় বললো।

—এ আর কী। তোমাদের কাছ থেকে যা পেলুম···! এক দমকে এতগুলো কথা বলে বৃদ্ধ চোখ বুজলেন।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। বৃদ্ধ আর কিছু বললেন না। গলা বোধ হয় শুকিয়ে উঠে থাকবে, ঠোঁটে একরকম ভঙ্গি হলো, কিন্তু শব্দ বেরুলো না।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় উস্‌খুস্ ক'রতে ক'রতে ছেলেটি বলে ফেললো—আপনাকে ওরা বিরক্ত করছে, তাই আপনি রেগে আছেন।

নন্দিতার বলতে ইচ্ছে ক'রলো—ওরা কেন, তুমিও তো কম যাওনি। সাইকেল নিয়ে চক্কর দিয়েছো আমার আশে-পাশে, আপিস যাতায়াতের পথে।

কিন্তু কিছু ব'ললো না। এখন সংসারের একমাত্র আপনজন মৃত্যুপথযাত্রী দাদুর শেষ পর্যায় বসে এ-সমস্ত আলোচনায় যেতে মন চাইছিলো না ওর।

—আমাদের যতটা খারাপ ভাবেন, আমরা কিন্তু আসলে···। ছেলেটি যেন কিছুতেই অন্য প্রসঙ্গে যেতে পারছিলো না।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নন্দিতা এবার না বলে পারলো না।

ছেলেটি তাকিয়ে থাকলো নন্দিতার মুখে। কথাটার তাৎপর্য বুঝতে সময় নিলো যেন।

নন্দিতার গলার মধ্যে দিয়ে চোঁয়া-ঢেঁকুরের মত উত্তেজনার বুদ্‌বুদ বেরিয়ে আসছিলো। পরিবেশ ও মানসিক অবস্থা যদিও উত্তেজনা প্রকাশের অনুকূল নয়, তবু নিজেকে সংযত ক'রতে পারলো না। ঝাঁঝিয়ে উঠলো—মানুষের আপদে-বিপদে এগিয়ে আসা তো খুব ভালো কথা। কিন্তু এমন যদি কিছু করা যায় যাতে মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে···কথাগুলো নন্দিতার

নিজের কানেই কড়া শোনালো। তাই এই বিষাদের মুহূর্তেও ছেলেটির দিকে হাসি হাসি-মুখে তাকালো। ছেলেটি হাসলো। কিন্তু ওর হাসি দেখে নন্দিতার মনে জ্বালা ধরলো এবার। এরা কী ভেবেছে! মৃত্যুর সবুর সইছে না! তার আগেই বাড়ি চড়াও হয়ে মহানুভব সাজতে চাইছে! বিষক্রিয়ার মত জ্বালা ধরা অবশ অনুভূতি নিয়ে নন্দিতা ভাবলো ছেলেটিকে সোজাসুজি চলে যেতে বলে। এদের সাহায্যের দরকার নেই। তেমন যদি কিছু হয়ই এদের কাছে যাবে না। হিন্দু সৎকার-সমিতি-কে ফোন ক'রবে। তারপর সব চুকে-বুকে গেলে আপিসে গিয়ে ট্রান্সফারের তদ্বির ক'রবে। বদ্‌লির কথা ক'দিন আগে উঠেছিলো। এতদিনে তা' নিশ্চয়ই কাগজে-কলমে এগিয়েছে।

নীরবতা ভঙ্গ হলো।

ছেলেটি কথা খুঁজে না পেয়ে যেন ব'লে উঠলো—ডাক্তারবাবুকে ডাকলে হয়না একবার? অবিশ্যি ব'লে এসেছি সন্ধ্যের ঝোঁকে একবার দেখে যেতে।

পিসী দু'কাপ চা রেখে গেলো, সঙ্গে বিস্কুট।

নন্দিতা চা-য়ের কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দিলো।

ছেলেটি কিন্তু হাত গুটিয়ে বসেই থাকলো।

—চা-য়ে অরুচি নাকি!

—মানে···আবার চা।

—তাতে কি! চা-য়ে অরুচি হ'লে তো সুধা-কেবিন লাল-বাতি জ্বালবে।

ছেলেটি এবার কিছু না বলে পেয়ালায় চুমুক দিলো।

—তা ছাড়া এ-পাড়ার নেতা-কে তো একটু আদর-আপ্যায়ন করা দরকার। নন্দিতার কণ্ঠে কৌতুক ঝিলিক দিলো।

—না, না, নেতা-টেতা নই। আমি সমীরণ···সমীরণ ভদ্র।

—আহা, আমি কি ব'লেছি অভদ্র!

ছেলেটি হেসে ফেললো।

এমন সময়ে বিকট আওয়াজ ক'রে পটকা ফাটলো একটা ধারে কাছে। এ'টা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তবু আজ এই মুহূর্তে বৃদ্ধের রোগ-শয্যায় বসে নন্দিতা ধৈর্য রাখতে পারলো না। কঠিন দৃষ্টিতে সমীরণকে বিদ্ধ ক'রতে ক'রতে বললো—ওদের আর খানিকক্ষণ সবুর ক'রতে বললে হয় না?

মানুষটা কি শান্তিতে মরতেও পাবে না? উত্তেজনার আঁচে নন্দিতার মুখ গনগনে লাল হ'লো।

সমীরণ গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো।

—আপনি শান্ত হোন। বলে বাইরে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরলো।—ওরা জানতো না, এখানে এ-রকম রুগী।

—বেশ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো নন্দিতার।—তা' হ'লে বাইরে একটা সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে দিলে হয়।

নন্দিতার কথার ঝাঁঝটুকু সমীরণ লক্ষ্য করলো। কিন্তু কিছু বললো না।

বাইরে জুতোর শব্দ। ডাক্তারবাবু। সমীরণ উঠে দাঁড়ালো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশন্ দিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন—এখন তো দেখছি প্রায় নর্মাল। এ-যাত্রা সামলে উঠলেন।

ব্যাগ গুছোনোর ফাঁকে নন্দিতা ফিসের টাকা ও ওষুধের দাম দিলো।

চলে যেতে যেতে বারান্দা থেকে ডাক্তারবাবু বললেন—তবে আপনি আর রাত জাগবেন না। বিশ্রামের দরকার আপনার।

পাশ থেকে সমীরণ বলে উঠলো—না, না, তা'হলে ওঁকে নিয়ে আবার নতুন বিভ্রাট বাধবে। আমার বোনেরা ক'দিন পালা ক'রে রাত জাগবে।

ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিয়ে সমীরণ ফিরে আসতেই নন্দিতা ঝাঁঝাঁলো গলায় বলে উঠলো—এ-সবের মানে কী? আমার দাদুর জন্যে কেন বাইরের লোক রাত জাগবে? আমার জন্যে পরেরই বা এ'তো মাথা ব্যথা কেন?

ম্লান-মুখে সমীরণ দাঁড়িয়ে ছিলো। বাঁধ-ভাঙা নদীর বিধ্বংসী তাণ্ডব চলছিলো নন্দিতার বুকে।

—এতই যদি কর্তব্য-জ্ঞান তবে কেন আমার দাদুর প্রতিটি মুহূর্তের শান্তি কেড়ে নেওয়া হ'য়েছিলো। ওঁর নাম বিকৃত ক'রে 'জগা জগা' বলে অপমান করা হ'য়েছে কেন? দুপুরে বিশ্রামের সময়ে চ্যাচামেচি, রাত্তিরে পটকা ফাটানো কেন বন্ধ করা হয়নি?

—এখন তর্কের সময় নয়। বলে ধীর পায়ে সমীরণ বেরিয়ে গেলো।

এরপরে মাস খানেক কেটে গেছে। বৃদ্ধ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। ক'দিন আগে নন্দিতার বদলির অর্ডার বেরিয়েছে। জিনিস-পত্র প্রায় সবই চলে গেছে ট্রাকে। সেখানকার আপিসের লোকেরাই সব গোছ-গাছ ক'রে দেবে।

কলকাতা ছেড়ে যেতে চেয়েছিল নন্দিতা। তাই মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল না। মনে মনে শুধু চাইছিলো একবার সমীরণের সঙ্গে দেখা

ক'রে সেদিনের উত্তপ্ত আবহাওয়া কিছুটা জুড়িয়ে নিতে। কিন্তু আশ্চর্য! সেই যে দাদুর অসুখের মধ্যে একদিন বাড়ি চড়াও হ'য়ে এসে হাজির হ'য়েছিলো, তারপর থেকে আর দেখতে পায়নি ও-কে। ভেবেছিলো আপিস যাতায়াতের পথে একদিন না একদিন দেখা হ'য়ে যাবে। দীর্ঘ একমাসের প্রতিটি দিন নন্দিতার চোখ সুধা কেবিন ও মোড়ের গজালিতে বা রকাড্ডায় ওর সন্ধান ক'রে ফিরেছে। কিন্তু দেখতে পায়নি, মানুষটা যেন হঠাৎ উবে গেছে। ভেবেছিলো ওর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে একবার খোঁজ ক'রবে, কিন্তু কোথায় যেন বেধেছে।

অথচ কাল সকালেই ওকে কলকাতা ছাড়তে হ'চ্ছে। কালই জয়েনিং-টাইমের শেষ দিন। পরশু ওকে রিপোর্ট ক'রতে হবে।

টুকিটাকি কেনা-কাটা সেরে ক্লান্ত পা-য়ে নন্দিতা বাড়ি ফিরলো। একা একাই একটা সিনেমা দেখে নিতে চেয়েছিলো। কতদিন পরে আবার কলকাতায় আসতে পারবে কোন স্থিরতা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপিসে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে কেনাকাটি সারতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'য়ে গেলো। আর ভালো লাগলো না। সোজা বাড়ি ফিরে এলো তাই।

ঘরে ঢুকে অবাক হ'য়ে গেলো। সমীরণের দুই বোন যারা ক'দিন দাদুর জন্যে রাত জেগেছিলো, তাদের একজন ওর মেঝের বিছানায় আধ-শোয়া হ'য়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলো। ওকে ঢুকতে দেখে হাসি-হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো।

হাতের জিনিস-পত্তর ঘরের কোণায় রেখে বিছানায় বসে ওকেও বসতে বললো। 'তুমি' বলে মেয়েটির নাম মনে ক'রতে চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু কিছুতেই যখন মনে পড়লো না, তখন কথাটা শেষ ক'রতেই যেন বললো—তুমি কতক্ষণ?

মেয়েটি লাজুক লাজুক মুখে বিছানায় ওর পাশে এসে বসলো।

—সকালে দেখলুম ট্রাকে করে আপনার জিনিসপত্র চলে গেলো।

—হ্যাঁ।

—ক'দিনই বা রইলেন আমাদের পাড়ায়। মেয়েটির কণ্ঠে বিমর্ষ স্বর। নন্দিতার কেমন মায়া হলো।

—কী করবো বলো, পরের চাকরী।

মেয়েটি এবার চুপ করে কী যেন ভাবলো। নন্দিতাও যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না।

বললে—তোমার নাম কিন্তু ভুলে গেছি।

—অতসী। মেয়েটি বললো।

—আর একজন। তোমার দিদি?

—হাঁ অপরাজিতা···

—ও এলো না?

অতসী বললে—আমাদের দু'জনের একসঙ্গে কোথাও গেলে চলে না। বাবার তো হার্টের অসুখ, শুয়ে শুয়েই থাকেন। ওঁর জন্যে সব সময়েই একজনকে থাকতে হয়।

—কেন মা?

অতসীর মুখ নীচু হলো। অস্ফুটস্বরে বললো, নেই।

যন্ত্রণার জায়গায় অজান্তে আঘাত করে মানুষ যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, নিজেকে অপরাধী মনে করে নন্দিতার অবস্থাও সেইরকম হলো। তবু সামলে নেবার জন্যে বললো—তাতে কি, তবুতো বাবা আছেন। আমার দেখোনা বাবা-মা, কেউ নেই।

অতি দ্রুত কথাগুলি বলে ফেলে নন্দিতা নিজের গভীরতম বেদনা দিয়ে ওর বেদনা মুছে দিতে চাইলো। তারপর পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে বললো—তবে যে তোমরা দু'বোন দাদুর অসুখের সময়ে।

হ্যাঁ। সে কটা দিন দাদাকেই বাবার দেখা শুনো করতে হয়েছিলো। অতসী বললো—জানেন, আমাদের দাদার মত দাদা কারুর হয় না।

—সে আমার দাদা থাকলেও আমি বলতুম। নন্দিতার প্রতিবাদ যেন শুধু মজা করার জন্যেই।

অতসী কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো নন্দিতার মুখে। বললো—এবার উঠি।

নন্দিতা কিছু না বলে ঘরের কোলের অপরিসর বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। পাশের চিলতে ঘরের কোণে আপাদমস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়ে দাদু শুয়ে আছে। বোধ হয় সন্ধ্যের ঝোঁকে ঢুল এসেছে।

পিসী চাদর মুড়ি দিয়ে বসে কী একটা বই পড়ছে। নন্দিতাকে দেখে বললো—কিছু বলবি রে নন্দ!

কী বলবে নন্দিতা! বলবে কি এক্ষুনি একবার বাইরে বেরুতে চায়, অতসীর সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়ে ওদের অসুস্থ বাবা-কে দেখে আসতে চায়! এখান থেকে চলে যাবার আগে, এ-পাড়ার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করার আগে জানিয়ে

দিয়ে আসতে চায় যে এ-পাড়া সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা নিয়ে ও চলে যাচ্ছে না। চলেই যখন যাচ্ছে তখন এ-পাড়ার ভালোমন্দতে কী বা এসে যাবে ওর। কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। দেখলো পায়ে পায়ে অতসি ঘর থেকে বেরিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার গলিপথ দিয়ে ওরা এগিয়ে চললো সদরের দিকে। রাস্তায় নামবার আগে অতসী ঘুরে দাঁড়ালো। বললো—দাদা নিজে এসে দেখা করে যেতো, কিন্তু চলাফেরা করতে এখনও ঠিকমত পারে না।

—কেন, কী হয়েছে!

জানেন না? বাস থেকে পড়ে গিয়ে···

—কিছুই জানিনা তো!

রাস্তায় পা দিয়ে অতসী বললো—কাল সকালে দাদা দু'বন্ধুকে পাঠাবে··· আপনাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসবে। অতসী চলে গেলো কখন দেখলোই না নন্দিতা। ওর কানে তখন ট্রেনের হুইসেল, প্ল্যাটফরমের কোলাহল বাজছিলো। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিলো এমন এক নিঃসঙ্গতা যার কাছে ওর তিরিশ বছর বয়সের কুণ্ঠা অভিমান খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছিলো। সদরের বন্ধ কপাটে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নন্দিতা দেখলো ও যেন গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেই লাল বাড়িটার সামনে।

লাঠিতে ভর দিয়ে সদর দরজা অবধি এসে সমীরণ বলছে—জানতুম, যাবার আগে আপনি নিশ্চয়ই একবার আসবেন।

নিতাইচন্দ্র মণ্ডল

ঝড়ের আকাশে সূর্যোদয়

আকাশে দীর্ঘস্থায়ী পুঞ্জীভূত মেঘরাশি ঝড়ের পূর্বাভাস। প্রচুর বারিবর্ষণে আকাশ মেঘমুক্ত না হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির বায়ুমণ্ডলে সামান্য দমকা হাওয়া থেকে শুরু হয় ব্যাপক ঝটিকা প্রবাহ, জলরাশিতে দেখা দেয় বিরাট তরঙ্গ বিক্ষোভ। জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবল ধ্বংসলীলা। কত জীবন বলি হয় ঝড়ের কোপে আশ্রয়হীন হয় কত মানুষ ঝঞ্ঝা স্রোতে; শেষ সহায় স্থলটুকুও ভেসে যায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে। অবশেষে প্রকৃতির বুকে নেমে আসে গভীর প্রশান্তি ধ্বংসস্তূপের মাঝে জাগে নতুন প্রাণের সাড়া।

প্রকৃতির রাজ্যে ঝড় একটা ভয়াবহ অভিশাপ। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে যে সব মানুষ, ইস্পাত কঠিন তাদের সংঘাতময় জীবন। জীবন সংগ্রামে তারাই প্রকৃত সংগ্রামী। পৃথিবীতে যে সব দেশের জলবায়ুতে ঝড়ের উপদান সর্বাধিক, তাদের মধ্যে অন্যতম বঙ্গদেশ। বিশেষতঃ বাংলার পূর্বখণ্ড অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ঝড়ের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ। অসংখ্য নদনদী আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই পূর্ববাংলা। দক্ষিণে বিশাল অরণ্য শোভিত সমুদ্র-উপকূলবর্তী এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যেন ঝড়ের একটা বিরাট পটভূমি। সামুদ্রিক জল কল্লোলে আর বনানীর পত্র মর্মরে শোনা যায় ঝড়ের পদধ্বনি। এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি গৃহ প্রাঙ্গনে, সর্বোপরি প্রতিটি মানুষের মনে। তাই যেন দেশটার সর্বত্রই বিক্ষোভ, ঝড় আর ঝড়— সমগ্র পূর্ববাংলার অন্তর আর বহিঃপ্রকৃতিতে ঝড়ের তাণ্ডব।

আবহমান কাল ধরে অনেক প্রাকৃতিক ঝড় বয়ে গেছে পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে, অনেক বিপর্যয় ঘটেছে ওখানকার জন-জীবনে। পৃথিবীর ঝড়ের পরিসংখ্যানে সম্ভবতঃ পূর্ববাংলা শীর্ষস্থানে। ওখানকার প্রকৃতি অনেক ঝড়ের সাক্ষী, মানুষগুলির আছে ঝড় ঝঞ্ঝার অনেক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ স্মৃতি শুধু ওদেশের মানুষের কাছে নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে আজও একটা বিরাট বিভীষিকা।

শতাব্দীর সেই প্রলঙ্কর ঝড়ের ক্ষতচিহ্ন ওখানকার মাটি থেকে এখনও মুছে যায়নি। জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরুপণ করা আজও সম্ভব হয়নি। সেদিনের ঝড়ের ধ্বংসলীলা দেখে আবহাওয়ার বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছিলেন—ভৌগোলিক অবস্থিতি বিচারে সমগ্র পূর্ববাংলা বন্দুকের নলের মুখে। সত্যই ওখানকার হতভাগ্য মানুষেরা বরাবর প্রকৃতির বন্দুকের শিকার কিন্তু বড়ই আশ্চর্য ওদের জীবনশক্তি, ইস্পাত কঠিন ওদের দৃঢ়তা। আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে টিকে আছে পূর্ববাংলা, আজও বেঁচে আছে ওপারের বাঙ্গালী।

স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলার বুকে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই ঘটেনি, যুগে যুগে বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশেও জমেছে অনেক মেঘ, জাতীয় জীবনে এসেছে অনেক বিপর্যয়। অতীতদিনে একাধিকবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে বাংলাদেশ, লুন্ঠিত হয়েছে এর ধন সম্পদ। বহুবার বিদেশী শাসনাধীনে শোষিত নির্যাতিত হয়েছে বাঙ্গালী জাতি। বহিঃশত্রুর আঘাত, পরাধীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী জাতির অন্তরকে যেভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে, মনে হয় প্রকৃতির আঘাত যে তুলনায় সামান্য। কিন্তু সেই একই জীবনশক্তি সেই ঝড় প্রতিরোধকারী ক্ষমতা বাঙ্গালীকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করেছে। বাঙ্গালী জাতি বাহুবলে একদিকে যেমন বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করেছে আর একদিকে তেমনি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বারবার ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ, আপন শক্তিতে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে জাতীয় স্বাধীনতা। এই সমস্ত কৃতিত্বের মূলে বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, চরিত্রিক দৃঢ়তা, ঐক্য বোধ, আর চিরন্তন স্বাধীনতা স্পৃহা। তাই বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষেও এই বাঙ্গালী জাতির অন্তরে সর্বাগ্রে এসেছে বিপ্লবের জোয়ার, দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। বাংলার মাটিতেই সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙ্গালীর বীরত্ব, ত্যাগে আর আত্মবলিদানে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল।

প্রাকস্বাধীনতার সংকটময় মূহূর্তে কিছু সংকীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি আর ধর্মীয় গোঁড়ামী জাতীয় ঐতিহ্যবোধের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে একের পর এক সম্প্রদায়িক ঝড়। জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ়ভিত ফেটে চৌচির হয়েছে তার আঘাতে ; তাই স্বাধীনতার লগ্নে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিশাল ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে। আমাদের সোনার বাংলার বিভাগও তারই বিষম ফলশ্রুতি। সেদিন

বাঙ্গালী জাতির একটা বৃহৎ অংশ স্বাধীনতার নামে নতুন করে আর একবার নিমজ্জিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন আর শোষনের গহ্বরে। বলাবাহুল্য, এর ফলে অশান্ত পরিবেশে আসেনি শান্তি, হয়নি ঝড়ের অবসান। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর হানাহানি নতুন নতুন ঝড়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করে দেশ ও জাতির মহাসর্বনাশ সাধন করেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কত মানুষ বলি হয়েছে সেই ঝড়ে। ছিন্নমূল বৃক্ষের মত লক্ষ লক্ষ নরনারী নিক্ষিপ্ত হয়েছে এপার বাংলায়; আশ্রয় আর জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

কিন্তু হীন বুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে বেশীদিন প্রতারণা করতে পারে না। পূর্ব-বাংলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ধর্মের জিগির আর সাম্প্রদায়িকতার বিষপ্রয়োগ কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকচক্র ওপার বাংলায় নিজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা-গুরু মুসলমানদের তাঁবে রাখতে পারে নি। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ব-বাংলার মানুষ চিনেছে ওদের নয়া শাসক গোষ্ঠীকে। ময়ূরপুচ্ছধারীকাকের ছদ্মবেশ খসে গিয়ে আসল স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। আর ধূর্ত শাসকের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরও সমস্ত মোহ ভঙ্গ হয়েছে। বাঙ্গালী জাতি জেগে উঠেছে আপন সত্তায়; নিজস্ব জাতীয়তাবোধে। স্বৈরাচারী শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সমস্ত বাঙ্গালী। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ওদের অন্তর; সারা দেশে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। প্রতিটি বাঙ্গালীর কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বাঁচার দাবী আর বন্ধন-মুক্তির প্রতিজ্ঞা—বিদেশী প্রভুত্বের হোক অবসান; চাই স্বাধীনতা, চাই স্বাধিকার। অমনি অত্যাচারীর উদ্যত হস্ত বাঙ্গালীর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে; আঘাতের পর আঘাত হেনে বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে স্বৈরাচারী শাসক। বিক্ষোভ আর প্রতিরোধের ঝড়ের মুখে বাঙ্গালীর প্রতিরোধ শক্তি হয়েছে আরও দুর্বার। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে আরও তীব্র। বারুদের স্তূপাকারে দিনে দিনে ওদের অন্তর-আকাশে সঞ্চিত হয়েছে বিক্ষোভের মেঘ।

অশান্ত বাঙ্গালী। কিন্তু এটাই বাঙ্গালীর আসল পরিচয় নয়। বাঙ্গালী চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য শান্তিপ্রিয়তা। কিন্তু স্বাধীনতা কিংবা আত্মমর্যাদার বিনিময়ে শান্তি বাঙ্গালীর কাম্য নয়। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী চির বিপ্লবী। কুসুমের কোমলতা আর বজ্রের কাঠিন্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র। বাঙ্গালী জাতির মূল্যায়নে অনেকে এই সত্যটা ভুলে যায়। যারা নিতান্ত মূঢ়, তারাই কেবল বাঙ্গালীর শান্তিপ্রিয়তাকে

দুর্বলতা বলে মনে করে। এমনি মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন ওপারের জঙ্গী শাসক্। বাঙ্গালীর অশান্ত রূপ দেখে ভীত হয়ে শান্তির বুলি দিয়ে কাজ হাসিল করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাঙ্গালীর স্বাধিকারদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঙ্গালীর অন্তরের বিক্ষোভকে স্তিমিত করেছেন। অবশেষে বিশ্বাস ঘাতক জঙ্গীশাহী সুযোগ বুঝে নিরস্ত্র বাঙ্গালী জাতির উপর সর্বশক্তিতে রক্তলোলুপ নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। শুরু হয়েছে নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যা, একটা সুপরিকল্পিত বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি দুর্বল মেষশাবক নয়, দুরন্ত সিংহ শিশু। তাই সহজে বাঙ্গালী নিজেকে নিধন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত নয়। তাই গর্জন করে উঠেছে বাঙ্গালী সিংহ-বিক্রমে। আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত জবরদস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে মামুলী হাতিয়ার নিয়ে বাঙ্গালী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমগ্র পূর্ববাংলায় প্রতিটি ঘরের প্রতিটি বাঙ্গালী আজ মুক্তি সৈনিক। শত্রু সংহার আর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার আজ ওদের চরম লক্ষ্য। ভাষা-আন্দোলনে যার সূচনা, স্বাধীনতা সংগ্রামে তারই সামগ্রিকরূপ।

ওপারে বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা আজ ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ, উত্তাল ওদের জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গমালা। পূর্ববাংলার আকাশে আবার এসেছে ঝড়, শুরু হয়েছে অবিরাম বজ্রপাত। এবার আর প্রকৃতির হাতের বন্দুক নয়, মানুষের হাতের বন্দুক মানুষ মারার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কামান, বন্দুক থেকে শুরু করে শত্রুর হাতের সমস্ত সমরাস্ত্রই একটা দেশ ও জাতিকে নির্মূল করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই এই ঝড় আরও ভয়ঙ্কর, প্রাকৃতিক ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক। এযাবৎ সংঘটিত প্রাকৃতিক ঝড় পূর্ববাংলাকে এমন করে আঘাত করেনি। এমনকি, সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ঘূর্ণি ঝড়েও সারা দেশের মানুষ একই সাথে এমন করে ধনে-প্রাণে বিপন্ন হয় নি। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর ভস্মীভূত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু ঝটিকাহত হয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সীমান্তের এপারে। আবার সাহায্যের উদার হস্ত প্রসারিত করেছে এপারের বাঙ্গালী, প্রতিবেশীর দুঃখে সহমর্মিতার প্রমাণ দিয়েছে সমস্ত ভারতবাসী। শরনার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা প্রভৃতির সুযোগ দিয়ে পশ্চিম বাংলা সহ সমগ্র ভারত যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে, মানবিকতার ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। ওপারের বাঙ্গালীর দুর্দশায় এপারের বাঙ্গালীর সহানুভূতি অপরিসীম; ওদের বিপদে আমাদের উদ্বেগ সীমাহীন। এর মূলে আছে বাঙ্গালীত্ব; সবকিছুর

ঊর্ধ্বে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ। বাংলা বিভক্ত হলেও বাঙ্গালীত্ব অবিভক্ত। সীমান্তে কৃত্রিম বেড়া দিয়ে একই জাতিকে আত্মিক দিক দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। দু-পারের বাঙ্গালীর ভাগ্য চিরদিন স্বাভাবিকভাবে একই সূত্রে বাঁধা। তাই দুই এর মধ্যে এই একাত্মতা ও সহমর্মিতা একান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু আত্মিক দিক দিয়েই কি শুধু দুপারের মধ্যে এই আত্মীয়তা? কখনই নয়। ভৌগোলিক দিক দিয়েও দুই বাংলার ভাগ্য অভিন্ন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অবস্থিতি একই ভৌগোলিক পরিবেশে; একই আবহাওয়া-মণ্ডলে। একই প্রকৃতি দুই বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দর আবহাওয়া যেমন সুনিশ্চিত করে দুপারের সুখশান্তি, তেমনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ডেকে আনে উভয়ের দুঃখ-দুর্দশা। ঝড়ের আবহাওয়া বিচারে পূর্ববাংলা যদি বন্দুকের নলের মুখে অবস্থান করে, তবে পশ্চিম বাংলা তার থেকে বেশী দূরে থাকতে পারে না। বন্দুকের গুলি যদি ওপারের মানুষের বক্ষস্থল বিদ্ধ করে, তবে এপারের মানুষের দেহের কোন না কোন অংশে আঘাত না করে ছাড়ে না। প্রাকৃতিক ঝড়ে যা ঘটেছে, আশ্চর্যের বিষয় যে, কৃত্রিম ঝড়েও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। শত্রুসৈন্যের গুলি যখন ওপারের মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, তখন সেই গুলি সীমান্ত পেরিয়ে এপারের নিরীহ মানুষদের কেবল আহত করছে না, নিহত করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

কিন্তু পশুশক্তির সাহায্যে একটা জাতিকে হীনবল কিংবা ধ্বংস করা অসম্ভব। বিধ্বংসী ঝড় যে জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয় নি, কোন শত্রু সে জাতির অস্তিত্বকে মুছে দিতে পারে না। বাস্তবেও আমরা তাই দেখছি। প্রত্যহ হাজারে হাজারে বাঙ্গালী মরছে, সারা দেশটা মুক্তিপাগল মানুষদের কবরখানায় পরিণত হচ্ছে। তবুও বাঙ্গালীর বড় কৃতিত্ব বাঙ্গালী জাতি এখনও বেঁচে আছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করে চলেছে। শুধু তাই নয়, মুক্তি বাহিনী একের পর এক অঞ্চল শত্রু কবল মুক্ত করে চূড়ান্ত জয়-লাভের পথে এগিয়ে চলেছে। তাই একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙ্গালী জাতি বেঁচে থাকবে। শ্মশানের বুক চিরে নতুন বাংলা আর বাঙ্গালী আত্মপ্রকাশ করবে। মহৎ উদ্দেশ্যে যারা প্রাণ বিসর্জন দিতে জানে, পৃথিবীতে মহান জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে। বাঙ্গালীর এত দুঃখবরণ, ত্যাগস্বীকার ব্যর্থ হতে পারে না। ওপারের লক্ষ শহীদের রক্তভেজা মাটি থেকে আসছে নতুন ফসলের সংবাদ। ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ পূর্ব দিগন্তে খুলে গেছে সাফল্যের স্বর্ণদ্বার; দুঃখের রজনীর অবসানান্তে নতুন

দিনের সূর্যোদয়। অতীতে এক দুর্যোগের দিনে যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল পলাশীর প্রান্তরে এক আম্রকুঞ্জে, সেই স্বাধীনতার সূর্য আজ আবার উদিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের আর এক আম্রকাননে আর এক দুর্যোগের দিনে। আজ দুঃখের দিনে বাঙ্গালীর কাছে বড় সুখের সংবাদ—পূর্ববাংলা এখন আর বিদেশের উপনিবেশ বা অঙ্গরাজ্য নয় : সে আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশ—স্বাধীন বিশ্বে এক নতুন মর্যাদায় আসীন। যদিও ওপারের আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, তথাপি বাংলা দেশের স্বাধীনতা আজ সূর্যালোকের মত বাস্তব সত্য। ওপারের পদ্মা, মেঘনা, মধুমতীর বুক থেকে আজ নতুন আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে এপারের গঙ্গা, যমুনা, ইছামতীর জলে ; তারপর সাগর থেকে সাগর পারে। বাংলার স্বাধীনতা শুধু ওপার আর এপারের বাঙ্গালীর কাছেই নয়, সাত সমুদ্র পারের প্রবাসী বাঙ্গালীর কাছেও গর্বের বস্তু। বাংলা দেশ স্বাধীন ; কিন্তু বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত। অন্ধকারমুক্ত ; তবুও মেঘে ঢাকা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আকাশ। প্রভাত সূর্যই বাঙ্গালীর আশার আলো। শত্রুর হবে বিনাশ ; স্বাধীনতা হবে সুরক্ষিত। কেটে যাবে মেঘ ; ঝড়ের হবে চির অবসান। বাংলা দেশের মুক্ত আকাশে শাশ্বত শান্তির দীপশিখা জ্বলবে অনির্বান।

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ

....

সপ্তম অধ্যায়

দেবভাষায় একটা শ্লোক আছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমার সাহিত্য-ভাবনায় এই চলতি কথাটি আংশিক সত্য। আংশিক বলছি এইজন্য যে সিদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছতে কত দুর্গম গিরি-প্রান্তর অতিক্রম করতে হবে—সেটা তো অনিশ্চয়তার তিমিরে।

অতুলপ্রসাদ অগ্রণী হলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠাও হল।

মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য ঋত্বিকের আসনখানিতে বসবার দায়িত্বটি আমার হাতে তুলে দিলেন অতুলপ্রসাদ। অথবা দায়িত্বটি অলক্ষিতে আমার উপর এসে পড়ল।

'উত্তরা'-র জন্মলগ্ন-আসরের রূপ-পরিবর্তনের নূতন গর্ভাঙ্ক!

পূর্বপক্ষ।

'অতুলদা' কয়েক সংখ্যা 'উত্তরা' বার হল—'এ বনেতে বনমালী' গানটি ছাড়া আর একটি গানও তো লিখলেন না! এ সংখ্যার জন্য নতুন গান দিতেই হবে।

'কমলদা', কই আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ? প্রেসের দোষ দেব কি! এবারও দেখছি, কাগজ বেরুতে দেরী হবে।

'অসিতদা'র আঁকা একখানা চমৎকার ছবি পাওয়া গেছে, ব্লক করতে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছি।

'ধূর্জটিদা', বাঃ বেশ মানুষ। এই দেব, এই দিচ্ছি। আপনার লেখা পাবার আশা এ মাসে ছেড়েই দিলাম।

'কুমুদদা', ইণ্ডিয়ান প্রেস তো মোটা মোটা ক'খানা বিল পাঠিয়েছে। কিছু টাকা পাঠাতে হবে যে।'

উত্তরপক্ষ।

'নতুন গান লিখি কখন? এই তো একটা কেসে কালই আবার বাইরে যেতে হচ্ছে। স্বরলিপি-সহ একখানি পুরনো গান দেব। সাহানার স্বরলিপি

নয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য। আমার কিছু গানের স্বরলিপি করেছেন।'

'বুঝলে ধূর্জটি, একটা প্রবন্ধে হাত দিয়েছি।'

'দিলীপের লেখা পেয়েছ তো? ওকে লেখার জন্য তাড়া দিয়ে যাও।'

'তোমার কাজকর্ম ভালই চল্‌ছে, কি বল! গ্রাহক বাড়ল কিছু?'

'না, না, আমার লেখা দু'একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে। নলিনী গুপ্তের প্রবন্ধ ও কিরণধনের কবিতা তো তোমায় দিয়েই দিয়েছি। কেদারবাবুর লেখার কি হল? গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' এখন চলবে তো? বেশ মূল্যবান লেখা হে! ওঁকে ছাড়া হবে না।'

'বলেছিলে না, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য কলকাতা যাবে! কবে যাচ্ছ?'

'এ মাসটায় আমায় বাদ দাও ভাই, পরের সংখ্যায় নিশ্চয় লিখব। আমরা ত' আছিই। তোমার তো অনেক সাহিত্যিক বন্ধু। লেখো না তাঁদের।'

'হ্যাঁ, এবার 'উত্তরা'-য় মহেন্দ্র রায়ের 'তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র' বেশ ভাল প্রবন্ধ।'

'বুঝলেন অতুলদা, আমাদের কাগজের এর মধ্যেই বেশ নাম হয়েছে।'

'প্রেসের বিলগুলি নিয়ে আমার বাড়িতে একবার এস না। দেখে শুনে একখানা চেক লিখে দেওয়া যাবে।'

১৩২৬ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কানপুরে সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন। নায়কত্ব স্বীকার করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসছেন কানপুরে। বাংলার সাহিত্য-গগনের নির্মল আকাশে তখন দুই জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের দর্শন বহুজনের। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরিত শরৎচন্দ্রের প্রতি-মূর্তিটির সঙ্গেও অপরিচয় অনেকের। তিনি প্রকাশ্য সভা-সমিতি বা সম্মেলনে যোগদানে সততই অনিচ্ছুক, এটা রটনা ছিল সর্বত্র। স্বভাবতই তাঁর আগমন-সংবাদ চাঞ্চল্যকর। এ সময় আমি কাশীতে।

পত্রিকা-সূত্রে মাসে মাসে না হক কাশীতে আসতে হ'ত প্রায়ই।

কর্মাধ্যক্ষকে তাগিদ দিয়ে বর্তমান সংখ্যাখানি প্রেস কবলমুক্ত করে সোজাসুজি সম্মেলনে যোগ দেব এই ছিল বাসনা।

দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা হতে প্রথম কথা।

'কি মুস্কিল হল বলত?'

'মুস্কিল! কেন, কি ব্যাপার?'

জিজ্ঞাসার উত্তরে একখানা পত্র আমার হাতে দিয়ে বললেন: 'এই দেখ।'

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের পত্র।

কানপুরে সম্মেলন অথচ প্রথম পুরুষ কেদারনাথ অনাগত, ডাঃ সেন সেটা স্বীকার করতে গররাজী। লিখেছেন 'আপনাকে আসতেই হবে।' একটু রসিকতা করে যোগ করেছেন আরও এক লাইন—'বাহনের অভাব হবে না, সুরেশ ভায়াই ত' রয়েছেন।'

পত্রখানি পড়ে হেসে: 'এই আপনার মুস্কিল। চলুন, দাদামশায়, শরৎবাবু আসছেন, দেখাটা হয়ে যাবে। অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, ডঃ রাধাকুমুদ, কমলবাবুরাও আসবেন, আলাপ-পরিচয়ে আনন্দ পাবেন।

'ভারতবর্ষে 'কোষ্ঠীর ফল' পড়ে এখন আপনার নাম লোকের মুখে মুখে। ধূর্জটিদা বৈঠকী রসিক মানুষ, আপনাকে পেলে ছাড়তেই চাইবেন না।'

একটু থেমে 'কানপুরে আপনার গুণমুগ্ধ তো অনেক। তাঁরা আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি শ্রদ্ধাও করেন। না গেলে ডাঃ সেন সত্যি দুঃখ পাবেন দাদামশায়।'

দাদামশায়কে রাজী করাতে বেগ পেতে হয় নি।

কারণ তাঁর মনেও ইচ্ছেটা চুপিসাড়ে কাজ করছিল।

লখ্‌নৌ থেকে দলে ভারী হয়ে কানপুরে উপস্থিত হলেন অনেকে।

লখনৌ থেকে কানপুর কতটুকুই বা পথ। এ পাড়া, ও পাড়া বলা অতিরঞ্জিত হবে না।

আমাদের জন্য প্রতিনিধি-নিবাস।

সম্মেলনের কর্তাদের দৃষ্টিকোণে অতুলপ্রসাদ সেন ব্যক্তি নন, ব্যক্তিবিশেষ। তাঁর বসবাসের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল অন্যত্র। কিন্তু সে সুখ-সুবিধা সবিনয়ে অস্বীকার করে তিনি বলে উঠলেন: 'না, না, তা হয় না। আমি সকলের সঙ্গে প্রতিনিধি-আবাসে থাকব।'

সম্মেলনের পূর্ব-পরিচিত মুখই তো দেখছি। তথাপি দু' একটি মুখের 'হারিয়ে যেতে নাই মানা।' ভিড়ের মধ্যে নতুন মুখও উঁকি দিচ্ছে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম এ সম্মেলনে সকলের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। অতুলপ্রসাদপ্রমুখ সম্মেলন-প্রধানদের সঙ্গে একাত্মতা প্রথম দর্শনেই।

অধিবেশনের সন্ধিক্ষণে কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শরৎচন্দ্র আসবেন না। সম্মেলন সম্পাদকের ভাষ্য—অসুস্থতা-নিবন্ধন।

অতএব প্রত্যক্ষ সুপাত্রটিকে সভাপতি পদে বরণ করে মাল্যদান করা হল।

আচম্বিতে এ-ভাবে সভাপতি-পদেবৃত অতুলপ্রসাদ বিভ্রান্ত হ'লেও অসম্মতি প্রকাশ করতে পারলেন না। প্রাণপ্রতিম এ প্রতিষ্ঠানের গঠনভিত্তির প্রথম কর্ণিক-স্পর্শ তো তাঁরই।

সভাপতির ভাষণ নয়। স্বল্প দুটি কথা। একটু মনে পড়ছে। যেন বলেছিলেন ভরতের উপমা দিয়ে। 'রামের অবর্তমানে সিংহাসনে তাঁর পাদুকা স্থাপন করে ভরত যে-ভাবে রাজ্য পরিচালন করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এ সভায় আমারও ঐ ভূমিকা।'

এটুকু বলেই, অভিভাষণের বিনিময়ে 'ভারত ভানু কোথা লুকালে' দরদভরা কণ্ঠে গানের অর্ঘ্য দিয়ে সকলের চিত্তজয় করলেন। সভা নিস্তরঙ্গ। শুধু গানের একটি স্তবক দর্শকমনে ঘুরে-ফিরে যেন প্রশ্ন করে চলেছে:

'আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন?
কোথা সে কালা, কালিন্দী কূলে?

কিন্তু সম্মেলনেব পক্ষান্তরও আছে।

কাজের কথার চুলচেরা-বিচারে অংশ নিয়ে 'উত্তরা'-র জন্মকথা শুনিয়ে বললাম—'পত্রিকার শিশুত্ব চল্‌ছে, পোষণের জন্য চাই অর্থ। লখ্‌নৌ সম্মেলনের প্রতিশ্রুত অর্থ আশানুরূপ কোষাধ্যক্ষের ভাণ্ডারে জমা পড়েনি। চেষ্টা করেও আমরা অসম্পূর্ণ। এখন সম্মেলন কথাটা ভাবুন।'

একটু আলোড়ন তুলে তরঙ্গভঙ্গ।

সভামঞ্চে এ দু'টি দিন অধিকাংশ সময় স্থাণুর মত উপবিষ্ট অতুলপ্রসাদ। প্রবন্ধপাঠ শুনেছেন, আলোচনার অংশভাগী হয়েছেন। সভাপতির রায় স্বাধীন। দু'পক্ষেই সন্তোষ।

বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে যুবজনের দৃষ্টান্ত।

পঙ্‌ক্তিভোজন সমাপ্ত করে দিনমানে সভা, রাত্রের মধ্যযাম পর্যন্ত প্রতিনিধি-মণ্ডপে গানের মজলিস। বিরামহীন গান আর গান। এ যেন গানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে—গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।

শ্রোতারা তাঁকে পেয়ে ধন্য। সম্মেলনে আসা তাঁদের সার্থক!

কানপুর সম্মেলন শেষে গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলি অতিবাহিত করতে অতুলপ্রসাদ বাঙ্গালোর যান।

পত্রের শরবর্ষণ সেখানেও।

'গান ত লিখ্‌বেনই, প্রবন্ধ লিখ্‌তে হ'বে। ভ্রমণ-কাহিনী লিখুন না—এত বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র।'

উত্তরও পাই।

অতুলদা চিঠি লিখলেন বাঙ্গালোর থেকে।

বিদেশে গিয়েও বাণী পাঠিয়েছেন আমাকে। গ্রাহক সংগ্রহ করেছেন। গান লিখেছেন। মনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন—এবার ধারাবাহিক কিছু লিখবেন। যতটুকু সাধ্যায়ত্ত আমাদের সাহিত্য-যজ্ঞে সমিধ আহরণে সচেষ্ট। পত্রখানি তো এই কথাই বলে।

Clonelley
Sumpegay Tank Road
Bangalore. 9.7.26

স্নেহাস্পদেষু,

সুরেশ, তোমার পত্র দু'খানাই যথাসময়ে পাইয়াছি। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের 'উত্তরা'-ও পাইয়াছি। তোমার উদ্যোগ ও পরিশ্রমের উপরই 'উত্তরা'-র ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। আশা করি এতাবৎকাল 'উত্তরা'-র উন্নতিকল্পে যেরূপ যত্ন করিয়াছ তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এখানে দু' একজন গ্রাহকের জোগাড় করিয়াছি ; দু' একদিনের মধ্যেই তাহাদের নাম পাঠাইব ; তাহাদিগকে 'উত্তরা' পাঠাইয়া দিও।

দ্বিত　তোমার অনুরোধ মত একটি গান পাঠাইতেছি ; কথাতেই বঝিতে পারিবে সেটি ইদানিং লেখা। 'উত্তরা'-র জন্য আরও কিছু এক গাহ্ করিয়াছি। সেগুলি এখনও লেখনীতে আসে নাই, তবে ত্রিকার শি মজুদ। এবার ধারাবাহিক কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব। াহিত্যমার্গের রতে অনেক দেশে ঘুড়িয়াছি।

কবি, প্রবন্ধকার ম ২২শে জুলাই লক্ষ্ণৌ ফিরিব।

পাঠাগার, শিক্ষা প্র করি, তোমরা সকলে কুশলে আছ।

'উত্তরা'-র সমাদর।　　　শুভাকাঙ্খী

অপরত্র 'উত্তরা'　　　শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

[illegible]

আমি 22শে জুলাই লক্ষ্ণৌ ফিরবো।

আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পত্রের বর্ণাশুদ্ধি নিয়ে কত-না রঙ্গ করতাম অতুলদা'র সঙ্গে। র ও ড়-এ সমান প্রীতিবিশিষ্ট অতুলপ্রসাদ হাসতেন। 'এবার দেখ্‌ছি বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগটা পড়িয়ে ছাড়বে তোমরা।'

এক বছরের জীবনেই 'উত্তরা' সমালোচনার নিকষে নির্বিকল্প সাহিত্য-ত্রিকার শিরোপা পেয়েছে। 'উত্তরা'-র আভিজাত্য আছে, অহঙ্কার নেই। াহিত্যমার্গের সার্থকনামা প্রবীণ ও প্রতিশ্রুতিবান নবীন কথা-সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকার 'উত্তরা'-র আমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে 'উত্তরা'-র স্বীকৃতি। বহু পারিবারিক সংগ্রহে 'উত্তরা'-র সমাদর। বিজ্ঞাপনের বাণিজ্যলক্ষ্মীও অপেক্ষাকৃত সদয়।

অপরন্ত 'উত্তরা'-র প্রতিটি সংখ্যার জন্য মূল্যবান আইভরি কাগজ,

আর্টপেপারে ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট, বহুবর্ণের চিত্র। প্রবন্ধ বা ভ্রমণ-কাহিনীর জন্য ফটোচিত্র। উচ্চহারে মুদ্রণ-মাশুল। অনুক্ত অন্যান্য ফিরিস্তি।

এখন আয়-ব্যয়ের সংগতিশূন্য দর-কষাকষি।

দুর্মনায়মান চিত্তে অতুলদা-র 'হেমন্ত-নিবাসে।'

'সুরেশ যে, এস, এস। খবর বল। দেখ, 'উত্তরা' দেখ ছি কতকটা অনিয়মিত হয়ে পড়ছে।'

'হ্যাঁ। প্রেস কাজে একটু ঢিল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা হিসেব দাখিল করে এক পত্রে এও জানিয়েছেন, তাঁদের পাওনা টাকা অবিলম্বে শোধ করে না দিলে পত্রিকা-ছাপানো বন্ধ করে দেবেন।'

অতুলদা' উদ্বিগ্ন হ'লেন, বললেন: 'রাধাকুমুদবাবুকে সব জানিয়েছ? কি বলেন তিনি?'

'তাঁর উত্তর 'উত্তরা'-র ফাণ্ডে টাকা কোথায়? কথা ত' অনেকে রাখলেন না, যা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, যেমন তোমরা বলেছ, চেক্ কেটে দিয়েছি।'

অতুলদা' গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

আবহাওয়াটা আদৌ সুখকর নয়।

'উত্তরা'-র গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনের আয় থেকে মাঝে মাঝে প্রেসকে 'পেমেণ্ট' করা হ'য়েছে। প্রতিমাসে কাগজপত্র কেনাকাটা, অফিস পরিপোষণ—সেও মোটা টাকার খরচ। এখুনি 'উত্তরা' স্বয়ম্ভর হ'বে, এতটা আশা করতে পারি না। অঙ্গীকৃত টাকাগুলি সব পাওয়া গেলে পরিস্থিতি এতটা অসহ্য হ'ত না।'

অতুলদা' নিঃশব্দে আমার কথা শুনে গেলেন।

'তুমি ভেবেছ কিছু এ-সম্বন্ধে?' অতঃপর প্রশ্ন।

'এখন শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিলে মুখরক্ষা হয়। বছর ত' শেষ হয়ে এল। নতুন বছরের 'উত্তরা'-র গ্রাহকের টাকাগুলি এসে পড়বে। বিজ্ঞাপনের বিলও কিছু অনাদায়ী। এতটা টানাটানি থাকবে না।'

আমার আশ্বাসসূচক কণ্ঠস্বর।

দ্বিরুক্তি করেন নি অতুলপ্রসাদ।

পাঁচশত টাকার একখানি চেক্ লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন।

কিন্তু শেষ এখানেই নয়।

অশনি-সম্পাতের প্রথম সংকেত।

* * * *

'উত্তরা'র এই ত' সবে উঠতি জীবন। মাত্র হাঁটি-হাঁটি, পা-পা। এরই মধ্যে তার প্রাণশক্তি অর্থনৈতিক পীড়নে থরথর।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্মকর্তা এবার একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব পাঠিয়ে তাঁদের প্রাপ্য দু'হাজার তিনশত টাকা দাবী করে বসলেন।

আংশিক নয়, পুরো টাকাটা না পেলে পত্রিকা আর প্রকাশ করবেন না। শুধু কথাটা জানিয়েই নিরস্ত হন নি, প্রেসে 'উত্তরা'র কাজও বন্ধ রাখেন।

এ ত' সমস্যা নয়—সংকট।

সমস্যা নিরাকরণের নানা পথ।

কিন্তু অর্থঘটিত সংকটের নিরসন-সূত্র একমাত্র ঐ অর্থ।

এই ত' সেদিন অতুলদা' পাঁচশো টাকা দিলেন।

আর যে কেউ উদারহস্ত হ'বেন, সে সম্ভাবনার ছোট একটু আলোকরেখাও যে দৃষ্টিবহির্ভূত।

'সম্মেলন তো ফতোয়া দিয়ে দায়মুক্ত। কর তোমরা পত্রিকা-প্রকাশ। গা-ঢাকা দিতে তার কতক্ষণ।'

পত্রিকাখানি যে যৌথ উদ্যোগের ফলশ্রুতি এ চেতনাও যেন আজ সকল মহলে অনুপস্থিত।

প্রতি সংখ্যা কাগজখানি হাতে নিয়ে—'বাঃ, বেশ হ'য়েছে এ সংখ্যাখানি'। এর বেশি ভারাক্রান্ত হ'তে কেউ চান না।

একমাত্র সৃষ্টিছাড়া অতুলপ্রসাদ।

অতুলদা' ইণ্ডিয়ান প্রেসকে দ্বিতীয়বার পাঁচশত টাকার একখানি চেক্ পাঠিয়ে 'উত্তরা'-র কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, অনুরোধ করে পত্রও লেখেন।

তখনকার মত প্রেস একটু চুপচাপ।

তিরোভাবের প্রতিবন্ধ থেকে আপাততঃ 'উত্তরা'-র উত্তরণ।

কিন্তু 'উত্তরা' ত' মুমূর্ষু। এত টাকা ঋণ।

পরিচালন-সমিতির সভ্য-সুজনদের সচেতন করতে ও 'উত্তরা'-র ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অবধারণের জন্য আহ্বান করা হ'ল এক আলোচনা-সভা সেন মহাশয়ের বাসভবনে।

যথানিয়মে আলোচ্য-সূচি-সম্বলিত পত্র পাঠান হ'ল সদস্যবৃন্দ সকাশে।

ঘরে-বাইরের সভ্যরা কেউ এলেন, কেউ বা পত্র লিখেই নির্ঝঞ্ঝাট।

'উত্তরা'র ঘটস্থাপনার উৎসাহমুখর আসর নয়। নিরুৎসব ম্রিয়মাণ কক্ষে কয়েকটি মানুষের নির্বিকার উপস্থিতি।

উপস্থিত তর্কিত-বিষয় 'উত্তরা'র হিসাব-পত্র।

এখানে বিনয় দাশগুপ্ত আগুয়ান। লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড্ অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমার্স।

তন্ন তন্ন করে প্রতিটি 'ডেবিট-ক্রেডিট' মেলাতে গিয়ে আশ্চর্য। 'প্রেসই শুধু টাকা পায় না, পায় সুরেশও। নিয়োগ-পত্রে তাকে যে টাকাটা মাসে মাসে দেবার উল্লেখ ছিল, খতিয়ানে তা অনুদ্দিষ্ট।

পরামর্শ তো হিং টিং ছট্। কথার ফুল্‌কি ঘরময়। সকলের ভাবখানা—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন,—এস্থলে অতুল সেন।'

*

'উত্তরা'র অনাদায়ী বিলগুলির স্বত্ব নিয়ে প্রেস তৎপর হ'য়ে উঠ্‌লো।

কর্তৃপক্ষ এবার আমায় পাশ-কাটিয়ে সেন মহাশয় বরাবরেষু।

প্রেস্সের অধিনায়ক হরিকেশব ঘোষ মহাশয় পত্র লিখলেন নিজস্ব এমবস-করা সুমুদ্রিত লেটার-প্যাডে।

22nd April 27

Dear Mr. Sen

I am sorry to bring to your attention that our letter regarding payments of Uttara bill has not so far been replied to.

I hope you will please see that payment be made immediately so that we may not be inconvenienced.

Yours sincerely.
H. K. Ghose

A. P. Sen Esq.
Lucknow.

পত্রের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু তাগাদা-সমৃদ্ধ।

বিব্রত অতুলপ্রসাদ।

বিব্রত আমিও। এই পত্রের মর্যাদা-মূল্য না পাঠালে পত্রিকা-মুদ্রণ আবার স্থগিত।

* * * *

এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান প্রেস। হরিকেশববাবুর খাস-কামরা।

'এই যে সুরেশবাবু! এলেন তাহ'লে। আমাদের যে অনেক টাকা পাওনা। কত টাকা এখন দিচ্ছেন ?'

প্রথম আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হ'লেও কুশল প্রশ্নের অন্তরালে একটু স্থিতধি হবার প্রয়াস।

প্রধান বক্তব্যের উপক্রমণিকাতেই হরিকেশববাবুর ঈষৎ উত্তেজিত প্রতিবাদ।

'না, না, সমস্ত বিলের 'পেমেণ্ট' না হ'লে 'উত্তরা'র কাজে আর হাত দেব না।'

বলতে যাচ্ছিলাম—'আসছে সম্মেলনে···'

কথার আগডালেই আমায় নিবৃত্ত করে সজোরে: 'আমরা আপনাদের ওই সম্মেলন-টম্মেলন জানি না। আমরা জানি মিঃ সেনকে।'

'উত্তরা'-র সংস্রবে মাঝে-মাঝে আমার এলাহাবাদ আসা এবং কার্য-ব্যপদেশে হরিকেশববাবুর কাশী আগমন এ দু'টি ঘটনাক্রম নিষ্ফলা নয়।

সুভদ্র, সুপুরুষ, কর্মবীর ভদ্রলোকটির গুণমুগ্ধ হ'তে কালবিলম্ব হয় নি। আমার সাহিত্য-প্রীতি ও কর্মনিষ্ঠায় সম্ভবতঃ তিনিও অল্পাধিক সহানুভূতিশীল। দুর্বলতা একটু ছিল বৈ কি!

বাতিল একেবারে হলাম না।

'বেশ, এখন হাজার টাকা দিন। দুই। প্রতি সংখ্যার 'উত্তরা'-র ছাপানোর টাকা অগ্রিম দিতে হবে। শেষ কথা। শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়কে এক পত্র দিতে হবে এই মর্মে—যে টাকা বাকী রইল তার জন্ম তিনি দায়ী।'

দৌত্যের ফলাফল পরিবেশন করলাম অতুলপ্রসাদকে।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যমণি লখ্‌নৌ অতুলপ্রসাদের কর্ম-সাধনার আদ্যপীঠ।

তাঁর য়্যুনিভারসিটি আছে, ম্যুউনিসিপ্যালিটি আছে। মিশন আছে, দরগা আছে। রাজনৈতিক তৎপরতা আছে, আছে কোর্ট-কাচারি-বার-এসোসিয়েসন। দানের বহর আছে, গানের আসর আছে। আতিথেয়তা আছে, আছে সামাজিকতা। শরীর আছে, সৌখিনতা আছে। সর্বশেষ, আছে সম্মান, আছে প্রতিপত্তি।

নেই কি? নেই স্বাস্থ্য।

এখন সেই সদা-প্রচলিত প্রবাদটির মত 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি।'

আমি 'উত্তরা'-র কথা বলছি।

এই পঞ্চাশ অতিক্রান্ত প্রাণময় পুরুষটি প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সূচনা থেকেই এর শীর্ষস্থানে। এই সদ্য অঙ্কুরিত প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙালীর নব জাগরণের দিশারী হবে এ ভাবশুদ্ধি তাঁর ছিল।

প্রতিষ্ঠান একক সংগঠন নয়। বহুজনের মিলিত উপক্রমের ভাব-রূপ।

সেই ভাব-রূপ-সমুদ্রোত্থিতা 'উত্তরা'। এক হাতে সাহিত্যের আলোক-বর্তিকা, অন্যহাতে আশ্বাসের করভঙ্গী।

কিন্তু আশ্বাস তো ছত্রভঙ্গ।

পরিচালন-সমিতির বৈঠকের পুনরাবর্তন। 'এক হাজার টাকা, মুদ্রণের অগ্রিম দাদন, সেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞাপত্র।'

উত্ত্যক্ত অতুলপ্রসাদ। চাপা বিরক্তি ওষ্ঠপ্রান্তে। 'আমি এ টাকার জন্য দায়ী হতে পারি না। 'উত্তরা' সম্মেলনের কাগজ, দায়িত্ব সম্মেলনের।'

বিক্ষুব্ধ আলোচনার ঘনঘোর।

অন্যদের মতে: 'কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হ'ক এবং সকল গ্রাহককে জানান দিয়ে নোটিশ পাঠান হোক।'

বললাম: 'প্রবাসী বাঙালীরা নয় আমাদের সংকট বুঝলেন কিন্তু তাঁরা ছাড়াও তো অনেক গ্রাহক আছেন। ধরুন, বাংলা দেশ। 'উত্তরা'র দ্বিতীয় বর্ষের এই তো কয়েক মাস। মোটে তো তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে। পরের ক'মাস কাগজ না পেলে এঁরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববেন?'

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

'তারপর প্রেস?'

'আসছে সম্মেলনে এ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা হবে।'

'প্রেস তাতে রাজী নয়। তাঁরা টাকাটা আদায় করবেন আমাদের কাছ থেকেই।'

সেন সাহেবের স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান।

'আমি তো অনেক টাকা দিয়েছি, অন্যরা এবার যা হয় করুন।'

হোমরাচোমরা অনেকেই তো সভাসীন।

বাক্‌স্ফূর্তি নেই কোন কণ্ঠে।

অনুমানে বুঝলাম—কেউ আর এ নিয়ে শিরঃপীড়া ঘটাতে প্রস্তুত নন।

'উত্তরা'র অন্তিম-বাসরের বন্ধুরা উশখুস করতে লাগলেন।

আলোচনার গতি-প্রকৃতির অন্তর্বর্তী সময়-সীমার ধাপে ধাপে একটা দুঃসাহসিক প্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে উঠছিল মনের অন্তঃপুরে।

এবার তার প্রকাশ্য বিস্ফোরণ।

'উত্তরা'কে বাঁচিয়ে রাখবার একটা সুযোগ দিন আপনারা। অন্ততঃ বাকী ন' মাস কাগজখানার পরিচালনার ভার দিন আমাকে।'

সকলের বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে বিদ্ধ হ'লাম। ততক্ষণে আত্মপ্রত্যয়ে আমার সঙ্কল্প আরও দার্ঢ্য। তৈরী হ'ল একখানা সর্তকণ্টকিত খসড়া-পত্র। সম্মেলনের স্বার্থ, সম্পাদকদ্বয়ের ভূমিকা যথাযথ। সর্তের কোন কোন ধারায় মৃগতৃষ্ণিকার অনেক ছলনা। মূল হেরফের অর্থ নৈতিক দায়-দায়িত্বে।

সেই চুক্তিনামায় সম্মেলনের প্রতিভূরূপে স্বাক্ষর দান করলেন সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ, ডঃ রাধাকমল ও ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়রা।

নিজের সম্বন্ধে মূল্যায়ণটা একটু বেহিসেবী হ'য়ে থাকবে।

অথচ আমার আবাল্য তপস্যা প্রবাস থেকে একখানা উচ্চকোটীর সাহিত্য-পত্রিকার অভ্যুত্থান। সাহিত্য-সাধনার কৃচ্ছ্রতায় দু-দুবার যত্নবান হয়েও ব্যর্থকাম।

ব্যর্থতার তিমিরান্ধকার ভেদ ক'রে আশার আলোকচ্ছটা আবার ঝলমল। সম্মেলন সহায় হ'লেন, সহায় হ'লেন অতুলপ্রসাদ। 'উত্তরা'কে মনের মত সাজিয়ে, বঙ্গবাণীর চরণে অর্ঘ্য ডালি দিয়ে এই ত' পুরশ্চরণের প্রথম পদক্ষেপ। এখনই ভূলুণ্ঠিত হব।

অতুলদার অবসর সময়টুকু আমার চিহ্নিত।

প্রাতঃকাল। অতুলদার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী। একখানি ছোট কাঁচি হাতে নিয়ে তিনি গুনগুন করে আপন মনে একটি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে উদ্যানের ফুল গাছগুলির শুকনো, শীর্ণ ডাল-পালার সম্মার্জন করছিলেন।

আমায় দেখে চিরাচরিত সহাস্য সম্ভাষণ।

আমার অধরে শুষ্ক হাসি।

'চল, চা খাবে।'

চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতে কেবল একতরফা কথার আত্ম-নিবেদন।

'অতুলদা' কাগজখানি বাঁচিয়ে রাখতেই হ'বে। 'উত্তরা' আপনার মানস-

কন্যা। অনেক তো করেছেন। সময় দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। আরও কিছু করুন। আমায় পাঁচশো টাকা দিন এই শেষবারের মত। বাকী পাঁচশো'র যোগাড় করে নেবো। অন্য সব ঝক্কি তো সাধ করেই নিয়েছি।'

অতুলদা'র তূষ্ণীম্ভাব।

আমার মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব।

ফিরে এলাম নিজস্ব কোটরটিতে।

দুশ্চিন্তার বিষবাষ্পে সমস্ত মন সমাচ্ছন্ন।

মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠল, প্রতি মাসে দেয় মুদ্রণদক্ষিণা, নগদ সহস্র মুদ্রার সংগতি, উদ্বৃত্ত টাকার স্বীকার-নামা।

কিন্তু আমায় নিরাশ করেন নি অতুলপ্রসাদ।

'সায়েব এখানা আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

অতুলদা'র খাস মুন্‌সিজী দেখা করতে এসে আমার হাতে একখানি বন্ধ খাম দিলেন।

খামখানি উন্মুক্ত করতেই দেখি, শুধু পত্রই নয়, আরও কিছু। আমার প্রার্থনা-পূরণ। তবে চিঠিখানির প্রতি ছত্রে ক্ষোভিত মনের বহিঃপ্রকাশ।

Hemantanibas
Charbagh
Lucknow
1. 5. 27

প্রিয় সুরেশ,

'উত্তরা'র জন্য আমাকে খুব ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হচ্ছে; যদি জানিতাম আমার উপরেই সমস্ত দায়ীত্ব ফেলবে তাহ'লে এ কাজে হস্তক্ষেপ করতাম না। যাহা হউক আমি আর একখানা ৫০০ টাকার Cheque Indian Press-এর নামে দিচ্ছি—যদিও এর জন্য আমি নিজে দায়ী নই। তুমি এ চেকখানা দেবে না যদি Indian Press আমাকে তাদের টাকার জন্য Personally দায়ী করতে চান। আমি Indian Press-কেও একখানি চিঠি দিলাম। ভবিষ্যতে তুমি যে সর্তে কাগজখানি আগামী আশ্বিন পর্য্যন্ত চালাইতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ, ঠিক সেরূপভাবে কাজ করিবে।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পুঃ সবশুদ্ধ আমি উত্তরার জন্য প্রায় ১৫০০ টাকা দিলাম

সংশয়-দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে প্রেসের সর্বেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের আত্ম-সমর্পণ : 'তবে তাই হোক।'

'উত্তরা'র পট-পরিবর্তন হ'লেও অতুলদা'র হৃদয়-পরিবর্তন হয় নি।

স্নেহে, আশ্বাসে, শুভেচ্ছায় বারবার দায়গ্রস্ত।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকটা তো বাংলা-সাহিত্যের 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'র যুগ। সেই যুগের পত্রিকা 'উত্তরা'। সাহিত্যের নব কলেবরে অনেক অস্বীকার, অনেক অসন্তোষ, অনেক বিদ্রোহ-বহ্নি। সেই বিদ্রোহ-বহ্নির আঁচ 'উত্তরা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। আমৃত্যু 'উত্তরা'-র শিরোদেশে 'সম্পাদক' অভিজ্ঞানটি বহন করে অনেক উত্তাপ সহ্য করেছেন অতুলপ্রসাদ।

এ আশির দশকে সে-সব কথা ও কাহিনী তো স্মরণাতীত। সাধ্য-সাধনায়, মন্ত্র-উচ্চারণে অতীতকে আবাহন করতে হবে :

'কথা কও, কথা কও
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি, সব তুমি তুলে লও—
কও কও, কথা কও।'
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্যলিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও কথা কও।

স্তবে তুষ্ট 'অতীত' যদি কখন মুখর হয়, কথা কয়, তবে শ্রাবকের অবিদ্যমানতায় তাকে স্তব্ধ হ'তে হ'বে না।

সুধীর করণ

রাশি চক্রে অন্ধকার

....

অন্ধকার শেষ হলে
 ভোর হয়।
প্রতিদিন মনে হয়
জন্তুরা মানুষ হবে।
প্রতিদিন মনে হয় শকুনের ডানা
 আকাশে উড়বে না আর!
বর্বর হিংসার কণ্ঠে শ্মশানের চিতা
জ্বালানো হবে না আর!
প্রতিদিন মনে হয়—
রাজহংস সরোবরে যাবে
পৃথিবী বিচিত্রা হবে
 নখের দর্পনে।
কিন্তু কিছুতেই—
গীর্জাতে বাজে না ঘণ্টা,
শ্লোক আর উচ্চারিত নয়—
আকাশের বিষন্নতা কিছুতে কাটে না।
ফুলের রঙের মোহে—
প্রজাপতি কিছুতে আসে না।
রাশিচক্র অন্ধকার। ক্ষ্যাপামোষ। কবন্ধ শরীর।

সুভাষ ঘোষাল

ইতিমধ্যে

....

আজ দুপুর বাসন হয়ে ছড়িয়ে আছে
যা অক্ষয় তা তো মানুষের কোন কোন মৌলিক স্বাদ।

অসীম মৌলিক এই প্রান্তফাল্গুন যদি
তবে কেন অহরহ ভয় পাও!

আমার বিলম্ব হয়
বিদায়ের মতো তাড়াতাড়ি
আমার ফেরার কথা ছিলো।

কথা বলে উড়ন্ত বায়স বারবার
ছাদে কার শাড়ী নদীর স্রোতের মতো নীল!

তাদের দিকে যাবার পথ নির্মান সাপেক্ষ
যারা জেনেছিলো জলের অভাব হবে
  যে কোন সময়।

ইতিমধ্যে আমি যাই
    যেখানে দুপুর বাসন হয়ে
    বাসন ঘরের হয়ে
    ছড়িয়ে রয়েছে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন শুধু ভিন্ন নামে ডাকা

এখন শুধু স্মৃতিকথার ঝাঁপি, অলীক ছলাকলা
এখন শুধু ছদ্মভাষার বলা : নিজের প্রতিশ্রুতি,
এখন কেবল নিজের ছায়ায় সিন্ধুতীরে পোষাকবদল
স্পর্শকাতর জলের ব্যথা জলে ;—নষ্ট অহংকার
মায়ার টানে তোমারি সংসার,
পায়ের কাছে মাটি।

বিস্মরণের হাওয়ায় ফেরে ময়ূর !

এখন শুধু ভিন্ন নামে ডাকা।

শোভন মিত্র

সন্তানের উদ্দেশ্যে

আমাকে যা এড়িয়ে গেছে অবহেলায়
আমার আগামী আত্মজ তুই, সেই অসুখে ভোগ
ভালোবাসার কঠিন রোগে—রোজ তোর রক্ত ঝ'রুক
ভালোবাসার অসংখ্য দুর্ভোগ ঘিরে ধরুক তোকে,
দুঃখ শোকে গলার কাছে ব্যথার মত করুক।

আমাকে যা ছুতো নাতায় এড়িয়ে গেছে
সে কান্না তোর ঘুম কেড়ে নিক্। যে অপমান
ইচ্ছে করে গায়ে মাখিনি
তোর কাছে তা অধিক মনে হোক!

হে আত্মজে তুই খুঁজে নে
কোন আগুনে বুকের বনে আগুন ওঠে
ইস্তাহারে আবেগ ফোটে কোন ধরণের বর্ণমালায়!

আমাকে যা হেলাফেলায় ছাড়িয়ে গেছে—যে ক্রোধ
আমার আগামী অবোধ তাতে তোর শরীর যেন তাতে
আমাকে যা তুচ্ছ করে গেছে
সেই বিড়ম্বনার হাতে
তুই লাঞ্ছিত হ, লাঞ্ছিত হ রোজ!

কুড়ি

পরের দিন সকালে আর আর লোকজনদের সব ডেকে পাঠালেন শরৎচন্দ্র। তারপর চললো অনেক কথাবার্তা। শেষকালে ঠিক হোলো পত্তনিদার জমিদারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাতে যদি আরও কোনো গুরুতর কিছু ঘটে, তারও মুখোমুখি হতে কেউ পেছিয়ে পড়বে না। সে দিন সকলের মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, বড় রকমের একটা কিছু সংঘর্ষ যখন তখন বেধে না যায় জমিদারদের দলের সঙ্গে।

গৌরপতির চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল তখন, তাতে সবাই বলেছিল ওই উপযুক্ত জবাব জমিদারদের প্রয়োজন হলেই। সে বলেছিল তখন, আপনাদের হুকুমের অপেক্ষায় শুধু আছি ঠাকুর। একবার শুধু দেখতে চাই জমিদারের কত শক্তি আছে, আমাদের বাপ ব্যাটা লাঠির সামনে এসে দাঁড়ায়?

এইসব দেখে বুনো ঘোষাল সেদিন এসে আপোষ মিটমাটের কথা তোলেন। তারপর ঠিক হয়, জমিদার পক্ষ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা ও অভিযোগ তুলে নেবেন। আর কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন না তাঁরা। তা ছাড়া যে দেবোত্তর জায়গাটা নিয়ে এত ঝগড়া সেটাও ফিরিয়ে দেবেন গ্রামবাসীদের। এরপরও যে-যে মারামারিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বা আঘাত পেয়েছে যারা, তাদেরও চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করবে জমিদার তথা পত্তনিদার পক্ষ।

সেদিন জমিদার পক্ষ বিষম বেকায়দায় পড়ে বুনো ঘোষাল তথা বড় ঘোষালের বুদ্ধিতে একটা সোলেনামা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার পেছনে যে শত্রুতাও জিইয়ে রেখেছিল তারা, তারও অবদান ছিল ওই দুই ঘোষালের। পরে কত যে ঝঞ্ঝাট আর গণ্ডোগোল পাকিয়ে তুলতে সেখানে একটুও কসুর করেন নি ওই ঘোষালরা, সে তো সকলেরই জানা আছে। সে যাক্, বড়মা বলতেন, এরপর থেকে গৌরপতির ওপরে অনেকেরই ভয় বেড়েছিল খুব। আরও বলেছিলেন তিনি, গৌরপতিই হোলো আকবর সর্দারের ছায়া, পল্লীসমাজের আকবর সর্দারে আর গৌরপতিতে কোনো প্রভেদ নেই।

শরৎচন্দ্র শহর ছেড়ে পল্লীগ্রামে বসবাস করাতে, শত্রুতা ছাড়াও কত রকমের যে বাধা বিপত্তি আর দুর্বিপাকের সামনা সামনি তাঁকে পড়তে হয়েছিল, সেও ছিল এক দারুণ কঠিন ব্যাপার। এসব সত্ত্বেও পল্লীগ্রামকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর মুখের কথা ছিল,—দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করছেন—সেই গ্রামই আমার সব। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেকদিন ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি।

বর্ষাকালে তাঁর পল্লীর রাস্তাঘাট ছিল দারুণ সাংঘাতিক। সামতাবেড়ের তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে যে বাঁধের একমাত্র রাস্তাটা বড় বড় মাঠ পেরিয়ে একেবারে স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেটা ছিল তখন মানুষ মারার কল। এমন পেছল হোতো সেটা, কোনোদিন বর্ষায় তিনি বেরুতে পারতেন না। সে বিষয়ে এক বন্ধুর কাছে কৌতুক করে লিখেছিলেন তিনি,—যে বিশ্রীপথ, তাই কেউ আসবে বললে ভাবনা হয়—এ রাস্তা পার হবে কি করে? তাছাড়া এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাঁটু পর্যন্ত না উঠলে আর পাড়াগাঁয়ের মর্যাদা রইলো কোথায়? আরও বলেছিলেন তিনি আর এক চিঠিতে,—আচ্ছা জায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে ক্ষুর গজায়—তাতেই দিব্যি তারা খট মট করে হেঁটে চলেন,—পিছলে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায়নি—তবে এঁরা ভরসা দিয়েছেন আরও দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে।

এর ওপর এখানে বাণ-বন্যার পরিস্থিতিও ছিল দারুণ ভয়াবহ। আর সে কথাও তিনি লিখেছিলেন আর এক চিঠিতে আর একবার। লিখেছিলেন তিনি—বাণ ও বন্যায় ঐ নদী (রূপনারায়ণ) যে কি ভীষণ হতে পারে এবার ভালো করে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আসতে সে নেই। বোধহয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপরে জল আর জল! বাংলা দেশের ষড়ঋতুর অর্থ যে সত্য-সত্যই কি বস্তু তা এখানে বছরখানেক না থাকলে বোধ করি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ···দিন দশ-পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে যোজানো এই নিয়ে কেটে যাচ্ছে।

এসব নিয়ে বড়মা কতবার যে বলেছিলেন তাঁকে দেশ ছেড়ে আবার শহরে ফিরে গিয়ে স্বস্তি ও শান্তিতে বসবাস করতে, তাতে তিনি একবারও মত দিতে পারেননি। দিনের পর দিন কিন্তু বড়মা বলে যেতেন সে কথা। বলতেন

কোলকাতায় একখানা বাড়ি করার জন্যে তাঁকে বার বার। বড়মার এমন একটা ইচ্ছে প্রবল হয়েছিল যে, তিনি কোলকাতায় গিয়ে নিজের বাড়ীতে কিছুদিন থাকেন। তাতে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তাঁকে, বেশ তোমার জন্যে না হয় কোলকাতায় একটা বাড়ী কোরবো, কিন্তু দু-চার দিন সেখানে ছাড়া এখানেই তোমায় থাকতে হবে সব সময়।

সে কথায় রাজী হয়েছিলেন বড়মা। আর তাই তিনি পরে বালীগঞ্জের অশ্বিনী দত্ত রোডে একটা জায়গা কিনে সেখানে এক মনোরম বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন। বড়মাও তাঁর কথা রেখেছিলেন। সারাজীবনটা একরকম তিনি সামতাবেড়ের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। শেষনিশ্বাস বড়মার এই সামতাবেড়ের বাড়ীতেই পড়েছিল। মাঝে মাঝে শুধু কয়েক দিনের জন্যেই যেতেন কোলকাতায়। অবশ্য যখন শরৎচন্দ্র কোলকাতায় থাকতেন তখনই থাকতেন তিনি।

এই সামতাবেড়ের বাড়ীতেই শরৎচন্দ্রের মেজো ভাই প্রভাসচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ইনি সন্ন্যাসী মানুষ ছিলেন। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে ইনি গৃহত্যাগ করেন অতি অল্প বয়সেই। সেই থেকেই তিনি বেদানন্দ স্বামী নামে সকলের কাছে পরিচিত। ইনি বেশীর ভাগই বার্মায় থাকতেন। মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। শরৎচন্দ্রের কাছে রামকৃষ্ণমিশনের জন্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতেই আসতেন ইনি। শরৎচন্দ্রও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন নানান জায়গায় আর সংগ্রহ করে দিতেন অনেক চাঁদা। এঁরও মধ্যে ছিল তাঁদের বংশগত ধারার মত বিশেষ এক সাহিত্য চেতনা। তাঁর এক চিঠি থেকেই শুধু এইটুকু বোঝায় যে, তিনি কেমন ও কত সুন্দরভাবে তুষার শুভ্র হিমালয়ের রূপটি বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,—এই সাদার কান্তি যে কি মহৎ, কি গভীর সুন্দর—আমি তাই দেখছি। যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়ে গেল। অনবিচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সকলকে নিজের আড়ালে টেনে নিল। সমস্ত ঢাকা পড়লো। প্রাণ ঢাকা পড়লো, বর্ণছটায় নীল সাদায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু এতো মরার দৃশ্য নয়। আমরা যাকে মরণ বলে জানি—সে যে কালো—শূন্যতা তো আলোকের মত সাদা নয়। সে তো অমাবস্যার মত অন্ধকার নয়। সূর্যের রশ্মি—লাল, নীল, সমস্ত ছটাকে একেবার ঢেকে ফেলেছে, কিন্তু তাকে তো মেরে ফেলেনি—তাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করেছে। দেখ ভাই, আজ এই নিস্তব্ধতার অন্তর নিগূঢ় দাস আমার প্রাণকে রসপূর্ণ করে তুলেছে। আজ গাছপালা তাদের

সমস্ত গহনা খসিয়ে ফেলেছে। একটি পাতাও রাখেনি। কেবল রজত মুকুট শিরে ধারণ করে মহিমান্বিত অথচ মহান গম্ভীরতার মধ্যে নত মস্তকে বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করছে।

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মধ্যেও সাহিত্যের সুপ্ত চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। এই দিদির একটি চিঠি থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি তাঁর এক দেওরকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন,—ভাই, কাল তোমার সুন্দর মধুমাখা চিঠিখানি পেয়ে যে কি আহ্লাদ পেলুম লেখা যায় না। এত দিন এসেছি, আমি মনে করেছিলুম বৌদের হাওয়া লেগে তুমিও ভুলেছ আমায়, তা নয়। পুরানো চাল ভেঙ্গে গেলেও তার গুণ আছে—তাই মনে রেখেছ এখনও।...সংসারে ভিন্ন হলেও আমার মন ভিন্ন হয় নাই। এক জায়গায় ২।৪টে হাঁড়ি রাখলে ঠোকাঠুকি হোয়েও শব্দ হয়, তাই বোলে কি চট করে হাঁড়ি ভেঙ্গে যায়? ভাই, তোমাকে চিঠি লিখতে আবার ভয় করে, পাছে কেউ মুখে যা হোক তাই বোলে ফেলে—প্রাণ কাঁদলেও চুপের বালাই নেই—ঠাকুরপো, আমি ভুলিনি কিছু।

স্বামীর ভিটে পর্ণ কুটির হোলেও স্বর্ণ অট্টালিকা—সোনার সংসার। মায়া অনেক বেশী। এ স্মৃতি মরণের পরপারেও মাথায় কোরে নিয়ে যাবো, এ ভোলা নারী হৃদয়ে নয়।...এই ত আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা...। পুরুষের সঙ্গে কলহে সংসার তেতো হয় না ভাই, কিন্তু মেয়েদের মিল না থাকলে সে স্থলে একতিল থাকতে ইচ্ছা হয় না। বুকে অনেক ব্যথা বোঝাই করে বসে আছি।

এঁরই নাম দিয়ে শরৎচন্দ্র ছদ্মনামে কত যে লেখা লিখেছিলেন তখন পত্র পত্রিকায় তা আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে। তাছাড়া অনিলা দেবীরও যে সাহিত্যের হাত ছিল, সে কথা অনেককে অনেক চিঠিতে তিনি লিখে গেছেন। তাঁর এই দিদির সংসার নিয়েও অনেক উপন্যাসে তাঁর অনেক আখ্যান বস্তু গড়া হয়েছিল। এই দিদির অনুপ্রেরণাতেই তিনি সামতাবেড়েয় নিজের বাড়ী তৈরী করতে পেরেছিলেন একদিন। সেদিনের কথা উঠলে বড়মা বলতেন, দিদি ছিলেন বলেই তো ওঁর বিবাগী মন সংসারের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল।

যাইহোক শরৎচন্দ্র তারপর থেকে গ্রামে সংগঠনের কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে তাদের নানান কাজের সহায়তা করতেন, তেমনি নিজের গ্রামেও জনহিতকর কতকগুলো প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলেন তখন। প্রথমেই তিনি এক মেয়েদের ইস্কুলের গোড়া পত্তন করলেন। সেই ইস্কুল নিয়ে তিনি

এমন উঠে পড়ে লেগেছিলেন যে, তখন বরিশালে জাতীয় কংগ্রেসের কনফারেন্সেও যেতে পারেন নি। সে সময় তাতেও অনেক বাধা পেয়েছিলেন তিনি।

গ্রামের মাতব্বরেরা তখন বলতে শুরু করেছিল, দেখ আবার মেয়েদের ইস্কুল নিয়ে দেশে অন্য কিছু না শুরু করে দেয় চাটুয্যে!

শরৎচন্দ্র তাতে বলেছিলেন, এরা যে নিজের ক্ষতি কত করে চলেছে এটা এদের সত্যিই দৃষ্টির বাইরে। তবুও তিনি কোমর বেঁধে লেগেছিলেন সে কাজটায়।

এই সব দেখে একদিন বুনো ঘোষাল এসে বললেন তাঁকে, এবার তো গ্রামের রাস্তাটাতেও হাত দিতে হবে ভায়া।

সেদিন বুনো ঘোষাল চেয়েছিলেন যাতে নিঃখরচায় ওঁর নিজের বাড়ীর রাস্তাটা তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন সে কথা। তাই তিনি বলেছিলেন, বেশ তো সবাই মিলে লাগলে না হবার কি আছে ওটায়!

কিন্তু ঘোষাল চেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রই যেন নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে এটা করিয়ে দেন। কিন্তু তাতে রাজী হননি তিনি। আর এই নিয়ে আর একটা রেষারেষি ও সংঘর্ষের অবতারণা হয়েছিল তারপরে। (ক্রমশঃ)

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

কেউ ভোলে কেউ ভোলে না—

কালের হিসাব খাতায় পঁয়তাল্লিশটা বছর হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য-জীবনে সে হিসেবটা একেবারে অবহেলার বস্তু না-ও হতে পারে।

আজ থেকে ঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর আগে নিজের মাত্র পাঁচ বছর বয়সে যেদিন কপালে দইয়ের ফোঁটা কেটে, শ্লেট বগলে নিয়ে পরম উৎসাহে বাবার সঙ্গে গুহ-ভিলার পথ দিয়ে প্রথম গিয়ে দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে পৌঁছালাম, সে দিনের সেই সামান্য নগণ্য ঘটনাটা আজও কেন যেন ভুলে-ভুলেও ভুলতে পারি না।

পশ্চিমের এক বিখ্যাত দার্শনিকের কথায় বলতে হয়,—জীবনের পাতা থেকে কেমন করে স্মৃতির কথাগুলো মুছে ফেলতে হয়, আমি তা তো জানি না।

আমার পাঁচ বছর বয়সের দুরন্তপনায় ঠাকুমা-কাকিমা-পিসীমা, এমনকি যাঁর পবিত্র অঙ্কে স্থান পেয়ে সর্বপ্রথম দুনিয়ার আলো দেখে ধন্য হয়েছিলাম, সেই স্নেহময়ী জননীদেবী পর্যন্ত তখন তিক্ত বিরক্ত হয়ে বাবার কানে অহরহ নালিশ জানাতে লাগলেন, "ছেলেকে স্কুলে না দিলে তো আর বাপু বাড়ীতে টেকা যায় না," তখন পণ্ডিত মশাইকে (শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অগ্রজ) আমন্ত্রণ করে এনে আমাদের ভাগলপুরের মোসাকচক্ মহল্লার বাড়ীতে ঠাকুর ঘরের সামনে খড়ির আঁক হাতে-খড়ির পালাটা কোনমতে চুকিয়ে আমায় বাংলা স্কুলে বিদেয় করে তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাই বলি, সকলে যখন আমার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে দূরে ঠেলে নিষ্কৃতি পেতে চাইলেন, তখন যে তীর্থস্থান আমায় সাদরে টেনে নিয়ে বুকে স্থান দিলে, তার কথা কেমন করে ভুলি, সে বিদ্যে তো আমার শেখা হোল না।

আজ স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই তাঁত ঘরের হাঁক দিয়ে-দিয়ে নামতা পড়া ক্লাস। তিন্-ত্রিক্খে নয়। এ নামতা কণ্ঠস্থ করবার আগে অহিবাবুর লক্লকে বেতের

কয়েক ঘা যখন চর্মস্থ করেছিলাম, তখন মর্মে-মর্মে বুঝেছিলাম আমার উচ্চারণে ভুল হয়েছে।

আমার সেদিনের শিক্ষকদের আজো স্মরণ করে শ্রদ্ধায় বারংবার মস্তক অবনত করি। অহিবাবু, রামবাবু, ভূপতিবাবু, বিধুবাবু, মাখনবাবু,—স্কুলে এঁদের রূপ ছিল সংহার-দেবতার। রামবাবু আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াতেন। স্কুল কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইতিহাস পড়ান হয়, তার প্রায় সবটাই রাজা রাজড়ার ইতিহাস। যুদ্ধ-হিংসা-লোভ দিয়ে একের পর এক রাজত্ব গড়ে তোলা, আর পরবর্তী পরাক্রমী আক্রমণকারী কর্তৃক হৃত-রাজ্য হওয়া,—এই তো ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু মানুষের ইতিহাস কোথায়? সে প্রশ্ন আজ জাগে।

তখন অবশ্য জাগা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রাজা-রাণীদের তেমন ইম্পিরীয়ল সিরিয়স্‌নেস্‌ দিয়ে সেদিনও নিতে পারিনি। ইতিহাসের পাতায় যে সব রাজারানীর ছবি দেওয়া থাকত, সেগুলো রং পেন্সিল দিয়ে চিত্রিত করতাম। রাণীদের গুম্ফ আঁকা আমার রোগ ছিল। তার জন্য রামবাবু কি প্রচণ্ড মার-ই না মারতেন! তিনি বেশীর ভাগ পিঠে সজোরে কিল মারতেন। তাঁর সেই প্রচণ্ড কিল থেকে পৃষ্ঠরক্ষা করার জন্য আমি ৪।৫টা জামা গেঞ্জী একের পর এক পরতাম। কিন্তু মারার পরক্ষণেই রামবাবু বুঝতেন আমি আত্মরক্ষার অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছি। ব্যর্থ হয়ে বলতেন, ছোঁড়া কাঁথা পরে এসেছে।

বলতাম—শীত করে স্যার।

গরমের দিনে সহপাঠীরা আমার এই কথায় হো হো করে হেসে উঠতো।

স্কুলে পড়ার সময় বেশী আকর্ষণ ছিল আমার ভিন্ন বস্তুতে। একমাত্র সেই লোভেই দৈনিক স্কুলে যেতাম বোধহয়। শনিবার সকালে উঠেই স্কুলের কথা মনে পড়ত। গুহ-ভিলার চাঁপা ফুলের গন্ধে যেন আমায় বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে যেত। আকর্ষণটা ছিল স্কুলের পাশে ঐ দেয়াল ঘেরা টেনিস্‌ খেলার পাকা মাঠের ওধারে মালীর বাগানে লিচু, ফলসা, পেয়ারা ইত্যাদির ওপর। ফাঁক পেলেই ছুটে গিয়ে দল বেঁধে আমরা হামলা করতাম ঐ বাগানে। বিনা দুর্ভোগে যে সববারই ফিরে আসতে পারতাম না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু আমাদের অভিযান কখনও বন্ধ হত না।

বিদ্রোহী নজরুলের 'বাবুদের তাল পুকুরে' যখন আমার ছেলেরা আজ আমার সামনে আবৃত্তি করে, যখন, "ওরে বাস্‌ করলে তাড়া' বলে ওঠে, তখন

মানস-পটে ভেসে ওঠে মালীর বাগান থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের সেদিনকার 'পড়ি মরি' ছুটের কথা। হেসে ফেলি, কিন্তু চোখে জল ভরে আসে। হায়রে, শৈশবের সে নির্মল নিষ্কলুষ মোহময় জীবন কোথায় হারিয়ে গেল। ইহ-জীবনে আর তো তার নাগাল পাব না। তাই তার স্মৃতিটুকুই অতি সযতনে পালন করি মনের মণি কোঠায়। কৃপণের মত সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সে স্মৃতিকে জীয়ন্ত করে রাখার চেষ্টা করি।

বাংলা স্কুলে আমি পাঁচ বছর ছাত্র ছিলাম।

সে সময় যে নগণ্য মানুষটির স্নেহ পেয়েছিলাম, যে মানুষটি আমার মতো আরো অনেক বালকের সেদিন উপদ্রব শুধু সহ্যই করতো না, বরং হাসি মুখে আমাদের কাছে টেনে নিত, তার কথা কেন জানিনা, এতগুলো বছরের কঠিন বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধিকে পরাস্ত কোরে বেদনার স্মৃতি হয়ে আজো আমাকে উন্মনা করে,—বিষণ্ণ করে তোলে। কি কোরে যে তার মত একটা সামান্য ছুতোর মিস্ত্রী আজো আমার অন্তর অধিকার করে আছে, সেকথা বুঝিয়ে বলবার মত পাণ্ডিত্য তো আমার নেই।

পরবর্তী কর্মজীবনে অনেক রাজা-গজাই তো দেখলাম। হামেসা দেখছি। কিন্তু তাঁদের জাঁকজমকের ভীড় ঠেলে যে মলিন মুখখানা আজো আমার পথ আগলে এসে দাঁড়ায়, সে মুখ আমাদের "এতোয়ার"।

স্কুলের পেছন দিকে ঝগড়ু মিস্ত্রীর কাঠের কর্ম-শালায় সামান্য কারিগর ছিল এতোয়া। তার সঙ্গে আমার ভাব জমে গেল,—সে আমায় আশ্রয় দিত বলে। অন্যায় অপরাধের জন্যে ধাওয়া খেয়ে আমি ছুটতাম তার কাছে—সে আমায় রক্ষে করত, কিন্তু পরে শাসন করে দিত। সে শাসন ছিল স্নেহের শাসন। যে বয়েসে অপরাধের শাস্তিকে শারীরিক যন্ত্রণাভোগ দিয়েই আমাকে চিনতে হয়েছে, সে সময় যার কাছে মমতা মেশানো শাসন পেয়েছি, তার কথা ভোলা যে অসম্ভব। কত অত্যাচার করেছি। তার হাতুড়ী, বাটালী, বসুলা, রেন্দা, ভাঁজকরা কাঠের ইঞ্চি, রংসুতো—এসব যে কত নষ্ট করেছি তার হিসেব দেওয়া শক্ত। এতোয়া তার জন্যে কোনদিন বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করত না। এতই ছিল তার স্নেহভরা প্রাণ। মালীর বাগান থেকে না বলে যে সব ফল নিয়ে আসতাম, সে সব নিরাপদে তারই কাছে গচ্ছিত রাখতাম। ছুটির পর তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে আমার পকেটে ভরে দিত ফলগুলি। তারপর বলত, ছিঃ আর কোন দিন চুরি কোর না। চুরি করার

বিপক্ষে সকল রকম ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রলোভন ও যুক্তি দেখিয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশাবলী পাঠ্যপুস্তকে আর দশজন ছাত্রের মত আমিও পড়েছিলাম। কিন্তু ফললাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে সব সদুপদেশ আমার মনে থাকত না। তেমনি এতোয়ার উপদেশেও আমার কোন কাজ হয় নি।

এতোয়াকে দেখতাম আমাদের টিফিনের সময় ময়লা কাপড়ের টুকরায় বাঁধা একটা বুটি-কাটা পেতলের থালা বার করতো। কোনদিন তাতে থাকত পান্তাভাত। কোন দিন বা ছাতু। এতোয়া যেদিন ছাতু মেখে শক্ত ডেলা পাকিয়ে লঙ্কা সহযোগে আহার করত, চোখে মুখে তার পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠত। ঐ মহার্ঘ বস্তুতে আমারও লোভ হোত ভাগ বসাতে। মাঝে মাঝে চেয়ে নিতাম। অমন উপাদেয় বস্তু যেন আর কখনও খাইনি। এতোয়া নিঃশব্দে হাসতো। আজ পর্যন্ত ছাতু সংক্রান্তির দিন ছাতু খাই। কিন্তু এতোয়ার মত কোরে কোনদিনও তেমন মাখতে পারলাম না। একথাটা মনে পড়ে।

কিছুদিন পর এতোয়ার সঙ্গে আসত তার মেয়ে। এখন আন্দাজ করতে পারি মেয়েটির বয়স বছর ছয়েক ছিল তখন। রংটা ময়লা। ততোধিক ময়লা একটা কাপড় পরা। ঐ বয়সেই সে মাথায় ঘোমটা দিত। মাথায় জটপাকানো সোনালী চুলের রাশি। গায়ে তাঁ-তাঁ জ্বর। তবু বাপের পেছন পেছন তার প্রতিদিনই আসা চাই। দিনমানে কাঠের একটা তক্তার ওপর কুণ্ডুলী পাকিয়ে পড়ে থাকত।

বিকেলে কোনদিন দেখতাম এতোয়ার থালায় সেই অবশিষ্ট পান্তাভাত খাচ্ছে। কোনদিন দেখতাম ছাতুর ডেলা কামড়ে খাচ্ছে। অবাক হয়ে যেতাম। জ্বর গায়ে কেউ পান্তাভাত বা ছাতু খায়, এটা জানা ছিল না। দুধ, সাবু, বার্লি খায়, এই জানতাম। এতোয়াকেও বলেছি সে কথা। সে কোন জবাব দিত না।

পরে একদিন জানতে পেলাম, মেয়েটার মা কিছুদিন হোল মারা গেছে। ঘরে কেউ নেই। তাই রোগা মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে এতোয়া।

সেবার গরমের ছুটির পর স্কুলে গিয়ে আর এতোয়ার দেখা পেলাম না। স্কুলে গিয়ে ওদিকটা মাঝে মাঝে ঘুরে আসতাম, টিফিনে একবার। ছুটির পরও একবার গিয়ে দাঁড়াতাম মিস্ত্রীর সামনে।

একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, এতোয়া আসেনি ? মিস্ত্রী কাজ করতে করতে জবাব দিত "নহি"।

আমার অনেক অসুবিধা হতে লাগল, পেয়ারা, ফলসা, লেবু লুকিয়ে রেখেও ভোগে আসছিল না। অতি-সন্ধানী সহপাঠীর বাটপাড়ীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

কেন এতোয়া আসবে না মিস্ত্রী ?

ওর মেয়েটা মারা গেছে, তাই।

তাই কাজ ছেড়ে দিলে ?

মিস্ত্রী আর কোন জবাব দিল না। নিতান্তই অসহায় মনে হোল নিজেকে।

একদিন মিস্ত্রীর কর্মশালার সামনের ফুলবাগান থেকে গাঁদা ফুল তুলছিলাম।

মিস্ত্রী তাড়া করে এল। বলল অহিবাবুকে বলে দিয়ে বেঁত খাওয়াবে আমাকে।

বললাম, এতোয়াতো মানা করত না।

এতোয়াকা বাপ কা হ্যায় ? গর্জে উঠল বুড়ো মিস্ত্রী।

বাগানটা মিস্ত্রীর পূর্ব পুরুষেরও যে ছিল না, তা আমার জানা ছিল। নয়ত শাস্তি প্রদানার্থে অহিবাবুর নামই বা হবে কেন ?

বললাম, আচ্ছা, ফুল তুলব না। কিন্তু তুমি বলে দাও এতোয়ার ঘর কোথায় ?

ওর ঘর নেই।

তবে থাকে কোথায় ?

আস্তাবলে। খঞ্জনপুরে।

আস্তাবলে ?

হ্যাঁ!

কাদের আস্তাবল ?

কি জানি। পুরানা আমলের কোন গোরা সাহেব-টায়েবের হোবে।

আমি আজ যাব।

কিন্তু সেত আর ওখানে নেই।

কোথায় গেছে তবে ?

ক্যায়া জানে।

ঠক্ ঠক্ করে পিটে পিটে সদ্য নির্মিত কাঠের বেঞ্চটার ভারবহনের শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল বোধহয় মিস্ত্রী।

মনটা আমার দমে গেল।

যার সঙ্গে এক জায়গায় এতদিন কাজ করল, সে লোকটা হঠাৎ কিসের শোকে এমন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল, তার একটা খোঁজ পর্যন্ত নিলে না মিস্ত্রী? একথাটা আজ মনে হয়।

মনে আছে, সেদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আসিনি। খঞ্জনপুরে সাধক শ্রীভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের ছেলে সুধা ছিল আমার সহপাঠী। সেখানে গিয়ে উঠলাম।

সুধা বলল, কিরে বাড়ী যাসনি? সে কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, সুধা, এতোয়া কোথায় থাকে রে?

কোন এতোয়া?

ঐ যে স্কুলে কাঠের……

ও বুঝেছি। ও তো চলে গেছে।

কোথায়?

তা জানিনা।

সুধার মা বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাকে বিলক্ষণ চিনতেন। তাঁদের বাড়ীতে প্রায়ই গিয়ে আমি খোল বাজিয়ে কীর্তন করতাম।

তিনি বললেন, আহা, বড় ভাল মানুষ ছিল। বৌ মেয়ে সব ওজন্মের পাপে মরে গেল। বেচারা শোক সইতে না পেরে কোথায় যে চলে গেল। ঐ বস্তির ওরা এসে সব বললে আমাদের কাছে।

বস্তির মেয়ে বৌরা অদূরেই একটা পথের কল থেকে জল ভরছিল। তাকিয়ে দেখলাম একবার ওদের। কিছু জিজ্ঞাসা করতে আর ইচ্ছা হোল না। সুধা বললে, আয়, আজ থাকবি তো?

না ভাই। বাবা ভীষণ মারবেন তা হলে।

কেত্তন করবি না?

না। আজ কেত্তন থাক।

সোনার শৈশব কৈশোর পেরিয়ে তপ্ত-তিক্ত যৌবনে যখন উপনীত হলাম, যখন এ দুনিয়ার জীবন-রহস্যের কিছু কিছু নিজেও বুঝতে শিখলাম, তখন আমার সেদিনের শৈশবের প্রশ্নের জবাব পেলাম নিজের কাছেই। তাই আমি আজো এতোয়াকে ভুলতে পারিনি। এদের হিসেব কেউ রাখে না। সংসারে

এমনি কত শত শত জীবন প্রতি দণ্ডে অন্ধকারে তলিয়ে যায়, তার হিসেব রাখা সংসারের কাজ নয় হয়তো।

পথে-ঘাটে যখন বয়েসের ভারে ন্যুব্জ-দেহ অপরিচ্ছন্ন কোনো সর্বহারা এসে আমার সামনে হাত পেতে দাঁড়ায়, তখন তাচ্ছিল্যভরে তাকে পাশ কাটিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে যেতে পারি না। তার অতি নিকটে গিয়ে দাঁড়াই। সব হারাবার বেদনায় যে মরা-চোখের দৃষ্টি গেছে ঘোলাটে হয়ে, যে মুখমণ্ডল বলিরেখায় সমাচ্ছন্ন, সেই সব মুখ আমি নিরীক্ষণ করে দেখি। হতাশায় ম্লান মুখগুলি আমায় অস্থির করে তোলে। তাদের মাঝে আজও আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি ঘর-ছাড়া অভিমানী এতোয়াকে।

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

....

অবনীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী : বাংলা শিশু সাহিত্যের অনবদ্য রূপকার অবনীন্দ্রনাথ। রূপকথা-উপকথা আর ইতিহাসকে এক অপরূপ আশ্চর্যভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন তিনি। ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির উজ্জীবনেও তাঁর দান অপরিসীম। এক অর্থে, বাংলার সাংস্কৃতিক নবজন্মে এক অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এই কারণেই বোধ করি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—"দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।" এই মহান কথাশিল্পী ও শিল্পগুরুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান গত ৭ই আগস্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়।

শান্তিনিকেতনে এক প্রভাতী অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনিই তার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সকালবেলার এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিল্পী ও কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত ও মন্ত্রপাঠের পর তিনি তাঁর ভাষণে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অবনীন্দ্রনাথের গৌরব ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রেখে নিজের উদ্ভাবিত পথে নব্য-ভারতীয় কলা-মণ্ডল প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের শিল্প সাধনার পথ প্রশস্ত করেছেন। কলাভবনের নন্দন গৃহে ডাক ও তার বিভাগের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে স্মারক ডাকটিকিটের অ্যালবাম তুলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে 'নন্দন'-এর প্রদর্শন কক্ষে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনার একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে ১৩ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে

অপর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবনঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন—"অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে ভারত আত্মার প্রকাশ ঘটেছে। জীবনের সত্য, সুন্দর ও শিবকে অবনীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শিল্পে ও সাহিত্যে।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন—"অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে নবকালের প্রবর্তক। তাঁর চিত্রকলা বিশিষ্টতায় নতুন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তিনি কোন বিশেষ রীতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা পরম্পরা থেকে তিনি অবলীলাক্রমে আদর্শ ও ভাব সংগ্রহ করেছেন।' প্রখ্যাত শিল্পী চিন্তামণি কর তাঁর ভাষণে বলেন যে, ঠাকুরবাড়ির বন্ধ বাক্স থেকে উদ্ধার করে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন সংগ্রহ শালার। না হলে অবনীন্দ্রনাথের অনেক শিল্পকর্মেরই বিলুপ্তি ঘটবে। সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন—"অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। তাঁকে যোগী বা দার্শনিক বললে ভুল হবে।" লীলা রায়ও সভায় ভাষণ দেন।

কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলারস ক্লাবের পক্ষ থেকেও অবনীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। অল্ডারম্যান তারাপদ লাহিড়ি অবনীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—"অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে ভারতীয় শিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।" মেয়র ও ডেপুটি মেয়র অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

এ ছাড়াও 'সুরবিতান', 'আকাদমি অব ফাইন আর্টস', 'নাট্য সংরক্ষণ সমিতি' প্রভৃতি সংস্থার উদ্যোগেও অবন ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়।

বেতার কবি সম্মেলন : গত ১ আগস্ট সন্ধ্যায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে আকাদমি অব ফাইন আর্টসে এক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন কলকাতা কেন্দ্র থেকে পঠিত কবিতাগুলি সম্প্রচারিত হয়। ৪৪ জন কবি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। পঠিত কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলাদেশের অভ্যুত্থান।'

বেতার কর্তৃপক্ষকে এই অভিনব আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানাই। যত-দূর মনে হয়, এই ধরণের প্রচেষ্টা ভারতে এই সর্বপ্রথম। স্মরণীয় কালে এরকম কবি সম্মেলন আর দেখা যায় নি। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরা যেভাবে কবিদের অভিনন্দিত করেছেন, তাও প্রশংসার দাবী রাখে। অবশ্য দুই একটি বিক্ষিপ্ত

মন্তব্যও মাঝে মাঝে শোনা গেছে। তবু সম্মেলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে বলা যায়। তবে কবিদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশি সময় নিয়েছেন। দু'মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট থাকলেও কেউ কেউ চার মিনিট পর্যন্ত সময় নিয়েছেন। এটা সমস্ত দিক থেকেই অশোভন। ভবিষ্যতে কবিরা এবং বেতার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু সচেতন হবেন বলে আশা করি।

কোলন বাস্তবতা ঃ অতি সাম্প্রতিক সাহিত্য আন্দোলনে একটি নতুন শব্দ খুব বেশি উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন 'কোলনী বাস্তবতা'। এর অগ্রদূত হলেন ভিটার ভাইলারসফ। তাঁকে এই আন্দোলনের তাত্ত্বিক বলে গণ্য করা হয়। এর মধ্যে তাঁর দু'টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। নাম 'আইন শ্তোনার টাগ', দ্বিতীয় উপন্যাস 'শাটেন গ্রেনজে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে।

কোলন-বাস্তবতার অর্থ গতানুগতিক কাঠামো থেকে দূরে মিতব্যয়ী ভঙ্গিতে ও অত্যন্ত সততার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের চরিত্রচিত্রায়ন। যা কিছুকে সত্য বলে প্রতিভাত হয়না, তাব প্রতি এই শ্রেণীর লেখকদের বিরূপতা এত বেশি যে, অনেক সময় তাঁদের রচনাকে মনে হয় অনেকটা দলিল-দস্তবেজের মত। যাই হোক, জার্মান সাহিত্যে ষাট দশকের আন্দোলনে কোলনী বাস্তবতা নিয়ে বেশ একটা হৈ চৈ হচ্ছে।

কবিতা ও কম্পিউটার ঃ কমপিউটার দিয়ে কবিতা লেখা যায় কিনা, তা নিয়ে পঞ্চাশ দশকে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এরপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এ ব্যাপারে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। সম্প্রতি The Michigan Quarterly Review পত্রিকায় জন মরিস How to write Poems with a Computer প্রবন্ধে বিষয়টির উপর নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। অনুরূপ আরেকটি প্রবন্ধ The Mechanical bard : Computer composed parodies of Modern poetry লিখেছেন West Coast Review পত্রিকায় রবার্ট আয়ান স্কট। কমপিউটারের স্বপক্ষে তাঁদের ওকালতি সত্বেও কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সার্থক-কাব্য রচনা কমপিউটারের পক্ষে সম্ভব নয়।

কমপিউটার এক ধরণের যন্ত্র। এই যন্ত্রের মাধ্যমে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বা যার লজিক্যাল পরিণতি হতে পারে এমন কাজে অসাধারণ দক্ষতা দেখা যেতে পারে। কিন্তু What a computer cannot do is to perform an activity that is neither logical nor random. কবিতা হচ্ছে

কবির আত্মগত হবার মাধ্যম। সুতরাং তার শব্দ, তার ছন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। Poetry Australiaর এপ্রিল সংখ্যায় বিশিষ্ট সমালোচক আলেক্স. আই. জোনস এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কবিতার ভাষা সম্বন্ধে বলেন—To create a poem one needs a poetic vocabulary, and by this I think one means a vocabulary whose wards are concerned with objects, actions and qualities that are physically deserved, not with abstractions and inferred characteristics.

অবশ্য এর মানে এই নয় যে, কমপিউটারে কবিতা লেখা একেবারে অসম্ভব। হাইকু বা অনুরূপ ছন্দের এক জাতীয় কবিতা এর দ্বারা লেখা যেতে পারে।

কিন্তু এই ধরণের কবিতা নিতান্তই শব্দের সমাহার। সহৃদয়ের মনকে আলোড়িত করার দিক থেকে এর আবেদন খুবই সীমিত। অতএব বলা যায়, কবিদের সম্মান আরো দীর্ঘদিন চলবে। চাঁদে মানুষ অবতরণ করেছে সত্য, কিন্তু কল্পনার চাঁদ এখনও দেদীপ্যমান।

মানুষের মুখ ঃ বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থান ওড়িশার বুদ্ধিজীবী মহলকে কিভাবে আলোড়িত করেছে, তার একটা নিদর্শন তুলে ধরেছেন কটক থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা কবিতা পত্রিকা "মানুষের মুখ"-এ। বর্তমান সংখ্যায় বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির সঙ্গে ওড়িষার কয়েকজন প্রখ্যাত কবির বাংলাদেশ বিষয়ক কবিতার অনুবাদ সংযোজন করে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। তরুণ ওড়িআ কবি রবি সিং লিখেছেন—

"ধর্মীয় বিভ্রান্তি পড়ে ভেঙে ; হিন্দু নয়, নয় মুসলমান
মাথা তোলে বাংলাদেশ, নিপীড়িত শ্রমিক কৃষাণ।
জিন্নার মর্মর মূর্তি চূর্ণীকৃত জনতার বজ্রমুষ্টিঘাতে—
অনাবৃত বাংলাদেশ ঝথমক সূর্যোদয় পথে!"

জয়ন্ত মহাপাত্রের অনুভূতিতে—

সীমান্ত ওপারে
ধূসর বিবর্ণ দিনের ক্ষত থেকে
চুইয়ে পড়া রক্তবিন্দু
জন্ম দিল অলক্ত প্রভাত।

বাঙালী বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর, সেনগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, শামসুল হক, আল মাহমুদ, মেজবাহউদ্দিন আহমেদ খান, শুভ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়,

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমময় দাশগুপ্তের লেখা কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন কটকের বাক্সাবাজার থেকে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমময় দাশগুপ্ত। শচী রাউত রায়ের অসামান্য কবিতা 'রোশেনারা' এই সংকলনে স্থান পেলে সংকলনটির আরো মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

অনু পত্রিকার আন্তর্জাতিক সংখ্যা : অনু সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক পত্র হিসাবে 'পত্রানু' গত এক বছরেই বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এঁরা শেষ পর্যন্ত এও প্রমাণ করেছেন যে, এটি বিশ্বের প্রথম অনু পত্রিকা। কবিতা গল্প, আলোচনা ও আরো নানা টুকিটাকি সমাচার নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদে এঁরা এযাবৎ বেশ রুচির পরিচয়ই রেখেছেন। এখন এ পত্রে প্রকাশিত কবিতা, গল্প ও আলোচনার থেকে নির্বাচিত লেখা নিয়ে ইংরেজীতে একটি আন্তর্জাতিক সংখ্যা প্রকাশে এঁদের উদ্যোগ পর্ব চলেছে। অনু পত্রিকার জগতে প্রথম এই অভিনবত্বের দাবীদার সম্ভবত 'পত্রানুই' হোল। এ সংখ্যাটিও সম্পাদনা করছেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চম বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • কার্তিক ১৩৭৮

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বারো টাকা ও
ছ'মাসের জন্য ছ'টাকা অগ্রিম দেয়
রেজিস্ট্রি ডাকে পেতে হলে পৃথক খরচ দেয়
সাধারাণ ডাকে পত্রিকা নিরুদ্দিষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
যে কোন সময় থেকেই গ্রাহক হওয়া চলে
গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক
রচনার নকল রেখেই লেখা পাঠাবেন
কোন গোলযোগে রচনা নষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়
কিন্তু অমনোনীত কবিতা
কখনোই নয়
রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা
সম্ভব নয়
পত্রোত্তরে এজেন্সীর নিয়মাবলী
জানানো হয়
পত্রিকার সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা
সবরকম যোগাযোগ ও টাকাকড়ি পাঠানোর ঠিকানা
কালি ও কলম ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ কার্ত্তিক ১৩৭৮ ॥

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট—পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিঃ-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিঃ-১২ হইতে প্রকাশিত।

আমাদের কথা

বিজয়া উপলক্ষে "কালি ও কলম" এর লেখক-শিল্পী, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সকল সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষককে আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার জানাই। কামনা করি, আপনাদের জীবন থেকে সকল অশুভ দূর হোক, জীবন হয়ে উঠুক স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর।

* * * *

"কালি ও কলম" পঞ্চম বর্ষে পা বাড়ালো। দুর্জয় সাহস ও দুর্মর আশায় ভর করে এই সাহিত্যপত্রখানিকে আমরা এতাবৎকাল চালিয়ে এসেছি। এক একটি করে বছর কাটে, আর আমরা ভাবি এবারে বোধ হয় সুদিন সমাগত। কিন্তু না, সুদিনের মরীচিকা আমাদের শুধু হাতছানিই দেয়, তৃষ্ণা মেটায় না! অথচ, অনেকেই একথা স্বীকার করবেন যে, আজ বাংলা দেশে একখানি সৎ সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজন কতোখানি। বহুবাজারের চলতি লেখক ও বড়োবাজারের ছাপমারাদের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ না হয়েও এবং আর্থিক-বাণিজ্যিক কোনো প্রকার সুবিধার অধিকারী না হয়েও, এ-কাগজ যে আজও টিঁকে আছে, তা আমাদের উপর্যুক্ত ধারণাকেই সমর্থন করে। বহু সাধারণ পাঠকের উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র ও সস্নেহ সমালোচনাও আমাদের আশান্বিত করে। কিন্তু, শুধু আশায় ভর করে, আর উৎসাহকে অবলম্বন করে, এই অর্থকেন্দ্রিক সমাজে আর কতোদিন চলা যায়। কাগজের আর্থিক দিকের তদারক করে বিজ্ঞাপন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা তো সকলেরই জানা। পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকার ব্যাপারে বহির্বঙ্গের, বিশেষ, লক্ষ্মীর বরপুষ্ট, বিজ্ঞাপনের উৎস, বোম্বাই নগরীর, অনীহা-ও অনেকেরই অজানা নয়। এ-অবস্থায়, কিঞ্চিত বিচলিত আমরা, শুভানুধ্যায়ীদের সদুপদেশের প্রত্যাশী।

* * * *

কবি, সাঙ্গীতিক ও আইনবিদ অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মশতবার্ষিকীর মাস এটা। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর স্মরণে নানান সভা-সমিতি, পত্রিকায় রচনা, ইত্যাদি

প্রকাশিত হচ্ছে। "কালি ও কলম"-এ "উত্তরা" সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীর ধারাবাহিক অন্তরঙ্গ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদ ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। এতো বিভিন্ন মানবিক গুণের একত্র সবাবেশ দুর্লভপ্রায়। বাংলার বাইরে বঙ্গসন্তানের এতো সম্মানলাভ দুর্লভ বই কি! বাংলা-সাহিত্যের অমন দরদী এবং বাংলা সঙ্গীতের এতো বড়ো স্রষ্টা পুরুষের স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

* * * *

জন্মসূত্রে আমি জমিদার, কিন্তু নিজের সৃষ্টিবলে আমি আসমানদার···বোধ হয় এ ধরনের একটা কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কথাটি সদ্য লোকান্তরিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও খাটে বোধ হয়। বীরভূমের এক ভূস্বামী গৃহেই জন্ম হয়েছিল তাঁর। কিন্তু নিজের সৃষ্টিবলে তিনি আজ দেশবিদেশে পরিচিত; বাংলা সাহিত্য তো বটেই, গোটা ভারতীয় সাহিত্য-গগনেও তিনি ছিলেন জ্যোতিষ্কের মতো ভাস্বর। যে কোনো বিচারেই মহান সাহিত্যিক ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে; সে বিষয়ে বিতর্কের স্থান নেই। পূর্ব ঘোষণা-অনুযায়ী, আমাদের আগামী সংখ্যা তারাশঙ্কর-স্মৃতিসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবেন প্রবীন এবং নবীন বহু সাহিত্যসেবী ও প্রেমী।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বহির্বাংলায় বাংলা নাটক : নেপাল

....

॥ এক ॥

বাঙালীর নাট্যচর্চা কেবলমাত্র বাংলাদেশের ভৌগোলিক চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, আঞ্চলিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে পার্শ্ববর্তী বহুস্থানেই প্রসার লাভ করেছিল। আধুনিক বাংলা নাটকের সঙ্গে এই নাটকগুলির রূপ ও রীতির আঙ্গিকগত যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, বাঙালীর নাট্যচর্চার যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে হলে এদের বিচার বিশ্লেষণ একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নতুবা বাঙালীর নাট্যচর্চার যে পরিচয় পাওয়া যাবে, তা' তার সামগ্রিক পরিচয় নয়, খণ্ডাংশ মাত্র। তাই বহির্বাংলায় রচিত বাংলা নাটকের আলোচনা প্রয়োজন।

মধ্যযুগে নেপাল উপত্যকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল্লরাজ্যগুলির মধ্যে ভাতগাঁও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এখানকার শেষ দুই মল্লরাজা ছিলেন ভূপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৬ খ্রীঃ—১৭২২ খ্রীঃ) ও তাঁর পুত্র রণজিতমল্ল (১৭২২ খ্রীঃ—১৭৬৯ খ্রীঃ)। ভূপতীন্দ্রমল্ল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের কোন-না-কোন সময়ে। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি রাজা হয়েছিলেন। তাঁর পাটরানীর নাম ছিল বিশ্বলক্ষ্মী। দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে রাজত্ব করার পর তিনি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন রণজিতমল্লকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তিনি পুত্রের শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করতেন। কথিত আছে, ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। রণজিতমল্লও দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সঙ্গে রাজ্যশাসন করেছিলেন। বুদ্ধিলক্ষ্মী ছিলেন তাঁর পাটরানী। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অবৈধ সন্তানেরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার উপক্রম করেছিল। সেই সময় ভীত হয়ে বুদ্ধিলক্ষ্মী শিশুপুত্র দেবেন্দ্রমল্লকে নিয়ে ভাতগাঁও থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক বৎসর পরে অবস্থা আয়ত্তে এলে রণজিতমল্ল পুত্র দেবেন্দ্রমল্লকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নেপালে গোর্খারা বিশেষ শক্তিশালী

হয়ে উঠেছিল। তাদের রাজা পৃথ্বিনারায়ণ সাহ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মকওয়ানপুর, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পতন ও কাটমণ্ডু অধিকার করেছিলেন। তারপর তিনি ভাতগাঁও আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ রাজা রণজিতমল্লকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত ও রাজ্যচ্যুত করে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি ভাতগাঁও দখল করে নিলেন। এই ভাবে একে একে মল্লরাজ্যগুলির অবসান ঘটল এবং সমগ্র নেপাল উপত্যকায় গোর্খাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

॥ দুই ॥

ভূপতীন্দ্রমল্ল ও রণজিতমল্লের আমলই ভাতগাঁও-এর সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। তাঁরা পিতাপুত্র দুজনে মিলে সুদীর্ঘকাল ধরে রাজ্য শাসন করে দেশকে যেমন নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, তেমনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার ফলে দীর্ঘকাল সমগ্র নেপাল উপত্যকার রাজনৈতিক অবস্থা পরিচালনা করে ভাতগাঁও-এর সম্মান ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজ-জীবনেও ছিল ভাতগাঁও-এর প্রভাব সুচিহ্নিত। প্রচলিত প্রবাদ থেকে জানা যায়, এখানকার মল্লরাজাদের পূর্বপুরুষ প্রথম মল্লরাজা হরিসিংহদেব ছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট রঘুর প্রপৌত্র অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লব-এর বংশধর।

শেষ দুই মল্লরাজার সময়েই শিল্পে ও ভাস্কর্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে এবং সামরিক শক্তিতে ভাতগাঁও শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিল। কৌলিক-দেবী তলেজু-মন্দির ও অন্যান্য পুরোণো মন্দির সংস্কার, ভবানী-মন্দির, ভৈরব-মন্দির প্রভৃতি নতুন নতুন মন্দির স্থাপন, বিরাট বিরাট প্রাসাদ ও সু-উচ্চ সৌধ প্রভৃতি নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হনুমান নরসিংহ উগ্রচণ্ডা ভৈরব প্রভৃতি প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত মূর্তি প্রস্তুতি প্রভৃতি একদিকে যেমন তাঁদের শিল্পানুরাগের স্বাক্ষর বহন করছে; অন্যদিকে তেমনি কলা ও বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত বিশাল পুঁথিশালা থেকে তাঁদের বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভূপতীন্দ্রমল্ল স্বয়ং ছিলেন গীতিকবি। মৈথিলী ভাষায় লেখা তাঁর গীতিকবিতার সঙ্কলন "পদাবলী"-তে প্রায় একশটি ভক্তি-রসাত্মক কবিতা রয়েছে। "মাঘকাব্য" তিনি "সুবোধিনী" ভাষ্য সমেত নকল করেছিলেন। "সূর্যসহস্রনামস্তোত্রম্"-এরও অনুলিপি তিনি প্রস্তুত করে-ছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন "দেবদেবীস্তোত্র"গুলির মধ্যে কয়েকটিকে প্রস্তরে

মুদ্রিত করা হয়েছিল। রণজিতমল্লও ছিলেন মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সূক্ষ্ম সাহিত্যানুরাগী। তিনিও বহু কবিতা এবং উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছিলেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অকৃত্রিম, শিক্ষাকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন বাস্তব-জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে।

এই মল্লরাজাদের রাজসভায় দেশী ও বিদেশী অনেক পণ্ডিতের সমাগম হয়েছিল, বিশেষ করে সেখানে বাঙালী ও মৈথিলী পণ্ডিতদের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে সুদূর হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্যভূমিতে রাজসভাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলার যে সমুন্নত বর্তিকা জ্বলে উঠেছিল, তা' আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৈথিলী, বাংলা, হিন্দী, পর্বতিয়া (পার্বত্য অঞ্চলের ভাষাসমূহ) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় এবং একাধিক ভাষার মিশ্রণে বহু গীতিকবিতা ও ভক্তিরসাত্মক কবিতা, সঙ্গীত ও নাটক রচিত হয়েছিল।

।। তিন ।।

১৩২২ সালে নেপালে বাংলা নাটকের যে পুঁথিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি সবই বাঙালী ব্রাহ্মণদের রচনা। ভণিতায় সকলেই নিজেদের 'দ্বিজ' বলে পরিচয় দিয়েছেন। ভূপতীন্দ্রমল্ল ও রণজিতমল্লের রাজত্বকালে এগুলি তাঁরা রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া নাট্যকার সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্বই জানা যায় না। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস আজ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ভাতগাঁও-এর মল্লরাজাদের গুরুরা ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। প্রথম মল্লরাজা হরিসিংহদেবও ছিলেন বাঙালীর শিষ্য। তাঁর গুরুর বংশধরেরাই পুরুষানুক্রমে মল্লরাজাদের গুরুগিরি করেছেন। সমকালীন সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে ও রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভাতগাঁও অগ্রগণ্য ছিল বলে কাটমণ্ডু ও পতনের মল্লরাজারাও এই গুরুদেরই নিজেদের গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। নেপালে যতদিন মল্লরাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, ততদিন বাঙালী ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল। গোর্খাদের নেপাল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেই প্রতিপত্তির বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই অনুমিত হয়, বাঙালী নাট্যকারেরা সকলেই ছিলেন মল্লরাজাদের গুরুদের আত্মীয়-কুটুম্ব কিম্বা আশ্রিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুলিপিও বাঙালীরা তৈরি করেছিলেন।

নেপালে মোট চারটি নাটকের পুঁথি পাওয়া গেছে। এই পুঁথিগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "পুঁথিগুলি নেবারী অক্ষরে লেখা, কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা। প্রথম তিনখানি (কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ, কৃষ্ণদেবের মহাভারত ও গণেশের রামচরিত্র) এক হাতে লেখা; ধনপতির মাধবানলকামকন্দলা আর এক হাতের লেখা। বিদ্যাবিলাপের ২২ খানি পাতা, মহাভারতের ৮০ ও রামায়ণের ৪২টি পাতা। রামায়ণের ১৯ নং পাতাটি নাই। আর একটি ধারাবাহিক নম্বর বিদ্যাবিলাপে ৪৫ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণের শেষ পাতায় ১৮৭ নং পর্য্যন্ত আসিয়াছে।...শেষ পুঁথির পাতা ২৫ খানি।"
>
> [নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ভূমিকা, পৃঃ—/০]

এই নাটকগুলি নাটকাকারে রচিত হলেও এগুলিকে ঠিক নাটক বলা যায় না। বিভিন্ন প্রকার শ্বাসাঘাতপ্রধান ছড়ার ছন্দ, তানপ্রধান পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ ও ধ্বনিপ্রধান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতায় এগুলি রচিত। কবিতা-গুলি উচ্চশ্রেণীর ভাবদ্যোতক গীতিকবিতার সমষ্টি, এতে নবরসকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রধানত গান করার উদ্দেশ্য নিয়েই এগুলিকে কবিতায় লেখা হয়েছিল। একের পর এক পাত্রপাত্রী এসে গান করে চলে গেছে। এইভাবে গানের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনীর গতি সঞ্চারিত হয়েছে অর্থাৎ সঙ্গীতময় সংলাপকে মাধ্যম করেই নাটকীয় গতি গড়ে উঠেছে। সঙ্গীত তাই নাটকগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীতগুলি ছিল বিভিন্ন প্রকার উচ্চাঙ্গ রাগ-রাগিণী কেন্দ্রিক। অভিনেতারা সকলেই ভাল গান করতে পারত, তাদের উদাত্তকণ্ঠের রাগ-রাগিণীশ্রয়ী সঙ্গীত সেকালের দর্শকদের মাতিয়ে তুলত সন্দেহ নেই। সাধারণত প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য পুরাণ-সমূহ থেকে নাট্যকাহিনী চয়ন করা হয়েছে, কখনও কখনও গৃহীত হয়েছে সর্ব-ভারতীয় লৌকিক আখ্যায়িকা বা গাথা থেকে।

নাট্য রচনার আঙ্গিকের দিক থেকে নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক ও মৈথিলী নাটকের পুঁথিগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মোটামুটি একই আঙ্গিককে অবলম্বন করে সব নাটকগুলি রচিত হয়েছিল। বাংলা নাটকে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, মৈথিলী নাটকেও তা' লক্ষ্য করা যায়। মৈথিলী নাটকের এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ বাগচী যে মন্তব্য করেছেন, বাংলা নাটক সম্বন্ধেও সেই একই কথাই বলা যেতে পারে। সেইজন্য একই

কথার পুনরাবৃত্তি না করে কেবল ডাঃ বাগচীর মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করলুম ;

"After the *Nandi* (Sometimes accompanied with *Astamangala* and *Puspanjali*) the *Sutradhara* and the *Nati* appeared on the stage, introduced the subjectmatter, the author, the patron and the occasion on which the play was composed. Then followed what was known as *Rajavarnana* and *Desavarnana* (the description of the king and the country) and thereafter the section proper commenced. The actors entered the stage and disclosed their identity through appropriate songs. The action progressed in the songs ended in songs." [P—173]

॥ চার ॥

ভাতগাঁও, কাটমণ্ডু ও পতন—তিনটি মল্লরাজ্যেই শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটলেও ভাতগাঁও-এ নাটক যতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিল, কাটমণ্ডু বা পতনে তা দেখা যায় না। এই তিনটি রাজ্যের রাজপ্রাসাদেই ছিল স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। এদের বলা হত "নাসলচোক"। প্রধানত এই রঙ্গমঞ্চেই নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিনা মূল্যে এখানে অভিনয় দেখার সুযোগ পেত। এই মঞ্চগুলি আজও বর্তমান রয়েছে। রাজপ্রাসাদ ব্যতীত অন্যত্রও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হত। জনসাধারণ স্থানীয় অধিবাসীদের আনন্দ-বিনোদনের জন্য মঞ্চ তৈরি করে অভিনয় করত। কখনও কখনও মন্দির-প্রাঙ্গণেও অভিনয় হত।

প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের প্রচলন ছিল। অভিনেয় দৃশ্যকে উপস্থাপনার জন্য পিছনে পশ্চাদপট হিসাবে কোনও পর্দা ব্যবহৃত হত না। গানের মাধ্যমে দৃশ্যের যে বর্ণনা করা হত, তা থেকেই দর্শকেরা অভিনেয় দৃশ্যকে বুঝে নিত। পশ্চাদপট ব্যতীত মঞ্চকে দৃশ্যের প্রয়োজন অনুসারে সুসজ্জিত করে তোলা হত। অভিনেতারা চরিত্রানুগ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত ও মুখোস ব্যবহার করত। অভিনয়ে নৃত্যের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কখনও কোরাস সঙ্গীতের সঙ্গে সমবেত নৃত্য করা হত,

আবার কখনও বা দৈহিক সাংকেতিক ভঙ্গিমায় বিশেষ মুহূর্ত্তকে মূর্ত করে তোলা হত। ধীমে, খীম, ঘা, কোঁচখিম, তাইনাই, ভুস্যা, মুআলি, ঢোল, ত্যম্পে, ঝ্যালি, বয়, নায় খীম, তা, দুন্দুভি, বনসুরি। তকা, মৃদঙ্গ, পন্‌গা করতাল, খঞ্জন, তূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অর্কেষ্ট্রা গঠিত হয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

নিম্নে নেপালে রচিত বাংলা নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলুম :—

॥ বিদ্যাবিলাপ ॥

"বিদ্যাবিলাপ"-এর রচয়িতা কাশীনাথ। অন্যান্য নাটকের তুলনায় এই নাটকটির আয়তনই সবচেয়ে ক্ষুদ্র, পুঁথির পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র বাইশটি। নাটকটি মোট সাতটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্ক ব্যতীত সমস্ত অঙ্কেরই প্রারম্ভে "অথ দ্বিতীয় দিবসে", "অথ তৃতীয় দিবসে," "অথ চতুর্থ দিবসে" ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। নাটকের সূচনা ঘটেছে নৃত্যনাথের প্রণতিতে— "শ্রী৺নৃত্যনাথায় নমঃ"। নৃত্যনাথ নটরাজের বন্দনা করা হয়েছে সংস্কৃত ও বাংলা "নাসিশ্লোকে"। এরপর সূত্রধার প্রবেশ করে নটরাজকে "পুষ্পাঞ্জলি" প্রদান করেছে। তারপর "রাজ বর্ণনা" ও "দেশ বর্ণনা", এতে বর্ণিত হয়েছে পৃষ্ঠপোষক রাজা ও তাঁর শাসিত রাজ্য। পরিশেষে বিন্যস্ত হয়েছে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনের আদিরসাত্মক লৌকিক কাহিনী। সমাপ্তিতে "আশীর্বাদ-শ্লোকে" রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁর পুত্র রণজিতমল্লের যুদ্ধ জয় কামনা এবং নাট্য-রচনার তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বত্রই নাট্যকার রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের গুণ কীর্তন করেছেন।

॥ মহাভারত ॥

"মহাভারত" লিখেছেন কৃষ্ণদেব। বাংলা নাটকগুলির মধ্যে "মহাভারতই" সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন, পুঁথির পৃষ্ঠাসংখ্যা আশি। তেইশটি অঙ্কে সমগ্র নাট্য-কাহিনী বিভক্ত। এই নাটকেরও প্রত্যেক অঙ্কের গোড়ার দিকে "অথ প্রথম দিবসে", "অথ দ্বিতীয় দিবসে", "অথ তৃতীয় দিবসে" ইত্যাদি বলা হয়েছে। নৃত্যেশ্বরের প্রণতিতে নাটকের সূচনা—"শ্রী৺নৃত্যেশ্বরায় নমঃ॥"। "বিদ্যাবিলাপ"-এর মত এতেও সংস্কৃত বাংলা "নান্দি শ্লোকে" নৃত্যেশ্বর নটরাজের বন্দনা করা হয়েছে। সূত্রধার প্রবেশ করে নটরাজের বন্দনা গান

করেছে এবং সংস্কৃত "পুষ্পাঞ্জলিশ্লোকে" তাঁকে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেছে। "রাজবর্ণনা" ও "দেশবর্ণনার" পরে সম্পূর্ণ মহাভারতের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে। নাটকের শেষে "আশীর্বাদ শ্লোকে" রাজা ভূপতীন্দ্রমল্লের কল্যাণ কামনা ও নাট্য রচনাকালের উল্লেখ করা হয়েছে। নাটকের সর্বত্র পৃষ্ঠপোষক রাজা ভূপতীন্দ্রমল্লের প্রশস্তি দেখা যায়।

।। রামচরিত্র ।।

"রামচরিত্র" রচনা করেছেন গণেশ। আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে "মহাভারত"-এর পরেই এই নাটকের স্থান, পুঁথির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট বিয়াল্লিশ। অন্যান্য নাটকের মত "রামচরিত্র" নাটকটির কোনও অঙ্ক-বিভাগ নেই, সমগ্র গ্রন্থকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে অর্ধনারীশ্বর ও নৃত্যেশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করে যথাক্রমে বলা হয়েছে "শ্রীশ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বরাভ্যাং নমঃ॥" ও "শ্রীনৃত্যেশ্বরায় নমঃ॥", কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পাতা অর্থাৎ পুঁথির উনিশ নম্বর পাতা বিনষ্ট হওয়ায় ঐ খণ্ডের সূচনায় কি লেখা ছিল তা' জানা যায় না। বাংলায় রচিত এর "নান্দীগীত"-টিতে মহাদেবকে প্রণাম জানানো হয়েছে, তারপর সূত্রধর এসে তাঁর মহিমা-কীর্তন করেছে। সূত্রান্তে "রাজবর্ণনা" ও "দেশবর্ণনার" পর সমগ্র রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, পূর্ববর্তী নাটক দুটির মত এই নাটকের শেষে কোনও "আশীর্ব্বাদ-শ্লোক" কিম্বা রচনার সাল-তারিখের উল্লেখ নেই। সর্বত্র রাজা রণজিতমল্লের গুণগান করেছেন নাট্যকার।

॥ মাধবানল-কামকন্দলা ॥

"মাধবানল-কামকন্দলা" নাট্যকার ধনপতির লেখা। আয়তনের দিক থেকে নাটক চারটির মধ্যে এই নাটকের স্থান তৃতীয়, পুঁথির পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র পঁচিশটি। সাতটি অঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ। "বিদ্যাবিলাপ"-এর অনুরূপ এতেও একমাত্র প্রথম অঙ্ক ব্যতীত প্রত্যেক অঙ্কের আরম্ভে "অথ দ্বিতীয় দিবসে"। "অথ তৃতীয় দিবসে", "অথ চতুর্থ দিবসে" ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে। নাটকের সূচনায় প্রণাম করা হয়েছে নৃত্যেশ্বর নটরাজকে—"শ্রীনৃত্যেশ্বরায় নমঃ॥"। নৃত্যেশ্বর নটরাজের বন্দনাজ্ঞাপক এর "নান্দিশ্লোক"-টি "রামচিত্র"-এর মত বাংলায় রচিত। নান্দির পরে সূত্রধার প্রবেশ করে নৃত্যেশ্বর নাটরাজের বন্দনা গান করেছে। তারপর "রাজবর্ণনা" ও "দেশবর্ণনা," পরিশেষে বর্ণিত হয়েছে মাধবানল ও কামকন্দলার লৌকিক প্রেম-কাহিনী। নাটকের শেষে দেবী ভবানীর নিকটে রাজা রণজিতমল্লের বিজয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নাটকটিতে

রচনাকালের কোনও উল্লেখ নেই। নাট্যকার রাজা রণজিতমল্লের প্রশংসা করেছেন সমস্ত নাটকে।

॥ ছয় ॥

সর্বশেষে বাংলা নাটকগুলির ভাষা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। নাটক চারটির মধ্যে প্রথম তিনটির অর্থাৎ "বিদ্যাবিলাপ," "মহাভারত" ও "রামচরিত্র"-এর ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের অনুরূপ, তবে কিছুটা প্রাচীন ধরণের। "বিদ্যাবিলাপ" ও "মহাভারত"-এ কয়েকটি বিদেশী শব্দ দেখা যায়। "রামচরিত্র"-এর ভাষা আধুনিক বাংলা ভাষার খুব কাছাকাছি। সেযুগে বাংলাদেশ থেকে এত দূরে কি করে এটি সম্ভব হয়েছিল, তা' ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। শেষ নাটক অর্থাৎ "মাধবানল-কামকন্দলা"-র ভাষা একটু বেশি পরিমাণে হিন্দি ও মৈথিলী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত, সমস্ত কথার অর্থও বোঝা যায় না। নাট্যকারেরা নাটকে দু' একটি চরিত্রের মুখে অন্যান্য ভাষাও ব্যবহার করেছেন। মুসলমানেরা কথা বলেছে উর্দুতে, মাড়োয়ারীরা মরুভাষায়।

বাংলা নাটকের এই পুঁথিগুলি যে অবিকৃতভাবে আমাদের হাতে এসে পড়েছে, এ কথা বলা যায় না। শুধু এগুলি কেন, মধ্যযুগের কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধেই জোর করে তা' বলা সম্ভব নয়। নেপালে বাংলা নাটকের ভাষাগত বিকৃতি ঘটেছে প্রধানত লিপিকরদের হাতে। অবাঙালী লিপিকরেরা নিজেদের উচ্চারণের মত করে বাংলা লিখতে গিয়েই বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। তাঁদের হাতে পড়ে মাঝে মাঝে এমন হয়েছে যে, অনেক বাংলা শব্দই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। আবার দীর্ঘদিন বাংলাদেশ পরিত্যাগ করে বিদেশে বসবাস করায় ফলে নাট্যকারদেরও ভাষা যে অল্পবিস্তর বিকৃত না হয়েছিল, এমন নয়।

—॥ নির্দেশক-গ্রন্থপঞ্জী ॥—

১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ১৩২৪ সাল।

২। ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, দ্বিতীয় খণ্ড—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গিরিশ নাট্য-সংসদ, ১৯৪৭।

৩। Medieval Nepal, part II.—Dr. D. R. Regmi, Firma K. L. Mukhopadhyay, First Edition-1966.

৪। History of Nepal—Editor-Daniel wright, Susil gupta (India) Private Ltd, First Indian Edition—1958.

রঞ্জিত রায়চৌধুরী

সময় ও সুধাকরবাবুর মন

....

একবার ভাবিয়া ছিলাম, অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করি।

ভাবিয়াছিলাম জানিয়া লই কি উহাদিগের অভিযোগ। কিন্তু ভরসা পাই নাই। ক্ষণ পরে মনে হইয়াছে—এইরূপ মধ্যরাত্রে যাহারা আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করে না, কেবল মাত্র প্রশ্ন দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা যাইবেনা। তবে অভিযোগ আছে বলিয়াই এবং আগন্তুকগণ পুলিশ শুধুমাত্র সেই কারণেই আপত্তিকর ভাষায় কথা বলিবার সাহস থাকা সম্ভব নহে। অন্ততঃ এই একটা বিষয়ে উহাদিগকে প্রশ্ন করা যাইত।

বস্তুতঃ এই অঞ্চলে—একজন নির্বিরোধ ব্যক্তি বলিয়া, যে রূপ আমার পরিচয় আছে—আমরা নিতান্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ—এই মতামতটি-ও সমধিক প্রচলিত। ফলে অভিযোগ যাহাই হউক উহাদিগকে বলা চলিত, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন।' কার্যত আমি তাহা করিতে পারি নাই। বিচিত্র নহে সমগ্র ঘটনার নিমিত্ত আমি কিয়ৎপরিমাণে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি।

দরজা খুলিয়া শুভময়ই সর্বপ্রথম বাহির হয়।

দয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে গিয়া বিফল হইলে—আমার প্রতি এরূপ ভাবে চাহিয়াছিল যে—মুহূর্ত মধ্যে আমি চূড়ান্ত একটা কোন বিপদের আশংকা না করিয়া পারি নাই। অবশ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঘটনা তদরূপ ভাবে ঘটে নাই। যত সময় শুভময় উহাদিগের সহিত কথা বলিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া নিজের পোষাকআদি লইয়াছে এবং আমাদের উভয়কে প্রণাম করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দয়া একটা শব্দও করে নাই!

দয়া সেই যে ক্রন্দন করিতে বসিয়াছে—এখন পর্যন্ত তাহার কোন বিরাম হইল না। উহাকে কিছু সান্ত্বনা বাক্যে নিবৃত্ত করিবার একবার নিস্ফল চেষ্টা করি, ক্রন্দন তাহাতে কেবল উচ্চ গ্রামেই উঠিয়াছে—দয়াময়ী শান্ত হয় নাই।

অসম্ভব নহে ঐ ভাবে ক্রন্দনরত দয়াময়ীর সম্মুখে বেশী সময় স্থির হইয়া থাকিবার মত মানসিক শক্তি নাই বলিয়াই আমি এক সময় ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া শুভময়ের ঘরের দিকে অগ্রসর হই। সাধারণতঃ তাহার ঐ জগত—দেশ বিদেশের মহানায়কদিগের দেওয়ালজোড়া প্রতিকৃতি; ইতস্তত অগুছাল হইয়া পড়িয়া থাকা রাশি রাশি পুস্তক, অযত্নে মলিন শয্যাদি—ইত্যাকার সমস্ত কিছুর সংসারটা আমার দৈনন্দিন জীবন যাপনের বাহিরেই থাকিয়া যায়। কশ্চিৎ কখনো আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি। দীর্ঘকাল সে ক্রমশ বয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে তাহার সহিত যাহা কিছু যোগাযোগ—দয়াময়ীই রক্ষা করিয়াছে আমি তাহাতে নিশ্চিন্তই বোধ করিয়াছি। আজ সেই বিশ্বাসের সহিত বিরোধ বাধাইয়া শুভময় কেমন বাহির হইয়া পড়িল!

এখন বুঝিতেছি—গত কয়েকদিন ধরিয়া সামান্য শব্দ হইলেই কেন সে ছুটিয়া দরজা খুলিতে যাইত। এক্ষণে ইহা স্বতঃই স্পষ্ট যে, সে নিশ্চয় করিয়া জানিত অদ্য কিম্বা যখনই হউক তাহাকে যাইতে হইতে পারে।

বারকয়েক দেওয়ালের উপর হাত প্রসারিত করিয়াও আলো জ্বালাইবার সুইচ খুঁজিয়া পাই না। যতদূর জানি, এই বাড়িতে বসবাস করিবার পর হইতেই ঘরের উত্তর দেওয়ালে সুইচটা স্থির আছে তথাপি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও—উহা আয়ত্ত করিতে ব্যর্থ হই। দয়াময়ীকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত 'একবার থানায় গিয়া বিস্তারিত জানিয়া আসিব—এবংবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা সম্ভব।

কিন্তু কোন সাহসে সংবাদ লইতে যাইব? যদি প্রকৃতই সে কোন অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে?

না এক্ষণে আর সেই বিশ্বাস নাই—আমি কি প্রকারে বলিব শুভময় আমার পুত্র বলিয়াই নির্দোষ। তাহার কার্যবিধির কতটুকুই বা এতকাল জানিতে পারিয়াছি! আর বলিলেই তাহা কে বিশ্বাস করিবে। শুভ নিজেই হয়তো কথাটা মানিবে না। তাহার নিজের বিচার ক্ষমতা আছে—আদর্শ আছে।

হয়ত তাহার ঐ আদর্শই তাহাকে গৃহত্যাগী করিল। দয়াময়ীর পক্ষেও কোন কিছুই বিশদরূপ জানা সম্ভব নহে। সে জানিলে বলিত নিশ্চয়। কিম্বা হয়তো সে পুত্রের সকল সংবাদই রাখিত…। আশ্চর্য…কতকাল হইয়া গেল আমরা এক সংসারে বসবাস করিতেছি তথাপি আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট কতই না অপরিচিত।

২

আমাদিগের এই সংসার—একমাত্র সন্তান শুভময়, স্ত্রী দয়াময়ী এবং আমি এই যে তিনটি প্রাণীর এতকালের বাসস্থান—তাহার ভিতর কবে কি ভাবে বিরোধ ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বলিতে পারিব না। কিম্বা ইহাই সংসারের বিধি। আমার সহিত পিতাঠাকুরের বিরোধের ঘটনাটা মনে পড়িয়া গেল। আমি চাকুরী করিব শুনিয়া তাঁহার সে কি ক্রোধ! বি, এ পাশ করিয়া আমি রেলকোম্পানীর চাকুরী লইব ইহা নাকি তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিস্তর উপদেশ পরামর্শ এমন কি অবাধ্য হইলে, বিষয় সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত করিবার ভয় পর্যন্ত দেখান হইল। রেল কোম্পানীর চাকুরী করিলে ধর্ম ও সামাজিক মর্যাদা দুই নষ্ট হইবে তিনি তাঁহার এই বিশ্বাস লইয়া রহিলেন। আমি মাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ হইয়া চাকুরীতে যোগদান করিলাম।

সত্য বলিতে কি জীবনে কোন দিনও ঐ আদেশ অমান্য করিবার জন্য কোন গ্লানি অনুভব করি নাই। পরে পিতাঠাকুর তাঁহার জিদ যে ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। আমিও অনেক নতি স্বীকার করিয়াছি। অথচ কি চূড়ান্ত বিরোধটাই না বাধিয়াছিল।

শুভময়কে লইয়া ইতিপূর্বে কদাচ কোন প্রকারের অসন্তোষ বোধ হয় নাই। বলিতে দ্বিধা নাই প্রত্যহ যে যুব সম্প্রদায়কে চতুর্দিকে দেখিয়া থাকি সে কোন কালেও এরূপ ছিল না। বাল্যকাল হইতে অত্যধিক স্নেহ আহ্লাদ পাইয়া সে কিছুটা জেদি হইয়াছিল, ইহার অতিরিক্ত কিছু নহে। বরং সে ধীরস্থির প্রকৃতির ছিল। অতি সম্প্রতি রাজনীতি বিষয়ে সে চিন্তা ভাবনা করে এই রকম সংবাদ পাইতাম, তাই বলিয়া শুভময় এবংবিধ বেপরোওয়া হইয়া উঠিবে এমন বুঝি নাই। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পুলিশ বিভাগের লোকজনেরা তাহাকে গ্রেফতার করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ অস্থিরতা এবং অশোভনতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে না ভাবিয়া উপায় নেই যে, শুভময়ের অপরাধ যথেষ্ট গুরুতর। হয়ত ঘটনা এইভাবে না ঘটিলেও একদিন সে আমাদিগের নিকট হইত তাহার জগতের দিকে সরিয়া যাইত। ইহাই কালধর্ম। তবে এক্ষণে এরূপ চিন্তাতেও প্রবোধ বোধ করিতেছিনা।

নিজ যুবা বয়সে যে একাগ্রতা ছিল তাহার সহিত শুভময়ের বিষয়ের কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছিনা। কিছু পরিমাণে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, পিতা-ঠাকুরের মত জমিজমা, প্রজা, প্রতিবেশি—এইসব বহুবিধ দায় বহন অপেক্ষা

একটা বাঁধা মাহিনার চাকুরী, দেশ দেশান্তরে অবাধে ভ্রমনের সুযোগ—এই সমস্তই আমাকে প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু শুভময়—সে কি প্রত্যাশা করে?

নেতা হইবার চেষ্টা করিতেছে? যাহা সত্য নহে! তবে? সমগ্রসমাজের কল্যাণ করিতে কৃতসংকল্প? তাই তাহার মমতাময়ী মাতা, সম্প্রতি বার্দ্ধক্যে পঙ্গুপ্রায় পিতা—আমাকে পরিত্যাগ করিবার এমন আয়োজন? জানিনা শুভময় উহারা কোন সমাজ সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর। আপাতত মনে হইতেছে, সে বড় নির্মম সমাজ, সেখানে আমার মতন একজন নির্বিরোধ পিতা এবং দয়াময়ীর মতন একজন স্নেহাতুরার কোন স্থান নাই। তথাপি তাহাদের উদ্দিষ্ট সমাজ বিষয়ে কোনরূপ অভিযোগ করিতে চাহিনা। তাহাকে চিরকাল দুর্বলচিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে ইহা নিশ্চয় পিতা হিসাবে কামনা করি না।

শুধু আশঙ্কা হয় যুবা বয়সের উত্তেজনাবশতঃ কোন ভুল ভ্রান্তি না করিয়া বসে। নিজ জীবন দিয়া শিখিয়াছি; ভুল সচরাচর হয়না, যুবা বয়সই প্রকৃত সময়…তথাপি। হয়ত তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করি বলিয়াই তাহাকে লইয়া দুশ্চিন্তা আর শেষ হইতে চাহে না।

খোকার জন্য ভেবোনাতো, ও কি চোর না ডাকাত! বলিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে দয়া চুপ করিয়াছে। বলিতে পারিবনা ইতিমধ্যে সে নিদ্রিত কিনা। এক্ষণে চতুর্দিকে অন্ধকার। তবে এত সহজে তাহার নিদ্রা আসিবে এমন বিশ্বাস হয় না। আমি নিজেই কি আর নিদ্রা যাইতে পারিব! সম্ভব নহে। কেবল নিজের এই অক্ষমতাকে দয়াময়ীর নিকট গোপন করিতে হইবে।

আমাদিগের বংশে শুভময়ই প্রথম—যে একটা গোটা সমাজকে পরিবর্তন করিবার স্বপ্ন দেখে। এযাবৎকাল আমার পূর্বপুরুষগণ কেবল আপন আপন সংসার ও স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াছেন, নিজেদের সংসার সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

৩

জীবনে স্বপ্ন বড় কম দেখিলাম না। কিয়ৎকাল পূর্বে যাহা দেখিলাম তাহা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। সেই দুর্জ্ঞেয় স্বপ্নের কথা—এই অন্ধকার প্রতিবেশে স্মরণে পর্যন্ত শিহরিত বোধ করিতেছি। নিজের স্বপ্নের ভিতর মানুষ নিজেকে মৃত বলিয়া সচরাচর বুঝিতে পারে এরূপ শুনি নাই। অথচ স্পষ্ট দেখিলাম আমার শবদেহ লইয়া বাহকেরা শ্মশানে উপস্থিত। অদূরে একটা

জলন্ত চিতা—ঈষৎ দক্ষিণে এক শ্রেণী সোপান ক্রমশ শ্মশানভূমি হইতে নিম্নে প্রবাহিনী নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমি উন্মুক্ত আকাশের নিচে মৃতদেহ হইয়া শুইয়া আছি।

হঠাৎ কোথা হইতে একটা ছায়ামূর্তিপ্রায় মানুষ আসিয়া দাঁড়াইল তাহার ব্যবহারে মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না—তবে উন্মাদ হইলেও হইতে পারে। কোন কিছু সঠিক করিয়া বুঝিবার পূর্বেই সে অতি দ্রুত আমার শবের উপর হইতে পুরাতন লেপখানাকে টানিয়া লইয়া সেকি দৌড়। ইহার পর আর কিছু স্মরণে আসিতেছে না। কেবল, উহার পশ্চাতে বাহকেরা 'চোর' 'চোর' 'ধর' 'ধর' বলিয়া ধাবিত হইতেছিল, এরূপ কিছু ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

নিজের মৃতদেহ বা শ্মশান প্রতিবেশের বিষয় কিছু বোধ করিতেছি না। বিস্মিত বোধ করিতেছি ছায়ামূর্তির কথা ভাবিয়া। কি অবলীলায় না সে একটা শবদেহের উপর হইতে আচ্ছাদন লইয়া পলায়ন করিল। শব বা বাহক কেহই তাহার উদ্যোগের বাধা হয় নাই। সর্বোপরি তাহার পলাইবার ধরণটাও বড় বিচিত্র।

উহার তুলনায় আমরা কত ভীরু।

বলিতে পারি না শুভময় ঘুমাইতেছে কিনা। শুনিয়াছি স্বীকারোক্তি আদায় করিবার নিমিত্ত নানা রূপ উৎপীড়ন করা পুলিশদিগের কর্তব্য কর্মের একটা প্রধান দিক। মনে হয়না শুভময়ের ভিতর তেমন কোন প্রতিরোধ শক্তি আছে। সামান্য প্রয়াসেই যে তাহার ধৈর্য ভাঙ্গিবে ইহা নিশ্চয়। তদবির তদারক করিলে হয়ত তাহাকে রাত্রিকালের মধ্যেই জামিন ইত্যাদির সাহায্যে লইয়া আসা সম্ভব ছিল। কিন্তু তেমন একটা কিছু করিবার যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমি জানি, চুরি, বা রাহাজানি সে করিতে পারে না। সে যাহারা সমাজ বদলাইতে যায় সেই দলের লোক। একটা নতুন সমাজ গঠন নাকি অবশ্যম্ভাবী। এত বড় বিশ্বাস তাহার কোথা হইতে আসিল বলিতে পারিব না।

মনে পড়ে মধ্যরাত্রে চিটাগাং মেল চলিয়া গেলে—কখনও কখনও আমার ভগ্নীপতি প্রিয়তোষ ও তাহার বন্ধুবান্ধব যাহারা কখনও সুপারী বাগানের অন্ধকার পথ দিয়া বাড়িতে আসিত, দুএক বেলা বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইত, হয় চাঁদপুর নচেৎ কুমিল্লা—সেই সকল সময় সেই মানুষগুলির কথা। এই

সকল ঘটনা দয়াময়ীর নিকট হইতে শুনিয়াছি। নিজে দেখি নাই। কারণ, চাকুরীস্থল তখন অনেক দূরে। বিবাহের পর প্রিয়তোষ তরুবালাকে লইয়া আর দ্বিরাগমনে আসে নাই বলিয়া বহুকাল আমাদিগের পরিবারে দুঃখ ছিল। পরিবারের একমাত্র কন্যাসন্তান তরুবালা অপাত্রে পড়িয়াছে বলিয়া—মাতাঠাকুরাণী দুঃখ করিতেন।

সেই প্রিয়তোষ—সেই তরুবালা—এবং তাহাদিগের পরিচিত ব্যক্তিদিগের রহস্যময় চলাফিরা—এই সমস্তই দয়া আমাকে নানা সময়ে নানা ভাবে বলিয়াছে।

ঢাকা—নারায়নগঞ্জ—চাঁদপুর-কুমিল্লা—এই সকল স্থানের ঘটনাবলী··· ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত স্বদেশী আন্দোলনের লড়াই—দূরে থাকিয়া এই সব সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম। তবু উপদ্রুত অঞ্চলের নিকটস্থ গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধ পিতামাতা আর নিতান্ত কিশোরী দয়াময়ী ইহাদিগের কাহারও নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বোধ করিতাম না। দেশ উদ্ধারের জন্য একদল মানুষ মরণ পণ করিয়াছে বলিয়াও কখনও কখনও উত্তেজিত বোধ করিয়াছি—তবে তাহা ঐ পর্যন্ত।

দয়াময়ীর নিকট পরে বিশেষত প্রিয়তোষ ও তরুবালার ক্রিয়াকলাপের ঘটনা শুনিয়াও প্রিয়তোষকে সেরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয় নাই। সে যে দেশ উদ্ধার করিবার মত কঠিন দায় বহন করিতে পারে বিশ্বাস হয় নাই।

৪

আমরা পরিবারস্থ কেহই ইতিপূর্বে—ঐ রকম বড় করিয়া কোন বিশ্বাস পাই নাই। শুভময় কোথা হইতে পাইল বলিতে পারিব না। তবে সত্য বলিতে কি কেবল এই একটা কারণে আমি ধৈর্য ধরিয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে তাহার মতন করিয়া কোন কিছুকে বুঝিতে শিখি নাই। এবার তাহার মতন মানিতেও অভ্যস্ত নই। তবু তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা বরাবর দিয়াছি।

বাল্যকালের প্রথম সন্ধ্যাতারা দেখার মতন সম্ভবতঃ স্মৃতি। বাল্যকালে প্রথম সন্ধ্যাতারা দেখিয়া চোখ ফিরান চলিত না। এক তারা দেখিলে পাপ

হয়—ফলতঃ পাপের ভয়ে একে একে অগনণ তারা উঠিয়া পড়িলে—তারা গুণিবার খেলা শেষ হইত। সম্ভবতঃ স্মৃতি তদ্রূপ। নচেৎ আজ এই মধ্যরাত্রে ফিরিয়া ফিরিয়া নানা কথা মনে পড়িবে কেন ?

হেমন্তকাল আরম্ভ হইলেই প্রতি বৎসর ধুনুরীরা আসিয়া বাহির বাটির পূর্বদিকে যে প্রকাণ্ড কুলগাছটা সম্বৎসর তাহার শুকনা শাখাপ্রশাখার কাঁটা এবং অন্ততঃ এক মাস, অজস্র শুয়াপোকার দৌরাত্ম্যসত্ত্বেও, বাড়ির সকল অনুপানের আশ্রয় জোগাইত ; তাহার নিচে তুলা ধুনিতে বসিত।

ধূলা আর তুলার আঁসে চতুর্দিক ভরিয়া উঠিত।

আমি যাদুকরের মত উহাদিগের রহস্যময় কার্যকলাপ, লক্ষ্য করিতাম। পরে বহুদিন পর্যন্ত ক্রং ক্রং শব্দটা কানে বাজিত। মনে পড়ে, নূতন তুলার ওজন বেশী বলিয়া একবার উহারা একেবারে একপ্রস্ত নূতন লেপ তোষক তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল।

এক্ষণে বহুকাল পর সেই শব্দগুলি যেন আবার চতুর্দিকের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। যেন এই অন্ধকার চরাচর জুড়িয়া একদল দক্ষ ধুনুরী উত্তাপের নিমিত্ত অসংখ্য লেপ তোষক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। যেন প্রচণ্ড কোন দুর্দিনের পূর্বে, প্রতিরোধের একটা মহড়া শুরু হইয়া গিয়াছে। কেবল বলিতে পারিব না—সেই নিতান্ত গ্রাম্য কিশোরের মতো, দৃশ্যের কোন স্থানে, শুভময়রা অপেক্ষা করিতেছে।

কোন কালেও শুভময়ের মত সমাজ পরিবর্তনের কথা মনে হয় নাই। অথচ কত সহজে শুভ, সেই পরিবর্তনের নিমিত্ত—আমাকে তাহার স্নেহাতুর মাতাকে ছাড়িবার মত মনোবল সঞ্চয় করিয়াছে। কতকাল এই সংসারে আমরা তিনটি প্রাণী এক সঙ্গে বসবাস করিয়া আসিয়াছি অথচ কতই একে অপরের নিকট আজ অপরিচিত! শুধুমাত্র জন্মদাতা বলিয়া, কেবল মাত্র পিতা এই অধিকার দিয়া এই অপরিচয়ের ব্যবধান, সম্ভবতঃ আজ আর দূর হইবার নহে। অথচ এরূপ সরল সত্যটাই এতদিন এমন করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

তাই এই মধ্যরাত্রে শুভময়কে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেলে, সর্বাগ্রে এ সংসারের সকল দুঃখের নিমিত্ত তাহাকেই অভিযুক্ত করিতে পারিলাম।

ইহা অপেক্ষা মর্মান্তিক আর কিইবা হইতে পারে। তথাপি আমি সুধাকর রায় এক্ষণে দুঃখে, লজ্জায়, মৃতপ্রায় বোধ করিতেছি। কারণ শুভময় এতদিনের

পরিচিত পদ্ধতিতে বাঁচিতে চাহেনা। এই সংসারে পুরুষানুক্রমে আমরা যেরূপ জীবন যাপন করিলাম তাহাতে শুভর সামান্ত আস্থা নাই।

বড় আশা করিতে শিখি নাই—তাই এই মুহূর্তে কোন প্রকার বিচার করা সম্ভব হইতেছে না। শুধু আমরা, দয়াময়ী, শুভময় ও আমি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট হইতে চিরকাল দূরে বাস করিয়া আসিলাম—কেবলমাত্র এই কথাটাই ফিরিয়া ফিরিয়া উপহাসের মত আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত বুঝিতে পারিতেছি।

জগন্নাথ ঘোষ

মুকুন্দরামের কাব্যরচনা কাল

মুকুন্দরাম কবে দেশত্যাগ করেছিলেন, কবেই বা তাঁর বিখ্যাত কাব্য চণ্ডী-মঙ্গল রচনা করেন, এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের শেষ নেই। তার একমাত্র কারণ হল, উপযুক্ত সাল তারিখের অভাব। তবে একথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, আদি ও মধ্যযুগের কবিদের সম্পর্কে এই ব্যাপারে যত অসুবিধা দেখা যায়, মুকুন্দরাম সম্পর্কে ততটা নয়। কেননা, তিনি তাঁর কাব্যে আত্মকাহিনী এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ পাঠে জানা যায়, কবি তাঁর স্বগ্রাম দামুন্যা ত্যাগ করে আরড়া গ্রামে গিয়ে সেখানকার রাজা বাঁকুড়া রায়ের স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেন এবং তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর রঘুনাথ রায় রাজা হলে তাঁরই নির্দেশে মুকুন্দরাম কাব্য রচনা করেন।

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর দ্বারা মুকুন্দরামের কাব্যরচনার কাল নির্দেশ পাওয়া যায় না, যেহেতু উক্ত কাহিনীতে বাঁকুড়া রায়ের বা রঘুনাথের রাজত্ব-কাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সুখের বিষয়, এ ব্যাপারে কবি পাঠককে অন্ধকারে রাখেন নি। মুকুন্দরাম তাঁর আত্মকাহিনীতে এমন কতকগুলি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা পাঠক অতি সহজেই কবির কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করতে পারবেন। তবু আশ্চর্য, এই সহজকে পণ্ডিত গবেষকগণ দুর্বোধ্য ও জটিল করে তুলেছেন। অবশ্য এটা তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেন নি। করতে বাধ্য হয়েছেন মধ্যযুগের বাংলাদেশের কোনও সুষ্ঠু ইতিহাস নেই বলে।

মুকুন্দরাম তাঁর আত্মকাহিনীতে রচনাকাল নির্দেশ দিয়েছেন। মানসিংহের উল্লেখও পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। প্রথমে কাব্য রচনার কাল নির্দেশটি বিচার করা যাক। সেটি হল—

> শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
> কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

এই ছত্রদ্বয় পাওয়া যায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রামজয় বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত মুকুন্দরামের কাব্যে। এখনও পর্যন্ত এই নির্দেশটি সাধারণ্যে গৃহীত হয়ে

আসছে। ডঃ সুকুমার সেন এই ছত্রদ্বয়ে নিহিত কালকে ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি লিখেছেন, "মোট কথা 'রস' শব্দের এখানে মানে ছয় ছাড়া হতে পারে না। কেউ কেউ অষ্ট রসের কথাও বলেছেন। যেমন পীতাম্বর দাসের 'অষ্ট রস ব্যাখ্যা', কিন্তু এখানে অষ্টরস বলতে অষ্ট নায়িকার ভাবরস। কোনো পুরানো বাঙালী কবি 'রস' বলতে ছয় ছাড়া আর কিছু ধরেননি। সুতরাং 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক' মানে ('অঙ্কস্য বামাগতির' ধরে) ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ সাল।"[১]

অর্থাৎ ডঃ সেনের মতে মুকুন্দরাম ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্য হয়েছিলেন গৃহ ত্যাগ করতে। গৃহত্যাগেরও কারণ ছিল। মুকুন্দরাম লিখেছেন—

উজীর হৈল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লেখেলাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥

এই রকম ডামাডোলে "প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হৈলা বন্দী।" এইসব দেখে শুনে মুকুন্দরাম নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। যে বিপর্যয়ের ফলে মুকুন্দরাম স্বগ্রাম দামুন্যা ত্যাগ করেন, ডঃ সুকুমার সেন তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সে হয়েছিল পাঠান অধিকারের শেষ অবস্থায় আর সুরবংশীয় আফগান অধিকারের কালে।"[২]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঐ কালটি যথার্থই বিভ্রান্তির কাল। তখন মুকুন্দরামের পক্ষে দেশ ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে গমন স্বাভাবিক। এই নিরাপদ স্থানটি আরড়ার বাঁকুড়া রায়ের রাজসভা। বাঁকুড়া রায় হয়ত মুকুন্দরাম সম্পর্কে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। তিনি কবিকে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দেন। তাঁর ছেলে রঘুনাথের গৃহশিক্ষকতাও প্রাপ্ত হন।

---

১ মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল: বিশ্বভারতীপত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩।
২ ঐ

বাঁকুড়ার মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হলে কবি রঘুনাথের নির্দেশে কাব্যরচনা আরম্ভ ও শেষ করেন। রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই তথ্যটি রামগতি ন্যায়রত্ন জানিয়েছেন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে। তিনি নাকি রঘুনাথের বংশধর এবং তৎকালীন মেদিনীপুরের জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পেয়েছেন। তথ্যটি কতখানি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই সন্দিগ্ধ তথ্যকে সুমুখে রেখেই ডঃ সেন মুকুন্দরামের কাব্য রচনার সমাপ্তিকাল বলে চিহ্নিত করেছেন ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দকে।[৩]

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে লিখেছেন—

ধন্য রাজা মানসিংহ কৃষ্ণ পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ॥

বলা বাহুল্য, মুকুন্দরাম যদি ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্যরচনা সমাপ্ত করে থাকেন, তবে তাঁর কাব্যে মানসিংহের উল্লেখ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। এই বিভ্রান্তি দূর করতে ডঃ সেন লিখেছেন, "১৬০৪ সালে রঘুনাথের পুত্র রাজা হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুব কম ধরলেও বারো-তেরোর নীচে সম্ভবত নয়। তা হলে কাব্যরচনা কালের শেষ সীমা ১৫৯১-৯২ সাল। মানসিংহের উল্লেখও অসংগত হয় না, যেহেতু মানসিংহের 'উৎকল মহিম' ঘটেছিল ১৫৯০-৯১ সালে। প্রথম বারে মানসিংহ স্থলপথে গিয়েছিলেন বর্ধমান দিয়ে দক্ষিণ মুখে এবং আরামবাগে কিছুকালের জন্যে শিবির গেড়েছিলেন। আরামবাগ থেকে আরড়ার দূরত্ব বেশি নয়। সেই সময়ই কবি মানসিংহের মহত্ত্বের ও বিষ্ণুপরায়ণতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তবে তিনি ভুল করেছিলেন যে, মানসিংহের শাসন এদেশে চিরকাল ছিল না। তাঁর

৩ "রঘুনাথের পুত্র চক্রধর ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। চণ্ডীমঙ্গলের কোন ভণিতায় রঘুনাথের পুত্রের বা কন্যার উল্লেখ নাই। সুতরাং কাব্যরচনা-কালে রঘুনাথের সন্তান নাই। চক্রধর কত বয়সে রাজা হইয়াছিলেন জানি না, তবে বিশ বছর ধরিলে অন্যায় হইবে না। তাহা হইলে কাব্য সমাপ্তিকাল মোটামুটি ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।" বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ ৩য় সংস্করণ ১৯৫৯ পৃঃ ৫১৬।

দেশত্যাগ কালে যিনি রাজা ছিলেন ভ্রমক্রমে তাঁর বদলে মানসিংহের নাম করে ফেলেছেন।"[৪]

উদ্ধৃতির শেষাংশে 'ভ্রমক্রমে' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। মোট কথা ডঃ সেন একথাই জানাতে চান, মুকুন্দরাম মানসিংহের কালের কিছু আগে তাঁর কাব্যরচনা করেন। এই ব্যাপারে তিনি কতকগুলি অনুমান ও বিশ্বাসকে তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি স্বরূপ বলে মনে করেছেন। একথা মানতে বাধ্য যে, সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে বসে যদি তথ্যের ঘাটতি পড়ে তবে সেখানে অনুমান ও বিশ্বাস অনেকখানি সাহায্য করে। কিন্তু যুক্তিহীন অনুমান ও বিশ্বাসকে আমরা কেমন করে মেনে নেব? ডঃ সেনের সুগভীর পাণ্ডিত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাস্মরণে রেখেই একথা বলতে হল। তিনি রামগতি ন্যায়-রত্নের দেওয়া রঘুনাথের রাজত্বকালের সূচনাস্বরূপ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দকে মেনে নিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, এটাই বিভ্রান্তকর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই তিনি মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কাল ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দকে ধরেছেন এবং তাঁর কাব্যে মানসিংহের উল্লেখ নিতান্তই 'ভ্রমক্রমে' ঘটে গেছে বলে মনে করেছেন।

কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যের আত্মকাহিনী ও গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ পাঠে আমরা এমন কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই, যা মোঘল শাসনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি বলে মেনে নিতে বাধা নেই। যেমন, ডিহিদার, উজীর, পোদ্দার, শিকদার, কাজি প্রভৃতি।

মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তা মাৎস্য ন্যায়ের জন্য নয়। কবি দামুন্যায় বসবাসকালে এমন এক শাসনব্যবস্থার আওতায় ছিলেন যে শাসনব্যবস্থা মোগলশাসনের আবির্ভাবের ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অভ্যস্ত প্রথায় চলতে চলতে নতুন প্রথাকে অন্যান্য গ্রামবাসীদের মতো কবিও সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাই এমন এক জায়গায় তিনি চলে এলেন, যেখানে পুরাতন প্রথার চল ছিল। আরড়া সেই রকম একটি জায়গা। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

"মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কবি যে রাষ্ট্রীকতার ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা এই নববিধানের। উহাতে তিনি সুবেদার, উজীর, পোতদার, সরকার এবং

---

৪ মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্য রচনা প্রসঙ্গ: বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক পৌষ ১৩৭৫।

ডিহিদারের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজারা এরূপ নূতন ব্যবস্থার ও কর্মচারীদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত পূর্বে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা তালুকদারদের নিকট জমা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তালুকদারেরা জায়গীরদারের নিকট এবং জায়গীরদারেরা সদরে দেওয়ানের নিকট রাজস্ব জমা দিয়া নির্বিবাদে সম্পত্তি ও অর্থ ভোগ করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা ছিল প্রথা! মোগল শাসনের এই নূতন ব্যবস্থায় রাজদরবারে সরাসরি খাজনা জমা দেওয়ার নির্দেশে কিন্তু প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেম ভূম্যধিকারীরা।…জমির পুরাতন মাপের স্থানে নূতন মাপের ও নূতন পডচার প্রবর্তন, মুদ্রা বিনিময়ে বাট্টার জন্য ক্ষতি, পুরাতন মুদ্রা জমা দেওয়ার তারিখ পার হইলে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা এবং সর্বোপরি কড়া হুকুম প্রজাগণকে সাময়িকভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল।…আমাদের কবি এই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হইয়াছিলেন।" [৫]

'এই পরিস্থিতি' মানসিংহের শাসনকালে দেখা দেয়। মুকুন্দরাম এত অসচেতন কবি নন যে 'ভ্রমক্রমে' তিনি তাঁর কাব্যে মানসিংহের নাম উল্লেখ করিবেন। মানসিংহ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। অনুমান করা যায় মুকুন্দরাম এই তারিখের কিছু পরে দামুন্যা ত্যাগ করে আরড়ায় গিয়ে বাঁকুড়ারায়ের আনুকূল্যে আশ্বস্ত হন এবং তৎপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই রঘুনাথের রাজত্বকালেই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয় এবং শেষও হয়। রঘুনাথের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় না। তবে যুক্তিসিদ্ধ অনুমান করা চলে।

মুকুন্দরামের দেশত্যাগের সময় এক যুগসঙ্কট চলছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৫৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে আফগান কর্‌রানি বংশের অবসান এবং মোগল অধিকারের স্থচনা ঘটে। এই সময়ে গৌড়ে জায়গীরদার ও ভুঁইয়াদের অপ্রতিহত প্রতাপ চলছিল। মোগল সাম্রাজ্যের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জায়গীরদার ও ভুঁইয়াদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। দামুন্যার প্রভু গোপীনাথ নন্দী এই নব-শাসনের ফলে বিপাকে পড়েন। কিন্তু মোগল শাসনে প্রজাদের উপর কোনও উৎপীড়ন চলেনি। মুকুন্দরাম প্রভুর বিপদে নিজের আসন্ন বিপদের কল্পনা করে দেশত্যাগ করেছিলেন। এই দেশত্যাগ কাল সম্পর্কে কবি তাঁর কাব্যে যথার্থই উল্লেখ করেছেন

শাকে রস রসবেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

—উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুটিতে যে শকাব্দ এবং খৃষ্টাব্দের হিসেব পাওয়া যায় তা যথাক্রমে ১৪৯৯ এবং ১৫৭৭। 'রস' কে ৯ ধরে এই হিসেব মেলে। বলা বাহুল্য 'রস' নয়টিই তো। ডঃ সুকুমার সেনের হিসেব মতো এই সালটি প্রায় ৩০।৩৫ বছর কম। সময় কমানোর কারণ স্বরূপ তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা স্বয়ং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের কাব্যটি তার মূর্তিমান প্রতিবাদ।

সবিত চক্রবর্তী
শোক ও শত্রু

আশ্বিনের এক অন্ধকার রাত্রি।

সকাল থেকেই এক নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। গত তিনদিন ধরে আকাশের এই অবস্থা। মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া। পথ ঘাট জলে ভরে গেছে, পুকুর, খাল, বিল জলে কানায় কানায় ভরে গেছে। সদর রাস্তা এত উঁচু, তাও দু' এক জায়গায় রাস্তার মাটি সরে গেছে, খালের জল রাস্তার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। দু' একটা বাঁশের সাঁকো ভেঙে গেছে। গত তিনদিন ধরে গাঁয়ের লোক বাজারে যেতে পাচ্ছে না। এত জল কাদা ভেঙ্গে কে যাবে সোনাপুর বাজারে। হপ্তায় দু' দিন হাট বসে।

রাজপুর গ্রাম থেকে বাজার চার মাইল। হাসপাতাল, ডাকঘর, ইস্কুল, পুলিশ, থানা সব কিছু সোনাপুরে। এক কথায় গোপালপুরের সঙ্গে রাজপুর কেন, আশেপাশের যত গ্রাম রয়েছে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার সুত্রে বাঁধা আছে। সোনাপুর থেকে হেঁটে গেলে বিশ মাইল অতিক্রম করলে হাজিগঞ্জ রেলষ্টেশন। বর্ষাকালে নৌকো ব্যতীত আর কোন পথ নেই। উঁচু রাস্তা কিছুদুর গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। বুক অবধি জল। এমনি অসংখ্য জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গা। জল না শুকানো পর্যন্ত নৌকো ছাড়া পথ নেই।

নিবারণ ডাক্তার সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিসপেনসারি বন্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চার মাইল পথ পায়ে হেটে যেতে হবে। এখন সাইকেল নিয়ে চলা ফেরা করাও বিপজ্জনক। আসবার সময় পরিচিত কারো নৌকোয় করে সোনাপুর চলে আসে। সারাদিন ওখানেই কাটিয়ে দেয়। নিজেই সব কিছু করে। বাজারের মধ্যে ছোট একটি দোকান। একটি পুরাণো আলমরি, টেবিল চেয়ার, রোগীদের বসবার জন্য লম্বা একটি বেঞ্চি পাতা আছে। দুপুরের দিকে ডিসপেনসারি বন্ধ করে পাশের পুকুর থেকে স্নান সেরে বনমালির হোটেলে খেয়ে নেয়। বনমালির ছেলে-মেয়েদের অসুখ-বিসুখ হলে নিবারণ ডাক্তার পয়সা নেয় না। বনমালিও মাসকাবারের পাওনা সামান্য কিছু নিবারণ ডাক্তারের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। রাত্তিরে বাড়ী গিয়ে খেয়ে নেয়।

নিবারণ রায়, সংক্ষেপে নিবারণ ডাক্তার রাজপুর গ্রামের মধ্যে একমাত্র এল. এম. এফ্. ডাক্তার। আশেপাশের গ্রামে আর কোন ভাল ডাক্তার নেই। মাঝে মাঝে দু' একবার অস্ত্রও ধরতে হয়েছিল। সবাই এক কথায় স্বীকার করে নিবারণ টাকা বেশী নিতে পারে, রোগীদের গালমন্দ দিতে পারে, কিন্তু ঔষধ খুব ভাল। দু'বার আর যেতে হয়না। সবাই একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করত। গাঁয়ের লোকেরা যার যা সামর্থ্য নিবারণ ডাক্তারের বাড়িতে কেউ চাল, মুড়ি, খৈ, তরি-তরকারী রেখে যেত। রবিবার নিবারণ ডাক্তার সোনাপুর যেত না। সারাদিন বাড়ি থাকতো। ঘরের কাজ-কর্ম করত। অন্য গাঁয়ের লোক এলে সাইকেল নিয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়ত।

আশেপাশের দোকান অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বনমালির হোটেলও বন্ধ করে দিয়েছে। এই বর্ষাবাদলে কে আসবে খেতে? হাটবার হলে একটা কথা ছিল। বনমালি হাটু পর্যন্ত কাপড় তুলে নিবারণ ডাক্তারের সামনে এসে চিৎকার করে বললে—কি নিবারণ দা, বাড়ি যাবে না?

নিবারণ বুক পকেট থেকে ঘড়িটি বের করে বললে—ছ'টা বাজে, এখনই যাব?

—নইলে কি করবে। এখনো তোমার রোগী আসবে! মরে গেলেও এমন দিনে তোমার দোকানে কেউ আসবে না। আর দেরী করে না, বাড়ি যাও। বাড়ির কথা একবার ভাবো নিবারণ দা।

নিবারণ হাসে। বছর চল্লিশ হবে বয়স। দু' এক জায়গায় চুল পেকেছে। মাঝারি চেহারা। কালো রঙ। হাটু পর্যন্ত কাপড় পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনমালি বললে—আমি চলি নিবারণ দা, কাল আবার হাটবার। যা রাস্তা হয়েছে, কোনদিন খালের মধ্যে পড়ব। পা দুখানা আমার আর রইল না, আঙ্গুলের ভিতরগুলো খেয়ে গেছে। কাল ভাল দেখে একটু মলম দিও।

—আজই নাও না বনমালি, কালকের জন্য বসে থাকবে কেন। রাত্তিরটা বিশ্রাম পাবে।

—তবে তাই দাও। বনমালি ছাতা বন্ধ করে ভিতরের বেঞ্চিতে বসে।

নিবারণ ডাক্তার পুরানো জীর্ণ পর্দা ঠেলে ভিতরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কাগজের প্যাকেট বনমালির হাতে দিয়ে বললে—বাড়ি গিয়ে পায়ের আঙ্গুলের ভিতরে খুব ভাল করে মালিশ করে দেবে।

বনমালি উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে নিবারণ ডাক্তারের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—ধর।

নিবারণ আপত্তি করল। বনমালি শুনল না, টেবিলের ওপর পয়সা রেখে বেরিয়ে পড়ল।

নিবারণ সব কিছু বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়াল। চার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। সদর রাস্তা থেকে ছোট একটি সোজা পথ আছে, নতুবা অনেক জল ভাঙতে হবে। হ্যারিকেন ঝাঁকিয়ে একবার দেখল তেল আছে কি না। অবশ্য ব্যাগের মধ্যে টর্চ লাইটও আছে। দরজায় ভাল করে তালা দিয়ে দু' হাত দিয়ে টেনে দেখল। কাপড়টা আরও তুলে নিল। ব্যাগ আর হ্যারিকেন এক হাতে, অন্য হাতে ছাতা মাথায় দিয়ে নিবারণ বাড়ির দিকে রওনা হবার জন্য পা বাড়াবে এমন সময় শুনতে পেল—ডাক্তারবাবু!

নিবারণ চমকে উঠল। এই অন্ধকার বাদলা রাতে কে অমন করে ডেকে উঠল? নিবারণ ফিরে তাকাল।

দেখতে পেলো ছড়ানো চুল, কালো পেড়ে শাড়ি সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে। মানকচুপাতা মাথার ওপরে রয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। টিম টিম করছে হ্যারিকেনের আলো। এদিকে বাতাস জোরে বইতে সুরু করেছে। নিবারণ কোন রকমে ছাতা সামলে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, কে তুমি?

মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে নিবারণের চোখের দিকে তাকাল। অন্ধকারে সামান্য আলোয় দু'জনার ছায়া বিরাট আকার ধারণ করল। নিবারণ দেখতে পেল মেয়েটির কপালে সিঁদুরের চিহ্ন, বৃষ্টির জলে লেপটে আছে। চোখেমুখে বৃষ্টির জল টপ টপ করে পড়ছে। সব কিছু ভিজে চুপসে গেছে। নিবারণের বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। এই নিস্তব্ধ ঝড়ো হাওয়ার রাতে দূরে ব্যাঙ একটানা ডেকে চলেছে, চারদিক একটানা অন্ধকারের মাঝে এই মেয়েটি যেন হঠাৎ পিছন থেকে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি কোথায় থাকো?

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে আর দেরী করবেন না ডাক্তারবাবু, আপনি এখনই চলুন। ভগবান্, ছেলেটির না জানি কি হল।

নিবারণ এগিয়ে এলো। বললে তুমি কোথায় থাকো বললে না ত।

মেয়েটি বললে ওই ত পাশের গাঁয়ে। আমি নৌকা এনেছি গো, আর দেরি করো না।

মেয়েটি ছুটতে থাকে। নিবারণও পিছু পিছু চলতে থাকে। হাওয়ায় হ্যারিকেন নিবে যাবার মত অবস্থা। খাল পাড়ে এসে নিবারণ দেখতে পেল ছোট একটি নৌকো বাঁধা আছে। নিবারণ খুব সাবধানে পা ফেলে এগুতে থাকে।

—আর দেরী করো না গো। মেয়েটি চিৎকার করে বলে ওঠে।

নিবারণ দেখলে মেয়েটি কখন নৌকোর মুখে দাঁড়িয়েছে।

নৌকোর কাছে এসে নিবারণ বললে, মাঝি কোথায় ?

—মাঝি ! মেয়েটি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিবারণের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

—তুমি উঠে এসো।

নিবারণ উঠে পড়ে। মনে মনে রাম নাম জপতে থাকে।

নিবারণ দেখতে পেল মেয়েটি জলের মধ্যে লগি ফেলে শরীর বেঁকিয়ে নৌকো বাইতে স্থরু করলে। ছলাৎ ছলাৎ করতে করতে নৌকো এগিয়ে চলেছে। হ্যারিকেনের আলো নৌকোর চলার তালে তালে দুলছে এধার ওধার।

বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দ, নৌকো তর তর করে এগিয়ে চলেছে। নিবারণ বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলে সাতটা বেজে গেছে। কখন রাজপুরে ফিরবে ভগবান জানে। কেমন করে ফিরবে তাও বুঝতে পারল না। মেয়েটির কথাবার্তা চালচলন কেমন অদ্ভুত ধরনের। নিজেই নৌকো করে এসেছে, নিজেই এই অন্ধকার রাতে আপন মনে বেয়ে চলেছে। মেয়েটির বয়সও অল্প, বছর সাতাশ হবে। মজবুত শরীর। মেয়েটির ভয় বলে কিছু নেই। ওর স্বামী কি করে, কেনই বা একা এসেছে কিছুই বুঝতে পারল না নিবারণ। ছেলেটির কি অসুখ তাও ভাল করে জানতে পারেনি নিবারণ।

নিবারণ ভিতর থেকে বের হয়ে এলো। চারদিক কালো নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। গাছপালা সব কিছু যেন যেন কালো কালি দিয়ে লেপে দিয়েছে। ঝিঝি পোকার শব্দ, দূরে কুকুরের আর্তনাদ। এই বাদলা রাতে কোন নৌকো দেখতে পেল না নিবারণ। শুধু এই নৌকাটি তর তর করে চলেছে। মেয়েটির শরীরেও যেন কোন ক্লান্তি নেই, একনাগাড়ে লগি বেয়ে চলেছে, একটু বিশ্রামও করেনি।

নিবারণ ভয়ে ভয়ে বললে—তোমার স্বামী কি করে ?

—কি বললে ? মেয়েটি মুখটি বেঁকিয়ে বললে।—আমার স্বামীর খবরে তোমার কি দরকার ? রোগী দেখতে চলেছ, পরের হাঁড়ির খবরে কি দরকার ?

মেয়েটি বেশ মুখরা। সর্বাঙ্গে বৃষ্টির জল পড়ছে।

নিবারণ ব্যস্ত হয়ে বললে—হ্যাঁগো, তোমার নাও কি থামবে না ?

—কি হলো আবার ?

—কোথায় থামবে বলত ?

—ভয় পেয়েছ বুঝি? এই রাতে একটি মেয়েছেলের সঙ্গে নৌকোয় থাকতে তোমার ভয় করছে?

নিবারণ চমকে ওঠে। এর ছেলের অসুখ কথাবার্তা থেকে বুঝবার উপায় নেই। মেয়েটি আবার রসের কথাও বলছে।

মেয়েটি নিবারণের দিকে এগিয়ে এসে বললে, লগিটি ধরত কাপড় ছেড়ে আসি। সকাল থেকে বৃষ্টি, কাপড় ছাড়বার সময় পেয়েছি? শালার বেটা দিনরাত টাকার চিন্তা করে মাগ, ছেলের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? নইলে আমার এ দশা হয়। কোনদিন আমি বাড়ির বের হইনি। বসে, মেয়েটি উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

নিবারণ সান্ত্বনার স্বরে বললে, অমন করছ কেন? তোমার ছেলেকে যেমন করে হক বাঁচাতে হবে ত। আমারও ছেলে আছে।

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বিদ্যুত চমকাচ্ছে। মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বললে—আজ সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি।

—সেকি, সারাদিন তুমি কিছু খাও নি?

মেয়েটি হাসল। লগিটা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

—ও আমার সওয়া আছে। গাঁয়ের মেয়ে ত, মরদ কোথায় থাকে, ছেলেমেয়ের খোঁজ নেয় না। এই দেখ না, সকাল থেকে বৃষ্টির মধ্যে পাট জাকতে গেছি, পরের বাড়িতে কাজ করি। আমার মরদ সেই যে সকাল বেলা বের হয়েছে আর ফিরবার নাম নেই। বেটা কি করে তাও বলে না। জিজ্ঞেস করলে শুধু বলে তোদের কথা ভাবলে চলবে না।

নিবারণ মনে মনে হাসল। মেয়েটি বেশ সাজিয়ে কথা বলতে পারে।

নিবারণ বললে—তোমার সঙ্গে মানুষটির কিন্তু ঝগড়া লেগেই আছে।

—কেন চুপ করে থাকবো? কামিনী মাগী বসে বসে গিলছে না, রীতিমত গতর খাটে।

নিবারণ জানল মেয়েটির নাম কামিনী।

নিবারণ বললে—দেখ মেয়ে, আজ সারাদিন তুমি খাও নি, এর মধ্যে এত পথ নৌকো বেয়ে এসেছ, শেষকালে তোমার চিকিৎসা না করতে হয়।

—ওই ত এসে গেছি। আমার কোনদিন অসুখ হয় নি। ছেলেটার জন্য বড় ভয়। ঠিক বাপের মত হয়েছে।

—ছেলের বয়স কত?

কত হবে, বছর দশেক। কারো কথা শুনতে চায় না। আমার সঙ্গে

বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে পাট ছাড়িয়েছে। বিকেলের দিকে জ্বর এলো, গাঁয়ে ত কোন ডাক্তার নেই। আমার মরদ আবার তোমার কথা বলে। তাই ভাবলাম তোমার দেখা পেলে ছেলেটিকে দেখাতাম। তা ভাগ্যি ভাল দেখা পেলাম।

নিবারণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—তোমার স্বামী আমাকে চেনে?

—চিনবে না কেন। এ তল্লাটে তোমাকে সবাই চেনে।

নিবারণ মনে মনে গর্বিত হল, সারা গাঁয়ে তার নাম ডাক আছে শুনে। প্রথম দিকে মেয়েটির প্রতি বিরক্ত হয়েছিল, এখন তার প্রতি করুণা হল, মায়া হল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে দেখতে হবে।

—সে তোমার দয়া।

নিবারণ বললে—ও কথা বলছ কেন। সকলকে সমান ভাবে দেখতে হবে। ডাক্তারের কাছে রোগীর কোন জাত নেই। আমি নিজেও গরীব। বড় কষ্টে আমার সংসার চলে। সেই ভোর বেলায় ঝড় জলের মধ্যে বের হয়েছি, এখনো বাড়ি যাই নি। আমি ইচ্ছে করলে না বলতে পারতুম তোমাকে। কিন্তু আমার ধর্ম তা নয়। আমি তোমাদের মত মানুষ।

মেয়েটি নিবারণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কথাবার্তার মধ্যে মনে হল কতদিনের পরিচিত ওরা। কামিনী শান্ত কণ্ঠে বললে—তোমার কথাগুলি খুব ভাল লাগল। ওকে যত গাল মন্দ করি, কিন্তু ও মানুষের, গাঁয়ের চাষাদের জন্য নিজের সুখ গ্রাহ্যি করল না। সবাইকে বলে তোরা মুখ বুজে চুপ করে বসে বসে মার খাবি না। তোদের হাতে সব কিছু। আমি ত অত বুঝি না। ক'দিন ধরেই ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

—কেন?

—শুনছি নাকি জমিদারের লেঠেলরা ওকে মারবে। চাষীদের খেপাচ্ছে বলে। এদিকে থানা থেকে পুলিশও এসেছিল ওকে ধরবার জন্য। ওর হয়েছে মরণ।

নিবারণ স্তব্ধ হয়ে শোনে কামিনীর কথা। কে এই মানুষটি যে নিজের কথা, স্ত্রী পুত্রের কথা একবারও ভাবে না? চারদিকে শত্রু ঘুরে বেড়াচ্ছে ওকে ঘায়েল করবার জন্য!

নিবারণ বললে—আজ রাতে তোমার স্বামী আসবে না?

—রাতের বেলায় কোনদিন আসে না। অন্য গাঁয়ে থাকে, ওই এসে গেল। তুমি দাঁড়াও, আমি নৌকো বেঁধে নি।

ছোট নৌকোটি ধীরে ধীরে ছোট খালের মুখে ঢুকতে আরম্ভ করে। পাড়ের কাছে আসতেই এক লাফে মাটিতে গিয়ে কামিনী নৌকোর দড়ি টেনে একদম ধারে এনে আমগাছের শিকড়ের মধ্যে বেঁধে ফেললে।

—এসো গো।

নিবারণ সাবধানে নৌকো থেকে নামল।

ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে সরু এক ফালি রাস্তা চলে গেছে। গাছের পাতায় পাতায় জলের শব্দ, দু একটা পাখীর চিৎকার। কামিনী হ্যারিকেন নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। নিবারণ তার পিছু পিছু। কিছুদূর যেতেই ছোট পুরানো বাড়ি থেকে সরু আলোর রেখা চোখে পড়ল।

কামিনী ঘাড় ফিরিয়ে বললে—আস্থন ডাক্তারবাবু।

ভাঙ্গা দরজাটা ক্যাচ করে খুলে কামিনী ভিতরে ঢুকল।

নিবারণ ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেল মাটির মধ্যে ময়লা বিছানার মাঝে দশ বছরের ছেলেটি যন্ত্রণায় ছটফট করছে। দূরে স্তিমিত প্রদীপের আলো ঘরখানাকে রহস্যময় করে তুলেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হল এখন গভীর রাত। নিবারণ ছেলেটির পাশে বসে হাত পা মাথা সবকিছু দেখতে লাগল। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। কামিনী পাশে বসে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে—কেমন দেখলেন ?

নিবারণ গম্ভীর হয়ে বললে, জ্বর আছে। ভয়ের কিছু নেই, জলে ভেজার জন্য হয়েছে। আমি ওযুধ দিচ্ছি দুদিনের জন্য।

—তাই দাও।

নিবারণ ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করে বাইরে রাখল। কাগজের মধ্যে কয়েকটা টেবলেট রেখে কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললে—এই বড়িটা এখনই জল দিয়ে খাইয়ে দাও।

নিবারণ সব কিছু পরীক্ষা করে বললে—আজ রাতটা সাবধানে রেখো।

কামিনী ছেলেটির মাথা উঁচু করে বললে—বাবারে বড়িটা খেয়ে ফেল।

ছেলেটির গলায় জল ঢেলে দিল, বড়িটা গলার মধ্যে ছেড়ে দিল কামিনী।

নিবারণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—আমি চলি। কোন ভয় নেই।

কামিনী কাপড়ের আঁচল থেকে একটি টাকা বের করে নিবারণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এই নাও।

নিবারণ বললে—তুমি রেখে দাও। তোমার ছেলে ভাল হ'ক, তারপর দিও।

—কিন্তু তুমি এত পথ এলে।

—এটাই আমার কাজ।

নিবারণ দরজা ঠেলে বাইরে যাবে হঠাৎ দেখতে পেল অন্ধকারের মাঝে জ্বলন্ত দু'টি চোখ। নিবারণ পিছিয়ে গেল, চিৎকার করে বলে উঠল—কে?

ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, বড় বড় দাড়ি। কালো কুচকুচে রঙ। ভেজা গেঞ্জি, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়। তীব্র দৃষ্টিতে নিবারণের দিকে তাকিয়ে বললে—কি ডাক্তার, আমাকে চিনতে পারলে না?

গলার কণ্ঠস্বর শুনে নিবারণ চমকে ওঠে।

—তুমি ক্ষুদিরাম মণ্ডল?

—তাহলে চিনতে পেরেছ! হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম বললে।

নিবারণ বললে—এটা তোমার ঘর? তোমার ছেলে যে জ্বরে বেহুঁস।

ক্ষুদিরাম বললে—আমি জানি। কিন্তু উপায় নেই। দিনের বেলায় আমি পালিয়ে থাকি, রাত না হলে আসতে পারি না। হয়ত শালার লেঠেল পিছু নিয়েছে। ছেলে কেমন আছে বল।

—ভয়ের কারণ নেই।

কামিনী আড়ালে দাঁড়িয়েছিল।

ক্ষুদিরাম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তোমাদের গ্রাম থেকে এলাম। ওখানে সকাল থেকে গোলমাল হচ্ছে। জমিদারের লেঠেলরা আমাদের লোকের গায়ে হাত দিয়েছে। আমরাও বদলা নিয়েছি। এদিকে পুলিশ এসেছে, ক'জনকে ধরেছে। এমন করে আর কতদিন চলবে বলতে পার?

ক্ষুদিরাম বলতে থাকে—তুমি আমার ঘরে এসেছ, এই ঝড় বৃষ্টির রাত্রে। তোমার কোন কাজে লাগতে পারি নি।

—ওসব কথা বলোনা ক্ষুদিরাম। তুমি অনেক বড়, সবাই তোমাকে চেনে ভয় করে।

—না না ডাক্তার, সে কথা বলছি না! আমি বলছি আমার ছেলেকে তুমি দেখতে এসেছ, কিন্তু তোমার ছেলের কথা একবার ভেবেছ?

নিবারণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

—কেন কি হয়েছে?

ক্ষুদিরাম বললে—সকাল থেকেই তোমাদের গ্রামে বসে আছি। একটানা বৃষ্টি। লেঠেলরা জোর করে বাঁধ ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছে। আমাদের লোকও বাধা দিচ্ছে। আমাদের দু'জন লোক জখম হল। সারাদিন এমনি চলল। এর মধ্যে খবর এলো তোমার ছেলেকে···।

নিবারণ চিৎকার করে উঠল, বল কি হয়েছে আমার ছেলের ?

হ্যারিকেন হাত থেকে পড়ে যায়। দু'হাত দিয়ে ক্ষুদিরামের হাত ধরে নিবারণ চিৎকার করে উঠে—বল তার কি হয়েছে ?

কামিনী হঠাৎ কেঁদে ওঠে।

ক্ষুদিরাম কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললে—ভিতরে যা। ছেলেটার পাশে বস।

ক্ষুদিরাম বললে—বুঝলে ডাক্তার, তোমার ছেলেকে এইমাত্র আমরা ক'জন মিলে হাসপাতালে পৌছে দিলাম।

নিবারণের সমস্ত শরীর কাঁপছে। ক্ষুদিরাম একটি হাত ধরে বললে—তুমি পুরুষ মানুষ। ভাঙলে চলবে না। তোমার ছেলেকে সাপে কামড়েছে।

—ভগবান।

—মানুষকে বিশ্বাস কর। এই রাতে নৌকো করে হাসপাতালে পৌছে দিয়ে এসেছি। আমার লোক বসে আছে। বাঁচবে, গাঁয়ের সাপ, কত বিষ হবে।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে শব্দ শুনতে পেল। ক্ষুদিরাম সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। নিবারণের হাত ধরে বললে আর অপেক্ষা করা চলবে না। আমার পিছু নিয়েছে। ওই যে আলো দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তার এখনই চল, তোমাকে দেখতে পেলে ওরা মেরে ফেলবে।

—কিন্তু তোমার ছেলে বউ ?

—ক্ষুদিরামের বউকে দিনের বেলায় দেখনি। এখনই চলে এসো।

নিবারণ দু'হাত ধরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে থাকে।

নিবারণ অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আমার ছেলে বাঁচবে ক্ষুদিরাম ?

—বলতে পারব না।

দু'জনে খালের ধারে এসে দাঁড়াল। নৌকোর মধ্যে এক লাফে উঠে পড়ে দু'জনে। ক্ষুদিরাম জোরে নৌকো চালাতে থাকে।

—শালারা পিছু নিয়েছে।

অনেক দূর থেকে আলোর রেখা দেখা যায়।

—আলো নিবিয়ে দাও। অন্ধকার ছেয়ে গেল।

নৌকো তরতর করে বেয়ে চলেছে।

ক্ষুদিরাম চিৎকার করে বলে ওঠে···ডাক্তার, আজ বুঝি তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। নৌকো এখন হোগলা বনের মধ্যে না ঢুকালে পালাবার পথ পাব না।

ক্ষুদিরাম এক লগির ঠেলায় নৌকো ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দু'জনে

চুপ করে বসে রইল। খস্ খস শব্দ, নৌকার লগির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্ষুদিরাম এক লাফে জলের মধ্যে নেমে নৌকো আরো ভিতরে ঢোকাতে লাগল। একে-বারে জলের ধারে এনে নৌকার ওপর বসে রইল।

এর মধ্যে দুতিন খানা নৌকো এসে পড়েছে। নানা রকম চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। নিবারণ ভুলে গেল ছেলের কথা। কেমন করে ক্ষুদিরামকে বাঁচানো যায়। এই শত্রুদের হাত থেকে ক্ষুদিরামকে বাঁচাতে হবে।

নিবারণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ক্ষুদিরামের দিকে তাকিয়ে বললে, ওরা এই দিকে আসছে। আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

—কিন্তু আমি যে নিরস্ত্র।

নৌকো ঝোপের মধ্যে এগিয়ে আসছে।

নিবারণ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, খবরদার এইদিকে এগুলে মরবে।

ওদিক থেকে চিৎকার শুনা গেল, তুমি শালা কে ?

নিবারণ চিৎকার করে বললে আমি নিবারণ ডাক্তার।

—মার শালাকে।

মুহূর্তের মধ্যে গুলির শব্দ শুনতে পেল।

আর একপা এগুবে না। নিবারণের হাতে পিস্তল। নিবারণ মরে যায়নি। স্বদেশী আমলে তার দুহাত দিয়ে পিস্তলের গুলি বের হয়েছে।

ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চারিদিক অন্ধকার।

নিবারণ আর একবার গুলি চালাল। একটা চিৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত করে উঠল।

নিবারণ বললে, ক্ষুদিরাম, আর ভয় নেই।

নৌকো এগিয়ে চলল। নিবারণ হঠাৎ কেঁদে উঠল। ক্ষুদিরাম আপন মনে নৌকো বেয়ে চলেছে।

—এখন কোথায় যাব ক্ষুদিরাম ?

—শশ্মানে। ওখানে আমার লোক অপেক্ষা করছে।

—ক্ষুদিরাম, এ তুমি কি বললে ?

—ডাক্তার, তুমি অনেক করেছ এ দেশের জন্য। আজ তোমাকে কেউ চেনে না, কেউ স্বীকার করে না। আমি তোমাকে চিনি।

নৌকো ঘন অন্ধকারের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বরণীয় সাহিত্যিকের স্মরণীয় জীবনী

যজ্ঞেশ্বর রায়

দস্তয়েফ্‌স্কি

....

উনত্রিশ

য়ুরোপ বেড়িয়ে এসে দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর সে অভিজ্ঞতার বিবরণ লেখেন জামনিত্র জামেৎকিও লেৎনিখ ভ্‌পেচাৎলেনিত্রখ্‌-এ (১৮৬৩), যার অর্থ শীতের দিনে বসে গ্রীষ্মের স্মৃতিচারণ।

পুস্তকখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "য়ুরোপ বেড়ানোর বাসনা আমার বহু দিনকার। বলতে গেলে এ বাসনা আমার বালক বয়স থেকেই। য়ুরোপের অ-লৌকিক পবিত্র ভূমি আমাকে সব সময় টানত।...এক কথায় বায়ু বদল, নতুন কিছু দেখা, বিরাট কিছু একটা সামগ্রিক ধারণা অর্জন ইত্যাদির ঝোঁক আমার চিরকালের..."

শুধু এ জন্যেই য়ুরোপ তাঁকে টানত কী? দস্তয়েফ্‌স্কি য়ুরোপ-বেড়াতে বেরোবার অল্প ক'দিন আগে তুর্গেনিএফ য়ুরোপ থেকে ফিরেছেন। এসেই শুনলেন দস্তয়েফ্‌স্কিও যাচ্ছেন য়ুরোপ-বেড়াতে। কিছু উপদেশ বিতরণের লোভ সামলাতে পারলেন না তিনি ; একটি বিশিষ্ট হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন দস্তয়েফ্‌স্কিকে। সে আসরে আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। দস্তয়েফ্‌স্কি নানা কারণে তুর্গেনিএফকে সহ্য করতে পারতেন না, তুর্গেনিএফ-এর য়ুরোপ-প্রীতি তার অন্যতম। য়ুরোপ-প্রসঙ্গ উঠলে খাওয়ার টেবিলেই তুর্গেনিএফের য়ুরোপ-প্রীতিকে আক্রমণ করলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, বললেন, "আমি বিশ্বাস করি না য়ুরোপের কাছ থেকে রাশিয়ার কিছু ধার করার আছে। আমি বিশ্বাস করি একদিন রাশিয়াই য়ুরোপকে, উঁহু, তামাম দুনিয়াকেই নতুন কিছু দেবে।"

এ বিশ্বাস তিনি ভ্রেমিয়ায় লেখা তাঁর প্রবন্ধেও প্রকাশ করেছেন। পরম প্রত্যয়ের কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন—"সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে রুশ জাতি এক অনন্য ঘটনা।...য়ুরোপের আধুনিক সব জাতি থেকে তার চরিত্র আলাদা,

উভয়ের মধ্যে এত বৈষম্য যে, কেউ কাউকে জানতে বুঝতে পারছে না···যুরোপের কাছে রাশিয়ার কিছু শেখার নেই বরং রাশিয়াই আনবে যুরোপের সামনে নতুন দিকদর্শন জীবনের নতুন অঙ্গীকার।" এমন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার পরেও দস্তয়েফ্‌স্কির মনে কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল—'যা বলছি তা ঠিকত? ঠিক কিনা যাচাই করা হল না ত।' এই সন্দেহ তাঁকে বড় উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছিল; কিন্তু শুধু উদ্‌বেগের কি সাধ্য কাওকে দূর বিদেশে ঠেলে পাঠায়। রেস্ত চাই। সেই রেস্তই হঠাৎ তখন হাতে এসে গেল তাঁর। 'মৃত্যু পুরীর স্মৃতি'-র রয়েলটি বাবদ প্রায় চার হাজার রুবল এক সঙ্গে পেয়ে গেলেন তিনি।

পলিনা ভেবেছিল দস্তয়েফ্‌স্কি তাকে তাঁর বিদেশ-ঘোরার সাথী করে নেবে। স্ত্রী ভেবেছিলেন ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন স্বামী কিংবা বহুদিন দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগার পরে এবার স্বামী সচ্ছলতার মুখ দেখলেন তাঁর হাতেও একটা মোটা অংশ আসবে তার। রুগ্ন মানুষের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু পরম স্বার্থপরের মতন দস্তয়েফ্‌স্কি সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যুরোপের দিকে পা বাড়ালেন ১৮৫১-র জুন মাসে।

কেউ কেউ বলেন দেশ দেখা-টেকা কিছু না, আসলে এক সঙ্গে একগাদা টাকা পেয়ে তাঁর মাথায় জুয়ার নেশা চেপেছিল, জুয়ার নেশা তাঁর সেই কলেজ-জীবন থেকে; কিন্তু সাধ মিটিয়ে জুয়া খেলার সাধ্য ছিল না এতকাল, এবার চুটিয়ে সে সাধ মিটিয়ে নেবেন বলে টাকার বাণ্ডিল পকেটে পুরে তক্ষুনি পালালেন, পাছে কেউ হাত পাতে বাগড়া দেয়, টাকা নিয়ে কারো সামনেই এসে দাঁড়ালেন না। যে দাদা নিজের সর্বস্ব পণ করে কাগজটা দাঁড় করালেন, প্রচার সংখ্যা তুললেন সাড়ে চার হাজারের ওপর, তাঁর কাছেও চেপে গেলেন মতলবটা, একটা কোপেনও সাহায্য দিলেন না তাঁকে। তিনি রাশিয়া থেকে জর্মনীর রাজধানী অব্দি পাতা নতুন রেলে চেপে চলে এলেন ভিজবাডেন। একটা হোটেলে বিছানা সুটকেস রেখে আর দেরি করলেন না, এসে বসলেন রুলেট টেবিলে।

জুয়া সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বলেছেন—জুয়াড়ী হওয়ার জন্যে যে-সব গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে আসল হল ধৈর্য, বিচার-বুদ্ধি, সাহস আর অভ্যাস, সবার ওপরে মনের জোর। অথচ এসব কোনটাই ছিল না তাঁর। অস্থির অব্যবস্থিত মানুষটা যৎপরোনাস্তি অমনোযোগী ও অধৈর্য ছিলেন—দু' একবার বাদে তাই তিনি বারবার হেরেছেন, প্রতিবার মোটা মোটা টাকা

খুইয়েছেন। তবু জুয়ার টেবিল তাঁকে ক্রমাগত টেনেছে, সে-দুর্নিবার টান তিনি সহজে এড়াতে পারেননি।

তাঁর প্রথম হারের কথা আমরা শুনি মিখাইলের লেখা চিঠিতে। দস্তয়েফ্স্কির চিঠির জবাবে মিখাইল লিখেছিলেন, "ঈশ্বরের দিব্যি ফিওদর, তুমি আর জুয়া খেলো না। জুয়ার টেবিলে ভাগ্যের সঙ্গে লড়ব আমরা, সাধারণ মানুষ, তুমি কেন? তুমি প্রতিভাবান। তুমি প্রতিভা দিয়ে যা রোজগার করতে পারবে না, জেনো, তা জুয়ার টেবিলে ভাগ্য তোমাকে কখনো দেবে না। ভিজবাডেনে তুমি অনেক টাকা খুইয়েছ জেনে মর্মাহত হলাম।"

মিখাইলের দুঃখ স্বাভাবিক। অবশ্য দস্তয়েফ্স্কি তাঁকে ভরসা দিতে কসুর করেননি, "ভয় কী, ভ্রেমিয়ার সারকুলেশন চার হাজার দু'শ। আরও বাড়বে। আমাদের অবস্থা সচ্ছল হবে।" কিন্তু কী করে হবে? মিখাইলের চিন্তা। এখনও অনেক ঋণ বাজারে। পত্রিকা যদি এখনকার মতন আরও দু' বছর চলে তখন আশা করা যায় ধারকর্জ শোধ হয়ে হাতে কিছু জমবে। তার জন্যে পত্রিকার পেছনে টাকা খাটাতে হবে না? গরু কী অমনি দুধ দেবে, খাবে না?

দরিদ্র ঋণ-গ্রস্ত মানুষটির টাকার প্রয়োজন সব সময়, তার ওপরে ছিল রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্ন। সেই টাকার ধান্দা, ধনী হওয়ার স্বপ্ন, আর জুয়ার নেশা জোট বেঁধে তাঁকে অন্ধ করে দেবে, স্বাভাবিক। তা ছাড়া তখন পলিনাও কী একটা সমস্যা হয়ে ওঠেনি। অসম সেই ভালবাসার মোহ কাটাতে জুয়ার নেশায় ডুব দিলে দুর্বল স্নায়ুর মানুষটিকে দুষব কী? দস্তয়েফ্স্কির আবার আর এক মহৎ দোষ ছিল, অতীত ভবিষ্যৎকে আদৌ তিনি আমল দিতেন না। অতীত নিয়ে ভাবা কি ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করা তাঁর ধাতে সইতনা। তাঁর কাছে বর্তমানই ছিল সব। বর্তমানের সুখ এবং দুঃখটাকে এমন আঁকড়ে থাকতেন যে, নিকট ভবিষ্যৎও তুচ্ছ হয়ে যেত তাঁর কাছে। সেই তাঁর পরম বাস্তব যখন ভিজবাডেনের রুলেট-টেবিলে আচ্ছা চাটি দিল তাঁকে তিনি তক্ষুনি সেখান থেকে পালালেন।

নানা জায়গা ঘুরে এলেন লণ্ডন। সেখানে নির্বাসিত রুশ বিপ্লবী হেরজেনের সঙ্গে দেখা করলেন। আটদিন লণ্ডনে থেকে এলেন পারী। পারী থেকে ডুশেলডর্ফ হয়ে রাইন পেরিয়ে এলেন জেনিভায়। এখানে দেখা হয়ে গেল স্ত্রাখফের সঙ্গে। দু' বন্ধুতে মণ্ট সেনিস হয়ে ইতালি এলেন, তুরিন জেনোআ ফ্লোরেনস দেখলেন। তারপর বন্ধু পড়ে রইল পেছনে, দস্তয়েফ্স্কি আগসটের

শেষে একাই স্বদেশে ফিরে এলেন। বেশ হতাশা নিয়েই ফিরলেন। য়ুরোপ সম্পর্কে তাঁর মনে একটা স্বপ্ন ছিল, তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। কেবল স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণাতেই ভুগলেন তিনি।

আবেগপ্রবণ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখকের চোখ য়ুরোপের ঐশ্বর্যে ধাঁধিয়ে যাওয়ার কথা। যেমনটি ঘটেছিল তুর্গেনিএফের বেলা। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির বেলা য়ুরোপের সে চালাকি খাটল না। বাইরের জৌলুস আর পালিশ দেখিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কিকে ভোলাতে পারল না য়ুরোপ।

স্ত্রাখফের কাছে দস্তয়েফ্‌স্কির মন্তব্য: পারী শহরটা বড্ড বোরিং, এক-ঘেয়ে; জেনিভা বিবর্ণ মনমরা। তুরিনটা প্রায় পেতের্সবুর্গের মতন। ফ্লোরেনস সম্পর্কে তিনি অবশ্য কিছু মন্তব্য করেননি। করবেনই বা কী, তিনি কী সেখানে দেখেছেন নাকি কিছু। ভিকতরয়ুগোর 'লে মিজারেবল' সবে বেরিয়েছে তখন। ফ্লোরেনসে বইটা তাঁর হাতে পড়তে তিনি আর কোন দিকে তাকালেন না। ফ্লোরেনসে তিনি যতদিন ছিলেন, হোটেলে বসে সে সাত দিনে বিশ্বসংসার ভুলে চার খণ্ডের ঢাওস বইটা গোগ্রাসে গিললেন।

একদিন স্ত্রাখফ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত শিল্প-সংগ্রহ শালা য়ুফিজী গ্যালারিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দস্তয়েফ্‌স্কি ক্লান্ত হয়ে হাই তুলতে থাকলেন। বিশ্ববিশ্রুত নানা ভাস্কর্য ও চিত্র-কৃতিত্ব আদৌ তাঁর মন টানতে পারল না। আসলে বস্তুর বাহ্য-দৃশ্য চিত্রকল্পতা কোন দিনই দস্তয়েফ্‌স্কিকে মনোযোগী করতে পারে নি। তিনি মানুষের অন্তর্গত জীবন ও তার রহস্য নিয়ে এত বেশী চিন্তিত মগ্ন থাকতেন বলেই আর সব কিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত।

এই তাচ্ছিল্যের ভাব তাঁর '…গ্রীষ্মের স্মৃতি'-তে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেছেন। বুঝি যার কাছে মানুষ সব থেকে বেশী আশা করে তার কাছে কিছুই না পেলে সে বড় বেশী রুষ্ট অসন্তুষ্ট হয়। সে অসন্তোষের স্বরই গুমরে উঠেছে তাঁর ওই দুই দেশের সমালোচনায়।

লণ্ডনে তিনি দেখেছেন একদিকে সুবেশ সচ্ছল বিলাসী ধনী আর আত্ম-সুখী সন্তুষ্ট পাদ্রীর দল আর অন্য দিকে ছিন্নবাস শীতার্ত নিরন্ন মানুষ। ধন-বৈষম্যের এই দৃশ্য—রাজপ্রাসাদের পাশাপাশি নোংরা বস্তি দস্তয়েফ্‌স্কির মন বিষণ্ণ করে দিয়েছিল। হেমার্কেট এলাকার নরক সেই বিষণ্ণ মনকে এমন বিষিয়ে দিয়েছিল যে, সে দেশের ভাল কিছুই আর তাঁর মনে ধরল না, দৃষ্টি

আকর্ষণ করল না। তিনি য়ুরোপ বেড়াতে এসেছিলেন সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার চেহারা দেখার মন নিয়ে—তারা কী খায়, কেমন করে বাঁচে, সে দেশের সরকার কেমন, তাদের দেশ শাসনের লক্ষ্য কী। এ সব দেখার জন্যে যতখানি ধৈর্য্য ও সময় দরকার, স্বীকার করতে হবে, দস্তয়েফ্‌স্কির তা ছিল না; কিন্তু যে টুকুই তিনি দেখলেন জানলেন তাতেই তাঁর চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

পারী সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা লণ্ডন থেকে আরও তীব্র। বলেছেন, ফরাসীরা যেন মুনাফাখোর দোকানদার। ফ্রান্সকে এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কারণ বুঝি ফরাসী-বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর সুগভীর বিশ্বাস। তিনি আশা করে-ছিলেন, দেখবেন, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে মহানবাণী তুলে ধরে ছিল ফরাসী-বিপ্লব প্রত্যেক ফরাসীর চোখে তা নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। কিন্তু তিনি দেখলেন তার চিহ্ন মাত্র নেই কারো চোখে। বরং বুরজোআ জনতার বে-আবরু অর্থগৃধ্নু তাই চোখে পড়ল, চোখে জ্বলছে তাদের। "এ জাতটা একটা অদ্ভুত জীব", বলে তিনি সোজাসুজি আক্রমণ করেছেন তাদের, "এমন দাস-বৃত্তি আর কোথাও দেখিনি আমি", তিনি লিখেছেন, "অর্থই যে মানুষের পরমার্থ হতে পারে এখানে না এলে আমি জানতামনা। অথচ এক একটি মানুষ যেন বিষয়ের অবতার—নিজের কোলে ঝোল টানতেও বিনয়, চুরি করতে, খুন করতেও বিনয়। ঠোঁটে বিনয়ের মধুর একচিলতে হাসি ঝুলিয়ে রেখে এরা অনায়াসে বাপকেও বাজারে বিক্রি করে দিতে পারে।"

তিনি অবাক হয়ে গেছেন এই মানুষগুলির ভয় ভীতি দেখে, যেন সর্বদাই কী এক শঙ্কায় এরা সন্ত্রস্ত, তিনি ভেবে পাননি, কিসের এত আশংকা এদের মনে। "যাদের তারা বঞ্চিত করে রেখেছে তারা রুখে উঠবে এই কী ভয়?" কিন্তু সেই বঞ্চিত প্রতারিত শ্রমিক কুলকেও লক্ষ্য করে দেখেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি, তারাও টাকার জন্যে হন্যে হয়ে আছে, যেমন করেই হোক সঞ্চয় করতে হবে, সচ্ছল হতে হবে সেই যেন সবাইর পণ। তবে? এমন জাতের মানুষ-দের থেকে বুরজোআদের এত ভয় কেন? তবে কী সমাজতন্ত্রকে ভয় করছে, এঁরা হয়ত তাই। দস্তয়েফ্‌স্কি চিন্তা করেছেন, ওঁরা সমাজতন্ত্রকে যে ভাবে আক্রমণ করে কথা বলে তাতে সেই সাংঘাতিক ভীতিটাই প্রমাণ হয় বৈ কি!

কিন্তু য়ুরোপের সমাজতন্ত্রও যে বুরজোআ তন্ত্রের থেকে ভাল কিছু নয় এটাও ততক্ষণে জেনে গেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। স্বাধীনতা অর্থে ফরাসীরা বোঝে আইন বাঁচিয়ে যৎপরোনাস্তি স্বার্থসিদ্ধির অধিকার। আর স্বার্থসিদ্ধির সে

অধিকার কেবল টাকার জোরেই সম্ভব জেনে সঞ্চয়কেই তারা সার করেছে জীবনে। সাম্যও সেই রকম: আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকুই তারা সাম্যবাদী। অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই তাদের। তাদের ধারণা হৃদয় নয় আইনই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্ষক। এই সামাজিক স্বার্থপর প্রকৃতি দেশের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ বিলিয়ে দিতে বাধা দেয়। এবং পশ্চিমী সমাজতন্ত্রের সমস্যাই হল সেখানে; যে প্রেরণা আসা উচিত হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তা আসে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক হয়ে। সত্যিকারের সৌভ্রাতৃত্ব সর্বস্ব ত্যাগের জন্যে হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়। তলোয়ার হাতে যে জাতি মানুষের কাছ থেকে সে সৌভ্রাতৃত্ব আদায় করতে চায়, সে কিছুতেই হৃদয় জয় করতে পারে না। যেখানে হৃদয় নেই সেখানে সৌভ্রাতৃত্ব একটা মুখের কথা, শ্লোগান—একটা মুখোশ মাত্র; একটা নীরস আচার যার পেছনে একটা হীন স্বার্থের ষড়যন্ত্র সবসময় থাবা উঁচিয়ে থাকে। এমন দেশে সাম্যবাদ কখনো মাটিতে শেকড় ছড়াতে পারে না, বুরজোআ শ্রেণী-বৈষম্য সব ব্যাপারে সফরদারী করে সব সময়।

য়ুরোপের এই পাপচক্রের দিকে তাকিয়ে নিজের দেশ সম্পর্কে চিন্তিত না হয়ে পারেননি তিনি, কেননা তখন রাশিয়াতেও ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। দাস প্রথা থেকে সদ্য মুক্ত কৃষকরা স্বরাজ পেয়ে সামাজিক মর্যাদার লোভে অর্থলিপ্সায় ভুগছে তখন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কোন জাতির পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ নয়। পশ্চিমী দেশগুলিতে যার জন্যে সর্বনাশ অন্ধকার করে আসছে, তাঁর দেশেও কী তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? প্রোলেতারিয়েৎরা এখনও রাশিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেনি, উঠলে তখন সে কী বুরজোআ-বিরোধী পাপচক্রে পরিণত হবে?

দস্তয়েফ্‌স্কি এই জিজ্ঞাসার যন্ত্রণা নিয়ে য়ুরোপ ঘুরে দেশে আসেন। সুতরাং বলতেই হবে সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর এ ভ্রমণ হাওয়া বদল মাত্র হয়নি কিছু চিন্তা-সমৃদ্ধও হয়েছে। সেই সমৃদ্ধির ফলই ফলেছে তাঁর পরবর্তী কালের মহান উপন্যাসগুলিতে। সে প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসব।

এখনকার কথা এখন বলি। পেতের্সবুর্গে ফিরে এসে তিনি '...গ্রীষ্মের স্মৃতি শেষ করে একটা দীর্ঘ গল্প লিখলেন। ভ্রেমিয়ার প্রবন্ধ ছাড়াও ফাঁকে ফাঁকে চলল গল্প উপন্যাস লেখার কাজ। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি কোন দিনই নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে লিখতে পারেননি, এখনও একাধিক দুশ্চিন্তা তাঁকে ব্যস্ত করে তুলল

পারিবারিক শান্তি তাঁর কোন দিনই ছিলনা, এখন তা আরও নিদারুণ হয়ে উঠেছে। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন মারিআ, বিষ ঢেলে দিচ্ছেন কথায় কথায়ঃ তাঁর অভিযোগ, "আমি কবে মরব, কবে তুমি আমার দায় থেকে রেহাই পাবে খালি সেই দিন গুনছি। আমার দিকে ফিরেও তাকাও না তুমি, আমার রোগ যে দিনে দিনে সাংঘাতিক হয়ে উঠছে, আমার যে ভাল চিকিৎসার দরকার, হাওয়া বদল দরকার সেদিকে তোমার এতটুকু নজর নেই। ভ্রেমিয়ার জন্মে খেটে মরছ এটা তোমার একটা ডাহা মিথ্যা কথা' আসলে তুমি আর একটা মেয়েছেলে জুটিয়েছ তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তা করে সময় কাটাচ্ছ। আমাকে দেখার বেলা তোমার সময় থাকেনা, আমার শিয়রে একটু বসলেই তুমি ছট্‌ফট্‌ করতে থাক যেন কেউ তোমাকে বার্চের চাবুক দিয়ে মারছে। জানি, সব জানি আমি······"। অতঃপর মারিআ হাপুস নয়নে কাঁদতে বসেন।

শুধু মারিআ নয় জানে অনেকেই, অনেকেই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে, ঘনিষ্ঠ মহলে প্রচার হতে বাকি নেই বিদেশ ঘুরে এসে দস্তয়েফস্কি আবার পলিনাকে নিয়ে মেতে উঠেছেন প্রচারটা সর্বৈব সত্য ; কিন্তু এতে দস্তয়েফস্কিরই যে সব দোষ তা কিন্তু নয়, প্রেম কখনো এক তরফা হয় না এবং এক্ষেত্রে উভয়ের আগ্রহই প্রবল, মতান্তরে পলিনার উৎসাহটাই অত্যধিক। কারণ এই অসম বয়সী প্রেমের ব্যাপারে দস্তয়েফ্‌স্কির বেশ একটু হীনমন্যতা বোধ ছিল। পলিনা এগিয়ে এসে তাঁর সেই ভয়টা মুছে দিল। পলিনার আগ্রাসী ইচ্ছার শুশ্রূষা পেয়ে তাঁর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ক্রমশ পৌরুষ ফিরে পেতে থাকলেন। এসময়ে পলিনার আর একটি গল্প ছাপা হল ভ্রেমিয়াতে। অমনি গুনগুনিয়ে উঠল একটা গুজব, দস্তয়েফ্‌স্কির মতন বুড়োকে ভালবাসতে দায় পড়েছে পলিনার মতন বিশ বছরের মেয়ের। ওটা আসলে গল্প ছাপানোর জন্মে নকল ভালবাসার খেলা। তা না হলে ওর ওই রদ্দি গল্প কখনো ভ্রেমিয়ার মতন প্রথম শ্রেণীর কাগজে বেরোতনা। পুরুষ ভোলাতে জানে মেয়েটা।"

কিন্তু এ গুজবে সত্য ছিলনা এতটুকু। গল্প লিখত পলিনা, এবং সে গল্প ভ্রেমিয়ার মতন কাগজে ছাপা হলে অহংকার করত ঠিকই কিন্তু তার জন্মে সে দস্তয়েফ্‌স্কিকে ভালবাসার অভিনয় দিয়ে বশ করেছিল সে কথা ঠিক নয়। ঠিক কথাটা তার ডাইয়েরীতেই লিখে রেখেছে পলিনা। এই বেপরোয়া মেয়ে ডাইয়েরী লিখতে বসে কোন কথা গোপন করেনি কি সংকোচে থেমে যায়নি।

তার বিপ্লবী চেতনা এমনই প্রখর ছিল কিংবা দস্তয়েফ্‌স্কির নামের সঙ্গে নিজের নামটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখবে বলে কাজটা করেছিল পলিনা ; অবশ্য সাহস জুগিয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি নিজেই। দ্য গ্যামলার (জুয়াড়ী) উপন্যাসে নায়ক নায়িকার বেনামিতে নিজেকে যেমন পলিনাকেও তেমনি বে-আবরু করে এঁকেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, তাঁর সেই সাহসেই সাহস পাবে পলিনা, তার সংকোচ কেটে যাবে অকপট জবানবন্দী লিখতে পারবে, স্বাভাবিক।

দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে আপোলিনারিআ পেয়েছিল এমন একজন লেখককে যাঁর খ্যাতি দিন দিন বাড়ছে, যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ক্রমশই রুশ-সাহিত্যকে কব্‌জা করে ফেলছে। অবশ্য দস্তয়েফ্‌স্কির দুর্লভ প্রতিভা অসাধারণ ধী ও বুদ্ধি সর্বোপরি তাঁর নৈতিক দার্ঢ্য যে সে সম্যক বুঝতে পেরেছিল তা নয়। কেবল সে তাঁর প্রতিভার উত্তাপ অনুভব করেছিল। পলিনার রোমান্টিক মনকে সেই উত্তাপই নিবিড় টানে এত নিকটে আকর্ষণ করেছিল, এগিয়ে এসেছিল পলিনা চল্লিশ বছরের গৃহ-প্রত্যাশী অসুস্থ মানুষটির দিকে। একজন অসাধারণ প্রেমিককেও পলিনা আবিষ্কার করেছিল দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে—দস্তয়েফ্‌স্কির মতন এক সূর্যস্পর্শী প্রতিভা তাকে ভালবাসে সেও ছিল তার এক দারুণ অহংকার। তা ছাড়া নিজের চরিত্রের প্রতিবিম্বও দেখেছিল সে তাঁর মধ্যে। পীড়ন করার ইচ্ছা ও পীড়িত হওয়ার বাসনা এক সঙ্গে একই সময়ে কাজ করত উভয়ের স্বভাবে। অবশ্য এ দুই বৃত্তি দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে কতখানি প্রবল তখনও জানত না পলিনা। তখনও সে তাঁর কাম-বাসনার আসল চেহারা দেখেনি। দেখল দস্তয়েফ্‌স্কি বিদেশ ঘুরে এলে সে যখন আবার এগিয়ে এসে ধরা দিল। পলিনাকে নিজের করে একলা নির্জনে পাওয়ার জন্যে পেতের্সবুর্গের এক টেরেতে একটা ঘরই ভাড়া করে ফেলেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেখানে নিভৃতে উভয়ের অবসর বিনোদন রাত্রি যাপন চলছিল অব্যাহত ভাবে। ধর্ষ ও মর্ষকামী এই মানুষ দুটি সেখানেই পরস্পরকে চিনল স্পষ্ট করে। পলিনা অনুভব করল, দস্তয়েফ্‌স্কি যেন তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলছে। দস্তয়েফ্‌স্কি অনুভব করলেন পলিনার প্রেমে তিনি যেন একেবারে কেনা গোলাম হয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যেকার এই বোধ যতই প্রবল হয়ে উঠতে থাকল ততই একটা প্রতিরোধের অদৃশ্য প্রাচীর যেন ক্রমাগত উঁচু হতে থাকল উভয়ের মাঝখানে।

দস্তয়েফ্‌স্কি টের পেতে থাকলেন পলিনার মধ্যে কোথায় যেন আত্মহারা শরণাগতিতে অনীহা আছে, সে যেন ঠেকিয়ে রাখছে নিজেকে ; তার

ব্যক্তিত্ব যেন প্রেমের মধ্যে ডুবে গিয়ে অস্তিত্ব হারাতে অনিচ্ছুক। পলিনা যেন অ-লভ্য দুর্জয়, বুকের মধ্যে সম্পূর্ণ পেয়েও যেন মনে হয় অনেকখানিই সে দিল না। দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে এ ধারণা যতই মূল ছড়াতে থাকে ততই দুর্নিবার হয়ে ওঠে পলিনাকে সর্বাঙ্গে মনে সবটুকু এক করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্খায় পলিনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ওঠেন দস্তয়েফ্‌স্কি। যে মত্ততায় দস্তয়েফ্‌স্কির ক্ষুধা সর্বদাহী হয়ে ওঠে, কখনো কখনো তা অসহ্য অসহনীয় হয়ে ওঠে পলিনার কাছে। তারই বিক্রিয়ায় আরও বেশী করে সে ভালবাসতে থাকে দস্তয়েফ্‌স্কিকে। এভাবে পলিনার মধ্যে প্রেম যত তীব্র হয়ে ওঠে ততই সে অসন্তুষ্ট হতে থাকে নিজের ওপরে, দস্তয়েফ্‌স্কির ওপরে। অসন্তোষ দুদিক থেকে গ্রাস করতে চায় তাকে। প্রেমের প্রাবল্যে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে, করে ফেলছে এই এক রাগ, নিদারুণ অরুচি সত্ত্বেও দস্তয়েফ্‌স্কির বিকৃত-বৃত্তির কাছে হার মানতে হচ্ছে, আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে সেই আর এক রাগ।

সেই রাগে পলিনা একদিন বলেছিল—যে প্রথা সবাই মেনে এসেছে চিরকাল, যে ভঙ্গীকে স্বাভাবিক বলে জেনে এসেছে সব মানুষ, সে প্রথা সে ভঙ্গীতে তুমি সন্তুষ্ট নও কেন, এ বিকৃতি কেন তোমার ?

দস্তয়েফ্‌স্কি জবাব দিয়েছেন—সব সংস্কার অস্বীকার করে দেহ-মনের সাধ মেটানোর কথা অকপটে তুমিই বলেছ, গতানুগতিক ধারার প্রতি তোমার অসন্তোষ বারবার উচ্চারণ করেছ, সনাতন সব সংস্কার ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন পথে নতুন প্রথায় জীবন গড়ে তোলার কথা তুমিই একদিন খুব বড় গলা করে বলেছ, সে সবই কী তবে মিথ্যে ?

পলিনা উত্তর দিতে পারেনি তখন। তবু সে আহত বিরক্ত হয়েছে। আসলে দারুণ বৈপ্লবিক কথা গাল বাজিয়ে ঘোষণা করলেও নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে সনাতন রীতি পদ্ধতিগুলিকেই সে পছন্দ করত; সে বিষয়ে সে রক্ষণশীল ছিল। কিংবা তার শারীর গঠন ও শালিনতা বোধই এমন ছিল যে দস্তয়েফ্‌স্কির দাবি মেটাতে তা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত। তবু যে পলিনা দস্তয়েফ্‌স্কির কুরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার কারণ দস্তয়েফ্‌স্কির দুরতিক্রম্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব বেশীদিন বাধ্য রাখতে পারল না পলিনাকে। রাশিয়ার দ্য সাদ্‌-এর কাছে একটা রবারের পুতুলের মতন যদৃচ্ছা ভোগের বস্তু হয়ে উঠতে জেদী যুবতীর মনে ক্রমশই যে আপত্তি তীব্র হয়ে উঠছিল এক দিন তাই সোচ্চার হয়ে উঠল তার গলায়।

দস্তয়েফ্‌স্কির এক অরুচিকর ভোগেচ্ছার তৃপ্তি দিয়ে বিরক্ত পলিনা রুষ্ট

গলায় বলে উঠল—তুমি আমাকে একটা সাধারণ রক্ষিতার মতন রেখেছ। একটা মাংসের ডেলার মতন ব্যবহার করছ আমাকে, ক্ষুধা পেলে বাচ্চা ছেলে যেমন খেলা ফেলে ছুটে আসে, প্রেমিয়ার অফিস ফেলে তেমনি করে আমার কাছে ছুটে এস তুমি। আমাকে খাদ্যের মতন ব্যবহার করে ক্ষুধা মিটিয়ে চলে যাও, আর এক জনের ক্ষুধা মিটছে কিনা জানতে চাওনা। কাগজ নিয়ে, রোগা অক্ষম বউ নিয়ে তুমি সব সময়টা কাটিয়ে কেবল শরীর জুড়াতে এস আমার কাছে, ক্ষুধা পেলেই কেবল তখন আমার কথা মনে পড়ে তোমার। একটা ঝানু ব্যবসায়ীর মতন আমার সঙ্গে ব্যবহার করছ তুমি। ব্যবসায়ীর মতন সব কাজ রুটিন বাঁধা তোমার, আমার সঙ্গে অবসর কাটানোও ওই রুটিনেরই ব্যাপার, হৃদয়ের সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে। হৃদয়ের টানে সব কাজ ফেলে আমার কাছে ছুটে এসনা কখনো তুমি। আসলে তুমি একটা ক্রিমিনাল।"

নিদারুণ সেই অভিযোগ শুনে নার্ভাস দস্তয়েফ্‌স্কি পলিনার সামনে হাঁটু গেড়ে বলে উঠল।

—"পলিনা, পলিনা, এমন করে বলোনা, আমি তোমাকে চাই, তোমাকে ছাড়া……।"

—"চুপ, মিথ্যে কথা বল না, বুজরুকি ছাড়।" ধমকে উঠল পলিনা।

—"বিশ্বাস কর, আমি সব ফেলে তোমার কাছেই রাত দিন পড়ে থাকতে চাই। তুমি কী ভাব, বাড়িটা আমার খুব মজার জায়গা। মারিয়ার অসুখ দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে তার ঝগড়ার নেশা। আমাকে সে এতটুকু সহ্য করতে পারেনা। তুমি কী ভাব আমি বাড়িতে যে সময়টা থাকি সেটা ওই যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে ভালবাসি বলে?"

—"তবে তুমি আমাকে বিয়ে করছ না কেন? কেন ঝগড়াটে ওই মেয়ে মানুষটাকে ডিভোর্স করছ না?"

—"যে মানুষ বিছানায় পড়ে আছে, যার আয়ু করে গোনা যায়, তাকে ডিভোর্স করা আর না করা একই কথা না? একদিন যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম আজ ভালবাসা নেই বলে তাকে যদি এই দুঃসময়ে ত্যাগ করি সে কি মনুষ্যত্বহীনতা হবে না? তুমিই বল, তখন তুমিই কী আমাকে পাষণ্ড বলবেনা?

পলিনা তখন চুপ করে যায় শান্ত হয়। এভাবেই কাটতে থাকে দু'জনের দিন। আর ক্রমাগত অসন্তোষের ফাটলটা দু'জনের মধ্যে বড় হতে থাকে। কিন্তু সে ফাটল যে এত তাড়াতাড়ি এমন সাংঘাতিক গভীর ও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠবে দস্তয়েফ্‌স্কি জানতেন কী?

—ক্রমশ

চুনীলাল রায়

চোখ

আসলে এ'সব নিয়ে আমি লিখতে চাই না। কেননা, এসব নিয়ে কিছু লেখবার যে শুধু ঝামেলা আছে তা নয়, অসুবিধেও রয়েছে।

প্রথম অসুবিধে হ'ল যে জায়গার গল্প সে জায়গাটার সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাও নাহয় দেওয়া গেল। বললাম যে, এই কাহিনীর সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে চুনার-এ। কিন্তু এখানেও এক ফ্যাকড়া। এখনতো চুনার বিরাট জংশন ষ্টেশন।

মীর্জাপুর হয়ে ইলাহাবাদ যেতে অথবা মুঘলসরাইয়ে বেনারস যাবার সময়েও চুনারের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে এখন। আজ চুনার থেকেই চুরুকের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী বা রেনু-কোটের অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরীতে যেতে হবে। আর তখন চুনার ছিল ছোট্ট একটা ষ্টেশন।

তখন ঐ চুনারের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন ভবরঞ্জন ধর মশাই। ব্যস্ সন্ধ্যে হ'লে আর কথা নেই। ধরবাবু-র রিটায়ার করতে যদিও আরও বছর দুয়েক বাকী আছে কিন্তু তাঁর বাড়ীতেই পাড়ার রিটায়ার্ড মানুষের জমাট আড্ডার আসর বসে যেত। চা, পান, সিগারেট, তাস, পাশা—বয়স যাই হোক না কেন সবারই ইচ্ছে করে ও রকম আড্ডায় বসে যেতে।

সেদিন আড্ডার শুরুতেই রিটায়ার্ড সাব-জজ বিশ্বাসবাবু একটু চটেই উঠলেন—'আপনাদের সব তাতেই গণ্ডগোল মশাই। এই দেখুন না'। বিশ্বাস বাবুর কথা শুনে সবাই বেশ একটু ঘাবড়েই গেলেন। 'কি হ'ল, কি হ'ল ?' শুধু ধর বাবু নয়, বোসবাবু, চ্যাটার্জীবাবু, এমনকি রেলওয়ের I. O. W. অফিসের ষ্টোরকীপার রতনবাবুর মুখেও ঐ একই কথা।

কেননা, আড্ডায় বিশ্বাসবাবুর একটা আলাদা প্রেষ্টিজ আছে। রিটায়ার্ড সাব-জজ হয়েও তিনি সবার সংগে কেমন অন্তরঙ্গ ভাবে মেশেন। ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে আসতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। একী সহজ কথা! অবশ্য কথা তিনি কমই বলেন—বড় মেপে ঝুকে। অন্যদিন কোনও আলোচনা তিনি শুরু করেন না বটে কিন্তু সব কিছুর কনকুলুসন তিনি ছাড়া

আর কারো করাটাই যেন ওখানে শোভা পায়না। আর তাঁর উপর কথা বলবার কেউ নেইও। সবাই তাঁর কথাতে কখনও 'হ্যাঁ' আবার কখনও বা 'না' বলে থাকেন।

কথা ক'টা বলে একটু থেমেছিলেন বিশ্বাসবাবু, সবার চোখ-মুখের দিকে একটু ঠাওর করে দেখতে চাইছিলেন আগ্রহটা কার কি ধরণের? তিনবছর আগে চাকরী ছাড়লেও তাঁর প্রতিপত্তি আজও কমেনি—সবাই আছে উমেদারী করে কিছু বাগিয়ে নেবার তালে। তাই একটু নিজের বাজার দরটাকে বাড়িয়ে বেশ গম্ভীরভাবে তিনি এবার কথা বলা শুরু করলেন—এই মশাই, আপনাদের একটা কথা হয়েছে—সবকিছু ভারতীয় করতে হবে। কিন্তু ভারতীয় করে কি হবে—এরাতো সুযোগ পেলে নিজেদের ঘরে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে ক্ষতিপূরণ চাইতে বসে। এই প্রতি বছর শুনি রেল বাজেটে ঘাটতি, এখানে ঘাটতি। ওখানে ঘাটতি। লোকের যদি ঐ ভারতীয় বোধটাই থাকত তবে আর নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করত? আপনারাই বলুন না? আপনি বলুন না রমেনবাবু, কি ধর তুমি কি বলো?

আরে আমি যখন জাপানে ছিলুম তখন সেখানকার এক কাণ্ড দেখে আমি অবাক। ইয়াকোহামা থেকে গাড়ীতে চড়েছি, কিন্তু গাড়ীতে একজনও চেকার উঠল না। টোকিওতে পৌছে আমি আর কৌতূহল চাপতে পারলুম না। পাশের জাপানীজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম। উনি বললেন, 'কেন, লোকে টিকিট কাটবে না কেন? দেশের ক্ষতি কি লোককে বলে দিতে হবে?'

বিশ্বাসবাবু এখানেই থামলেন না, তাঁর কথার রেশ তিনি আরও একটু টেনে নিয়ে গেলেন, আসলে এতো উত্তেজিত তিনি কোনদিনই হননা—তাই বলি, ভারতীয় ভারতীয় বলে চেঁচালেই কি সব হয়ে যাবে নাকি? দেশের উপর আপনাদের দরদ কোথায় মশাই? অথচ দেখুন বৃটিশদের, দেখুন···।'

মাপ করবেন, কিছু মনে করবেন না; ওখানে থাকলে বিশ্বাসবাবুর কথাবার্তা শুনে, তার ভাবগতিক দেখে আপনিও মনে মনে তাকে সমীহ করতে শুরু করে দিতেন। তাঁর কথাই নির্বিচারে মেনে নিতেও আপনার আপত্তি হ'তো না। কেননা এটাই নিয়ম—এখানে প্রথম দিন থেকে চলে আসছে।

বিশ্বাসবাবুও এটা জানেন খুব ভাল করেই। তাই কথা শেষ করে একটু তৃপ্ত হলেন তিনি। তারপর বার্মিজ চুরুটটা ধরিয়ে, একটা টান দিয়ে বললেন, 'আরে, কই হে ভব, আর একবার কফি দিতে বল বৌমাকে। আচ্ছা, সেদিনকার পকৌড়ীটা কিন্তু বেশ হয়েছিল, তাই না? আপনি কি বলেন

চ্যাটার্জী বাবু' ঃ আজ্ঞে, আপনি যা বলেন—চ্যাটার্জী বাবুর ঐ জবাবের সংগে হয়তো আপনারও এতক্ষণ বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছে।

অথচ সেদিনকার সুন্দর আড্ডাটায় যে এভাবে বোমা ফাটাবেন জিতেন সান্যাল, তা' কেউ ধারণাই করতে পারেন নি। বোসবাবুর হঠাৎ করে হিক্কে উঠল, দারুণ উত্তেজনায় পকৌড়ীটা তার মুখে ঢুকে গেছে, ওদিকে কিছুটা কফি ছল্‌কে পড়ল চ্যাটার্জীবাবুর নতুন পাঞ্জাবীটাতে, ধর মশাই মনে মনে শ্রাদ্ধ করলেন সান্যালের, এদিকে রতনবাবু জড়োমড়ো হয়ে একপাশে সরে বসলেন, আর বিশ্বাসবাবু চুরুটটা দাঁতে কামড়ে ধরলেন শক্ত করে।

আর,—এ আড্ডাতেই শুধু নয়, এ পাড়াতেও নতুন এসেছেন সান্যালবাবু। তবে আসাও ঠিক বলা চলেনা, বেড়াতে এসেছেন এখানে দিন পনেরর জন্য। এখানে রেললাইনের একদিকে শহর, অন্যদিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে পাহাড় চোখে পড়বে—সুন্দর, ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে আশ্রম রয়েছে। ঐ আশ্রমেই এসে উঠেছেন সান্যালবাবু। এইতো সবে রিটায়ার করেছেন তিনি। ফোর্টের কাছে গঙ্গা স্নানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল একদিন ধরবাবুর সংগে, তারপর আর একদিন মাটির খেলনা কিনতে গিয়েও দেখা হয়ে গিয়েছিল।

ধরবাবু সান্যালকে তারপর আর ছাড়েন নি। টেনে এনেছেন মজলিসে, আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। রিটায়ার্ড অধ্যাপক, এককালে দেশের কাজে জেলও খেটেছেন।

কিন্তু ধরবাবু কি ভেবেছেন যে, অধ্যাপক এখানেও জ্ঞান দেবেন সবাইকে? কথায় বলেনা, জ্ঞান দেওয়া ভাল, কিন্তু জ্ঞান দেওয়ার সীমারেখা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আরও ভালো। অথচ এখন আর কিছু বলার নেই অধ্যাপককে। লেখক আর অধ্যাপকদের ঐ এক দোষ, জ্ঞান দেবার সুযোগ পেলে তারা আর থামতে চাননা কিছুতেই।

আর তাই জিতেন সান্যাল প্রতিবাদ করেছেন বিশ্বাসবাবুর কথার। যেন তার এতদিনকার কায়েমী রাজত্ব তিনি একদিনেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারবেন!

অথচ কি শান্ত, মিষ্টি স্বরে সান্যালবাবু কথা শুরু করলেন—দোষটা দেশের সাধারণ লোকের নয়—আমাকে মাপ করবেন বিশ্বাসবাবু—দোষ আমার, দোষ আপনার, দোষ আমাদের সবার-ই। বিদেশের জিনিস পেলে আমরা আর অন্য কিছুই চাই না। কেন দেশের উপর, দেশের লোকের উপর আমরা আস্থা রাখতে পারি না, দেশের লোককে শিখাই না? বেশী দূর যেতে হবে

না, এই দেখুন না, 'আজ আমরা বেবীফুড, ওষুধ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নিজেদের দেশেই তৈরি করে নিচ্ছি, দেশের কাঁচা মাল, দেশী কারিগর—সবই এ' দেশের। অথচ মজা দেখুন, আপনার বিদেশী নামের ফলে সেই জিনিসই বিদেশী কোম্পানীর ট্রেডমার্কে বিক্রী হচ্ছে। দেশের প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ চলে যাচ্ছে বাইরে। অথচ সে জিনিসেরই কদর সবার কাছে, আপনি তো বিদেশী নামটাই কিনতে চান বাজারে গিয়ে। আমরা তাই চাই—সব কিছুই ভারতীয় করা হোক। হ্যাঁ, এমন কি আমাদের মনটাকেও ভারতীয় করতে হবে, বিশ্বাসবাবু। আমরা সবাই যদি ভারতীয় হতে পারতাম তবে আমাদের অনেক গোলমাল মিটে যেত—অনেকটা কথা বলে থামলেন সান্যালবাবু, কিন্তু মনে হ'ল তিনি যেন আরও একটু বলতে চান।

নাঃ,—কিন্তু এতো বড়ো বক্তৃতার পর আর ঠিক থাকতে পারলেন না ধরবাবু। তাঁর বাড়ীতে এ' রকমটা যে হতে পারে এটা তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি। কিন্তু এবার সুযোগ এসে গেল হঠাৎ-ই, সান্যালকে এক হাত দেখে নেওয়া যাবে।—না, না সান্যালবাবু, না—অধ্যাপক একটু থামতেই বেশ উত্তেজিত হয়েই ধরবাবু কথাটা বলে ফেললেন—দয়া করে আর ইণ্ডিয়ান করতে চাইবেন না সবকিছু।

একটু থামলেন ধরবাবু। স্বাভাবিক হতে চাইলেন তিনি, তাকালেন বিশ্বাসবাবুর দিকে, উনি এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ছেন, দু' চারটে 'রিং'-ও ছাড়লেন বোসবাবু দু' প্লেট পকৌড়ী শেষ করে ফেলেছেন, আর এক প্লেট সামনে টেনে নিয়েছেন এরই মধ্যে। চ্যাটার্জীবাবু কফির কাপে আয়েস করে একটা চুমুক দিয়ে চোখটা বুজেছেন। রতনবাবু স্বস্তি পেয়ে উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পীডটা একটু বাড়িয়ে দিলেন, আবার বসবেন কিনা ভাবলেন। সান্যালবাবু কিন্তু সোফাতেই বসে একটা হিন্দী মাসিক পত্রিকা—সারিকা না সরিতার পাতা উল্টাতে লাগলেন।

ধরবাবু এবার তাঁর কথার খেইটা আবার নতুন করে খুঁজতে লাগলেন। বিশ্বাসবাবু উদাসভাবে বললেন, 'ধর, তোমার কথাটা শেষ করো—ইণ্ডিয়ান করতে চাইবেন না সবকিছু…।'

না, হ্যাঁ, এই দাদা…মানে—ধরবাবু হাত কচলে নিলেন একটু। বিশ্বাস-বাবুর তাঁর উপর এতটা অনুগ্রহ তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। ধরবাবু জানেন, ওঁদের সুপারিনটেনডেণ্ট সিন্‌হা সাহেব, বিশ্বাসবাবুর বন্ধু লোক। একটু বললেই এক্সটেনশনটা হয়ে যায়,—হ্যাঁ, তা' যা' বলছিলাম সান্যাল-

বাবুকে। এইতো দেখুন না আমার চোখটা…ক'দিন ধরে মাথার কি যন্ত্রণা, রাতে কিছু পড়তে গেলেই চোখ লাল হয়ে যায়, কোনও কাজ যে করব তারও আর উপায় রইল না। আমার চোখ তো এই যায়, সেই যায়।

তা' বিশ্বাসদা'র গাড়ীতে করে গেলুম সেদিন শহরের ডাক্তারকে দেখাতে। হ্যাঁ মশাই, আপনাদের দেশের নামকরা ডিগ্রী পাওয়া ডাক্তার। কিন্তু হাহতোহস্মি। আমি এই মরি কি সেই মরি। আর ডাক্তার বললে কি-না আমার নাকি কিছুই হয়নি। কি একটা বাজে আই ড্রপ লিখে দিলে—ও' দিলেই না-কি সব সেরে যাবে। এইতো আপনাদেরই ইণ্ডিয়ান ডাক্তার, সান্যালবাবু। তা' আমি ওঁর কথায় কান দিইনি, ওষুধও কিনিনি। বাজে পয়সা নষ্ট!'

এবার নড়ে চড়ে বসলেন বিশ্বাসবাবু—'ভব, তাহ'লে তুমি এবার কল্‌কাতায় গিয়ে বড়ো ডাক্তার দেখিয়ে এসো তো হে। এদের ওষুধ দিলে তোমার চোখে আর চোখ থাকবে না জেনে রেখো।'

হ্যাঁ দাদা, আমি কালই ক'দিনের ছুটীর জন্য অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি,—ধরবাবু কৃতজ্ঞতায় গলে পড়লেন যেন—আপনাকে বলেছি না দাদা, আমার খুড়তুতো ভাইপোই রয়েছে কল্‌কাতায়। বিলাত থেকে কী সব পাশ করে এসে খুব নাম করে ফেলেছে এই অল্প বয়সেই।

ব্যস তাহ'লে সব ঠিক আছে ভব—বিশ্বাসবাবু মৌজ করে চুরুটে টান দিতে লাগলেন—তুমি তাই করো তাহ'লে…

* * *

কল্‌কাতাটা কী অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে—ভাবলেন ভবরঞ্জনবাবু। অন্য-বারের মতো এবারও কোল্‌কাতায় এসে বাল্য বন্ধু প্রিয়তোষের ওখানেই উঠেছেন—শুধু কোল্‌কাতা কেন, সব্বাই বদলে গিয়েছে, প্রিয়টাও এবার যেন কেমন বদলে গিয়েছে। বিজনেস্ করে বেশ দু' হাতে এলোপাথাড়ি কামিয়েছে, কিন্তু এখন ঐ এক কথা—আর ভাল লাগছে না, রাতে ঘুম হয় না, পিল খেতে হয়।

এ' সব যেন বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় ভবরঞ্জনবাবুর কাছে। কই তার তো আজও এ' সব হয়নি। কোল্‌কাতার এখনকার জীবনটাই কি সব কিছু গণ্ডগোল করে দিয়েছে না কি? অথচ এখন তো কোল্‌কাতার প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্য যেন আরও উপচে পড়ছে।

না কি প্রিয়টার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। বাড়াবাড়ি নয় তো কি?

বলে কিনা মেয়ে দুটোকে পার করতে পারলে এ'সব গাড়ী-বাড়ী আশ্রমে দিয়ে একেবারে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে উঠবে। প্রিয়টার বোধহয় মাথার গণ্ডগোল হয়েছে, ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার। জীবনটাকেই ও ভোগ করতে জানে না!

অথচ কলেজ লাইফ থেকেই টাকা, টাকা করত ও'। বিয়েও করল একটু বেশী বয়সে, আর এখন টাকা পেয়ে—।

এইসব আর এই রকম নানা চিন্তা ভবরঞ্জনকে এবার বড় ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। চিন্তাটা তার আরও বাড়ত, যদি ট্যাক্সী ড্রাইভারের কথায় তার চমক না ভাঙত।

—ইয়ে, মানে এমন না হ'লে আর বাড়ী। মনে মনে ভাবলেন ভবরঞ্জন। সদানন্দ রোডে প্রিয়র বাড়ীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ডোভার লেনের এই বাড়ীটা। দীনুদার ছেলে একটা কাজের কাজ করেছে বটে! আঃ, দীনুদা বেঁচে থাকলে কি আনন্দটাই না পেতেন! সামনের দরজাতেই কপার প্লেটে লেখা রয়েছে—

ডাঃ ডি. ধর

এম. বি. বি. এস. (ক্যাল), ডি. ও. এম. এস. (লণ্ডন)

আই স্পেশালিস্ট

ট্যাক্সী ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে দরজার পাশের সবুজ ঘাসে ঢাকা লনটা পেরিয়ে সোজা ভিজিটর্স রুমে এসে ঢুকলেন ভবরঞ্জন। বেয়ারার হাতে তাঁর নাম লিখে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন ভিতরে।

এবার একটু স্থির হয়ে সোফায় গিয়ে বসলেন ভবরঞ্জন। সমস্ত ঘর ভর্তি রোগীদের ভিড়। প্রত্যেকে অপেক্ষা করে আছে কখন তাদের ডাক পড়বে তারই অপেক্ষায়। উঃ, এই বয়সেই কী কাণ্ডই না করে ফেলেছে ছেলেটা— ভবরঞ্জন আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠলেন—হ্যাঁ, এ' নাহলে আর ডাক্তার। আঃ, এ'টা যদি সব্বাইকে দেখান যেত—বোসবাবুকে, চ্যাটার্জীবাবুকে, বিশ্বাসবাবু হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইতেন না।

কাকাবাবু আপনি'—ভবরঞ্জন এবার যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। দীপু নিজেই বের হয়ে এসে একেবারে সটান তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়েছে—'চলুন, আপনি ভিতরে চলুন।' উপস্থিত সবার আগ্রহী আর কৌতূহলী চোখের সামনে দিয়ে বিখ্যাত ডাক্তার কী ছোট্ট হয়ে, কী সাধারণ হয়ে তাকে মাথায় তুলে নিয়ে গেল।

তারপর বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দীপুর বৌয়ের কাছে চা খেয়ে, মিষ্টি খেয়ে, দেশের নানারকম গল্প করে, ওদের তিন বছরের ফুটফুটে মেয়েটার সঙ্গে খেলা করে,— আনন্দর স্বর্গলোক থেকে ঘণ্টাখানেক বাদে ভবরঞ্জন যখন দোতালা থেকে আবার নীচে নেমে এলেন, তখনও বসবার ঘরে রোগীদের সেই একই রকম ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

কী মনে করে হঠাৎ আবার ভেতরের দিকে চললেন তিনি, ঘরে গিয়ে ডাকলেন—বৌমা। মেয়েটার কান্না থামিয়ে দীপুর বৌ কাছে আসতে বললেন —এই যে বৌমা, তুমি এসেছ। কি হয়েছে, খুকী কাঁদছিল কেন?—ভবরঞ্জনের উৎকণ্ঠা ভালভাবেই প্রকাশ পেল। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা দেখ বৌমা, একটা কথা বলি তোমাকে—দীপু কিন্তু বড্ড খাটুনী করছে। এত রোগী ও কখন দেখে শেষ করবে? ওকে কি বিশ্রামও করতে দেবে না কেউ? না, না এতো ভাল কথা নয়, বৌদি-ও নেই—। না, না তুমিই একটু বুঝিয়ে বোলো।

চেম্বারে এসে দীপুকেও ভবরঞ্জন ঐ একই কথা বোঝাতে চাইলেন। দীপু হেসে ফেলল সব শুনে—কাকাবাবু, বুঝিতো সবই। এই দেখুন না, ভিড় কমাবার জন্য ভিজিট ষোল থেকে বাড়িয়ে বত্রিশ টাকা করলাম, কিন্তু ভিড় কমে কোথায়?

ভবরঞ্জন অবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে—বলে কি ছেলেটা! এঁ্যা, মাসে তবে আয় কত দীপুর? ছি, ছি, ছি—বিশ্বাসবাবুকে তিনি এতদিন কেন বোকার মতো অতো সমীহ করে এসেছেন? ছোঃ, কিইবা আছে তাঁর? আঃ, এবার ফিরে গিয়েই পুজোর ছুটিতে দীপুকে তাঁর কাছে আসতে লিখতে হবে—সবাই-কে এবার দেখিয়ে দেবেন কাকে বলে বড় লোক!

আসুন কাকাবাবু এবার আপনাকে দেখব—খুব যত্ন করে ধরে এনে দীপু তাকে বসিয়ে দিলো একটা পুরু গদী আঁটা চেয়ারে। তারপর একের পর এক চলল পরীক্ষার পালা। পাওয়ার টেস্ট করে দেখা হল—না কাকাবাবু, কোনও গোলমালতো নেই এতে। দীপু এবার নিজেই হাত ধরে ভবরঞ্জনকে নিয়ে এলো ডার্করুমে।

ভবরঞ্জনের অবাক হবার পালা বোধহয় তখনও শেষ হয়নি। এমন একজন বড় ডাক্তার তার আত্মীয়, তাকে এমন আদর করে, যত্ন করে দেখছে—এটা যেন পৃথিবীর সব মানুষকে ডেকে দেখাতে না পারলে জীবনে আর তারসুখ নেই।

হ্যাঁ, দু'টো মিনিট ভবরঞ্জন এখন ভাবতে পারবেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী একটা জরুরী ফোনের খবর দেওয়াতে, দীপু অন্য ঘরে গিয়েছে।

ছেলেটাকে যতই দেখছেন, ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছেন ভবরঞ্জন। তাঁর ভাবনা যেন আর কিছুতেই শেষ হতে চাইছেনা, তাঁর ভাবা যেন আজ আর কোনও তলই খুঁজে পাবেনা।

আমার আনন্দ, আমার সুখতো আমার একলার নয়। আমার এই গৌরব এই অহঙ্কার—এও-তো সাবাইকে ডেকে দেখাতে হবে। আরে দূর, দূর—চুনারের ডাক্তার আবার ডাক্তার। ফড়িং ও আবার পাখী! বোসবাবু, চ্যাটার্জীবাবু, বিশ্বাসদা'—কেউই এসব জীবনে কখনোও দেখেনি, কল্পনাও করতে পারবেনা কেউ ভবরঞ্জনের এত সৌভাগ্য।

কিন্তু এইসব তাদের না দেখাতে পারলে সুখ কোথায়, আনন্দ কোথায়? আমার আনন্দ, সুখ—সবাইকে দেখাতে না পারলে কি সুখ পাওয়া যায়, না-কি আনন্দ পাওয়া সম্ভব? দীপুকে দিয়ে খুব লম্বা চওড়া একটা প্রেসক্রিপ্‌শন্ করিয়ে নিতে হবে। দামী দামী ওষুধও কিনতে হবে কোলকাতার নামী দোকান—সাহিব সিং রস, দেজ—থেকে। হ্যাঁ তবেই লোকে বুঝবে, জানবে ভবরঞ্জনবাবু একজন ডাক্তার দেখিয়েছে বটে! ভবরঞ্জন এখানে ছোট চাকরী করে ঠিকই, কিন্তু সে-ও বড়ো ফেলনা লোক নয়, সেও কমতি নয়, তার আত্মীয়রা সব—। আর একটা কাজ করতে হবে—ঐ ডাক্তারের মুখের উপর দীপুর প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌টা ছুড়ে মারতে হবে, তবেই বোধ হয় ঠিক কাজের কাজ হবে।

কাকাবাবু বড় দেরী করে ফেললাম—একটু লজ্জিতই হল ডাক্তার, দেরী করে আসাতে। 'না, না ও কিছু নয়'—এই বিনয়, একী সোজা কথা! কী ব্যবহার! ভবরঞ্জনের ইচ্ছে হল এসব কিছুর যদি একজন সাক্ষী তিনি রাখতে পারতেন—নাঃ দীপুকে একবার চুনারে নিয়ে যেতেই হবে—তার চিন্তাটা আরও গম্ভীর হল এবার।

চোখের উপর টর্চ ফেলে—কতরকম পরীক্ষাই না করলে ডাক্তার। তারপর মিনিট দশেক পরে যখন তাঁরা চেম্বারে এসে বসলেন তখন দীপুর মুখে একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল যেন।—না কাকাবাবু আপনার একটুও ভয় নেই। চোখ আপনার খুব ভাল আছে। আসলে কোনও ওষুধই আপনার দরকার নেই। রাতে একটু কম পড়াশোনার কাজ করবেন, আর একটা আইড্রপ ব্যবহার করবেন পিচুটি পড়লে। চোখ নিয়ে আপনি একটুও ভাববেন না···।

কি বলছ বাবা তুমি?—কথাটা শুনে চম্‌কে উঠলেন ভবরঞ্জন, এতো বড়ো আশার কথা শুনেও তিনি যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইলেন।

একটা নিদর্শন, একটা কিছু, একটা কিছু না দেখলে যে এই ভালবাসা,

এই আদর-যত্ন, এই সেবা, এই চিকিৎসা—সব কিছুই যে মিথ্যা হয়ে যাবে। বোসকে, চ্যাটার্জীকে, বিশ্বাসদাকে—তিনি আর মুখ দেখাবেন কেমন করে? বড়লোক আত্মীয় তাকে পাত্তাই দেইনি—কি বলবেন, কি বোঝাবেন ভবরঞ্জন সবাইকে? সমস্ত শরীর তাঁর যেন শিউরে উঠল সেই ভয়াবহ চিন্তায়। সমস্ত শরীরটা যেন বেদনায় কেঁপে উঠতে চাইল।

ড্রাইভারকে বলি কাকাবাবু, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে—দীপু ব্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তার ঐ ভালবাসার জবাবে ভবরঞ্জন যেন কোনও কথা খুঁজে পেলেন না আর—থাক্ বাবা, থাক। আমার কিছু হয়নি—স্বাভাবিক হতে চাইলেন এবার ভবরঞ্জন।

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলেন তিনি—আমার সুখ কোথায়, সুখ কিসে? আমার দুঃখই বা কিসে?—হঠাৎ যেন মাথাটা তুলে উঠল তার—জীবনের সুখ, সুখকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?—লন ছেড়ে বড় রাস্তায় নামবার জন্য জোরে পা বাড়ালেন ভবরঞ্জনবাবু—মনে হ'ল কেউ যেন তাকে ঠেলে দিল, ঠেলে দিল।

রণজিৎ চক্রবর্তী

নাট্যচর্চা—ভারতীয় সংস্কৃতির একটি আদি পর্ব

সাম্প্রতিক কালে নাট্যকলার সমধিক প্রচার এবং প্রসার ঘটলেও নাট্য-চর্চা কিন্তু শুধুমাত্র আধুনিকতার অঙ্গ নয়। নাট্যচর্চা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি আদি পর্ব। ভারতীয় নাট্যকলা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগেও ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন করেছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণে নাটক, সমাজ, নাটপীট, নট প্রভৃতি শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। কাজেই ভারতীয় নাট্যকলার কিংবা অভিনয়কলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতান্তরের কোন অবকাশ নেই। সংলাপই নাটকের প্রধান মাধ্যম। ঋগ্বেদের ভাষার মধ্যেই নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগীতা দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নাট্যানুষ্ঠানের কোন প্রমাণ দেখা না গেলেও স্বর্গের দেবতাদের মত ঋত্বিকরাও কথা ও সঙ্গীতের আবৃত্তি করতেন। বেদের সুক্ত ও স্তোত্র গানের মত উপনিষদেও নাটকীয় সংলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সংহিতা যুগের 'সুপর্ণাধ্যায়' একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'দশকরূপক', 'সাহিত্য দর্পণ' প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয়ের আভাস আছে।

খৃষ্টের জন্মের আনুমানিক প্রায় এক হাজার বছর আগে ভরত ঋষি তাঁর নাট্যসূত্রগুলি রচনা করেছিলেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় কলা, শিল্পীর গুণাগুণ ও মঞ্চের স্থাপত্য বিষয়ের নির্দেশ আছে। রামায়ণ মহাভারতেও আমরা নাটকের উল্লেখ দেখতে পাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় প্রবেশ করেন, তখন বসুদেব আত্মীয়স্বজন নগরবাসী নট ও নর্তকদের নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধকেও আমরা নাট্যকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাই। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধ জাতকেও নট ও নাটকের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভারত গৌরব মহাকবি কালিদাসের নাট্য রচনার কথাও আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে পারি। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী অভিজ্ঞান শকুন্তলা; কবি ভাসের স্বপ্নবাসব দত্ত, পঞ্চরাত্র, চারুদত্ত প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। কবি ভাস, অশ্বঘোষ, বানভট্ট, রাজশেখর

প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্য রচয়িতারা আপন প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। ভবভূতির উত্তর রামচরিত একটি প্রসিদ্ধ নাটক। ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বনে মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সীতার বনবাস' নাটকটি রচনা করেছিলেন।

মোঘল রাজত্বে নাট্যকলার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। সম্ভবতঃ নাট্যচর্চা অথবা নৃত্য-গীত প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত নয় বলেই এই শিল্পকলাটি প্রসার লাভ করতে পারেনি। বাংলায় হুসেনশাহের রাজত্বকালে গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শিষ্যদের মধ্যে নাট্যচর্চার পরিচয় আমরা পাই। মহাপ্রভুরও নাট্যানু-রাগের কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে। পরবর্তীকালে ইংরেজী ষ্টেজ্ অর্থাৎ থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচর্চার আবার পুনরুদ্ধার ঘটে।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হেরাশিম লেবেডেফ্ নামে একজন রুশ ভদ্রলোক একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। দু'টি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ বাঙালী নট-নটী দের দিয়ে তিনি অভিনয় করিয়েছিলেন। দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসন্ন কুমারের নাট্যশালাতেও ইংরেজী নাটকই মঞ্চস্থ হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্যাম-বাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এই নাট্য-শালায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকরূপে পরিবেশিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সে যুগে বাংলা নাটকের অভাবেই বাংলা নাট্যশালা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তদানীন্তনকালে যে সব বাংলা নাটকের খোঁজ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকটিই প্রাচীনতম। যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক হিসাবে আমরা পাই। এর পর হরচন্দ্র ঘোষ, কালী প্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি নাট্য রচয়িতারা নতুন নতুন নাটক রচনা করে নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বাংলা নাটকের উষালগ্নে প্রধান নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর 'কুলীনকুল সর্বস্ব'র কথা নাটকের অনুরাগী মাত্রেই জানেন।

এর পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সার্থকনামা নাট্যস্রষ্টাদের দানে নাট্যচর্চার সবিশেষ প্রসার লাভ ঘটেছে। নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়েছে।

আজ নবনাট্য আন্দোলনের কথা যতই আমরা তারস্বরে প্রচার করি না কেন, বা অভিনয়কলা সম্বন্ধে আপন কৃতিত্ব প্রকাশে যতই যত্নবান হই, এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নয় যে আধুনিক যুগের এই নাট্যচিন্তা অতীতের

সার্থকনামা পূর্বসূরীদের দানেরই ফলশ্রুতি। আজকের নাট্যসৃষ্টি হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কোন শিল্পকর্ম নয়। কাজে কাজেই নাট্যচিন্তা সম্বন্ধে আমাদের পূর্বসূরীদের দানের ঋণ স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। আজকে যাঁরা সেই অতীত কালের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দিতে পরাঙ্মুখ, ভাবীকালের ইতিহাস নিশ্চিতই তাঁদের ক্ষমা করবে না।

ছবি মুখোপাধ্যায়

পাঁচিল

....

ও পাশ থেকে তর তর করে সিঁড়িতে নামতে নামতে নতুন বৌ শিউলি এদিকের বৌ পূর্ণিমাকে ডেকে বলল, দিদি কলেজে ভর্তি হয়ে গেছি। কথাগুলোয় যতটা না আনন্দ, তার চেয়ে বেশী বোধহয় ক্ষোভ ছিল।

—তা কোলকাতাতেই তো? রেলিঙে কাপড় দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো পূর্ণিমা বৌ।

—না কোলকাতাতে নয়, এখানেই।

—যাক্ তবুও তো তুমি শ্বশুরবাড়ীতে এসে কলেজে ঢুকতে পেলে! আমার কিন্তু ঠিক উল্টোটি হয়েছিল। অর্থাৎ—স্কুলের পাসের পর বাপের বাড়ীতে তার, বাড়ীর পাসেই নামকরা কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকা সত্বেও তা থেকে সে দারুণভাবেই বঞ্চিত হয়েছে। ওই সময়েই তার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কথাগুলো সেও তখন বলেছিল ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গেই। বলতে বলতেই সে যেন তখন কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে দমাস্ করে একটা আওয়াজ হোলো কিসের। তাই শুনে বলে উঠলো সে, দেখলে তো এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে একটু কথা বলতে দেবে না রাবণের পালেরা। বলে সে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

—আহা দাঁড়ান না? গিয়ে তো এক্ষুণি মারতে শুরু করে দেবেন ছেলেমেয়েগুলোকে। থামিয়ে দিল শিউলি।

—মারি কি সাধে? সব সময়ে পালেরা একটা না একটা অপাট করে বসে থাকবে দিন রাত।

—অমন কথা বলবেন না দিদি, আপনার তিনটি ছেলেমেয়েই অনেক ছেলেমেয়ের চেয়েই ঠাণ্ডা।

—তুমি আর কি বুঝবে ভাই, যে ওই নিয়ে ঘর করছে সেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। কোলকাতায় কলেজে পড়তে পারলে না বলেই তোমার মনে কষ্ট, আর আমার এদিকে যে কত জ্বালা সে আমিই বুঝছি।

—থাক্ খুব হয়েছে, এসব শুনতে পেলে আবার ছেলেমেয়েদের ঠাক্‌মারা এক্ষুণি চ্যাঁচামেচি সুরু ক'রে দেবেন। চুপ করুন আপনি।

অগত্যা চুপ করে যেতেই হয় পূর্ণিমাকে। হেসেই তারপর সেখান থেকে সে চলে যায়। শিউলিও হেসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

এককালের এই চাটুয্যেরা সকলেই এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত ছিল। তখন ছিল এদের খুব হাঁক-ডাক। এখন এরা হয়েছে অঙ্কের ভগ্নাংশের মত। তখনকার এদের বড় বাড়ীটা হয়েছে এখন পাঁচিলের পর পাঁচিল দিয়ে বিভক্ত। কোথাও বা সে পাঁচিল উঠেছে একেবারে তেতলা বরাবর। আবার কোথাও কোমর উঁচু সমান থেকে এটা এক এক তরফের সীমা চিহ্ন হয়ে রয়েছে এখন। এই রকম একটা ছোট্ট পাঁচিল পড়েছিল শিউলি ও পূর্ণিমাদের দু'তরফের মধ্যে। এরই এপার ওপার থেকে ছিল দুজনের যত কথা।

একদিন শিউলি যখন সত্যিই ঠাকুরের ফুল কপালে ছুঁইয়ে হাতে এক-খানা রেক্সিন মোড়া খাতা নিয়ে বাহারী লাল টক্‌টকে শাড়ী পরে কলেজে গেল, তখন পূর্ণিমা এসে দাঁড়ালো রেলিঙের ওপর। যাবার সময় সে চাপা আনন্দের একটা হাসির ঝিলিক তুলে চলে গেল। তাই দেখে পূর্ণিমারও বেশ ভালো লাগলো। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কেমন যেন খচখচে ভাব মনের মধ্যে উঁকি মেরে উঠলো। মনে হলো তখন পূর্ণিমার, এরকম করে সেও তো যেতে পারে। কিন্তু বাধা অনেক তাতে।

হ্যাঁ বাধা বৈকি! তিনটে ছেলে মেয়েকে রেখে যাবে কার কাছে? এক রেখে যেতে পারে শাশুড়ীর কাছে। কিন্তু শাশুড়ী ওই দুর্দান্ত ছেলেমেয়েদের সামলাবেন কি করে? হয়ত কেউ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে হাত পা ভাঙবে, নয়ত ঘরের এক আধটা জিনিসপত্র যে ভাঙবে না তাই বা কে বলতে পারে? তাছাড়া ওপরের রেলিঙ দিয়ে তো সব সময়েই ছেলেটা ঝোঁকে নিচের দিকে। সে সব তো আর সর্বক্ষণ শাশুড়ী চোখ রেখে বসে থাকতে পারবেন না। এরপর রান্নাবান্নার সংসারের কাজ তো রয়েছেই। আচ্ছা নাহয় যদি রান্নার ঠাকুরই রাখা গেল, তার ওপরেও তো নজর রাখতে হবে শাশুড়ীকে। সবকিছুর ওপরে রয়েছেন তার স্বামী, তাঁর হাতে হাতে সমস্ত জিনিস যুগিয়ে না দিলে কুরুক্ষেত্র শুরু করতে তাঁর একটুও দেরী হবে না। অতএব মনের ইচ্ছে মনের মধ্যে চেপে রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সেদিন শিউলি কলেজ যাবার পর পূর্ণিমা রান্নাঘরে ছেলে মেয়েদের দুধ খাওয়াতে এলো। ছেলেটা ঢক্‌ঢক্ করে দুধের বাটিটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল

তক্ষুণি। বোধ হয় বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল তখন তার। বড় মেয়েও একটুখানি হ্যাঁ-না করে চামচে করে বেশী একটু চিনি নিয়ে বসে পড়লো বাটি নিয়ে। তাকে তখন বলল পূর্ণিমা, দেখলি তো নতুন কাকিমা কেমন সেজে গুজে কলেজে গেল ?

—হ্যাঁ মা, কাকিমা বুঝি দিদিমণি হবে ? বছর নয়েকের বুদ্ধিতেই ওই বড় মেয়ে জিজ্ঞেস করলো তাকে।

—হ্যাঁ, তুইও ভালো করে লেখাপড়া কর, তুইও তাহলে বড় হয়ে ওই রকম করে কলেজে যাবি। তারপর কত পাস করে খুব বড় দিদিমণি হবি তখন।

—হেড দিদিমণি হবো মা ?

—তারচেয়েও বড় হবি। নে নে দুধটা খেয়ে নে আগে দেখি ? বলে জোর করে মেয়ের মুখের কাছে তুলে ধরলো।

সে এক ঢোক খেয়ে তারপর মার মুখের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল একটুখানি। যেন কিছু একটা জিজ্ঞেস করার আছে তার।

—কি, খাবি না ?

—খাবো।

—কিছু বলবি ? বল না তাহলে।

—আচ্ছা মা, বড় হয়ে আমি যদি বড় দিদিমণি হই, তাহলে কি আমার বিয়ে হবে না ?

সেকথা শুনে হেসে বলে তখন পূর্ণিমা, কেন বিয়ে হবে না, দিদিমণি হলেও বিয়ে হবে তোর। বলতে বলতে খোঁজ করতে লাগলো সে ছেলেটার। জিজ্ঞেস করলো সে মেয়েকে, হ্যাঁরে বাবুটা গেল কোথায় ?

—এই তো ছিল, দাদুর কাছে বৈঠকখানায় বোধহয়।

—না দাদুর কাছে নেই। দাদু তো তাগত পড়ছে। আধো আধো গলায় ত-ত করে বলল ছোটোটি।

—তাগত পড়ছে, গাল টিপে তাকে আদর করে পূর্ণিমা বলল আবার, আচ্ছা পড়া হয়ে গেলে দাদুর কাছ থেকে নিয়ে এসো আমার জন্যে, আমি পড়বো।

—আত্তা, বলে ছেলেটি ছুটে পালিয়ে গেল তারপর।

ঠিক এমনি সময় কার যেন বকাবকির গলা শোনা গেল। সেই সঙ্গে কান্নার আওয়াজও শোনা গেল ছেলের। পূর্ণিমার ছেলেটাই ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদছিল তখন। আর তারপরেই ছেলেটাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে

নিয়ে এলো তার বাবা পূর্ণিমার কাছে। এনে বলল, দেখ তোমার ছেলের কাণ্ডটা দেখ। বলে মেয়ের একটা বই ফেলে দিল স্ত্রীর সামনে।

পূর্ণিমা বইটা তুলে নিয়ে দেখলো যে, বইটার প্রায় সব রঙিন ছবিগুলো কাঁচি দিয়ে কাটা। আর বড় মেয়েটাও তাই না দেখে কাঁদতে শুরু করে দিল আমার বই কেটেছে বলে। তারপর পূর্ণিমা দমাদম্ ঘা কতক দিল ছেলেটাকে। এরপর ছেলে মেয়ের কান্না থামিয়ে, ছেলেকে দুধ খাইয়ে নিজের সামনে বসিয়ে রাখল শ্লেট পেন্সিল দিয়ে।

এমনি করেই পূর্ণিমার সকাল সন্ধ্যে দিনরাত প্রত্যহ কেটে যায়। ওরই মাঝে সময় পেলে কখনো বই পড়ে, কখনো বা মাসিক পত্রের পাতা ওল্টায়। আবার কখনো বা ইংরিজী খবরের কাগজখানা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়তে শুরু করে দেয়। পড়তে গিয়ে যেসব কঠিন ইংরিজী শব্দগুলো হাজির হয় তার সামনে, সেগুলোর মানে জেনে নেয় শশুরের কাছে। এ নিয়ে ছোটো দেওর ক্ষ্যাপায়ও মাঝে মাঝে, তবুও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না সে। মাঝে মাঝে যখন খেয়াল হয়, স্বামীর পর্বত প্রমাণ কমার্সিয়াল বইগুলোর মধ্যে থেকে সর্ট হ্যাণ্ডের ছোট্ট বইটা বের করে শব্দ চিহ্ন দেখতে থাকে সে। কিন্তু কিছুদূর এগুবার পর আর পারে না। এর ওপর আর একটা উপসর্গ হয়েছে তার, শিউলির কলেজের নতুন বই কেনা হলেই একবার গিয়ে দেখে আসবেই। একদিন তার জুলিয়াস সিজার বইখানা দেখে, তার নোট বইখানা নিয়ে এলো সে। সহায়ক ওই নোট বইটা তারপর অবসর সময়ে পড়ে নিলো। পড়ে মনে মনে ঠিক করলো, এ বইটার সিনেমা এলেই সে দেখতে যাবে। কিন্তু তাদের ওখানে মফঃস্বলে সে সিনেমা আসেওনি, দেখাও হয়নি তার।

এরই মধ্যে একদিন শশুরবাড়ী থেকে তার ননদ এলো সেখানে। কয়েক বছর হোলো এই ননদের বিয়ে হয়েছে তার। বিয়ে হয়েছে কোলকাতার প্রাণকেন্দ্র মধ্য কোলকাতায়। অতএব সিনেমা থিয়েটার গান জলসার আর্টিষ্ট আর রাজনৈতিক নেতাদের রকম রকম খবর সঙ্গে নিয়ে এলো সে। আর নিয়ে এলো তার নানান দেশ বেড়ানোর নানান ফটোর এ্যালবাম একটা। ফটোগুলো তার ও তার স্বামীয হাতে তোলা সব।

সেসব দেখাতে আর কোলকাতার রকম রকমের গল্প করতে তার ছিল ভারি উৎসাহ। সিনেমা আর্টিষ্টের কথা বলতে তো সে ছিল একেবারে অজ্ঞান। বিশেষ করে নাম করা কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর হাঁড়ির খবর তার

জানা ছিল। তাদের খাওয়া শোয়া চলা ফেরা এমন কি মত্ত অবস্থার অনেক অজানা কথা সংগ্রহ করে এনেছিল সে। অতএব সে তখন হয়েছিল চাটুয্যে বাড়ীর মেয়ে মহলে যেন এক আকর্ষণীয় বস্তু।

একদিন শিউলি তাকে তখন বলেছিল, বেশ আছো ঠাকুরঝি—বেঁড়ে মজায় আছো দেখছি তুমি। না আছে কিছু তোমার ঝঞ্ঝাট, না আছে সংসারে তোমার বাঁধাবাধি।

এই ননদটির কোন সন্তান হয়নি তখনো। তাছাড়া নিজের জায়ের সংসারে সে ছিল একরকম স্বাধীন মত। এখানে সেখানে যাওয়া আসায় বাধাই ছিল না কোন।

তাতে পূর্ণিমা বলেছিল তাকে, তোমারই বা কি ঝঞ্ঝাট আছে শুনি? বেশ তো দিব্যি কলেজে যাচ্ছো, সিনেমা দেখছো আর বেড়াচ্ছোও তো মন্দ না।

শিউলি সে কথার হ্যাঁ—না কোনো উত্তরই দিতে পারেনি তক্ষুনি। কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। যেন সে কিছু একটা ভাবছিল। যেন তার মনে হতাশার বেসুরো সুর একটা বেজে উঠেছিল তখন। কিন্তু তা সহজ হয়েই সম্বরণ করে নিলো তখনই।

ননদটি জিজ্ঞেস করেছিল তারপর, তা কলেজ কি রকম চলছে বৌ?

—ওই একরকম।

—কেন, একরকম কেন, কত নতুন মেয়ে বন্ধু হোলো সেখানে তোমার—সেসব তো তোমার কাছে একটা নতুন জগতের মত এখন?

—হ্যাঁ, বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে আবাহাওয়টা নতুন ঠেকেছে বটে, তবে ক্লাসের মেয়েদের কাছে আমি হোলাম দূরের মানুষ।

—সে আবার কি?

—হ্যাঁ, এর কারণ হোলো—একে হোলাম গিয়ে সেখানে সকলের চেয়ে বয়সে বড় আমি, তারওপর সিঁদুর পরা বৌ একজন। সকলেই ডাকে আমায় বৌদি বলে ক্লাশে।

পূর্ণিমা তার ব্যথার আঁচটা ধরতে পেরে বলে ওঠে তখন, তাতে হয়েছে কি, তাই বলে বয়েসের দোহাই দিয়ে কি শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখতে হবে?

—না তা হবে কেন, তবে অস্বস্তি যে আছে তাতে, সেটা কিন্তু সত্যি। বললে ননদটি তাদের।

এরপর কথার প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরিয়ে শিউলি বলল, তা ঠাকুরঝি তুমি তো শুধু হিল্লীদিল্লী মেরে বেড়াচ্ছো, কিন্তু ওদিকের তোমার খবর কি? অর্থাৎ তার সন্তানাদির ইঙ্গিত করলো সে।

তার সে কথা শুনে, ননদটি তার নিজের আঁচলের কাপড়টা টেনে নিজের কনুইয়ের ওপর তাবড়া করা ঝোলা মাদুলিগুলোকে চাপা দিতে শুরু করলো। কিন্তু তা চাপা দিলে হবে কি, বেরিয়ে পড়লো গলার বড় মাদুলিগুলোও সব। আর এতে ওই ননদের লজ্জায় যেন মুখটি রাঙা হয়ে উঠলো তখন।

তাই দেখে শিউলি তখন বলে উঠলো, এতে লজ্জার কি আছে ঠাকুরঝি।

পূর্ণিমা বলল, যতক্ষণ না হচ্ছে কিছু ততক্ষণ জ্বলতে হবে না আমার মত। তবে—

অসমাপ্ত কথা ঠোঁটেই থেকে গেল তার। বলতে গিয়ে চোখ পড়লো তার ননদের চোখের তারার দিকে। দেখলে সে দুটো চোখেই তার যেন তখন চক্‌চক্‌ করে উঠেছে আর তারপরেই তা থেকে গড় গড় করে অশ্রু বেয়ে নামতে শুরু করে দিল।

তা দেখে পূর্ণিমা ও শিউলি দুজনেই বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। পূর্ণিমা তো দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়লো এই ভেবে যে, অসাবধানে বোধহয় তার প্রিয় ঠাকুরঝির কোনো কোমল জায়গায় ঘা দিয়ে ফেলেছে সে। এরপরেই ননদের হাতটা ধরে সে বলল, ঠাকুরঝি অজান্তে যদি কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি, আমায় ক্ষমা কোরো ভাই।

তাতে ননদ বলল, না বৌদি সেসব কিছু না। শুধু একটা কথা আমার মনে হয় এখন—সংসারে সব পেয়েও আমি বঞ্চিত কেন?

সেকথা শুনে শিউলিও যেন কেমন হয়ে যায়। তারও দৃষ্টিটা তখন উদাসিনীর মত হয়। কিন্তু তক্ষুনি সে তা লুকিয়ে ফেলে।

এরপর আবহাওয়াটাকে সহজ ও সরল করে তোলার জন্যে পূর্ণিমা বলল, তুমি যেন কি ঠাকুরঝি, সময় কি তোমার চলে গেছে নাকি? বরং আরও এক আধটা বছর ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ করে নাও, তারপর তো রয়েইছে সব।

শিউলিও সে কথায় সায় দিল হ্যাঁ বলে। তারপরে সে একবার নিজের ঘরের দিকে যায়, ওই যা পাখাটা বন্ধ করে আসেনি বলে।

এই সময়ে পূর্ণিমা বলে ননদকে, তা ঠাকুর জামাইয়ের এখন খবর কি? অনেকদিন তো আসেনি এদিকে। খুব ব্যস্ত নাকি?

—কবে আর ব্যস্ত নয় বল, হয় লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে, নয়ত নাটক ফাংসান নিয়ে রয়েছেন সব সময়ে। তার মধ্যেও যেটুকু পান সময়, সেটুকুও বাড়ীর প্রতি ব্যয় করতে খুব কষ্ট হয় তাঁর।

পূর্ণিমা তাতে বলে, এবার এলে এখানে এসব কথা বলবো ওঁকে।

—বলো, দেখবে হেসে উড়িয়ে দেবে সব। এর ওপর আবার উনি তোমার রাজনীতি পাগল বাউণ্ডুলে সেজ দেওরের সঙ্গে নিত্যই রাত্তিরের দিকে তাদের পার্টি অফিসে আড্ডা দিতেও ভোলেন না।

—ও তাই সেজ ঠাকুরপো আজ কাল একেবারে শেষ ট্রেনটায় বাড়ী ফেরে রোজ!

—হ্যাঁ, সেজদাকে এসব বলতে পারো না তোমরা? দেখছো তো খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম করে কিরকম শরীরটা খারাপ হয়েছে সেজদার?

এরপর শিউলি ফিরে এসে বলে, দিদি চলুন না আজ কোথাও বেড়িয়ে আসি তিনজনে। যাবে ঠাকুরঝি?

—বেশ তো চল না।

পূর্ণিমাও মত দেয় যাবার। তারপর বলে কখন যাবে বলে, সেইমত কাজ কর্ম সব সেরে রাখবো।

ঠিক হোলো বেলাবেলি ব্যাণ্ডেল চার্চের দিকে বেড়াতে যাওয়া যাবে। তারপর সেখান থেকে হুগলীর ইমামবাড়াটাও দেখে নেবে তারা। পূর্ণিমা ঠিক করলো ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় দুটিকে শাশুড়ীর কাছে রেখে দিয়ে ছোটোটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে সে। আর তারপর সেইমত নিজের কাজ সারতে চলে গেল সে। এরপর তার ননদও চলে গেল তার পেছন পেছন, শিউলি গেল নিজের ঘরের দিকে।

সেদিন তারা ট্রেনে করে গিয়েছিল ব্যাণ্ডেল স্টেশনে। সেখান থেকে রিকসায় চার্চে। চার্চে ভগবান যিশুর মূর্ত্তি, তাঁর জীবন চরিত দেওয়াল ছবি গুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছিল তারা অনেকক্ষণ। তারপর সেখান থেকে রিকসায় আবার হুগলীর ইমামবাড়া দেখতে গিয়েছিল তারা। দেখতে দেখতে কখন যে দিনান্তের শেষ আলোটা চোখের ওপর দিয়ে বিদায় নিয়েছিল তা তারা প্রথমটায় ধরতে পারেনি। সেদিন তাদের তিনজনের মনই হারিয়ে গিয়েছিল যেন এক বাধাহীন কোন অজানা পথেই। তারপর তাদের নজর পড়লো তখন সেদিকে, যখন পূর্ণিমার ছোট্ট মেয়েটার আধো আধো গলায় শুনলো, মা বাড়ী যাবে না?

পূর্ণিমা বলল তখন, চলো ঠাকুরঝি এইবার ফেরা যাক্।

শিউলি বলল, এখান থেকে বাড়ী তো বেশী দূর না। বাসে গেলেও আধ ঘণ্টার আগেই পৌঁছে যাবো বাড়ি। আর একটু থাকুন না, বেড়ানো তো হয়ই না আপনার!

ননদ বলল, চলো একটু বরং গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে এসে তারপর বাস ধরবো।

এরপর তারা একটা ঢালু রাস্তা ধরে গঙ্গার দিকে নামতে লাগলো। তখন সবে এক আধটা করে আলো জ্বলতে শুরু করেছে ওদিকটায়। একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়লো হুগলীর বড় হাসপাতালটাকে। আর দেখা গেল তাতে পরিবার পরিকল্পনার তিনটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার মা বাপের হাসিতে উজ্জ্বল ছবির বিজ্ঞাপনটা।

এ দেখে নানান জায়গায় সকলেরই চোখ পড়ে গেছে। অতএব কেউ দাঁড়ালো না তখন। শুধু পূর্ণিমা একটু আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে এমনি সেদিকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল তখন। আর তাতেই সে একটু পেছন দিকে তফাতে পড়ে গিয়েছিল। তারপরেই সে আবার মেয়েটাকে একরকম ছুটিয়ে শিউলিদের সমান বরাবর এসে পড়েছিল জোরে জোরে পা ফেলে। তারপর বলেছিল, আর দেরী কোরো না এবার বাড়ি চলো ভাই তাড়াতাড়ি। ছেলে মেয়ে দুটো কি যে করছে এতক্ষণ বাড়ীতে কে জানে?

সে কথা শুনে তার ননদ ও শিউলি দুজনেই বলে, তাদের ঠাকুমা তো রয়েছেন, আর রয়েছে বাড়ীশুদ্ধু লোক সব।

—তা আছে, তবে, চুপ করেই গেল জোর করে পূর্ণিমা এরপর।

বলতে বলতে তার ননদ ও শিউলি আরও বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের তখন আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে। গঙ্গার ওপর দিয়ে ওই যে চঞ্চল ছোট বড় ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তরতর করে ছুটে চলেছে পাল তোলা ওই নৌকোগুলো, ওদের মত ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল দূর দূরান্তে কিন্তু পূর্ণিমা এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলো, আর না ভাই, ফেরো এবার।

বাস্তবিক ওরা তখন দুদল হয়ে গিয়েছিল। একদিকে পূর্ণিমা, অন্যদিকে তার ননদ ও শিউলি। ওদের মনের চৌহদ্দিতে তখন তৃপ্তি অতৃপ্তির বিভক্তির পাঁচিল উঠে গিয়েছিল।

শম্ভু রক্ষিত

তবু তোমার সম্মোহনে জন্ম নিয়ে

আমি তোমার সামনে তন্ময় হয়ে বসে আমার কৃতকর্মের জন্য
ক্ষমা চেয়ে নিলাম
আমার নিসঙ্গতার সঙ্গ দেবার জন্য তোমার স্বর্ণতন্তু রচিত শাড়ি
ধরে কাঁদলাম
এবং লাল পাথরের রোষ থেকে তোমাকে ত্রাণ করার জন্যে অস্পষ্ট
আবছায়ার মত উড়লাম আকাশে
তুমি জীবিত মৃত, তোমার গর্ভগৃহের ধুকধুক শব্দই শুনতে চেয়েছিলাম
তুমি কার শব আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করলে কার তীর্থপথ মিশে
গেল সূর্যের গভীরে
নির্মিত অনুষঙ্গ নিয়ে এখন অনুপূর্ব সম্রাটেরা দীর্ঘদিনের ঘুম থেকে
জেগে উঠছে

আমি তো রৌদ্রে তাদের হিরণ্ময় বেদীতে বসে তোমার সাথে
যৌনতাবিহীন প্রেম করেছিলাম
অনুভব করেছিলাম সমগ্র মাটির ভিতর পা ঢুকিয়ে দেবার এক
ধূম্রবর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে
স্বপ্নালোকের অভ্যন্তরে রেখেছিলাম তোমার নিরাময় যতো স্বগতোক্তি
তবু তোমার সম্মোহনে জন্ম নিয়ে বিষণ্ণতা অসুখের মত ভেসে উঠছে

আমি এক বন্দীর জীবনযাপন করেছি, তুমি আমায় ইসারা দাও
আমি সারাদিন দু'হাত আলোকিত করে লজ্জাহীন ঘুমিয়ে পড়েছি
আমি আলোকবিন্দু সম্মুখে রেখে পরিশ্রান্ত হতে চাই, আমি প্রায়
নগ্ন কৃষ্ণকায় মানুষ
আমি গৈরিক জানালার নীচে মাংসাশী ফুলের মত তোমাকে গ্রাস
করতে আশ্চর্য উৎসুক

আমার শাশ্বত আনন্দ হয়, যখন দেখি তোমার চোখে রূপের আকর
আমি তোমার শাপে জরাগ্রস্ত হয়েছি তুমি আমার বাধা পেরিয়ে যাও

আমি চন্দ্রমাশীতল রাত্রে খুঁজেছিলাম তোমার গাল আমার গলার পাশে
আমি উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাসে তোমাকে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিলাম : সব মানুষ
জন্মকাল থেকে সমান

অমিতাভ দাস

বাংলাদেশ/১৯৭১

এখন ঈশ্বরীর মতো তোমার মুখ হেসে উঠছে
অনশ্বর শেকল তোমার সহজে খুলে যাচ্ছে
নির্বাসনের কালো পাঁচিল ভেঙ্গে যাচ্ছে
তুমি পায়ে পায়ে ঘৃণিত অন্ধকার মাড়িয়ে
জাগরণে জেগে দেখ্ছো স্তিমিত উৎপাত
তোমার পায়ে ছড়ানো ফুল যা কখনো সাহস করে হাত দিতেনা
শিখর ছোঁয়া সিংহাসনের ভয়ের মূর্তি শ্মশান খোঁজে

চেয়ে দেখো শপথ কঠিন রাস্তা জুড়ে নিশান ওড়ে
নরমেধের ঘোড়াগুলি অনন্যোপায় কাঁপতে থাকে
এখন সফল তুমি কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবোনি
এমন সুখের ফুল ফোটাবার সোনালী দিন
চোখের জলে হারিয়েছিলে
শোণিত স্রোতে ঐরাবতের দর্প দেখো তলিয়ে যায়

মাগো তুমি ঈশ্বরীর মতো স্থাপিত বেদীতে বসে আছো
মাগো তুমি উপস্থিতি অকল্যানে
কেঁদে উঠছো
অনস্তিত্ব দিনের মতো
মাগো ঝড়ে ঝরাপাতা পশুর পাহাড়
সঙ্গে কিছু প্রিয় ফুলের ঝরার সময়
পবিত্র পথ ধরতে গেলে কাঁটার আঘাত সইতে হবে
এখন তুমি কেঁদে কেঁদে বুকের ব্যথা ঝরিয়ে দাও
বিসর্জনের বাজনা বাজে
মাগো এবার নিজের হাতে ঘরের দুয়োর খোলার সময়
অন্ধকারের বুক মাড়িয়ে রক্তরাঙা সূর্য আসে

আবুল আহসান চৌধুরী

আলো ফুটবে বলে কবিতা

বারুদ-জ্বলা চোখে আজ দেখ্‌ছি আমার মা-কে
এক সময় কী মমতা ছিলো সে চোখে
আমার জনম-দুখিনী মা
তার আবছা চোখের তারায় জ্বল্‌ছে চরমদিনের উস্‌কানি ॥
ভেঙে ফেলে পথ আসছে যে-জন
সেই তো আমার পিতা
বৃদ্ধ পেশীতে জাগবে আবার শক্তি-মাটাল ঢেউ
সেই তো আমার পিতা
মিছিলের গানে জাগালো স্বদেশ
আমার পারুল বোন
হাতে হাতে আজ বাঁধে যে রাখী
সেই তো আমার বোন ॥
আঁধার কেটে যে আন্‌বে সূর্য
আমার সোনার ভাই
মুক্ত-স্বদেশে আলোর পুরুষ
জেনো সেই তো আমার ভাই ॥

অনন্য রায়

একটি অনুভব

....

আমি অনুভব করি—

হৃদয় ময়ূর যেন, মেলেছে পেখম—
প্রেমের অজস্র বৃষ্টি নামবে এখনই।
সহস্র কদম ফুল ফুটেছে এ মনে।
রজনীগন্ধার ঘ্রাণে সন্ধ্যা ভরপুর।
উদার সুনীল ঐ মহাকাশে উড়ে উড়ে
কোনো এক পাখি যেন
গাইলো গান ; সে আনন্দগানে
শুনতে পাই : 'জীবনের তীব্র সার্থকতা
স্বার্থহীন দৃপ্ত আত্মদানে'॥

ধারাবাহিক উপন্যাস

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

মধুবন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ এগারো ॥

. ...

কয়েক মাসের মধ্যেই কাঁচ-বাংলার চেহারাটা একেবারে পাল্টে গেল। শেখর বলেছিল, আমার কোন আপত্তি নেই। অসুবিধে নেই। কাঁচবাংলাকে দুভাগে ভাগ করে মাঝখানে দেয়াল তোলা চলতে পারে। গেট থেকে নাক-বরাবর পাঁচিল টেনে একেবারে শেষ সীমানায় নিয়ে গেলেই হল।

সুলতার আপত্তি ছিল।

বলল, তা হয় না।

কেন হয় না ?

সুলতা একটুখানি হেসে বলল, তা হয় না শেখর। এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।

শেখর বলে, তাহলে, কি হলে হয় ?

সুলতা উত্তর দিল, কাঁচবাংলা যেমন আছে তেমনি থাকবে।

—কিন্তু আমি আর এভাবে কারবার চালাতে রাজি নই।

শেখর কথাটা সুলতার চোখের দিকে চেয়ে বলতে পারল না। আপনিই তার মাথা নিচু হয়ে এল।

কিছু শক্তি সঞ্চয় করে আবার বলল, আগে তবু যা হয় চলেছে। এখন একেবারে অসম্ভব।

সুলতা চুপ করেই ছিল। শেখরের কথাগুলো তার কানে সম্পূর্ণ অর্থবহন করে প্রবেশ করছিল কি না, বলা শক্ত।

শেখর বলে, নতুন রেঞ্জার আসবার পর থেকে আমাদের কাজের ধারা একেবারে বদলে দিতে হবে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। ঠিকাদাররা যে তার কেনা গোলাম নয়, এটা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। তার মত শতখানেক চাকর কাঁচবাংলার অধীনে কাজ করে। আমার ম্যানেজারের মাইনে ওর ডি-এফ-ও র চাইতেও বেশি। আর, সে কি না···

স্নলতা বাধা দিয়ে বলে, সে যা-হয় তোমরা কোরো শেখর। আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরেই সরে যেতে চাই। কাঁচবাংলা ভাগ করার প্রয়োজন হবে না।

কেন ?

ওতে অনেক কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অসাবধানে পা-ফেলে চললে তখন সকলেরই পা কাটবার ভয় থাকবে।

স্নলতার এ কথায় শেখর যেন বেশ উৎসাহ বোধ করল।

আরো একটু সোজা হয়ে বসে বলল, তোমার এ ভয় একেবারে নিরর্থক। দেখো, আমি এমন ভাবে দেয়াল টানবো···

শুষ্কমুখে স্নলতা বলল, তা আমি জানি শেখর। তোমার হাতে এখন অনেক দক্ষ কারিগর। ভেঙে না পড়লেও ফেটে ফেটেও তো যেতে পারে কাঁচগুলো। সে বড় বিশ্রী হবে দেখতে।

এবার বিপুল উৎসাহে শেখর উঠে দাঁড়াল। বলল, একবার এসো। বাইরে। দেখ, আমার প্ল্যানটা হচ্ছে···

স্নলতাকে চোখ বুজতে দেখে মাঝপথেই থেমে গেল শেখর। একটু কাছে গিয়ে বলল, তোমার শরীরটা বোধহয় আজ তেমন ভাল নেই, না ?

অবিনাশের অনেক সাধের এই কাঁচ বাংলা।

নামটা অবশ্য এ অঞ্চলের লোকদেরই দেওয়া। মস্ত সেই বাংলো বাড়ীটার চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা। কাঁচ দিয়ে ঘেরা। কেন এমন পরিকল্পনা ছিল অবিনাশের সে কথা কারো জানা নেই। এক এক খণ্ড কাঁচ যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে। তার ওপর রকমারি নক্সা। রং-হীন নক্সা কাঁচের গায়ে—গায়ে। পরিচ্ছন্ন রাখলে কত বাহারি ছবি ফুটে উঠেছে, স্পষ্ট দেখা যায়।

স্নলতা চেয়ে চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ।

বলল, শেখর তুমি তখন অনেক ছোট। আমিও খুব বড় নই। বাবার চোখের স্বপ্ন পড়বার বয়েস আমারো তখন হয়নি। বয়েস যখন বাড়ল, তখন বুঝলাম, অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর।

শেখর বলে, তুমি ভুল করছ। বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার যে পথ আমি বেছে নিয়েছি, হয়তো সেইটেই যথার্থ। তুমি আরো একটু ভেবে দেখো।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুলতা বলে, আমি অনেক ভেবেছি শেখর। শক্ত হাতে সব কিছু বজায় রাখতে কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু···

—কিন্তু, কি? বল?

কিন্তু দেখলাম, সে হবার নয়।

কেমন করে বুঝলে তুমি?

সে আমি তোমায় বোঝাতে পারব না শেখর। আমার বিশ্বাস, কাঁচবাংলাকে জীইয়ে রাখা সম্ভব নয়।

শেখর এবার শান্ত কণ্ঠে বলে, বেশ তো। আমি এবার চেষ্টা করে দেখি।

হাসল সুলতা। বলল, বেশ। তাই দেখ।

•

এ তোমার একেবারে ছেলেমানুষি সেন্টিমেন্ট শেখরচাঁদ। আমরা তো তাঁকে চলে যেতে বলিনি, তাঁকে ঠকাতেও যাচ্ছি না। সে বাসনাও আমাদের নেই।

শেখরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে সুন্দরম আবার বলে, আছে? বল?

শেখরচাঁদ তবুও কোন কথা বলল না।

সুন্দরম বলে, একেবারেই না। তাঁর সব প্রাপ্যই তো আমরা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। মালিকের কাগজপত্রের এতটুকু অবমাননা আমরা করিনি। করবও না। লাভের অংশ এতটুকু তাঁর এদিক-ওদিক হবে না।

শেখর বলে, আমি সে সব ভাবছি না। আপনি অন্যকথা বলুন।

হ্যাঁ, সেই কাজের কথাই তো বলতে এসেছি। আমাদের সদর অপিসে যেতে হবে। যেমন করেই হোক এই নতুন রেঞ্জারকে বদলী করতে হবে।

না। আমি সে পথে যেতে চাই না। ভয়টা কিসের শুনি? আমরা ওর মোকাবিলা করব।

সায় দিয়ে সুন্দরম বলে, ঠিক বলেছ। কতো সতীলক্ষ্মীই দেখলাম! এ-তো নব্য ছোক্‌রা। গরমটা একটু মরতে দাও। দেখবে সোজা হয়ে গেছে। তাছাড়া বুঝছ না, বে-থা করেনি। সংসার বোঝেনি তো। চাপ পড়লে বড় বড় রথী-মহারথী বাপ্‌ বলতে পথ পায় না, এ ছার কোন্‌ দেব্‌তা? চাঁদির

জুতো, যাকে বলে ভিটামিন্ 'এম্', পড়লে কতো সোনার চাঁদের মগজ ঘুরে যেতে দেখেছি।

শেখর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল বারবার।

সুন্দরম বলে। তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। কর্তার আমলে সব কিছু তো আমিই সামলে এসেছি। এখনো তার কোন নড়চড় হবে না। বুঝছ না, আঁতুড়ের গন্ধ এখনো ওর গা থেকে যায়নি কিনা, তাই একটু যা অসুবিধে।

জিজ্ঞাসু চোখে শেখর চাইল সুন্দরমের দিকে।

হ্যাঁ। ঠিক তাই। আঁতুড়ের গন্ধ। ঐ ডেরাডুনের গন্ধ আর কি।

আরেকটা কথাও ছিল শেখরচাঁদ। তাঁকে মানে তোমার দিদিকে কোন অশ্রদ্ধা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু তা হয় না। মেয়েছেলে মালিক হতে পারে, কিন্তু কর্মকর্ত্রী হতে গেলে সব নষ্ট হতে বাধ্য। তারওপর ওঁর যত দরদ, যাদের দিয়ে আমরা কাজ করাব তাদের উপর। তা কি চলে?

শেখর চুপ করেই ছিল।

সুন্দরম বলে চলে, প্রথম প্রথম আমরা সবাই অবাক হয়ে গেছিলাম সত্যি। এ যে পুরুষের কান কাটে। কিন্তু জানতো শেখর, মেয়েমানুষের দর্প বড় সাংঘাতিক জিনিস। সবকিছুকে রসাতলে পৌঁছে দিতে এমন কিছু আর নেই সংসারে। ঠিক সময় তুমি লাগাম টেনে ধরেছ।

শেখর বলে, দেখুন, আমি আর কিছু চাই না। বাবার আমলের সুনাম নষ্ট না হয় এইটুকু আপনি দেখবেন।

সে আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তার জন্যে আমি তো রইলাম। কর্তাও ঠিক একদিন এই কথাই বলেছিলেন। সিংহের বিক্রম নিয়েই তিনি চলে গেলেন। কোথাও তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে কোন দিন দিই নি। আর, তাছাড়া জানো শেখর, একটা মায়া পড়ে গেছে আমার। মায়া এই কাঁচ-বাংলার ওপর। তার সুনামের ওপর। আজো এ তল্লাটের যত কোম্পানী, তারা হাঁ করে চেয়ে থাকে। দেখে, শেখে। আমাদের কাছেই শেখে। কেমন কোরে কাঠ পিটিয়ে সোনা ঝরাতে হয়, সে আর্ট তো সকলের করায়ত্ত নয়। সেখানে কিনা সতীনাথ রায়, কালকের ছোকরা, কেতাবী বুদ্ধি দিয়ে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে! ভেবে দেখ একবার জঙ্গলগার্ডগুলো যারা এতদিন আমাদের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর হাতে ঘড়ি পড়ত, সাইকেল চাপত, একশ টাকা মাইনে পেয়ে তিনশ টাকা মনিঅর্ডার করত দেশের বাড়ীতে, মেয়ের বিয়ে দিত

ঘটা করে, শহরের কলেজে ছেলেকে আই-এ বিএ পড়াত, মানে জঙ্গলের ছোট খাটো জমিদারের মত জীবন কাটাতো, তারাও ওর চক্কোরে পড়ে যেন সব তৈলঙ্গস্বামী সেজে নোলা গুটিয়ে বসেছে। কিন্তু চোখ দেখলে তো বুঝি। লোভের জিভ ওদের চোখ দিয়ে লক্‌লক্ করে বেরিয়ে আসে। ভেতরে ভেতরে সবাই আগুন হয়ে আছে। সেখানে সতীনাথের সতীত্ব কত দিন বজায় থাকতে পারে বল ?

সুন্দরম বিজ্ঞের হাসি হাসে অনেক্ষণ ধরে।

কিন্তু কি আশ্চর্য জানো, উনি, মানে তোমার দিদি যেন…

বাধা দিয়ে শেখর বলে আপনি ভুল করছেন।

সামলে নিয়ে বলে সুন্দরম, ঠিকই বলছিলাম শেখরচাঁদ, উনি যেন তোয়াক্কাই করতেন না ওসব। তুমি ঠিক ধরতে পারলে না শেখর।

যাক। সকলকে বলে দেবেন, অপিসের নিয়ম-কানুনগুলো যেন সবাই ঠিক মেনে চলে এবার থেকে।

সে আমি বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি সবাইকে। বলে দিয়েছি, ভুলে যাও আগেকার আমল। কাঁচবাংলা আর দাতব্যচিকিৎসালয় নয়। হেঁপো খোঁড়া, হুলো, চালসেওলা, এদের আর স্থান হবে না এখানে। সাতভূতে লুটেপুটে খাবে আর কাঁচবাংলা গোল্লায় যাবে। শেখরচাঁদের আমলে সে দিবা স্বপ্ন যেন কেউ না দেখে। মনে করিয়ে দিয়েছি, শেখরচাঁদের নিশানা নির্ভুল।

শেখরকে নিয়ে অবিনাশের চিন্তাটা যে কোথায় ছিল, সুন্দরম ছাড়া সেকথা তেমন করে কেউ ধরতে পারে নি। নিরুপায় ঈশ্বরের মত অবিনাশের শেষ দিনগুলোর কথা একমাত্র সুন্দরমই জানে। তাই মাঝে মাঝে নিজের হারানো ব্যক্তিত্বের বেদনায় শেখর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়, সুন্দরম সতর্ক হয়ে ওঠে। সজাগ হয়ে ওঠে। বন্দুক, মদ আর অফুরন্ত যৌবন নিয়ে খেলা করা শেখরের রক্তে নেশা জাগায়। সম্বিত ফিরে এলে সে খেলার রসদের উৎস সম্বন্ধে সাময়িক ভাবে হলেও শেখর যেন একটু বেশি সচেতন হয়ে উঠতে চায়। সুন্দরমের কাজ সেখানে একটু রাশ টেনে ধরা।

প্রকৃতির নিয়মে অক্ষম শিশুর হামা দেওয়া কালে মাঝে মাঝে হঠাৎ দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার নিস্ফল প্রয়াসের খেলা যেমন অনেকের কৌতুক আহ্লাদ সৃষ্টি কোরে মৃদু হাততালির সঙ্গে অনর্থক উৎসাহদানেরও খোরাক জোগায়, শেখরচাঁদের স্বাধিকার সচেতনতার, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের এই নিরর্থক

হঠাৎ-প্রস্তুতির খেলাও ঠিক তেমন সুচতুর সুন্দরমের মনে কৌতুকভরা কৃত্রিম সহযোগিতার সৃষ্টি করে তার নিজের আত্মবিশ্বাসকে যেন আরো কয়েকগুণ বাড়িয়েই দেয়।

সুন্দরমের দৃঢ় বিশ্বাস, কাঁচবাংলার একমাত্র নিয়ামক আজ সে নিজে। রাখলে রাখতে পারে, ভাঙলে ভাঙতে পারে। বিশ্বাস করে, সুলতা পালিয়ে গেল! জানে না পালিয়ে যাওয়া আর ত্যাগ করে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কতটা। বৈষয়িক তৎপর মানুষের কাছে অবিশ্যি সে পার্থক্যের মূল্য এক কানাকড়িও নেই। দুয়ে দুয়ে চার ছাড়া আর তাদের কাছে কোন হিসেব নেই। আর কোন হিসেবের কথা তারা বুঝতেও শেখেনি।

সুন্দরম সিগার ধরায়।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরের বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আধবোঁজা চোখে চেয়ে দেখে যেন পাহাড়ী পথে মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছে সুলতা। কোথাও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। অবিনাশের দৃঢ়তা দিয়ে গড়া সুলতা। সাজ পোষাকে প্রতিপদক্ষেপে যার অনমনীয় দৃঢ়তার ছাপ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট।

কি হোল? আজ বড় তাড়াতাড়ি ফিরলে যে সুলতা?

আপনার ঘড়িটা কি বন্ধ?

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সুন্দরম বলে, একটুও ঘামোনি কি না, তাই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

এগিয়ে গিয়ে লাগাম ধরে সুন্দরম।

সুলতা সেদিকে না চেয়েই ছুটে যায় বাড়ীর ভেতর।

রাশভারি অবিনাশ চোখ তুলে তাকান।

মৃদু হেসে বলেন, রাণী তোমায় বিরক্ত করে না তো আর?

না বাবা। রাণী এখন খুব শান্ত। খুব বাধ্য আমার।

হুঁ। অবিনাশ বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে চুপ করে থাকেন। তৃপ্তি অনুভব করেন। অস্থির রাণী তাঁর বাধ্য হতেও মাঝে মাঝে অস্বীকার করে বসে। সুলতার কাছে সে শান্ত।

আবার চোখ তুলে তাকান মেয়ের দিকে রাশভারি অবিনাশ। জানো, রাণীকে আমি বিক্রি করে দেব ভাবছিলাম।

তাই তো আমারো জেদ চেপে গেল বাবা।

হুঁ।

অবিনাশ আবার চুপ করে যান।

সেই জেদ!

যা তাঁকে আজ বিখ্যাত করে তুলেছে। যে জেদ তাঁকে সকলের কাছে নমস্য করে তুলেছে। যে জেদ তাঁর মাথা আজ এতটা উঁচু করে দিয়েছে।

সেই জেদ।

একদিকে অবিনাশের প্রাণ মন ভরে ওঠে সুলতাকে দেখে। আবার হঠাৎ কেন যেন অকারণ দুশ্চিন্তার ছায়া ভেসে আসে তাঁর মনের আকাশের একটি কোণে। অবিনাশ জানেন, এই জেদ হয় মানুষকে একেবারে ওপরে তুলে নিয়ে যায়, আর না হয় রসাতলে পৌঁছে দেয়। সুলতার ভাগ্যে কোনটা আছে, ভবিষ্যতের সমস্ত বুকটা চিরেচিরেও অবিনাশ তার হদিশ পান না। শেখরের দিকে চেয়ে দেখেন, কাঁচ-ঘেরা বারান্দায় বসে রাইফেলের নল পরিষ্কার করছে শেখরচাঁদ।

সিগারের ধোঁয়াগুলো হাল্কা হয় আরো। আস্তে আস্তে মিলিয়েও যায়। সুন্দরম শব্দ করে হেসে ওঠে।

অবিনাশের স্বপ্নগুলো খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে কাঁচ-ঘেরা সেই বারান্দার শক্ত মেঝের ওপর।

গেলাসে চুমুক দেয় সুন্দরম।

নতুন করে সিগার ধরায়।

সুলতা।

বলুন।

তোমার মুখখানা দেখলে তোমার মায়ের কথা মনে পড়ে আমার। সুলতা সোজা চোখ তুলে তাকায় সুন্দরমের মুখের দিকে। বলে, সেই তো স্বাভাবিক।

তবু····। কি মনে হয় জানো?

জানি।

বলোত কি? Please তুমি জাননা সুলতা, আমার স্বপ্ন···

You are my paid servant. আমি জানি।

চোখবুজে ফেলে সুন্দরম। অনেকক্ষণ পর চেয়ে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে সুলতা। হাতে তার ঘোড়ার চাবুক। চোখে মুখে অবিনাশের দৃঢ়তা।

সিগারের ধোঁয়াগুলো জানলা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

সুন্দরম আবার শব্দ কোরে হেসে ওঠে। হঠাৎ চমকে ওঠে যেন। তার নিজের বিকৃত-স্বপ্ন কাঁচবাংলার শক্ত মেঝের ওপর গুঁড়িয়ে দিয়ে চাবুক হাতে স্থলতা নেমে গেল। রাণীর পিঠে চড়ে এক নিমেষে সে উধাও হয়ে গেল। গেটের বাইরে মেঠো পথে একখণ্ড হাল্কা মেঘের মত কিছু ধুলো ভাসছে।

এই তো বেশ, মা। এই তো ভালো। এছাড়া আর তো কিছু হওয়া সম্ভবও ছিল না। কাঁচবাংলার মধ্যে তুমি বন্দী হয়ে ছিলে। মুক্ত মানুষের কাছে আকাশটা যে কতো বড়, কতো বিশাল এই পৃথিবী, সে খবর লক্ষ্মী-ঠাকরুণের বন্দীশালার মধ্যে থেকে তুমি কোনদিনও টের পেতে না। অথচ তোমার মন চাইছিল বাইরের দুনিয়া। সে বদ্ধ অবস্থা যে কী যন্ত্রণাদায়ক, আমি বুঝি।

মোহন মিত্রের কথাগুলো স্থলতার আজ বড় ভাল লাগছে। কিন্তু কাঁচ-বাংলার সঙ্গে শিশুকাল থেকে যত স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কয়েকটা দিনে তা মুছে ফেলা তো সম্ভব নয়। মুক্তির নিশ্বাসের সঙ্গে মানুষ আরো একটা জিনিষের জন্যে কাতর হয়ে থাকে। তার নাম আশ্বাস।

ছোটবাংলার অপিস উঠে চলে গেছে কাঁচবাংলায়। স্থলতা নিশ্চিন্ত হয়ে সব গুছিয়ে বসবে ভাবছে দুমাস থেকে। কিন্তু কিছু আর গুছিয়ে তোলা হয়ে ওঠেনি। বাসব-রতনমাঝির দল প্রায় সব সময় এখানেই থাকে আজ-কাল। জীপ গাড়িটা গ্যারাজেই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পুরোন দাসদাসীদের কেউ নেই এখানে। অনেক পরিচিতের মাঝেও স্থলতার মাঝে মাঝে বড্ড একা মনে হয়। অবিনাশ আর শোভারাণীর ছবি দুটি সঙ্গে এনেছে স্থলতা।

শুধু টাকা-পয়সা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এই নিয়েই কি মানুষ তৃপ্তি পেতে পারে কাকাবাবু? স্থলতা প্রশ্ন করে।

মোহন মিত্র বলেন, জানতাম, এ প্রশ্ন তোমার জীবনে একদিন দেখা দেবেই। তুমি ঠিকই বলেছ মা, অনেকে সম্পদের চূড়ায় বসেও অতৃপ্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। আবার মজা দেখ, সেই সম্পদ আহরণের অক্লান্ত আজীবন পরিশ্রমকে মানুষ তপস্যা নাম দিয়ে, সাধনা নাম দিয়ে ক্ষণিক আত্মতুষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসে মত্ত থাকে। যখন শেষ সীমায় পৌছয়, তখন ভাবতে সে বাধ্য,— "এর পর"? অবশ্য সে চিন্তা দেখা দিতে পারে তেমন মাত্র কয়েকজনের মধ্যে

যাদের ভেতর সৃষ্টিকর্তা দু-চার ফোঁটা মানুষের রক্ত ভুল করে দিয়ে ফেলে থাকেন।

আবার বলেন মোহন মিত্র, মানুষের মন-সমুদ্রের অতল-তলে সবারই একটা কোরে গোপন চেম্বার আছে। সেইখানেই তার সত্যিকারের চেহারা। শুধু সেইখানেই সে নিজের কাছে খাঁটি সত্যি। বাইরে সবাই এক একজন সাজানো বাঁদর। বাঁদরের নাচ দেখেছ?

লোভের ছড়িটার শাসনে কখনো সে বাঁদর 'শ্বশুরবাড়ী' যায়, আবার কখনো মাথায় দুহাত তুলে 'জল ভরতে' যায়। কখনো বা মাতোয়ালা হয়ে ধূলোয় লুলোপুটি খায়। সব খেল্-এর পেছনে উদ্দেশ্য কিন্তু এক। একমুঠি ভিক্ষে। পেয়ে গেলেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নাচনদারের কাঁধে লাফ মেরে উঠে সরে পড়ে। এতক্ষণ তার নানান খেল্ দেখে যারা বারবার হাততালি দিলে, খুশি হয়ে ভিক্ষে দিলে, তখন সে আর তাদের কেউ নয়। তখন সে শুধুই ঐ নাচনদারের পোষা বাঁদর।···ঘরদোর গুছিয়ে ফেল। তোমার মত মেয়ের কি এমন মনমরা হয়ে পড়ে থাকলে চলে ?

মন আমার মরে নি কাকাবাবু। তা যদি হোত কোলকাতায় চলে যেতাম, যেখানে মরা মনের হাট। হেমপিশি চিঠি লিখেছেন। আর এ জঙ্গলে থেকে কি কোরব! কোলকাতার বাড়ীতে বাদুড় আর মাকড়সার জাল।

কেন, শেখর তো মাসে তিনবার যায় সেখানে।

হাসল সুলতা। বলল, হেমপিশি যা লিখেছেন তাই বললাম।

মোহন বলেন, আর কি লিখেছেন তোমার হেমপিশি ?

লিখেছেন, সুধাদাদুর এ বয়েসে বনবাস আর সইবে না।

সুলতা সুধাময়ের দিকে চেয়ে বলে, সত্যিই ওঁর বড্ড কষ্ট হয়।

হেসে মোহন বলেন, কিন্তু পঞ্চাশোর্দ্ধেই তো বনং ব্রজেৎ। সুধাময় বলে, ওসব কেতাবে আর শাস্ত্রে লেখে বটে। কিন্তু জীবনে ওকথাটা একেবারে অচল বলে মনে হয় আমার। মোহন বলেন, আমি রয়েছি কি করে ? আর, চেয়ে দেখুন, বুড়ো মানুষ কি নেই জঙ্গলে ?

ওরা আদিবাসী।

আমরা কি অনাদিবাসী ? অনাদি কাল থেকে বাস করে করে আমরা কি জড় হয়ে গেছি ?

সুধাময় বলে, সে কথা নয় মোহনবাবু। আমার শরীর আর বইছে না।

আর তাছাড়া দিদি আমার এখন সাবালিকা। ব্যবসাপত্তরের ঝামেলাও আর ওকে বইতে হবে না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে সুধাময় আবার, অবিনাশের সে কাঁচবাংলাই যখন আর রইল না, আমার আর এখানে মন টিঁকছে না মোহনবাবু।

সুলতার দিকে চেয়ে বলে সুধাময়, দিদিকে কতো বলছি, আর এখানে থেকে কি হবে? ফিরে চল কলকাতার বাড়ীতে। সে তো তোমারও পৈতৃক বাড়ী। এ বনজঙ্গলে একা একা আর পড়ে কেন থাকবে?

মোহন বলেন, সুলতা, সুধাময়বাবু ঠিকই বলছেন। কি বল?

হ্যাঁ। উনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু জানেন তো, কলকাতার বাড়ীতে কেবল বাদুড় আর মাকড়সার জাল।

সুধাময় বলে, কি যে বল দিদি! চক্‌চকে তক্‌তকে এমন সুন্দর সাজানো বাড়ী তোমাদের সেখানে। শেখর ভাই বলে, তার সখের আস্তানা। আর তুমি কিনা সেখানে কেবল বাদুড়ের ঝাঁক আর মাকড়সার জাল দেখ? জঙ্গলে তোমার বাঘ ভাল্লুককে ভয় হয় না, আর কলকাতায় মাকড়সার জালকে হয় ভয়? এ তুমি কেমন কথা বলছ দিদি?

সুধাময়ের মন উঠে গেছে ঝালুকপোখর থেকে। অবিনাশের মৃত্যুর পর তিনি মনে করেছিলেন তাঁর তত্ত্বাবধানে শেখর আর সুলতা কাঁচবাংলার মান-সম্মান বজায় রেখে অবিনাশের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। সুধাময় জানতো, সে স্বপ্ন অবিনাশের-ও ছিল। কিন্তু নিরুপায় ঈশ্বরের মত কেটেছে তার শেষের দিনগুলো। সুধাময়েরও আজ সেই একই অবস্থা যেন।

মোহন মিত্র বলেন, সুধাময়বাবু, অনিবার্য যা, তা এমনি করেই ঘটে। স্বপ্ন অনেকের অনেক থাকে। সার্থক হলে তো কথাই ছিল না। তাহলে কি কোন সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তো কোন দিন?

সুলতার দিকে চেয়ে বলেন, তোমার মন যেমন কাঁচবাংলা থেকে উঠে গেছে, সুধাময়বাবুরও তেমনি ঝালুকপোখর থেকে। ওঁকে আটকে রাখার আর কোন স্বপ্ন উনি নিজেও গড়ে তুলতে পারবেন না, তুমিও তাঁর জন্যে নতুন কোন কিছু অবলম্বন দিতে পারবে না।

সুলতা বলে, তা জানি। আমি শুধু ভাবছি, আমার মেয়াদই বা আর কতদিন এখানে, কে জানে?

মোহন মিত্র উঠে পড়লেন।

আজ চলি মা। কিন্তু হিসেবটা আমরা আরেক রকম করে সাজাতেও পারি। একটু ভেবে দেখো।

মোহন মিত্রের মনটা আজ আবার ছেলেমানুষ সাজাতে চায় তাঁকে। ফিরে আসার পথটা আজ বড় বেশি দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

চড়া রোদের আচম্‌কা ধমক খেয়ে পথের দুপাশের বনজঙ্গল যেন স্তব্ধ হয়ে আছে বলে মনে হল তাঁর। ঝাঁ ঝাঁ করছে ঐ দূরের ছোট মাঠটা, যেখানে গাছ-পালা নেই। দূরেদূরে কেবল কয়েকটা শুক্‌নো কাঁটাঝোপ। আগাগোড়া ধূলোয় ভরা। বড় রুক্ষ।

পথেই দেখা হয়ে গেল সতীনাথের সঙ্গে।

সদ্য জঙ্গল দেখে পায়ে হেঁটেই ফিরছে সে। ঘামে ভিজে গেছে তারা পোষাক। মাথার টুপিটা নামিয়ে নিতেই ঝরঝর করে ঘাম ঝরে পড়ল সারা মুখ বেয়ে। পকেট থেকে রুমাল বার করে সতীনাথ মুখটা বারবার মুছবার চেষ্টা করল।

ভেজা রুমালে কি আর ঘাম তেমন ধরে ভাই?

সতীনাথ বলল, ঠিক বলেছেন। আজ রোদের ঝাঁজটা বড় বেশি। কিন্তু আপনি এমন সময় এপথে কেন?

মোহন মিত্র বলেন, কোন্ পথ কখন কাকে কোথায় টানে, সে কি আগে থেকে তেমন মালুম করা সব সময় যায় ভাই? নইলে তুমি সতীনাথ, ঠিক এমনি সময় এই একই পথে উদয় হবে কেন বল?

এক সঙ্গে দুজনে পথ চলতে চলতে এগিয়ে এলেন রেঞ্জ অফিসের দিকে।

সতীনাথ বলে, গরমটা আজ একটু বেশি মনে হচ্ছে। তাই না?

মোহন মিত্র বলেন, সবে তো ফাগুনের শেষ। এতেই ধৈর্য হারাচ্ছ? শরহুল্ পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

সতীনাথ বলে, কিন্তু আশ্চর্য। রাতটা বেশ ঠাণ্ডা।

তাই হয়। জঙ্গলের শুধু নিয়মকানুনই আলাদা নয়। এখানকার জল-হাওয়াও আলাদা। একটু সমঝে না চললে পদে-পদে অসুবিধে। পদে-পদে বিপদ। আলো-অন্ধকার বিশ্বাস-ভালবাসা বেইমানী-হিংসা সবই এখানে জীবন্ত সতীনাথ। অরণ্যে সব কিছুই জীবন্ত। একথা তোমাকে আগেও বলেছি। মনে আছে?

সতীনাথ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোহন মিত্রের মুখের দিকে। মনে আছে তার। একথা বহুবার শুনেছে সে। কিন্তু আজ যেন কথাটার কোন মানেই বুঝতে পারল না সতীনাথ।

শামু দাঁড়ানো-পাখা সামনে এনে হাওয়া দিতে লাগল দুজনকে।

মোহন মিত্র বললেন, তুই থাম তো শেমো। ঐ অতবড় পাখা চোখের সামনে আর দোলাস্ না। বড় অস্বস্তি লাগে আমার। মনে নেই, আগেও তোকে বলেছি একথা? বারণ করেছি?

শামুর মনে আছে। কিন্তু আজ যেন একথার কোন মানেই হয় না এসময়ে।

মোহন মিত্র বললেন, সরিয়ে নে ঐ ধুম্‌সো তালপাখা। ব্যাটা যেন চামর দোলাচ্ছে। সরা।

সতীনাথ বলল, আর হাওয়া দিতে হবে না তোকে। ভাল করে চা তৈরী করে নিয়ে আয়।

বেশ প্রেম-সে।

মোহন মিত্রের একথায় সায় দিয়ে সতীনাথ হেসে বলে, হ্যাঁ, বেশ প্রেম-সে।

মোহন মিত্র বলেন, প্রেম কথাটা অত থাটো কোরে দেখো না সতীনাথ। তনুমন লাগিয়ে যে কাজই করবে, যে কাজে প্রেমের পরশ থাকবে, তাই হবে উত্তম। একখিলি পান বা ভাতের থালার একপাশে একটু নুন রাখার ব্যাপারেও প্রেম আছে কি নেই, ধরা পড়ে যায়। তুমি যে পাইপটা এখুনি সাজলে, প্রেম-সে সাজলে। তৃপ্তি পেলে। এলোমেলো করে সাজলে এমন জমাট ধোঁয়ার রাশি···

তাঁকে বাধা দিয়ে সতীনাথ বলে, দাদাকে আজ কিসে পেয়েছে শুনতে পাই?

সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মোহন মিত্র বলেন, চল, আমরা সবাই ঝালুকপোখর ছেড়ে চলে যাই।

আশ্চর্য হয়ে সতীনাথ প্রশ্ন করে, কি হোল আপনার? এমন কথা আপনার মুখে শুনলে আমরা টিঁকবো কোন্ সাহসে?

তাইতো বলছি, তুমিও চলো।

কোথায়?

যেখানে দুচোখ যায়।

দুজনেই শব্দ করে হেসে উঠল।

শামু পাশ থেকে দেখে হাসি সামলে ঘর থেকে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে মোহন বলেন, এ একটি চীজ্ রে ভাই। এই শেয়োর কথা বলছি।

সতীনাথ বলে, ওঃ, জ্বালিয়ে মারে সব সময়। তবু তারই মধ্যে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে, ওকে না-পেলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

ঠিক বলেছ সতীনাথ। অনেক রকম জ্বালার মধ্যেও আকর্ষণ থাকে।

চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মোহন মিত্র।

সতীনাথ শামুকে ডেকে বললেন, ছাতা নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আয় মিত্তর সাহবকো।

সতীনাথ বাধা দিয়ে বলেন, দরকার হবে না সতীনাথ। এই মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়জল আর কড়ারোদ পার হয়ে গেছে। তাছাড়া, ঐ যে বললাম, অনেক জ্বালার মধ্যেও কিছু-কিছু আকর্ষণ থাকে।

বেশ, চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবার কষ্ট করে কেন তুমি যাবে সঙ্গে?

হেসে জবাব দেয় সতীনাথ, জ্বালা আর আকর্ষণের কথাটা আমার দিক দিয়েও খানিকটা সত্যি হতে পারে তো?

বেশ, চল। মোহন মিত্র হাসলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলার পর কথাটা মোহন মিত্র বলেই ফেললেন।

—এতদিনে সব কথা শুনেছ নিশ্চয়ই?

সতীনাথ প্রথমটা একটু অবাক হয়। পরক্ষণেই বলে ওঠে, কাঁচবাংলার কথা বলছেন বোধ হয়?

হ্যাঁ।

হেসে সতীনাথ বলে, ওখানে আমার কোন জ্বালাও নেই, আকর্ষণও নেই। তাছাড়া, ঠিকেদারের সাংসারিক গোলমালে আমার কি? থাকুক বা চুরমার হয়ে যাক সব। যতক্ষণ আমাদের সরকারী কানুনের বিরুদ্ধে না যাচ্ছে তাদের রদবদলের ফলাফল, ততক্ষণ আমার সে সব ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধই বা কি, দায়-দায়িত্বই বা কি, বলুন?

মোহন মিত্র কিছুই বললেন না।

সতীনাথ আজ বেশ বুঝতে পারছে, মোহন মিত্রের মনটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে আছে। যেটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

একটা গাছের নীচে দাঁড়ালেন মোহন।

সতীনাথও সামনে এসে দাঁড়াল।

মোহন মিত্র ধীরে ধীরে বললেন, সম্বন্ধ না থাকতে পারে, দায়-দায়িত্বও কিছু আমাদের না-ও থাকতে পারে ; কিন্তু সেখানে একজন মানুষ ছিল, হয়তো আমরা তাঁকে হারাতে বসেছি। আর কিছু নয়। তাতে একটু, কি বলো সতীনাথ, একটু চিন্তা হবেই। আজ যদি আমিই তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাই, পথ চলতে চলতে কোন এক প্রখর দুপুরে তুমি কি কোন দিনও এমনি কোন উদার-স্নিগ্ধ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেবার সময়, একটি বারের জন্যেও মনে করবে না আমায় সতীনাথ ?

সতীনাথ চেয়ে দেখে, মোহন মিত্রের চোখদুটি স্থির হয়ে জেগে আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়। (ক্রমশঃ)

বিপ্লব সেনগুপ্ত

কয়েকজন বিদেশী ছোটগল্পকার

(১) বোক্কাচিয়ো

ছোটগল্পের জন্মদাতা রূপে যাঁরা অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম হোলেন বোক্কাচিয়ো। একনিষ্ঠভাবে কাব্যের চর্চা করছিলেন আর লিখছিলেন রোমান্স। ঠিক এমনি সময়ে তাঁর জীবনে আবির্ভাব হোল ছলনাময়ী ফিয়ামেত্তা। বঞ্চনা করলেন সুন্দরী ফিয়ামেত্তা। হৃদয়ে বোক্কাচিয়ো পেলেন প্রচণ্ড আঘাত। অন্তরের বেদনাকে কাব্যে রূপ দিলেন। রচনা করলেন "FILOSTRATO." এই সময় ইতালীতে মহামারী দেখা দিয়েছে। দিকে দিকে মৃত্যুর হাতছানি। সেই হাতছানিতে সাড়া দিলেন ফিয়ামেত্তা। ব্যক্তিগত জীবনে বোক্কাচিয়োর চলছিল চরম দুঃসময়। মহামারীর প্রভাব, ফিয়ামেত্তার মৃত্যু, নিজের দুর্গতি সবকিছুর সমন্বয়ে বোক্কাচিয়োর জীবনে এলো প্রচণ্ড পরিবর্তন। বাস্তবের মুখোমুখি হোলেন বোক্কাচিয়ো। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে প্রত্যক্ষ করলেন। গদ্যের আশ্রয়ে লিখলেন "দেকামেরন"।

বন্ধু পেত্রাকের নির্দেশে তিনি গদ্য সাহিত্যের পথ ছেড়ে অস্থি-বিদ্যার চর্চা করতে লাগলেন। ইউরোপীয় কথা সাহিত্যের প্রথম স্রষ্টার নির্বাসন প্রসঙ্গে ওয়াল্টার র‍্যালে বলেছেন—

"The greatest novelist of the modern world was taken in hand by a scholar and in comformity with academic usage was made to persue researches into the genealogy of the ancient Gods."

বোক্কাচিয়ো ঠিক ছোট গল্প লেখেননি। তবে তাঁর উপন্যাস ও রোমান্স থেকে ছোটগল্পের সূত্রপাত ঘটেছে। কীটস্ লিখেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা "ISABELL." সেক্সপীয়রের মত প্রতিভাবান নাট্যকারও প্রলুব্ধ হয়েছেন। মহামারীর ভয়ংকর বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর "দেকামেরন" আরম্ভ

হয়েছে। অবর্ণনীয় তুলনা। গ্রামান্তের একটি শূন্য প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল সাতটি তরুণী আর তিনজন তরুণ। তারা দশদিনে দশজন প্রত্যেকে যে একটি করে গল্প বলেছে তাদেরই সংকলন এই দেকামেরন। কাহিনী বিন্যাসে বোক্কাচিয়ো আদর্শ উপন্যাসিক। বোক্কাচিয়োর রচনা থেকে নাটক, রোমান্স, উপন্যাস, ছোটগল্প সবকিছুরই উপকরণ পাওয়া যায়। রেনেসাঁস সাহিত্যের জীবন সন্ধানী মানবের শিল্পী বোক্কাচিয়ো। সমাজের বুকে ব্যঙ্গের অস্ত্র প্রচার করেছেন। বিশেষতঃ ধর্মযাজক, গীর্জাগুলিকে বিদ্রুপ লেখনীতে আঘাত দিয়েছেন। এইখানেই তিনি সার্থক বস্তুতান্ত্রিক।

বোক্কাচিয়ো শুধু কৌতুক ও লালসার কাহিনীই বিন্যাস করেননি, প্রেম, পুরুষকার, শৌর্যবীর্যের নানারকম কাহিনীর অবতারণা করেছেন। বোক্কাচিয়ো ছিলেন জনগণের শিল্পী। অর্থ প্রতিপত্তি সবকিছুর উপরে যে মানবতাবোধ তা তিনি জানতেন। রক্তমাংস মানুষের কথা লিখেও যে আর্ট সৃষ্টি করা যায় তা তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এইখানেই বোক্কাচিয়োর মহত্ব উদ্ভাসিত। মানবধর্মের স্বপক্ষে তিনিই প্রথম উদাত্তকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সাহিত্যের অঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই তিনি পেরেছিলেন জাতি, শ্রেণী সবকিছুর উর্ধে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ও গল্পরচনার কৌশল ইতালীয় উপন্যাস সূচনাকে পূর্ণপ্রভায় বিকশিত করে। তাই বোক্কাচিয়ো "রেনেসাঁসের প্রথম প্রভাত কণ্ঠ, তিনি মানুষ আর রৌদ্রালোকের শিল্পী।"

(২) চসার

বোক্কাচিয়োর পর যাঁর নাম করা যায়, তিনি চসার। ইংরাজী সাহিত্যের জন্মদাতা, ছিলেনও খাঁটি ইংরেজ। স্বভাবতঃই ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্যে আদর্শ মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও সাহিত্যে চসারকে তস্কর বলা হয়েছে। এমার্সন একস্থানে বলেছেন—"সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর মত তস্কর আর নেই।" ক্যান্টারবেরী টেল্‌সের "The Squire Tale" টি সম্পূর্ণ আরব্য উপন্যাসের অনুসরণ। বোক্কাচিয়ো তেসিদে থেকে নিয়েছেন নাইটের গল্পের প্যালামন ও আরাসাইটের কাহিনী। এছাড়া তিনি বহু অজানা উৎস থেকে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তিনিই কবিতার সরল স্বচ্ছন্দ বিন্যাসে ছোটগল্পের নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এটি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; কারণ ইতালীতে বোক্কাচিয়ো

ছোটগল্প গদ্যে রচনা করেছিলেন। ইংলণ্ডে ক্যাণ্টারবেরী টেল্‌সে চসার কবিতা ব্যবহার করেছেন। ক্যাণ্টারবেরী টেল্‌সে চরিত্র-সৃষ্টি অপূর্ব। ব্লেক ক্যাণ্টারবেরী টেল্‌স সম্বন্ধে বলেছেন—

"The characters of chaucer's Pilgrims are the characters which compose all ages and nations".

রোমান্স, রূপকগল্প, নারী ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বন করে চসার দক্ষহাতে সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলিকে প্রকাশ করেছেন। বিশেষতঃ নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁর অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যে অন্যতম জ্যোতিষ্ক চসার। পরিশেষে বলা যায় ছোটগল্পের দ্বিতীয় পথনির্দেশক। বহু ঋণী হয়েও তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে আজও অমর হয়ে আছেন।

(৩) মোপাসাঁ

চসার র‍্যাবলের পর গী দ্য মোপাসাঁর নাম করতে হয়। "ফরাসী রিয়্যালিজমের গুরু—ন্যাচারালিজমের উদ্‌গাতা" ফ্লোবাবের শিষ্য মোপাসাঁ। ফ্লোবার মোপাসাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন—"My disciple" ফ্লোবারের বাণী ছিল—"রোমাণ্টিসিজমের প্রভাবমুক্ত বাস্তবজীবনের সত্য প্রকাশ ও শিল্প সুন্দরের সাধনা।" মোপাসাঁ গুরুদেবের বাণী অনুসরণ করলেও সুন্দরের সাধনা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। কারণ "মোপাসাঁ স্বোপার্জিত ব্যাধি ও MELANCHOLIAয় অভিশপ্ত" ছিলেন। গুরু ফ্লোবার এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে বলেছেন। কিন্তু অন্তর্যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ মোপাসাঁর হৃদয়কে অনুভব করা ফ্লোবারের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এক দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে মোপাসাঁর আবির্ভাব। স্কুলের ছাত্রের মত ফ্লোবার তাঁকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোপাসাঁর অন্তর্যন্ত্রনাকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন নি। অবশ্য ন্যাচারালিজমের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন মোপাসাঁ। মোপাসাঁর গল্পে তিক্ততার, ক্ষিপ্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজিত রক্তাক্ত ফরাসীর অন্তর্বেদনাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেন মোপাসাঁ। অভিজাত বিলাসবহুল সমাজের বুকে নিক্ষেপ করলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শানিত অস্ত্র। লিখলেন "BOULE DE SUIF"। গুরু ফ্লোবার মোপাসাঁর এই গ্রন্থখানি পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন তাঁর আশীর্বাদ। ষ্টিগ্‌মুলার BOULE DE SUIF এর সমালোচনাকালে বলেছেন—

"Mupassant made it into the first of his characteristic work of Art. The beauty and power of Boule de suif are the result of the successful combination".

এই "BOULE DE SUIF" পড়ে ফ্লোবার মোঁপাসাঁকে গল্পের কিছু পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। ফ্লোবার বুঝতে পেরেছিলেন যে এই গল্প অমর হয়ে থাকবে। কারণ মোপাসাঁ সমাজের শাশ্বত নিয়মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। মোপাসাঁর একটি মহৎ জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হোল নারী জাতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। তাই তাঁর সাহিত্যে নারী এক বিশিষ্ট মূর্তি। যারা স্খলিতা বা সমাজের নিষ্পেষণে যারা নিপীড়িতা, তাদেরই তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর এই অসামান্য মমত্ববোধ বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় দান করে।

"BOULE DE SUIF" ছাড়াও মোপাসাঁ অনেক বই লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "The vine yard", "The mad woman", "Simons Papa" ইত্যাদি। সমাজকে বিদ্রূপ বানে জর্জরিত করে লিখলেন "The false Gems." ফরাসী বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে যারা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করেছিল তারা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক নয়, তারা কৃষক, শ্রমিক যাদের মাটির সঙ্গে সখ্যতা; যাদের জীবনযাত্রা সহজ সরল প্রাণোদ্দীপ্ত তাদের নিয়েও লিখেছেন অনেক গল্প। এই সব গল্পে পঙ্কিল বিষাক্ততা নেই। শান্ত স্নিগ্ধতার পূর্ণ প্রতীক। "The story of a firm girl" তার একটি জলন্ত উদাহরণ। সাধারণ দরিদ্র কৃষক, শ্রমিকের মধ্যে মোপাসাঁ দেখেছিলেন নবজীবনের ঊষা। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্থ মোপাসাঁ সেই নবজীবনের ঊষার কিরণচ্ছটা দেখে যেতে পারেন নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার শেষ পর্যন্ত হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তবুও মোপাসাঁর কালজয়ী মহিমা চিরকাল অম্লান থাকবে। তলস্তয় তাই বলেছেন—

"Next to Victor Hugo Maupassant is the best writer of our time. I am very proud of him and rank him above all his contemporaries".

মোপাসাঁর জীবৎকালে তাঁর সামান্য রচনাই ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়। এমনও দেখা যায় যে কোন সংকলন গ্রন্থে তাঁর নামে বহু গল্প প্রকাশ করা হয়েছে যা তিনি কখনই রচনা করেন নি।

পরিশেষে বলা যায় ছোট গল্পের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন দুইপথিকৃৎ —তাদের একজন মোপার্সাঁ অপরজন হলেন চেকভ।

(৪) চেকভ

মোপার্সাঁ, পুশকিন, গোগোল'এর পর চেকভের নাম করতে হয়। পৃথিবীর গল্প সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সমস্ত প্রতিভাবান শিল্পী যুগের এক বিশেষ মুহূর্তে সাহিত্যের পথনির্দেশ করে সাহিত্যকে উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আন্তন চেকভের নাম স্মরণীয়। চেকভ বিশ্ব সাহিত্যে "The master" নামে পরিচিত। চেকভের প্রতিভা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—"চেকভ হচ্ছেন সেই শিল্পী যাঁর হাতের ছোঁয়ায় এক টুকরো পাথর ভাস্কর্য হয়ে ওঠে, ছেঁড়া রঙিন কাগজ ফুলের রূপ পায়, একটুখানি তার থেকে সেতারের ঝংকার ওঠে।" উপরি উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, কত প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন চেকভ। জগতের প্রত্যেকটি বস্তুকে তীক্ষ্ণভাবে অনুসন্ধান করেছেন। তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃত অর্থ। তাই মহান চেকভের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে— "Everything in Nature has a meaning."

নিপীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদ, মানব মনের বিচিত্র রহস্য এবং তাদের কামনা বাসনা, সুখদুঃখ হাসিকান্নার আদর্শরূপ চেকভের অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্ণ সত্য হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। চেকভ ছাত্রজীবন থেকে গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৪ সালে "Stories of melpomena" এবং ১৮৮৫ সালে "Motly Stories" নামে দুখানি গল্প সংকলন প্রকাশ হবার পর চেকভ খ্যাতির শিখরে উঠতে শুরু করেন। চেকভ ছিলেন চিকিৎসক। গল্প লেখক হিসাবে তিনি যতই খ্যাতি লাভ করুন না কেন চিকিৎসার প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি একবার সকৌতুক মন্তব্য করেছিলেন—

"Medicine is my lawful wife and literature is my mistress"—তাঁর সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। কেননা চেকভ নিজে এক জায়গায় বলেছেন—"আমার সাহিত্যকর্মের উপর চিকিৎসা বিজ্ঞান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ মাত্র নেই।"

চেকভ সমাজে মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দুরারোগ্য ব্যাধি।

কিন্তু সেই ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন নি। তাই চেকভ বেদনায় জর্জরিত হয়েছেন। চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেখানে দেখেছেন দুঃখ, হাহাকার, রিক্ততা-শূন্যতা সেখানেই তিনি করুণায় অভিষিক্ত হয়েছেন। এই মহীয়ান চেকভ বেশীদিন পৃথিবীর বুকে থাকতে পারেন নি। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৯০৪ সালে পৃথিবীর সকল মায়া মমতা ত্যাগ করে যাত্রা করেছেন অসীম স্বর্গপানে। তবুও তিনি প্রচুর গল্প লিখে গিয়েছেন যা বিশ্ব সাহিত্য চিরদিন সশ্রদ্ধ মর্যাদার আসন পাবে।

(প্রবন্ধটি লেখার পথে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সাহিত্যে ছোটগল্প" বইটির সাহায্য নিয়েছি)

ধারাবাহিক উপন্যাস

জরাসন্ধ

উত্তরাধিকার

॥ ২০ ॥

দুর্গামোহন ফিরে এসেছেন। অনেক দিন ছিলেন না। বালীগঞ্জে পৌঁছে একখানা পোষ্টকার্ড লিখেছিলেন অভিজিৎকে। সেও উত্তর দিয়েছিল। তারপর আর চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়নি। মাঝখানে ওঁর অভাবটা যখন বিশেষভাবে অনুভব করছিল, অভিজিৎ মনে করেছিল মাষ্টারমশাইকে একটা চিঠি লিখবে। বিশেষ করে ওঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আর লেখেনি। এখানকার সমস্যাগুলো জানাতে যাওয়া মানে তাঁকে উত্যক্ত করা বইতো নয়। ফিরে আসার খবর পাবার পরদিনই দেখা করতে গেল। দুর্গামোহন বাইরের বাগানে পায়চারি করছিলেন। অভিকে দেখতে পেয়ে সাদরে ডেকে নিয়ে বসালেন। এদিকের খোঁজ খবর নেবার আগে অভিই জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন, স্যর ?

"কেমন দেখছ ?" সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করলেন দুর্গামোহন।

"অনেক ভালো। বেশ সেরে উঠেছেন এই ক'মাসে।"

"সেরে না উঠে উপায় আছে ? যাওয়া মাত্র ডবল 'গার্জেনে'র পাল্লায় পড়ে গেলাম। একটি তো সঙ্গেই ছিল, আরেকটিও একেবারে তৈরি হয়ে ছিলেন। আমার বৌমা। পালা করে খবরদারি। নিয়মের একচুল এধার-ওধার হবার যো নেই।"

"তবু যদি আমাদের একটা কথাও শুনতে" বলতে বলতে বেরিয়ে এল গৌরী। তার চেহারাতেও স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য সহজেই চোখে পড়ে। ফর্সা রঙটা বড় ফ্যাকাসে মনে হত, এখানে যখন ছিল। এবার তার উপরে একটি স্নিগ্ধতার স্পর্শ লেগেছে। অন্য একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করল অভিজিৎ। তার সামনে যখনই বেরিয়েছে গৌরী, ঠিক যেন স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি।

আড়ষ্টতা না হলেও কেমন একটা বাধোবাধো ভাব। আজ সে অনেক সহজ ও সপ্রতিভ। বেরিয়ে আসা এবং কথাবার্তার মধ্যে অনাবশ্যক কুণ্ঠার জড়তা নেই। গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরোনর ফল, মনে মনে বলল অভিজিৎ। কিংবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে, যা সে জানে না।

গৌরী এগিয়ে এসে প্রথমে অভিকে এবং তারপর বাবাকে প্রণাম করল, ওদের সব খোঁজ খবর নিল এবং জানাল যে এদিকটা একটু গুছিয়ে নিয়েই বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

গৌরী চলে গেলে দুর্গাচরণ অভির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি কিন্তু অনেকটা রোগা হয়ে গ্যাছ অভি। অসুখ বিসুখ করেছিল কিছু?

"নাতো। বেশ ভালোই ছিলাম। তবে ভাবনা হচ্ছে এইবারে একটা অসুখ টসুখ না করে বসে।"

"কেন?" উদ্বেগের সুর দুর্গামোহনের।

"বৌরাণীও বলছেন আমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি। সেই অপরাধে খাবারের বহর যা বাড়িয়েছেন বড় বড় পালোয়ান ছাড়া আর কারো পক্ষে সেটা সামলানো সম্ভব নয়।"

দুর্গামোহন হেসে উঠলেন—"তা বললে চলবে কেন? তাঁর রাজত্বে বাস করে তুমি রোগা হতে থাকবে অর্থাৎ তাঁর ব্যবস্থা বান-চাল করে দেবে, তার একটা শাস্তি আছে তো। তবে তিনি যা দিচ্ছেন নির্ভাবনায় খেয়ে যাও। তোমার দরকার অ-দরকার তিনি তোমার চেয়ে ভালো জানেন। তারপর তোমার কলোনীর খবর কী বল।

দুর্গামোহন অনেকদিন ছিলেন না। সুতরাং সকলের আগে এই সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ দেখা দেবে, অভিজিৎ জানত। এই ক-মাসে যা কিছু ঘটেছে, সব দিক দিয়ে অবস্থাটা যেখানে এসে ঠেকেছে, তার সঙ্গে তার নিজের চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিবরণ মাষ্টারমশাই-এর কাছে খুলে বলবার আগ্রহ তার তরফের কম নয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই মিনিট দুয়েক চুপ করে থেকে বলল, সেটা তো দু-এক কথায় বলা যাবে না। আপনি সবে এলেন। দু-চার দিন যাক, তারপর সবই জানাবো।

দুর্গামোহন লক্ষ করলেন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের মুখে যে মৃদু হাসিটি ফুটে উঠল সেটা বড় নিষ্প্রভ, যেন জোর করে টেনে আনা, কণ্ঠ-স্বরেও উৎসাহের কোনো লক্ষণ নেই। মনে পড়ল যাবার আগে এই চোখ মুখেই তিনি কত না

উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখে গেছেন! স্বভাবতই এই পরিবর্তনের কারণটা জানবার ইচ্ছা হল। বললেন, "তোমার কি এখন কোনো কাজ আছে?"

"কিছু না। কেন বলুন তো?"

"তাহলে একটা মোটামুটি আইডিয়া বরং দিতে পার—কদ্দুর কী হল। ডিটেল্‌স্ না হয় পরে শোনা যাবে।"

অভিজিৎ বলল, বর্তমানে ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, খবরের কাগজের ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে 'অচলাবস্থা'।

"কী রকম?"

এরপরে অভিজিৎকে একটু বিস্তৃতির দিকেই যেতে হল। তার 'কটেজ স্কিম্'-এর উল্লেখ করতে গিয়ে তার পিছনে যে মনোভাব তারও কিছুটা আভাস দিল। দুর্গামোহনের সেটা আজানা ছিল না। তাদের বাড়ির সামনে ঐ কুৎসিত বস্তিটা, এবং তার ভিতরে একপাল মানুষ যে-ভাবে বাস করছে (বাস করা না বলে বরং বলা যেতে পারে পড়ে আছে) এখানে এসে অবধি সেটাই তার চোখ দুটোকে অহরহ পীড়া দিচ্ছিল! হতে পারে এটা তার একটা দুর্বলতা। খাওয়া পরার চেয়ে থাকাটাকেই সে বড় করে দেখছে। অনেকে হয়তো এই মানসিকতাকে উপহাস করবে। তা করুক। তবু ওটাই তার কাছে মানুষ নামক জীবের উপর সব চেয়ে চরম অবমাননা বলে মনে হয়েছে। সকলের আগে তার থেকেই সে বাঁচাতে চাইছিল লোকগুলোকে। বস্তির ঐ জমিটার স্বত্বটুকু ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু অভিজিৎ বুঝেছিল তাতে করে ওদের ঐ জীবনযাত্রাকে মেনে নেওয়া হবে। ঐ ভাবেই ওরা থাকবে তার চোখের উপর। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও পরিবেশ ওদের এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে, ঐ বসবাসের গ্লানি কদর্যতা ও অসম্মান আর লাগে না। প্রথম যখন এসেছিল, তখন লাগত। তারপর ঐ ভাবে থেকে থেকে অনুভূতির ধারগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। ধাপে ধাপে অনেক নীচে নেমে গেছে ওরা। আরো যাবে।

অভিজিৎ চেয়েছিল সকলের আগে ঐ জান্তবদশা থেকে টেনে তুলে মানুষগুলোকে খানিকটা ভদ্র, পরিচ্ছন্ন এবং সম্ভ্রান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়া। একটা ছোট্ট চালার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী তাদের বয়স্থ ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ ইত্যাদি একরাশ নরনারীর ঠাসাঠাসি হয়ে পড়ে থাকার যে পশুসুলভ জীবন, তার বদলে তারা পেত ছোট ছোট 'বাড়ি', যেখানে হাত পা ছড়িয়ে থাকতে না পারলেও লজ্জা-সরম-শ্লীলতা-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলার মত আব্রুর অভাব হত না।

কী করে তার এই প্ল্যান শুরুতেই বানচাল হয়ে গেল, কারা এসে কী মন্ত্র দিয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে ওদের ক্ষেপিয়ে তুলল এবং তারপর থেকে সারা কলোনীতে যে ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও বিরোধ ধূমায়িত হয়ে চলেছে এবং মাঝে মাঝে তার থেকে আগুন জ্বলে উঠছে—তার একটা মোটামুটি ছবি মাষ্টার মশাই-এর সামনে তুলে ধরল অভিজিৎ। তারপর বলল, কী যে ওরা চায়, তাই আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।

দুর্গাচরণ বললেন, কী চায়, ওরা নিজেরা জানলে তো তোমাকে বোঝাবে? সেই দেশ ছাড়ার পর কিংবা বলতে পার তার আগে থেকেই যে অবস্থার মধ্য দিয়ে ওরা চলেছে তারই ফল হল এই বিভ্রান্তি। নিজেদের ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে। তাই-ই হয়। আমরা শুধু ওদের দুঃখ কষ্টটাই দেখি। বাইরে থেকে সেটাই চোখে পড়ে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে অনেক বেশী যেটা ওরা এতদিন ধরে সয়ে এসেছে সেটা হল নানাজনের কাছ থেকে নানারকম অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা এবং সহানুভূতির মুখোস পরা নিষ্ঠুরতা। ওরা এত বেশী ঠকেছে যে, মানুষের সদিচ্ছার উপরে আর বিশ্বাস নেই। সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখে। এই অবস্থায় কাউকে বাইরে থেকে ভালো করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তাছাড়া তুমি যা কিছু করতে যাও ওদের ঐ নতুন শুভাকাঙ্ক্ষীর দল সব ভেস্তে দেবে।

অভিজিতের অভিজ্ঞতাও তাই। বলল, কিন্তু এতে করে তাদের লাভটা কী?

"আছে। সেটা তুমি বুঝবে না। তুমি তো ঐ দলগুলোকে চেনো না। আমি চিনি। আমি যা নিয়ে ছিলাম, তোমরা যাকে বল শিক্ষাব্রত সেখানেও দেখেছি ঐ দলের লড়াই। সেটা ঠেকাতেই তোমার দম ফুরিয়ে যাবে, ভালো কিছু করবার উপায় নেই। কিন্তু আমি তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি। রণে-ভঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তোমার তো আর সে কথা বলা চলে না।"

"আমারও দেখছি ঐ বেরিয়ে আসা ছাড়া অন্য পথ নেই স্যর। থেকে আর কী করবো?"

এমন একটা হতাশার সুর ছিল এই কথাকটির মধ্যে যে দুর্গামোহন সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। অভিজিৎও কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, তাই ভাবছিলাম এবার চলে যাই। অনেকদিন তো হল। কিন্তু এ দিকে বৌরাণীকে নিয়ে এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

"কী সমস্যা ?" উৎকণ্ঠিত হলেন দুর্গামোহন।

অভিজিৎ বলল, কিংবা বলতে পারেন, আমাকে নিয়েই তিনি সমস্যায় পড়েছেন এবং যে সমাধান করতে চাইছেন, তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না।

দুর্গামোহনের উৎকণ্ঠা দূর হল। মৃদু হেসে বললেন, ব্যাপারটা কী বলতো ?

"হাসবেন না, স্যর। ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস।

এতদিন শুনে এসেছি, (ইদানিং একটু বেশী জোর দিয়ে বলছিলেন কথাগুলো) এই যে বিশাল বাড়িটা, যার আমি একমাত্র এবং একচ্ছত্র মালিক, সেটা শুধু আমার 'বাড়ি' নয়, সম্পত্তি নয়, আমার পিতৃ-পিতামহের গচ্ছিত সম্পদ, আমার মহৎ উত্তরাধিকার। এর সম্বন্ধে আমার একটা পবিত্র দায়িত্ব আছে। তাঁর নিজের ভাষায় বলি—'একে তুমি রক্ষা করবে, ভোগ করবে। তা না হলে পূর্ব-পুরুষের ওপর তোমার যে কর্তব্য, সেটা লঙ্ঘন করা হবে।'

দুর্গামোহন বললেন, ঠিকই বলেছেন। এর ভেতরে আপত্তি করবার তো কিছু নেই।

"আপত্তি আমি করছি না স্যর, যদিও এর মধ্যে 'মহৎ' বা 'পবিত্র' কী আছে আমি জানি না। তবু বৌরাণীর এই মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবং সেইজন্যই এই বাড়ি বা সম্পত্তি সম্পর্কে এমন কিছু করিনি বা করতে চাই না, যাতে তাঁর মনের সায় নেই। এবারে তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমার অবর্তমানে কী হবে এই বাড়ুয্যে বাড়ির ? কে ভোগ করবে আমার পূর্ব-পুরুষের এই সেক্রেড্ ট্রাস্ট্ ? কার হাতের এক গণ্ডুষ জল তাঁদের স্বর্গত আত্মাকে তৃপ্তি দেবে ? সে ব্যবস্থাও আমাকে করে যেতে হবে। শুধু বাড়ি এবং সম্পত্তি নয়, আমাদের এই প্রাচীন বংশকে রক্ষা করবার দায়ও আমার।

কথাগুলো অনেকটা হালকা সুরে বলছিল অভিজিৎ। কিন্তু দুর্গামোহনের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। তাঁর কথাতেও সেই ভাব প্রকাশ পেল। ধীরে ধীরে বললেন, এ বিষয়ে বৌরাণীর যে উৎকণ্ঠা সেটা খুবই স্বাভাবিক। তুমিও একে লঘু করে দেখতে পার না।

অভিজিৎ বলল, "আমি লঘু করে দেখছি না। কিন্তু—"

"জানি, তুমি কী বলবে", বাধা দিয়ে বললেন দুর্গামোহন।

"এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। সেই যখন ছোট ছিলে, তখন থেকে তোমাকে অন্য চোখে দেখি, তারপর অভিভাবক হিসেবে যে স্বীকৃতি ও সম্মান তোমার কাছ থেকে পেয়েছি, তার থেকে কথাটা আপনা হতেই মনে এসেছিল। তুমি যখন এলে তার কিছু দিন পরে এ বিষয়ে একটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলাম। তুমি স্পষ্টভাবে বলেছিলে বিয়ে থা করবার ইচ্ছা তোমার নেই। অর্থাৎ তোমার মতে তারপরে, আর কোনো কথা নেই। ওটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে এবং সাধারণ অবস্থায় নিশ্চয়ই তাই! কিন্তু তুমিও জান, আমিও জানি, সংসারে এমন ক্ষেত্র আছে বা এমন অবস্থা দেখা দেয় সেখানে ঐ 'ব্যক্তি'কে গুটিয়ে আনতে হয়, ইচ্ছা অনিচ্ছার পাল্লাকে খাটো করতে হয়। তা না হলে অনেক জায়গায় টান পড়ে।

বলতে বলতে অভিজিতের মুখের দিকে চোখ তুললেন। সে সেটা লক্ষ করে বলল, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি, স্যর। কিন্তু এটা শুধু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়। তার চেয়ে অনেক বড় আরো কিছু আছে এর পেছনে। সেটা সেদিন আপনাকে বলিনি। মনে করেছিলাম বলবার দরকার হবে না। কিন্তু বৌরাণী যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন হয় তো বলতে হবে। তাঁকেও, আপনাকেও। তিনি বুঝবেন কি না জানি না, আপনি বুঝবেন।"

"বাবা"—ভিতর থেকে গৌরীর ডাক শোনা গেল। দুর্গামোহন সাড়া দিলেন, কী মা? ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল গৌরী। বলল, তোমরা কথা বলছিলে বলে এতক্ষণ ডাকিনি। কিন্তু আর দেরি করলে তোমার পিত্তি পড়বে। তোমাদের চা-টা দিয়ে দিই। প্রদীপদা কখন ফিরবেন তার তো কিছু ঠিক নেই।

দুর্গামোহন কোনো উত্তর দেবার আগেই অভিজিৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, আপনার এখনো চা খাওয়া হয়নি?

"না; ইচ্ছা করেই দেরি করছিলাম। প্রদীপ এলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। সেই সঙ্গে তিন জনে বসে গল্প করতে করতে চা খাওয়া যেত।"

"আমি ও পাট মিটিয়ে এসেছি। এখন আর কিছু চলবে না।"

"এটুকু চলবে", সঙ্গে সঙ্গে বলল গৌরী, "তেমন কিছুই তো করিনি।"

দুর্গামোহন মেয়ের কথায় সায় দিলেন, তাই তাহলে দে। আমরা খেয়ে নিই। ওর হয় তো দেরি হবে। কন্দরে গিয়ে পড়েছে কে জানে?

গৌরী ভিতরে চলে গেল। দুর্গামোহন অভির দিকে ফিরে বললেন, আমার মেজো ছেলে ভুবনের বন্ধু। বাড়ি ধানবাদে। তিন পুরুষ ধরে বিহারের বাসিন্দা। বাপ মস্ত বড় কোলিয়ারীর মালিক। একটা নয়, বোধহয় গোটা তিনেক। ঐ মাইন-সংক্রান্ত কি সব শেখবার জন্তে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। ওর ও-সব ভালো লাগল না। শিখে এল সুগার টেকনলজি। আমি তো ওসব কিছু বুঝি না। ভুবনের কাছে শুনলাম চিনি-সম্পর্কে যত রকম বিদ্যা আছে, সবটাতে বিশারদ। যাভা আর কোন্ কোন্ জায়গা থেকে মোটা মাইনের চাকরির অফার এসেছিল। কোনোটাই নেয় নি। চাকুরী করবার ইচ্ছা নেই। সুগার মিল খুলবে। তাই নিয়ে মেতে আছে। আর একটা ইণ্টারেষ্ট আছে, এবং তা নিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনোও করেছে দেখলাম। সেটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফিলজফি।

অভি হেসে উঠল—তাই নাকি? "অদ্ভুত কম্বিনেশন বলতে হবে। সুগার টেকনলজির সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ফিলজফি!"

"মানুষটাও অদ্ভুত, কথাবার্তায় চালচলনে। বিলেত থেকে ফিরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জমে গেল বন্ধুর বাবার সঙ্গে। প্রায়ই আসত এবং তার কোনো সময় অসময় ছিল না। ধানবাদ থেকে রাণীগঞ্জ নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসে উপস্থিত। এসেই আমাকে নিয়ে পড়ত। দর্শন নিয়ে না হয় এক-আধটু নাড়াচাড়া করে থাকি। কিন্তু চিনির আমি কী জানি বল। সম্পর্কই বা কী? চায়ের সঙ্গে দু'বেলা দু' চামচ। তাও ডাক্তার বন্ধ করে দিয়েছেন। তাহলেও তার জন্মের আগের ইতিহাস থেকে বর্তমান বাজার সব শুনতে হবে এবং মতামত দিতে হবে!

একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, আমাদের অঞ্চলে কিছু কিছু আখের চাষ হয়, বোধহয় আরো হতে পারে। অনেক জমি পড়ে আছে। এক আউষ ছাড়া আর কোনো ফসল হয় না। তাও বৃষ্টির ওপর নির্ভর। তাই শুনেই এসেছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে। এ কদিন চা খেয়ে বেরোত। তা না হলে গৌরী বকাবকি করে। অজে দেখছি—এই যে এসে পড়েছে।"

পর মুহূর্তেই ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল বছর তিরিশেক বয়সের একটি যুবক। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং আগে হয় তো ফর্সাই ছিল, বর্তমানে তামাটে। সম্ভবতঃ কড়া রোদের প্রভাব। পরণে সার্ট ট্রাউজার ঘামে ভিজে জবজব করছে। চোখে মুখে—শুধু চোখে মুখে নয়, বলতে গেলে সর্বাঙ্গে—ব্যস্ততার চাঞ্চল্য।

দুর্গামোহন বললেন, তোমার কথাই হচ্ছিল। এসো পরিচয় করিয়ে দিই।

—ক্রমশঃ—

স্তোত্র ও প্রত্যাবর্তন

পিতৃভূমি, হে আমার পিতৃভূমি, তোমার দিকে ফেরাই আমার রক্তধারা।
তোমার জন্যে কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা শিশুর মতো
মাতার জন্যে অশ্রুময়।
গ্রহণ করো এই অন্ধ গীটার
এবং এই ভ্রষ্ট কপাল।

বেরিয়ে গিয়েছিলুম বিশ্বভুবনে তোমাকে সন্তানদের খুঁজে দেব বলে
বেরিয়ে গিয়েছিলুম পতিতদের সেবা করতে তোমার তুষার নামে,
বেরিয়ে গিয়েছিলুম ইমারত তুলতে তোমার খাটি কাঠে,
আমি বেরিয়েছিলুম তোমার নক্ষত্র নামিয়ে এনে দিতে আহত বীরদের
ললাটে।

এখন আমি ঘুমাতে চাই তোমার বস্তু সম্পদের মধ্যে।
মর্মভেদী তন্ত্রীর তোমার স্বচ্ছ রাত্রি আমাকে দাও,
তোমার জাহাজের রাত্রি, তোমার নাক্ষত্রিক দীর্ঘাকার।

পিতৃভূমি আমার : আমি চাই আমার ছায়া পাল্‌টাতে।
পিতৃভূমি আমার : আমি চাই আমার গোলাপের রূপান্তর।
আমি চাই তোমার ঋজু কটী ঘিরে আমার বাহু বাঁধতে
আর সমুদ্রক্ষারে চূর্ণিত তোমার শিলায় শিলায় বসতে,
যাতে আমি গমের শীষ ভিতর অবধি নিরীক্ষা করতে পারি।
অমি এবার বাছাই করব সোরার স্বকুমার পুষ্পপর্ণ
আমি এবার কাঁসার ধাতু হিম পাকে পাকে স্থতা কাটব,
এবং তোমার প্রখ্যাত ও নিঃসঙ্গ ফেনা দেখে দেখে
আমি তোমার সৌন্দর্যের জন্যে বুন্‌ব উপকূলীন বরমাল্য।

পিতৃভূমি আমার পিতৃভূমি
প্রতিঘাতী জলে জলে আর
প্রতিহত তুষারে তুমি একেবারে ঘেরা,
তোমাতে একাকার ঈগল এবং গন্ধক,
এবং দক্ষিণ মেরুজাত তোমার শাল দোশালা ও ইন্দ্রনীলের হাতে
শুদ্ধ মানবিক আলোকের একটি বিন্দু
শত্রু আকাশকে জ্বালিয়ে করছে জ্বল্ জ্বল্ ।
রক্ষা করো তোমার আলোক, হে পিতৃভূমি উঁচু রাখো
আশার তোমার কঠিন শস্যের শীষ
অন্ধ ভয়াল এই হাওয়ায় মধ্যে ।

তোমার দূরদূরান্তর ব্যাপী বিস্তারের উপরে পড়েছে এই কঠিন আলোক,
মানুষের ভাগ্যরেখা,
যাতে তুমি বাঁচিয়ে রাখো একটি নিঃসঙ্গ রহস্যময় ফুল
ঘুমন্ত আমেরিকার বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে ।

অনুবাদ ঃ বিষ্ণু দে ॥

আশিস সান্যাল

পাবলো নেরুদা

....

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন চিলির কবি পাবলো নেরুদা। সুইডিস আকাদমির স্থায়ী সম্পাদক কার্ল রাগনার গিয়েরো তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করতে গিয়ে বলেছেন যে নেরুদা হলেন the poet of a violated human dignity. সলঝেনিৎসিনের মতো তাঁকেও একজন বিতর্কিত লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি আরো বলেছেন: Besides being the subject of debate, he is in some people's eyes debatable, not to say questionable. The debate has been running for almost 40 years as good a sign as any that his contribution cannot possibly be by-passed—and the differences of opinion have included the artsitic content of his work." গিয়েরোর এই উক্তির ভেতর দিয়েই বোধ করি তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিতর্কিত হলেও তাঁর কবি প্রতিভা যে আজ পৃথিবীর সমকালীন কাব্য আন্দোলনে একটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা কাব্য জগতেও তাঁর নাম সুদীর্ঘদিন ধরে সুপরিচিত। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলা দেশের সর্বাধিক বিশিষ্ট কবির সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি পাবলো নেরুদা। বাংলা ভাষাতে তাঁর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

নেরুদাকে এর আগেই এই পুরস্কারে সম্মানিত করলে বোধ হয় শোভন হত। প্রখ্যাত সুইডিস লেখক ও সুইডিস আকাদমির একজন প্রভাবশালী সদস্য আর্থার ল্যাণ্ডকুইভিস্ট প্রায় ২০ বছর ধরে নেরুদার নাম নোবেল পুরস্কারের প্রস্তাব করে আসছিলেন! গত মার্চ মাসেও তিনি একটি সুদীর্ঘ আলোচনায় নেরুদাকে এই পুরস্কার প্রদানের দাবী জানান। আসলে রাজনৈতিক কারণে নেরুদাকে এতদিন এই পুরস্কার দেওয়া হয়নি। যাই হোক,

শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হল দেখে সাহিত্য রসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

নেরুদার জন্ম ১৯০৪ সালের ১২ জুলাই দক্ষিণ চিলির পারাল শহরে। শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁর আসল নাম ছিল রিকোর্দো এলিজার নেফতালি রিয়ের বাসোয়ালতো। কিন্তু অতি তরুণ বয়স থেকেই প্রখ্যাত চেক গল্পকার য়ুয়ান নেরুদার অনুকরণে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন পাবলো নেরুদা।

মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিনি চিলির সরকারের দূরপ্রাচ্যের কোন অফিসে কনসাল পদে নিযুক্ত হন। তিনি এই সময়ে বার্মা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানেও এই দায়িত্ব নিয়ে বসবাস করেন। তাঁর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়: 'এই বছরগুলি আমার জীবনে বিচ্ছিন্নতার ও নিঃসঙ্গতার।" ১৯৩২ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আর্জেন্টিনায় বসবাস করবার সময়ে তাঁর লরকার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর জীবনে এটি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও যুগান্তকারী বোধ হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রতি তাঁর সমর্থন। ১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাই ফ্রাঙ্কো উত্তর আফ্রিকা থেকে এই দেশ আক্রমণ করে। তখন নেরুদা কনসালপদ ত্যাগ করে স্প্যানিশ রিপাবলিকের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। এই সময়েই তিনি কম্যুনিষ্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকায় যান। ১৯৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট হিসেবে চিলির খনি এলাকা আন্তোফোগাস্তার শ্রমিকদের অনুরোধে সেনেটরের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। এখনও তিনি চিলির কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং ক্যাস্ত্রোর সমর্থক। রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির একজন তীব্র সমালোচক।

নেরুদার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম "ক্রেপাস ক্যুলারি"। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থেই নেরুদা নিজেকে সকলের সঙ্গে সংযুক্ত উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কবিতায় এই সময় হুইট ম্যানীয় মানবিকতার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। হুইটম্যানকে উদ্দেশ্য করে তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন—

"Lend me your voice
and the burden
of your heart."

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় রচিত কবিতাবলীতে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষের জীবনবোধের অবক্ষয় তাঁর বিবেককে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এতকাল তিনি যে কাব্য সাধনা করে আসছিলেন, তার ছেদ

ঘটে এবং কবিতায় তিনি নতুন বাক্ প্রতিমা নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন।"
Explanation কবিতায় এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"You will ask where are the lilacs,
Where the metaphysics strewn with poppies,
Where the rain that ever taps out
Words full of pauses and birds ?
I would tell you what has befallen me—
They called my houses the "house of flowers',
Geniums blossomed everywhere,
It was a jolly place, my house,
With laughing children and romping dogs.
Cutthroats with Meroceans and aeroplanes,
Cutthroats with monks who blessed the kitters
They came down to slaughter
And along the streets the blood of children
Flowed, as flows the blood of children."

তাঁর এই উক্তি থেকেই সহজে উপলব্ধি করা যায়, কেন নেরুদা তাঁর কাব্যে মানবতার জয়গান করেছেন। মানুষই তাঁর কাব্যে একমাত্র অবলম্বন। মানুষকে ভালবাসতে গিয়েই তিনি ভালবেসেছেন নিজের দেশকে। এক সময়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে যখন তাঁর বাসভূমি ভস্মীভূত হয়ে যায় তখন একটি কবিতায় লিখেছিলেন : My people shall will. All people shall will. এই বলিষ্ঠ আশাবাদ তাঁর কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই আশাবাদকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি কিন্তু জীবনের তিমিরচর্যার পর্বটি অস্বীকার করেননি। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন, এক একটা যুগ অন্ধকারের পর আসে সূর্যকরোজ্জ্বল দিন। আর এই কারণেই তিনি বলতে পারেন—

আমি চাই মাঝে মাঝে
নিভে যাক জ্যোতির্ময় জ্যোতি।
বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ুক
তির্যক ভঙ্গিতে
মাটির বুকে চাপা কান্নার মত।

আর এই বিষণ্ণ মুহূর্তে কবির কামনা

"মনে মনে কামনা আমার

দেখি চূরমার

মোহনায় দেখি জাহাজের খোল।"

কেননা কবি জানেন—

আলোকের জন্ম নাহি হয়

বিনা দীর্ঘশ্বাসে।

এই গভীর প্রত্যয় নেরুদাকে এক অর্থে করে তুলেছে বিদ্রোহী। তিনি জানেন, জনগণের একমাত্র সমবেত প্রতিরোধই যে কোন প্রতিক্রিয়ার মৃত্যু ঘটাতে পারে। দেশকে ভালবাসার ভেতর দিয়েই মানুষ অর্জন করে তার সম্পূর্ণতা। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়।

"পিতৃভূমি! হে আমার স্বদেশ,

প্রতিরোধের পারাবারে, তুষারের বাধার দেয়ালে

আদিগন্ত ঘেরা

চোখে তোমার প্রহরী ঈগলের দৃষ্টি,

বুকে তোমার গন্ধকের বিস্ফোরণ,

পবিত্র পশম আর কান্নায় মোড়া

তোমার দক্ষিণ মেরুদেশের হাতে

এক ফোঁটা অনির্বাণ মানবিকতার আলো

টলমল টলমল করে

শত্রুদেশের আকাশে আগুন লাগায়।

[অনুবাদ-মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

নেরুদা আশা করেন, একদিন এইসব দীর্ঘশ্বাস আর হতাশার শেষে শান্তির ও সুখের দিন আসবেই। শান্তি শান্তি—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে অপরিসীম শান্তির আলোক। অত্যাচার অবিচার, আর শোষণের অবসান ঘটবেই। তাই তিনি প্রার্থনা করেন—

"Peace for the twilight to come,

Peace for the bridge, peace for the wine,

Peace for the baker and his lovers,

Peace for all those alive,

Peace for all lands and all waters.

নেরুদার কবিতায় এই বৈপ্লবিক মনোভাবের পাশাপাশি একটি গীতি কবিতার ধারাও লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কেমন যেন একাত্ম হয়ে যান। এক গভীরতর অনুভূতির স্তরে নিয়ে যান পাঠককে। মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর চিত্ত। তাঁর মনে হয়—

"মৃত্তিকার বক্ষে আমি, আর তুমি যেন
বিকীর্ণ ধূলির মতো প্রাণনায় জেগে ওঠো, আর
যদি নদী গাঢ় করে পলি
দূরে ঢেকে রাখে নগ্ন জটিল শিকরগুলি, ওরা
যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি তোমার সত্তা ছাড়াও আমার মধ্যে তুমি,
ওরই মত সঙ্গে করে আনো এক দারুন আঁধার।"

[অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ]

নিছক প্রেমের কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রতীক ও ছন্দের ব্যবহারেও তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখ্য। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

....

জর্জ সেফেরিস পরলোকে ঃ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গ্রীক কবি জর্জ সেফেরিস গত ২০ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। তাঁর প্রকৃত নাম জর্জ সেফেরিয়াডেস। কিন্তু সাহিত্য রচনা করেছেন জর্জ সেফেরিস নামেই।

জন্ম ১৯০০ সালে স্মির্নায়। পড়াশুনা করেছেন এথেন্সে ও প্যারিসে। কূটনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটে স্বদেশের বাইরে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। বইটির নাম "টার্নিং পয়েন্ট"। এরপর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কুড়িটি গ্রন্থ। এর মধ্যে আছে কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থও।

সেফেরিস ছিলেন ঐতিহ্যের অনুসারী। তাই তাঁর রচিত কাব্যে ধ্রুপদী ভাবধারার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। শব্দ ব্যবহারে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা সত্যই দুর্লভ। ১৯৬৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। সম্প্রতি তিনি আর একদম লিখছিলেন না। হয়ত শারীরিক অসুস্থতা তাঁর অন্যতম কারণ। কিন্তু মনে হয়, তাঁর দেশে সামরিক শাসনের প্রবর্তনও তাঁকে অনেকটা মূক করে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বসাহিত্যের যে একটা বিরাট ক্ষতি হলো, তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী কোন সংখ্যায় তাঁর সাহিত্য কর্মের উপর বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে রইল।

বাংলা দেশের সমর্থনে ইন্দোনেশীয় কবি ॥ বাংলা দেশের শরনার্থী-দের দুর্দশা এবং বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি অষ্ট্রেলীয়বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশিষ্ট ইন্দোনেশীয় লেখক কোয়াল পোয়েরনোমো ক্যানবেরার পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী অনশন করেন। এ ছাড়াও তিনি মেলবোর্ন এবং অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য জায়গায় ঘুরে ২০ হাজার ডলারের মত সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কবি লেখকদেরও অনু-প্রাণিত করবে বলে আশা করি।

আন্তর্জাতিক শেক্সপীয়র উৎসব॥ সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট শেক্সপীয়র বিশারদদের নিয়ে শেক্সপীয়র কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা শুধু অভিনব নয়, দুঃসাহসও বটে। এই পরিকল্পনা যাঁদের চার পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্ভব হয়েছে, তাঁদের অগ্রণী হলেন কানাডার সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুডলফ হ্যাবেনিখট।

সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডা কাউন্সিলের যুক্ত উদ্যোগে গত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কানাডার ভ্যাঙ্কভারে আটদিন ব্যাপী এই বিশ্ব শেক্সপীয়র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় পাঁচশো প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। এদের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক কবি প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং নির্বাচিত অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী যোগদান করেন।

ডঃ চক্রবর্তী ছাড়াও আর যে সব শেক্সপীয়র বিশেযজ্ঞ এতে যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে এম. সি. ব্যাডব্রুক (কেম্ব্রিজ), এফ. ডব্লু. বেডন (অক্সফোর্ড), ডব্লু. ক্লেমদ (ম্যুনিখ), জে. জ্যাকো (ফ্রান্স), জি. ই. বেণ্টলি (প্রিন্সটন), জেত বারিশ (বার্কলে), সি. লিচ (টরণ্টো), জি. সেলকিউরি (রোম), ই. ওয়েথ (ইয়েল), এন. র‍্যাকিন (কালিফোর্ণিয়া), টি. দে. বি. স্পেন্সার (বাকিংহাম), জি. কোজিৎসভ (লেনিনগ্রাদ), টি. ওয়াসা (টোকিও), ডি. ম্যালাভেটাস (গ্রীস), জেড, স্বিবনি. (প্রাগ) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই সম্মেলনে শেক্সপীয়র চর্চার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। এইসব আলোচনায় শেক্সপীয়র গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, নতুন গবেষণা পদ্ধতি, অনুবাদ সমস্যা, গ্রন্থপঞ্জী, শেক্সপীয়র ও কম্পিউটর এবং শেক্সপীয়র ও মনঃসমীক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রতিদিন দু'বেলা নির্ধারিত সময়ে আমন্ত্রিত প্রবন্ধ পাঠকেরা প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পরে তার উপর আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় কয়েকটি বিতর্কমূলক ফিল্ম দেখানো হয় এবং কয়েকদিন সেক্সপীয়র যুগের থিয়েটারও আয়োজিত হয়। রুশ ফিল্ম হ্যামলেট ও কিংলিয়র এর পরিচালক গ্রিগরি কোজিনৎসেভ তাঁর তৈরী ফিল্ম দু'টি একদিন প্রদর্শনের আয়োজন করেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তীকে এই কংগ্রেসের পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পঠন পাঠন ও গবেষণা বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রন জানান

ডঃ চক্রবর্তী আমন্ত্রিত হয়ে মন্ট্রিল (কানাডা), বার্কলে, স্যানফ্রানসিসকো, শিকাগো ইলিনয়েস, হার্ভাড (আমেরিকা), লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড (ইংলণ্ড), ইউনিভার্সিটি অ্ প্যারী (ফ্রান্স) ও রোম (ইতালী) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই বিশ্ব-শেক্সপীয়র-কংগ্রেস নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়র চর্চার নূতন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করি।

বিশ্ব রামায়ণ উৎসব—ইন্দোনেশিয়া ও ইউনেস্কোর যুক্ত উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব জাভায় বিশ্ব-রামায়ণ-উৎসব এবং আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। এশিয়া মহাদেশের যে সকল দেশে রামায়ণের ঐতিহ্য এখনও নানাভাবে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় আছে সেই সকল দেশ যেমন, ভারত, সিংহল, নেপাল ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস, ফিলিপাইনস্, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এতে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করে।

পূর্ব জাভার অন্তর্গত পান্ডান সহরে এশিয়ার বৃহত্তম উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে ৩১শে আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন, তারপর ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একাদিক্রমে প্রতি রাত্রে পান্ডানে দুটি দেশের রামায়ণ বিষয়ক নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। তারপর থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথমতঃ পূর্ব জাভার প্রধান সহর যোগ-জাকার্তা তারপর বালিদ্বীপের প্রধান সহর দেন পাসার এবং শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী সহর জাকার্তায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নৃত্য সম্প্রদায়ের এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব শিল্পীদিগের নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ভারতবর্ষ থেকে দুটি সম্প্রদায় তাতে যোগদান করেছিল—কেরলের কথাকলি এবং গোয়ালিয়রের লিট্‌ল ব্যালে। জাভা এবং বালিদ্বীপের বিভিন্ন সম্প্রদায় রামায়ণ নৃত্যে চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছে।

পান্ডানের নিকটবর্তী ত্রেতাস শৈলনগরের মনোরম পরিবেশে রামায়ণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের চারি দিন ব্যাপী অধিবেশন সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক দেশ থেকে তাতে যোগদান করবার জন্য দু'জন করে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিল, কেবল ভারতবর্ষ থেকে চারজন প্রতিনিধি তাতে যোগদান করে ছিলেন ; এঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, দিল্লীর প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর শ্রীলোকেশ চন্দ্র, মাদ্রাজ কলাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতা রুক্মিনী দেবী অরুণ্ডালে এবং তামিলনাড়ুর অধ্যাপক ডক্টর

শ্রীনিবাস রাঘবন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী-দের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধি ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি পুরস্কার লাভ করেন। ডক্টর ভট্টাচার্য আলোকচিত্র সহযোগে বালিদ্বীপের কয়েকটি নৃত্যের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া অঞ্চলের ছৌ নৃত্যের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উৎসবে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক এবং আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণকারী ব্যতীতও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহস্রাধিক অনুরাগী শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো, দ্বিতীয় উৎসব দু বছর পর ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানা গেছে।

একটি কবিতা পাঠের আসর ॥ কবিতা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ১০ অক্টোবর লেক স্টেডিয়ামে পাঠাগার গৃহে একটি কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা পাঠ করে শোনান বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, শান্তি লাহিড়ি, সামসুল হক, বিজয় কুমার দত্ত প্রমুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্রও কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সামসুল হক বাংলা দেশ মিশনের জন্য দুটি চেকে একান্ন টাকা প্রেমেন্দ্র মিত্রের হতে তুলে দেন।

আধুনিক আমেরিকান কবিতা বিষয়ে আলোচনা চক্র ॥ গত ১১ আগস্ট কটকের 'দিগন্ত' দপ্তরে ওড়িশার বিশিষ্ট কবিদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন কটক রেভেনশ কলেজের ইংরেজি ভাষার প্রধান ডঃ দেবপ্রসাদ পট্টনায়ক। ডঃ পট্টনায়ক সম্প্রতি আমেরিকা থেকে আধুনিক আমেরিকান সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আধুনিক আমেরিকান কবিতার উপর একটি সুদীর্ঘ সুন্দর আলোচনা করেন। তিনি বলেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমেরিকান কবিতায় এক নতুন বাঁক লক্ষ্য করা যায়। পাউন্ড, উইলিয়াম চার্লস উইলিয়ামস, ওয়ালেস স্টিভেনস, কামিংস প্রমুখ প্রবীন কবিদের অতিক্রম করে চল্লিশ দশকে রবার্ট লাওয়েল, এলিজাবেথ বিশপ প্রমুখ নতুন কবিদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু it is the third generation of poets that shows the most versatile range. Through little magazines, limited editions, broad-sided and manuscript circulation and through poetry readings these poets held

the audience and readers in Berkeley, San Francisco, Boston, Black Mountain and New York city. এই নতুনতর কবিদের মধ্যে যাঁদের প্রভাব খুব ব্যাপক তাঁরা হলেন চার্লস ওলসন, ডানকান, ক্রীলি, জনাথন উইলিয়ম প্রমুখ। ডানকান প্রকৃতপক্ষে সানফ্রান্সিসকো কবিগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়। এছাড়া বীট কবিরা তো আছেনই। তবে তাঁদের প্রভাব খুবই স্তিমিত।

এই তরুণতর কবিদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব কাব্যদর্শন আছে। ক্রীলি মনে করেন—কবিতা এবং গদ্য are equally given me to write, I do not feel to create them. ম্যাক ক্ল্যর মনে করেন যে কবিতা হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠ সমীকরণ। তাঁর রচিত কবিতা "For Synder, the Ten Master" সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : I try to hold both history and wilderness in mind, that my poems may approach the true measure and things and stand against the unbalance and ignorance of our times.

ব্ল্যাক পোয়েট্রি আমেরিকার সমকালীন কাব্য আন্দোলনে বিশেষ অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। এই কবি গোষ্ঠীর মধ্যে লেরোই জোনস, জি. ব্রুকস. প্রমুখ উল্লেখ্য।" তিনি সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতা সম্বন্ধে এই উপসংহারে উপনীত হন, এ হল বহু বর্ণের সমন্বয় এবং তার অগ্রগতি খুবই বিস্ময়কর।

তাঁর আলোচনার পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শচী রাউত রায়, ডঃ বি. জে. ত্রিপাঠী, জয়ন্ত মহাপাত্র, শ্রীমতী পদ্মালয়া দাশ, শ্রীমতী বীণাপাণি মহান্তি, শ্রীমতী সি. তুলসী প্রমুখ।

ওড়িআ কবিতা পাঠে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ গগনচন্দ্র মিশ্র, প্রফুল্ল কুমার মোহান্তি, টি, মহাকুল, ঝর্ণা রথ প্রমুখ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট তরুণ কবি।

সাহিত্য আকাদেমীর নতুন ফেলো॥ গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় আমেদাবাদের এইচ. কে. আর্টস কলেজে এক অনুষ্ঠানে কাকাসাহেব কালেল-কারকে সাহিত্য আকাদমীর দ্বাদশ ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। গুজরাটের গভর্ণর শ্রীমণ নারায়ণ এই ফেলোশিপ প্রদান করেন। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাত কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশি এম. পি. কাকাসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—"কাকাসাহেব ভারতীয় সাহিত্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির

প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যশৈলীও অনুধাবনযোগ্য। কাকাসাহেব তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাহিত্যিকদের রাজনীতির উর্ধে যাবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন—"যদিও আমার মাতৃভাষা মারাঠি তবু গুজরাটি আমার প্রিয়। আমি একাধিক ভারতীয় ভাষা জানি। ভারতকে জানতে হলে ভারতীয়দের এ পথেই যেতে হবে।"

সংস্কৃতি-সাময়িকী

দিগন্তের রঙ ৭·০০—গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

'দিগন্তের রঙ'-এ লেখক শ্রী গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী বর্তমানের জটিলতাপূর্ণ যন্ত্রযুগের মানুষদের যন্ত্রণাময় ইতিহাসের একটি বিশেষ দিগন্তের উপর আলোকপাত করেছেন। শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে অবহেলিত, লাঞ্ছিত এবং শোষিত শ্রমিকদের জীবনকথা। যারা জীবনের রস আস্বাদন থেকে চিরকাল বঞ্চিত, ভাগ্যলক্ষ্মী যাদের কোনকালে কৃপা করেন নি, সেই সব সর্বহারা মানুষেরা তাদের অভিযোগ আর হাহাকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'দিগন্তের রঙ'-এ। লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে সুনিপুণভাবে তাদের জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসোপম চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি এতে নেই। কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ঘটনা এখানে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

ঘটনার স্থান হিরণপুরের কোলিয়ারী অঞ্চল। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র জীবন চট্টোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক, ভাগ্যের পরিহাসে যিনি কয়লাখনি অঞ্চলে কাজ করতে গিয়েছেন এবং শ্রমিকদের ভালোবেসে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন অতি সহজে। তিনি দৃঢ়ভাবে জীবনের সবরকম বাধাবিপত্তির সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন এবং শ্রমিকদের আপদে বিপদে তিনিই সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মানসিক উদারতা, কর্তব্যে নিষ্ঠা এবং অনমনীয় দৃঢ়তা পাঠকের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। এছাড়া শ্রমিক চরিত্রগুলির মধ্যে আকলু গোরাইৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ যে মালিকদের শিকার হয়েছিল এবং জীবনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রমজানের চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরেকটি বিশেষ চরিত্র হ'চ্ছে স্বর্ণময় সোম, যে ব্যক্তিগত জীবনে জীবন চ্যাটার্জীর বন্ধু ছিল,

ঘটনাস্থলে যে সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতা এবং মালিকদের পরামর্শে যে শ্রমিক-দের সর্বনাশ ডেকে আনত। শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই যেখানে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে সেখানেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে মালিকদের হাতে। অত্যা-চারী মালিক হিসেবে চৌধুরী ও ভাটিয়াকে লেখক নিপুণভাবে এঁকেছে। স্ত্রীচরিত্র হিসেবে জীবনের স্ত্রী সবিতা (যার পূর্বনাম ছিল আশা) এবং কাঁকন খুবই উজ্জ্বল। এছাড়া আরও অনেক ছোটবড় চরিত্র এতে স্থান পেয়েছেন।

উপন্যাসটিতে লেখকের বর্ণনাশক্তি অনেক জায়গায় খুবই আকর্ষণীয়। বিশেষতঃ দীনদার হোটেল, তার পরিবেশ এবং সেখানে সবার মেলামেশার ধরণটি খুবই জীবন্ত।

এখানে লেখক শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের জাগরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এতদিন ওরা সহ্য করেছে। কিন্তু এবার ওরা অত্যাচারী মালিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছে। সেইদিন এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। সে দ্বন্দ্ব শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্ব; সুবিধাবাদী মধ্যস্থদের সেখানে কোন স্থান নেই।

পূর্বদিগন্তে যখন রঙ লাগে তখন তা একটি আলোকময় দিনের আগমন সূচিত করে। অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্রমিমসমাজের দিগন্তেও আজ রং লেগেছে। ওরা তাই আজ সুদিনের জন্য প্রতীক্ষমান। সেই ঘোষণা করেই লেখক তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। লেখকের সাবলীল বলার ভঙ্গী সহজেই উপন্যাসটিকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

কুমকুম সেন

চট্টজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ-বিচিত্রা, শ্রীকান্ত ৩য়, ৪র্থ খণ্ড) / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আরোগ্য নিকেতন / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
জাগরী, সতীনাথ-বিচিত্রা, দিগ্‌ভ্রান্ত / সতীনাথ ভাদুড়ী
কথা-চরিত মানস / বিমল মিত্র
ন্যায়দণ্ড, লৌহ কপাট (৩য় খণ্ড) / জরাসন্ধ
মন্দাক্রান্তা / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বলাকার মন, আবার আমি আসব / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বরযাত্রী, রূপ হ'ল অভিশাপ / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পুতুল নাচের ইতিকথা / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জেনানা ফাটক / রানী চন্দ
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে / সুরেশচন্দ্র সাহা
বালজাক / যজ্ঞেশ্বর রায়
মানব কল্যাণে রসায়ন / দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
নাগচম্পা / নারায়ণ সান্যাল
রুদ্ধ যাযাবর / গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সমুদ্রের চূড়া / গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রাশিয়ার ডায়েরী / প্রবোধকুমার সান্যাল
হাঁসের আকাশ / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দিগন্তের রং / গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রকাশ ভবন /

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পার বাংলা ওপার বাংলা // শংকর
র নাম সংসার // বিমল মিত্র
জল তুলির টান // আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ালোকপর্ণা // নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দার বংশধর // ওঙ্কার গুপ্ত
[illegible] // সমরেশ বসু
র্ম বিজ্ঞান ও শ্রী অরবিন্দ / দিলীপকুমার রায়
ঙ্কিকলাল // বনফুল
াবগারী দারোগার ডায়েরী // সুভাষ সমাজদার
ক বর অনেক কনে // কুমারেশ ঘোষ
গ্রাম / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ন অবশ্য, শুধুই কথা // চাণক্য সেন
ডি / জরাসন্ধ
[illegible] কখনও / প্রেমেন্দ্র মিত্র
শিপদ্ম / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য
প্রাইভেট লিমিটেড /
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ //

সাহিত্য
পত্রিকা

সুনীতা সুখী কিন্তু মালতী চিন্তায় জর্জ্জরিত

সুনীতার দূরদৃষ্টি ছিল: তিনি পরিবার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় সুনীতা ও তাঁর পরিবারের সুখের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে।

ছোট পরিবার
সুস্থ পরিবার

davp 72/228

নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বারো টাকা ও
ছ'মাসের জন্য ছ'টাকা অগ্রিম দেয়
রেজেস্ট্রি ডাকে পেতে হলে পৃথক খরচ দেয়
সাধারণ ডাকে পত্রিকা নিরুদ্দিষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া চলে
গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক
রচনার নকল রেখেই লেখা পাঠাবেন
কোন গোলযোগে রচনা নষ্ট হলে
আমরা দায়ী নই
সঙ্গে ডাকটিকিট থাকলে
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়
কিন্তু অমনোনীত কবিতা
কখনোই নয়
রচনা সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা
সম্ভব নয়
পত্রোত্তরে এজেন্সীর নিয়মাবলী
জানানো হয়
পত্রিকার সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা
সবরকম যোগাযোগ ও টাকাকড়ি পাঠানোর ঠিকানা
কালি ও কলম ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রাজর্ষি রামমোহন (জীবনী)—ঋষি দাশ	১০·০০
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) —ডঃ মনোরঞ্জন জানা	১০·০০
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক)— „	১৬·০০
বিদ্যাপতি-সমীক্ষা—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী	১০·০০
তুমি-আমি-অন্যান্য [রম্য-রচনা]—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৫·০০
বাস্তুবিজ্ঞান (Building Construction)—নারায়ণ সান্যাল	১০·০০
অপরূপা অজন্তা— „	১২·০০
রবীন্দ্র সাহিত্যে নবরাগ—সুখময় মুখোপাধ্যায়	৬·০০
বাংলার ইতিহাসে দু'শো বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল) ঐ	১৬·০০
ময়মনসিংহ-গীতিকা (ছাত্র-পাঠ্য সংস্করণ)— ঐ	১০·০০
শ্রীরূপ ও পদাবলী-সাহিত্য—ডঃ শুকদেব সিংহ	১৫·০০
সংস্কৃতির ধর্ম—দক্ষিণারঞ্জন বসু	৮·০০
মানব সমাজ—রাহুল সংকৃত্যায়ণ	৭·৫০
শক্তিদর্শন ও শাক্তকবি—ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৮·০০
চেকভের গল্প ; অনুবাদক—বিমল দত্ত	৪·০০
মোপাশাঁর গল্প— ঐ	৪·০০
পরমারাধ্যা শ্রীমা— মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত	৩·০০
মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা— ঐ	৮·০০
মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ— ঐ	৮·০০
উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি—সুশীল ভট্টাচার্য	১২·০০
লোকসাহিত্যে শৈশপ—ডঃ সুধীর করণ	৬·০০
বঙ্কিম অভিধান—অশোক কুণ্ডু	১৫·০০
গৃহস্থবধূর ডায়েরী [রম্য-রচনা]—বাসবদত্তা	৮·০০
হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস—বাণীকুমার	৬·০০
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—নারায়ণ চন্দ	৮·০০
আরামবাগের ইতিকথা—চুণীলাল বসু	৩·০০
পশ্চিমের পাঁচালী—[ভ্রমণ] ডঃ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	৪·০০
কাশ্মীর-অমরনাথ [ভ্রমণ]—মন্মথ রায়	৬·৫০
মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক—সুপ্রকাশ রায়	৩·০০
ইংলিশে বাংলায় লড়াই—স্বামী প্রেমঘনানন্দ	২·০০

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। ফোন—৩৪-৫১৭৮

কালি ও কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : **শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

সহ সম্পাদক : **শুভ মুখোপাধ্যায়**

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

॥ ষষ্ঠ বর্ষ ॥
॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥
॥ অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৭৯ ॥
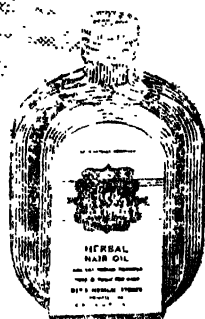
আমাদের কথা

'কালি ও কলম'-এর এই সংখ্যা প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ। মৃত্যুর এক যুগ পরে সুধীন্দ্রনাথকে স্মরণে আনার প্রয়াস পেয়ে আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করছি।

কী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ? "তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি।"—বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। "সুধীন্দ্রনাথ এমন একজন কবি যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আদীন ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।···কেননা সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ। পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষনী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য।···ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন এবং সর্ব বিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী।·· একটু চেষ্টা করলেই, বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাত বৃহত্তর কোনো ব্যাপারে নায়ক হতে পারতেন তিনি।···" (বুদ্ধদেব বসু) কিন্তু, তিনি লিখলেন কবিতা। এবং প্রবন্ধ। করলেন পত্রিকা সম্পাদনা। এবং কুল্যে সাতখানা ছোটো ছোটো কবিতার বই। দুখানা প্রবন্ধ সংকলন (কবিতার সংখ্যা দুশোর বেশি নয়, প্রবন্ধের পঞ্চাশ) এবং একটি পত্রিকার (প্রথমে ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক) বারো বৎসর-ব্যাপী সম্পাদনা-এর মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন নিয়ে নিলেন। বোধহয় একেই বলে প্রতিভা।

সুধীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় কবি হিসেবে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তিনি, মতান্তরে শ্রেষ্ঠতম। 'কল্লোল যুগের' ফেনোচ্ছ্বাসের পর এলো পরিচয়ের যুগের গহন, গভীর মনন ও মর্মিতা; আর সেই সঙ্গে হলো আধুনিক কবিতার নতুন অবগুণ্ঠন উন্মোচন। আগে থাকতেই ছিলেন জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব। এখন এলেন সুধীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-রা। বুদ্ধি, মনন, ভাষা, ভাবানুষঙ্গ, সব কিছু আলাদা। কবিতার ক্ষেত্রে এমন পালাবদল—রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা যখন তুঙ্গে—প্রায় অভাবনীয়। এবং এ যুগের সকল কবিতার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যই ধ্রুপদী

লক্ষণাক্রান্ত। প্রখ্যাত কবি সমর সেনের ভাষায়: Sudhindranath Dutta shuns the imprecision and the loose sequence of much that passes as inspired writing and in his best poems achieves a fusion of tradition and modernity, logic and passion. He combines common idioms with a classical diction. A predisposition to philosophical speculation gives his verse an intellectual textare rate in Bengali poetry.

এতো গেল কবিতার ক্ষেত্রে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের অবদান সম্যক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। গুটি পঞ্চাশ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার পরাকাষ্ঠা; বাংলা গদ্যে দিয়েছেন নতুন দিক্-দর্শন। এ-গদ্য বিমূর্ত চিন্তায় সাহায্য করে। বাস্তবিক, সুধীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পথ দুরধিগম্য হলেও, সাহিত্য-সমালোচনার ঐটিই আদর্শ সরণি-হওয়া উচিত। একথা অনস্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের পঙ্গু-অনুসরণে বাংলা গদ্যে যে স্ত্রী-আচার এসেছিল, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার ফলে তা আবার পৌরুষ ফিরে পাবার প্রয়াস পায়। আজকের সীরিয়স সাহিত্য সমালোচনার ভাষা অনেকখানিই যুক্তিবদ্ধ এবং দার্ঢ্যতায় মণ্ডিত, যার মূলে সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়' পত্রিকার দান অনেকখানি।

সুধীন্দ্রনাথের অপর প্রধান কীর্তি 'পরিচয়' গোষ্ঠী স্থাপনা ও 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশনা সম্পাদনা। ১৯২৬ সালে থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধের মাঝামাঝি কলকাতার সেই সুবর্ণময় যুগে বিদগ্ধজনের সেই 'আড্ডা' যার মধ্যে দেশি-বিদেশী দিকপালগণ: এক একটি নাম এক একটি জ্যোতিষ্ক বিশেষ। সে-গোষ্ঠীর মধ্যমণি সুধীন্দ্রনাথ। (আমাদের মধ্যে সব ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত দিত সুধীন, বলেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।) তারপর পরিচয় পত্রিকা প্রকাশ, যার মধ্যে দিয়ে আলোচনামূলক সাহিত্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ইত্যাদিতে কতো নতুন কথা, নতুন ভঙ্গী, নতুন চিন্তা। ওদিকে কবিতায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পরিচয়ের' কথা বলতে গিয়ে শিক্ষিত জনেরা টি. এস. এলিয়টের বিখ্যাত CRITERION পত্রিকার নাম করেন। দুটোই সমসাময়িক, এবং এক জাতের। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনখানি পত্রিকার নাম চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হবে: বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র এবং পরিচয়।

প্রতিভা এমন জিনিস তাহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে,—বলেছেন এক প্রাচীন প্রাবন্ধিক। সুধীন্দ্রনাথ এই প্রচলিত বাক্যটির জাজ্বল্য নিদর্শন। যা কিছু করেছেন তিনি,—সাহিত্য-ব্যতিরেকী অপর যে-কোনো কর্ম—তাতেও তিনি অসামান্য সফল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মাক্‌সিম গর্কি

এক সময়ে সৎসাহিত্যের সার্বজনীন আবেদনে আমার অগাধ আস্থা ছিল। তখন আর পাঁচ জনের মতো আমিও মনে করতুম যে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল ভিন্ন শিবের অন্য কোনও পরিচয় না থাকলেও, সত্য আর সুন্দর নির্বিকার ও নিত্য, তাদের সম্বন্ধে আদমসুমারির সাক্ষ্য যেমন অশ্রদ্ধেয়, বিসংবাদ তেমনই অভাবনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিশ্বাস ধোপে টিকল না; পারিপার্শ্বিক রুচি-পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে এবং নিজের খামখা খেয়ালের যুক্তি-সূত্র খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত আর না মেনে পারলুম না যে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা লোকাচারের মতোই দেশ, কাল ও পাত্রের মুখাপেক্ষী। এখানেও পরমার্থের স্বাক্ষর নেই, স্বার্থই কর্মকর্তা; এবং এক্ষেত্রে দর্শকের ব্যক্তিগত পক্ষপাত তো অনিবার্য বটেই, এমনকি দ্রষ্টার কৈবল্যও হয়তো কিংবদন্তী। অবশ্য তৎসত্ত্বেও সাহিত্যবিচারে শ্রেণীসংঘর্ষের প্রস্তাবনা সঙ্গত নয়; এবং হোমর বা সেক্‌স্‌পীয়র, য়ুক্লিড্‌ বা ন্যুটন্‌-এর প্রতিপত্তি এতই সার্বভৌম ও সর্বকালীন যে তাঁদের নির্লিপ্তি অন্তত আংশিকভাবে সার্থক। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রমমাত্র, সাধারণ বিধির প্রত্যন্তে অবস্থিত; এবং গত সাত-আট হাজার বৎসরের বিবর্তনেও এই রকম বিশ্বমানবের সংখ্যা যখন মুষ্টিমেয়ই রয়ে গেছে, অহংসর্বস্বদের মতো অসীমে ঠেকেনি, তখন শিল্পিবিশেষের সুনাম-কুনামের জন্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী তাঁর সমসাময়িকদের সহজ অনুকম্পা অথবা স্বাভাবিক অনীহা।

অর্থাৎ সরস্বতীপূজাও যুগধর্মেরই অভিব্যক্তি; এবং যুগধর্ম লোকোত্তরের ধার ধারে না, লোকায়তেই বাঁচে-মরে। অতএব প্রকাশ্যে বিদ্যোৎসাহ দেখালেও, ভারতীর কাছে আমরা ধনলাভ, বংশবৃদ্ধি, শত্রুনাশ ইত্যাদি বরই চাই; এবং সেই জন্যে কোনও কোনও কাব্যবিবেচকের মতে মহাকবিরা পরবর্তীদের উপরে প্রভাববিস্তারে অক্ষম, সে-সাফল্য অকবিদেরই আয়ত্তে। কারণ প্রকৃত কাব্যের প্রাঞ্জলতায় ভুল বোঝার অবকাশ নেই; এবং ব্যাসকূটের সংখ্যায় স্বেচ্ছাচার যেহেতু স্বাভাবিক, তাই অপসাহিত্য অনুযাত্র-আকর্ষণে সিদ্ধহস্ত। সম্ভবত এ-সিদ্ধান্ত অতিরঞ্জিত; কিন্তু চরিত্রগত ঐক্যের অবর্তমানে এড্‌গর অ্যালেন্‌ পো-র সংক্রাম বোদলেয়র মারফৎ ফরাসী দেশে পৌঁছাত

কিনা সন্দেহ, এবং স্বদেশের বাইরে বাইরন্-এর প্রতিপত্তিও উক্ত অনুমানের সাক্ষ্য। অন্ততঃপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদিপুরুষেরা মিসোলঙ্গিতে তাঁর অকাল মৃত্যুর অনুকরণ করেননি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি মানি যে তাঁর ক্ষেত্রে বিদ্রূপ ও বিদ্রোহের অবৈকল্য বাঙালীর অবিদিত ছিল না, তবু এ-কথার অস্বীকার শক্ত যে আমার অনেক সমসাময়িক এলিয়টী রচনারীতির গুণগ্রাহী, তাতে স্বসমুখ বিপ্রলাপের সামঞ্জস্য-সাধন আপাতত অনাবশ্যক বলে।

সে যাই হোক, পরলোকগত মাক্‌সিম্ গর্কি-র সঙ্গে দেশ-কালের যোগ আমার নেই, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি এমনই বিসদৃশ যে আমার পক্ষে সে মনীষার মূল্যবিচার ধৃষ্টতা। আমি উত্তরসামরিক মানুষ, বিমানবিধ্বস্ত সমাজে বেড়ে উঠেছি, মেশিন্ গানের অগ্নিবৃষ্টি, শর্ষে গ্যাসের বিষবাষ্প, গৃহবিবাদের রক্তগঙ্গা আমার আবাল্য সহচর। কাজেই আমার অবস্থাপন্ন অগ্রজদের মতো স্বাধীনতার দেবদত্ত অধিকারে অচলা ভক্তি আমায় সাজে না, অন্যায়ের অমোঘ পরাজয় আমি রূপকথার রাজ্যেই খুঁজি, এবং আমার জানতে বাকী নেই যে সাম্য ও মৈত্রীব মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্যায়ে। উপরন্তু অনাবশ্যক নরবলি ছাড়া বিদ্রোহের যে অন্য কোনও পরিণাম আছে, তা আমি ভাবতে পারি না, এবং প্রাগ্রসর মরীচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে এত জাতি গত বিশ বছর ধ'রে নরকের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে যে অদৃষ্টের গয়ংগচ্ছে অধৈর্যপ্রকাশ আমার বিবেচনায় মারাত্মক, তাতে অরাজকতারই আগল ভাঙে, ভাগ্যবিপর্যয় দুনে চলে না। অতএব গর্কির বিপ্লববিলাসে আমার সহানুভূতি নেই।

পক্ষান্তরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশায় মানুষের মনোভাব অন্য রকম ছিল, রোমান্টিক্ আদর্শের আত্মপ্রবঞ্চনা তখনও অনাবিষ্কৃত, কালপ্রবাহের বাঁধা ঘাট তখনও উদারনীতির শূন্যকুম্ভে শব্দায়মান, এবং নির্বাসিত ভগবানের উচ্চ সিংহাসনে ব'সে বিজ্ঞান তখনও দুঃস্থ সংসারকে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির প্রলোভন দেখাতে ব্যস্ত। অবশ্য ইতিমধ্যেই সেই স্বপ্নগর্ভ অন্ধকারের এখানে ওখানে রূঢ় আলোক উঁকি পাড়ছিল; এবং বুয়োর্ যুদ্ধ, জাপানের অভ্যুদয়, ফাশোদা ইত্যাদির উপদেশে কেবল কালারাই কান পাতেনি। কিন্তু তখনকার মানুষ শব্দব্রহ্মকেই সর্বশক্তিমানের মর্যাদা দিত, এবং সদিচ্ছা আর সমাজসংস্কারের মধ্যে যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান, তা সেই ওজস্বিনী বক্তৃতার যুগ ঘুণাক্ষরেও বোঝেনি। হয়তো সেই জন্যে শ-প্রমুখ ফেবিয়ান্‌দের কাছে মার্ক্‌স্ হাস্যকর ঠেকেছিল; এবং সেই বুদ্ধিজীবীরা স্থানে-অস্থানে জোর গলায় ব'লে বেড়িয়ে-

ছিলেন যে সকলে যদি তাঁদের মতো আমিষভোজন ছাড়ে, তবেই ভবিষ্যতের কল্পলতায় টেনিসনী নজীরের স্বতঃস্ফূর্তি শুরু হবে। যত দূর মনে পড়ে, গর্কি-র সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপের প্রথম পরিচয় এই ভাবধারার শ্রাবণপ্লাবনের দিনে; এবং সমাজের অধস্তন স্তরে জন্মালেও, তাঁর পরিকল্পিত ত্রাণকর্তারা যেহেতু কর্মবীর নন, অসাধারণ তার্কিক আর অসামান্য বাগ্মী, তাই গর্কি-র নাম জপতে জপতে তদানীন্তন রক্ষণশীলেরাও ভেবেছিলেন যে তাঁরাই বুঝি অত্যাচারের চির শত্রু ও নব বিধানের অগ্রদূত।

আমি জানি উল্লিখিত মন্তব্যের বিপক্ষে অনেকে আপত্তি তুলবেন; এবং যাঁদের চক্ষে সোভিয়েট্ শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্টিকের চরম ও পরম সমন্বয়, তাঁরা নিশ্চয় আমাকে ধমকে বলবেন যে, মাক্‌সিম্ গর্কি শুধু বৃদ্ধ বয়সে নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার গুণ গাননি, ১৯০৫ সনের সশস্ত্র রাজদ্রোহেও তিনি সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। তথাচ তাঁকে হিংসাব্রত বোল্‌শেভিক্‌দের সমপাঙক্তেয় ভাবা আমার পক্ষে অসাধ্য। কারণ তৎকালীন জার্মান্ দার্শনিকদের সংসর্গ-দোষে গর্কি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই মার্কস্‌বাদে আস্থা খোয়ান, এবং উক্ত সমাজতন্ত্রের শোধন-কল্পে কাপ্রি আর বোলোনাতে দুটি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করে সহকর্মী লুনাচার্স্কি-র সঙ্গে লেনিন্-এর কটু কাটব্য কুড়ান। কিন্তু তাতেও তাঁর ভুল ভাঙেনি; এমনকি ১৯১৭ সালের উপনিপাতের পরেও বুর্জোয়া সংস্কৃতির অপঘাত শোচনীয় জেনে তিনি উচ্ছ্বাসী লুনাচার্স্কি-র সংস্রবই ছেড়েছিলেন, বিজয়ী বিপ্লবের শৃগালী ঐক্যতানে স্বর মেলাতে পারেননি। তবে নব-বিধানের ধ্বংস-কামনায় তাঁর সম্মতি ছিল না; এবং বুনিন্-প্রমুখ স্বদেশপলাতক লেখকদের মতো মাতৃভূমির কুৎসা-প্রচারে তিনি উৎসাহ দেখাননি।

উপরন্তু গর্কি যদিও একাধিক বার সাফল্যের চূড়ান্তে উঠেছিলেন, তবু বাঁদা-বর্ণিত মসিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কোনও দিন ছোঁয়নি; এবং জনগণের আত্মপ্রসাদে সাধুবাদের ঘৃতাহুতি ঢালা আমরণ তাঁর বিবেকে বাধলেও, তিনি কখনও ভোলেননি যে প্রাক্তন আত্মীয়তার সূত্রে প্রোলেটেরিয়ট্ই তাঁর সেবা ও অনুকম্পার অংশভাক্। তাহলেও ব্যক্তিবাদ তাঁর কাছে মহামূল্য ঠেকত; রুষ ধনতন্ত্রের রক্তাক্ত উপসংহারে তিনি যথাসাধ্য প্রতিবন্ধক জুটিয়েছিলেন; এবং জন্মভূমি সম্বন্ধে বিদেশীদের অবিমিশ্র বৈরভাবে ধৈর্য হারিয়ে তিনি তাঁর শেষ জীবন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ছিদ্রান্বেষে কাটিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই রুচি-পরিবর্তনের পরেও গর্কি মনুষ্যধর্মের বাধ সাধেননি, আঁকড়ে ধরেছিলেন। আসলে গর্কি-র হৃদয় তাঁর মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বড়; এবং সেই জন্যে

লেনিন্-এর মৃত্যুর পরে তিনি এক দিকে যেমন লেনিন্-প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রকে তাঁর শোকার্ত বন্ধুবাৎসল্যের উত্তরাধিকারী ব'লে চিনেছিলেন, তেমনই অন্য-দিকে তার অহেতুক কৃষকবিদ্বেষের দায় রুষ জাতির তথাকথিত নৃশংসতার উপরে চাপিয়ে তিনি স্বদেশে সমষ্টিবাদের সম্ভাব্যতা মানতে চাননি।

তাহলেও গর্কি-সম্পর্কে নির্বোধ-বিশেষণ অব্যবহার্য। বরং তাঁর ক্ষেত্রে রুষ চারিত্র্যের স্বভাবসিদ্ধ তর্কপ্রেম আত্মশিক্ষিতের সচেতন বিদ্যাভিমানে মিশে রসরচনাকেও তত্ত্ববিচারের মতো শুষ্ক ও সূক্ষ্ম ক'রে তুলেছিল; এবং এ অভিযোগ শুধু তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাস "ক্লিম্ সাম্গিন্"-সম্বন্ধেই খাটে না, জগদ্বিখ্যাত "ফোমা গার্ডেইয়েভ্", "থি অফ্ দেম্", "দি মাদার" ইত্যাদিও কেমন যেন নীতিমূলক, কেমন যেন অবাস্তব ও অসংহত। অথচ সে-বইগুলোর জীবন-বেদ অসাধারণ; তাদের পাত্র-পাত্রীরা মাঝে মাঝে অতিশয় জীবন্ত; এবং প্রাদেশিক কুসংস্কারের অনড় অন্ধকারও যে স্বাধীনতার সূর্যকে চিরকাল ঢেকে রাখবে না. এই অমর আশার উন্নয়নে প্রায় প্রত্যেক পুস্তক উদ্দেশ্যপ্রধান হয়েও সঙ্কীর্ণ সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়েছে। তৎসত্ত্বেও যে-পিপাসা নিয়ে আমরা রুষ-উপন্যাসের অতলে ডুবি. এখানে তা মেটে না; এবং টল্স্টয়-এর বিশ্ববীক্ষা, টুর্গেনিভ্-এর মাত্রাজ্ঞান, ডস্টয়েভ্স্কি-র অন্তর্দৃষ্টি, চেকোভ্-এর বহিরাশ্রয়িতা. সে সমস্তই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি ব'লে ধরা পড়ে, এমনকি এর পরে গোঞ্চারভ্ আর্টসিবাশেভ প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠাকেও আর জাতীয় প্রতিভার লক্ষণ হিসাবে ভাবা যায় না।

তবে এ-ধরণের তুলনা আসলে হয়তো নিরর্থক। কারণ রসপ্রতিপত্তি একাগ্রতার পুরস্কার; এবং সম্প্রতি কীথ্-এর মতো নৃতত্ত্ববিদও জাতিস্বাতন্ত্র্যের দিকে যতই ঝুঁকুন না কেন, তবু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মানুষী বিবর্তনে বর্ণাভেদের প্রশ্রয় দেন না। তাছাড়া সংস্কারমুক্তি ও স্বকীয়তা সকল সাহিত্যিকেরই কাম্য; এবং গর্কি-র নভেলে সুষমার অভাব আমার মতো ব্যক্তিদের পক্ষে পীড়াদায়ক বটে, কিন্তু তাঁর ছোট গল্প ও জীবনস্মৃতি বৈচিত্র্যের বাহুল্যে, তথা অপরিচয়ের বিস্ময়ে আমাদেরও মন মজায়। "দি বর্থ অফ্ এ ম্যান্", "ইন্ দি অটম্", "টোয়েন্টিসিক্স্ মেন্ অ্যাণ্ড্ এ গর্ল" এবং সর্বোপরি "দি লোয়ার ডেপ্থ্স্" পড়লে, আর সন্দেহ থাকে না যে গর্কি রুষ সাহিত্যের মহাপথে চলুন বা না চলুন, তাঁর রূপনৈপুণ্য অন্য কারও চেয়ে কম নয়; এবং সেই কলা-কৌশলের উপভোগ যদিও দুর্লভ বৈদগ্ধ্যের ধার ধারে না, তবু আদর্শ ও যাথার্থ্য, বাদানুবাদ ও তন্ময়তা, চিত্তশুদ্ধি ও রোমাঞ্চপ্রীতি

কালোপযোগিতা ও অবৈকল্যের এ-রকম অপরূপ সংমিশ্রণ তাঁর আগে আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত রসায়ন গর্কি-র বুদ্ধিজাত নয়, তাঁর আবেগপ্রসূত; তার পিছনে বিরাট্ সাধনা নেই, আছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য; এবং উপন্যাস যেহেতু এক নিঃশ্বাসে লেখা যায় না, ঐকান্তিক সঙ্কল্পের সাহায্যে গড়ে তুলতে হয়, তাই গর্কি-প্রমুখ প্রেরণাপ্রধান লেখকেরা ছোট গল্প-রচনায় যে-সাফল্য পান, বড় উপন্যাসে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন না। এ-ধরণের পুস্তকে আমরা মাঝে মাঝে হয়তো বিদ্রোহী উন্মাদনার বিদ্যুদ্বিলাস দেখি, অথবা বিদ্রোহের শোকাবহ বার্থতায় বুঝি না, আগন্তুক সমাজের সুসমঞ্জস চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ করি না। আমি যত দূর জানি, সফল বিদ্রোহ-সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপন্যাস একখানাও নেই। কারণ উপন্যাসে বিশ্বাসের অবকাশ থাকলেও বুদ্ধিই সেখানকার প্রভু; তার থেকে পক্ষপাত বাঁদ পড়ে না বটে, কিন্তু তার মধ্যে তুলাসাম্যই নজরে আসে; এবং সে-কার্যে সত্যকে যদি বা সম্ভাব্যতার খাতিরে ভোলা চলে, তবু তথ্য বা তত্ত্ব, কারও প্রয়োজনেই শৃঙ্খলার অসম্ভ্রম সয় না। আপাতত নিরাসক্তি ভিন্ন ঔপন্যাসিকের গতি নেই; এবং গীতিকবিতা বা আখ্যায়িকা-রচয়িতার মতো অনুকূল ঘটনাচক্র তাকে উত্তেজনা যোগায় না—সে যখন চরিত্রব্যবসায়ী, তখন মানস পুত্রদের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সে নিজেই জোটাতে বাধ্য।

সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও অত্যধিক কল্পনাবিলাস বিপজ্জনক; অলস মনে ভাব থেকে ভাবান্তরে ঘুরলেই, উপন্যাস ফুটে ওঠে না; সেজন্যে মমত্ববোধ বর্জনীয় এবং বিবেচনা আবশ্যিক। অর্থাৎ ছায়ামূর্তিও স্বাতন্ত্র্যে অধিকারী, স্বধর্মেই তার উজ্জীবন; এবং যে-পুত্র অহরহ পৈতৃক আদর্শের বোঝা বয়ে বেড়ায়, তার ব্যক্তিস্বরূপ যেমন পিসে মরে, তেমনই মানস প্রতিমা যখন উদ্‌ভাবকের মত-প্রচারে ব্যস্ত থাকে, তখন তার মধ্যে প্রাণস্পন্দনের সাড়া শোনা যায় না। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ বলেছিলেন নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থনেই কাব্যের উৎপত্তি; এবং সে-অনুমান যে মিথ্যা, তার প্রমাণ শেলির উচ্ছ্বসিত কবিতাবলী। কিন্তু কাব্যের বেলা সে-নিয়ম খাটুক আর নাই খাটুক, ঔপন্যাসিকের মুখ্য সম্বল কীট্‌স্-বর্ণিত জীবন্মুক্তি। বলাই-বাহুল্য এই নঙর্থক ক্ষমতা ভাবয়িত্রী প্রতিভার লক্ষণ; এই নির্মিকার সমভাব কারয়িত্রী প্রতিভাকে সাজে না; এবং এটা শুধু নিষ্কাম ও নৈরাত্ম নয়, অমানুষিক রকমের নিষ্ঠুরও। হয়তো সেইজন্যে সাহিত্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ট্র্যাজেডি; এবং শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকেরা দেশপ্রেম,

সমাজসংস্কার, ভগবদ্‌ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণায় সাধারণত অকাতর বটে, কিন্তু অব্যর্থ সিদ্ধি যে-সাধনার উপসংহার, তার প্রশ্রয়ী নন। অতএব উপন্যাস করুণাময়দের উপযুক্ত রঙ্গভূমি নয়; কেননা সর্বগ্রাসী বোধশক্তি আর সর্বংসহ ক্ষমা কেবল ফরাসী প্রবচনে তুল্যমূল্য; সাধারণ মানুষ স্নেহান্ধ, এবং স্নেহ আর হিংসা অভিন্নহৃদয়— উভয়েই অধীর ও একদেশদর্শী।

দুঃখের বিষয় বিপ্লবী লেখকরা আর্যসত্যে বীতশ্রদ্ধ। তাই উপরের সিদ্ধান্তে তাঁদের সমর্থন নেই; এবং তাঁরা যদিও জানেন যে অগ্নিপরীক্ষা উৎরিয়েই বৈদেহী দুর্মুখদের থামিয়েছিলেন, তবু সে-জন্যে তাঁরা রামের স্বমতিকে বাহবা দেন না, বলেন যে নিশ্চিতের যাচাই চিরায়ুদেরই মানায়, মর্ত্যমানুষের কাছে স্বজ্ঞার নির্দেশ স্বতঃপ্রমাণ। মার্ক্‌সীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর যতই আপত্তি থেকে থাকুক না কেন, মাক্‌সিম্‌ গর্কি-ও সত্য ও সাফল্যের অদ্বৈত মানতেন; এবং ১৯০৭ সাল থেকে ক্ষয়রোগের কবলে প'ড়ে সময়সংক্ষেপের প্রয়োজন তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। উপরন্তু অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের মতো তিনি দুঃখ-দৈন্যকে দূর থেকে দেখেননি; এবং পরোক্ষ অভাব-অনটন তাঁর ভাববিলাসের উপলক্ষ যোগাত না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজ্‌নির এক সর্বহারা পরিবারে তাঁর জন্ম; এবং চার বৎসর বয়সে চর্মকার পিতাকে হারিয়ে ১৮৯২ সনে তাঁর প্রথম গল্পের মুদ্রণ পর্যন্ত যে-অকথ্য দুর্দশা তাঁর সঙ্গ নিয়ে ছিল, সেই উপাদানে হয়তো দশ-বিশ খানা মহাভারত লেখা যেত, কিন্তু সে-সম্বন্ধে শিল্পীশোভন পারিপাট্যের অবকাশ ছিল না। অবশ্য তারপর থেকে মাঝে মাঝে রাজপুরুষদের তাড়া খেলেও, বর্তমান বিধি-ব্যবস্থা গর্কি-র জয় যাত্রার সামনে কেবল ফুলই ছড়িয়েছে। কিন্তু প্রাপ্যের অধিক পূজা পেয়েও তিনি নিজের গন্তব্য ভোলেননি, আমরণ মনে রেখেছিলেন যে গ্রাসাচ্ছাদনের, আহ্লাদে-আমোদে, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে শুধু প্রতিভাশালীর আয়ত্তি যথেষ্ট নয়, সর্বসাধারণের উৎকর্ষ সাধনই সভ্যতার একমাত্র ব্রত।

এ-আদর্শ যে মহান, অনবদ্য শিল্প সৃষ্টির চেয়ে অকৃপণ সমাজসেবা যে অনেক বেশী উদার, তা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ। তৎসত্ত্বেও উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ অর্ধ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং অর্ধ সত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক। অন্ততঃপক্ষে এ-সংবাদ সকলেরই সুবিদিত যে অনুরূপ যুক্তি অনুসারেই জার্মানী ও ইটালীর স্বাধিকার প্রমত্ত রক্ষণশীলেরা তথাকথিত অসামাজিক সৌন্দর্য জ্ঞান বা শ্রেয়োবোধের উদ্বন্ধন ঘটাচ্ছে; এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদেই যখন গর্কি-র সারাজীবন কেটেছে, তখন তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে কখনও প্রজ্ঞাবিসর্জন কুমন্ত্রণা মিলবে না,

স্বাবলম্বী বিচারবুদ্ধিকেই অপরিহার্য লাগবে। কারণ ফ্যাশি্‌জ্‌ম্‌ আর কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর উভয়সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যৎকিঞ্চিৎ কম অসৎ ব'লে আমাদের অবশ্যবরণীয় নয়; এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্যপন্থাই হয়তো অগতির গতি; এবং সে-পথে চলতে গিয়ে বুরিদান্‌-এর গাধা অনাহারে মরেছিল বটে, কিন্তু তার দুপাশে যে-দুই বিপরীতমুখী গড্ডলিকাস্রোত প্রবাহিত, তাদের পরিসমাপ্তি একেবারে প্রলয়পয়োধিতে।

স্বগত আষাঢ় ১৩৬৪ সংস্করণ থেকে পুনর্মুদ্রিত

সুধীন্দ্রনাথের বোধ, সংহতি ও গম্ভীর ঐশ্বর্যের প্রমাণ নিবিড়ভাবে তাঁর রচিত বিভিন্ন গদ্য ও কবিতাবলীতে ছড়িয়ে রয়েছে। সে কথা স্মরণে আনতে এই নিবন্ধটি আলোচনার দাবীদার হতে পারে।

ফাদার পিয়ের ফালোঁ, এস. জে.

সুধীন্দ্রনাথ

[বিস্তারিত আলোচনা নয়, এমনকি সুধীন্দ্রনাথের যুগ সৃষ্টিকারী সার্থক কাব্যের মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টাও নয়। কিছু ব্যক্তিগত প্রতিফলন, বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের ঐকান্তিক প্রয়াস। কবিকে জানতেন ও ভালবাসতেন, তাঁর সম্পর্কে এমন একজন বিদেশীর কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য।]

সুধীন্দ্রনাথের প্রগাঢ়-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। বেনারস ও প্যারিস তাঁর বিরাট মানসিকতাকে তৈরি করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন জগতের মতো ভলতেয়ার ও দিদেরোর অষ্টম শতাব্দীর জগতে তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। তাঁর রক্তের মধ্যে উপনিষদ ছিল কিন্তু দেকার্তে ও স্পিনোজার রচনাবলীর সঙ্গে বেশী সান্নিধ্যবোধ করতেন। মহাভারত তাঁর কাছে ছিল বিষয় ও রূপকের রত্নখনি। গ্যেটে তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হলেও, রবীন্দ্রনাথ ও মালার্মের কাছে তিনি ছিলেন ঋণী। তিনি ছিলেন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ছিলেন, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে আশ্চর্যরকম অনুসন্ধিৎসু। এক বিরাট পাঠক, অসম্ভব বিজ্ঞ। জীবনের বিভিন্ন দিকের সর্বোত্তমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ছিলেন এক বিরাট পর্যটক, যিনি বহুদেশ এবং সেইসব দেশের লোকদের জানতেন এবং ভালবাসতেন। তাঁর গদ্য-রচনা ও কবিতায় প্রবেশ করা সহজ ছিল না। শিল্পী হিসাবে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের কথা একবারও ভাবতেন না। তাঁর বন্ধু সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি অসম্ভব রকম সহজ ও সুগম্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যে কথা কখনও ভোলা যায় না, সেটি হচ্ছে তাঁর সরল হাসি যা তাঁর সদাহাস্যময় মুখে সব সময় লেগে থাকত। এক বিরাট অভিজাত এবং একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক, তিনি সামাজিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। আধুনিক ও উদার মনোভাব সম্পন্ন অথচ ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এই মানুষটিকে বিভিন্ন দল ও আদর্শের লোকরাই ভালবাসত। বাইরে থেকে মনে হয় এই পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ও ধারাকে বাহ্যত কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কবিতাকে ভালবাসতেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে, তিনি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিস এনেছিলেন। কিন্তু এই নূতন জিনিস কি তা খুব সহজে বর্ণনা করা যায় না। এক নূতন ধরনের স্থাপত্যের গুণাবলী, সীমিত কথা, "ধ্রুপদী" গাম্ভীর্য, আবেগ ও অনুপ্রেরণা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিরন্তর ও সচেতন প্রচেষ্টা, সমৃদ্ধ তির্যক ভঙ্গী যা তাঁর কবিতাকে অনেক বেশী অর্থবহ করেছে, কবিতার ভাষাকে অপেক্ষাকৃত কম মধুর বা কম বিষণ্ণ করার দীর্ঘ ও সচেতন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর কবিতা অনেক সঙ্গীতময় ও সমৃদ্ধ : যাঁরা সুধীন্দ্রনাথের রচনাবলী সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা এসব কথা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। মালার্মে ও ভালেরির কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা ওদের কবিতার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তুলনা করেছেন। তিনি মালার্মেকে 'গুরু' বলে জানতেন কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে এমন জিনিস আছে যাতে ভালেরি তার অনেক কাছের কবি মনে হয়। ভালেরির মতোই তিনি আশ্চর্যজনকভাবে প্রতীকের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যরীতির মিলন ঘটিয়েছেন, শব্দের যাদুময় প্রভাব, যুক্তি-নির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি, গভীর নৈরাশ্য ও নৈঃশব্দের শান্তিময়তা। সবচেয়ে সুন্দর কবিতার কয়েকটিতে অর্থহীনতা ও বিষণ্ণতা পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু এই বিষাদময় অবস্থা এমন নিরুত্তাপ ও আবেগহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে কবিতায় রোমান্টিকতার কোন স্থান থাকে না, কবিতা এমন এক গভীর গাম্ভীর্যময় দার্শনিকস্তরে উপনীত হয়, যা সুধীন্দ্রনাথের আগে বাংলা কবিতায় কদাচিত দেখা যায়। স্পষ্টভাবে প্রকাশ ছাড়াই, তাঁর আবেগহীন বর্ণনার মধ্যে আশঙ্কা ও দুঃখকে গভীরভাবে বোঝা যায়, আরও আবেগ ও রোমান্টিক-সুলভ শব্দের ব্যবহারে ঐ ফল পাওয়া যেত না। য়ুরোপীয় সমালোকচরা তাঁর কবিতা জানলে আপোলোনিয়ান হেলেনিজমের কথা বলতেন। বলতেন তাঁর কবিতায় ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যময়, যুক্তিনির্ভর ও মানবতাবাদ। দুঃখের বিষয়, অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথের গতিকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না, তাঁর সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন, শব্দের ধ্বনির প্রতি তাঁর ভালাবাসা। তাঁর নিজস্ব কাব্যের পদ্ধতি এবং পুরাপুরি হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীক ব্যবহারের জন্য তাঁর কবিতা কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা একরকম অসম্ভব। তা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ মালার্মে ও ভালেরির কবিতার সুন্দর বাংলা অনুবাদ করেছেন। হয়তো কোন বড় ইউরোপীয় কবি একদিন তাঁর কবিতা অনুবাদ করতে

উদ্যোগী হবেন। তিনি নিজে কিছু কবিতা অবশ্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

প্যাসকেল কোথায় যেন বলেছেন যে, কোন কবি কোন বাড়ি বা সভায় ঢুকলে "একজন সার্থক কবি আসছে" বলার মধ্যে কবির প্রতি প্রশংসা বোঝায় না। একজন সত্যিকারের মহান ব্যক্তি একজন কবি বা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হতে পারেন কিন্তু প্রথমেই তিনি একজন মানুষ। পাসকেলের ব্যঙ্গোক্তি Poete et non honnete honme" একই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন কবি কেবল কবি হলেই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানোর দরকার হয় না। প্যাসকেলের সংজ্ঞার অর্থ অনুসারে সুধীন্দ্রনাথ আশ্চর্য রকম ভাবে 'honnete home' ছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন মানবতাবাদী ছিলেন। তাঁর বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঘরোয়া ও আকর্ষনীয় আলাপ আলোচনার সময় কবির এই মানবতাবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত। কোন রকম কৃত্রিমতা ও ভান ছাড়াই আলোচনার সময় তিনি সবাইকে মোহ-গ্রস্ত করতেন। পৃথিবীর সব ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর সংস্কৃতির চেয়ে তাঁর মানবতাবাদ অনেক ব্যাপক ও গভীর ছিল। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নিতে হত, তা তিনি জানতেন। তিনি একজন বড় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন কিন্তু তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি কেন্দ্রিক অহমিকা ও সংকীর্ণ অহং ভাব থেকে মুক্ত ছিল। তিনি আন্তরিকভাবে এবং গভীর ভাবে অপরকে সম্মান করতেন।

অনেকে তাঁর কবিতায় দার্শনিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। তাঁর সবচেয়ে তীব্র প্রেমের কবিতার মধ্যেও এই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাবে। একাডেমিক বা বিশেষজ্ঞ সুলভ অর্থে সুধীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। মালার্মে ও ভালেরিও ছিলেন না। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর দার্শনিক অর্থে তিনি দার্শনিক ছিলেন, যিনি তাঁর সময়ের সব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, যিনি মানব সমাজের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং শিল্পের দর্শন বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। যুক্তিবাদী মনই তাঁর দর্শনের ভিত্তি, এটাই আধিবিদ্যক ও ধর্মীয় বক্তব্য সম্পর্কে তাঁকে সন্দিহান করেছিল। তিনি ভগবানে অবিশ্বাসী হলেও সত্যিকারের ধর্ম ও প্রকৃত দর্শন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অবশ্য তাঁর যুক্তিবাদী ও গ্রহণশীল মন সায় দিত না, এমন কিছু তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বড় বড় মিষ্টিকদের লেখা পড়েছেন,

ভগবানে বিশ্বাসী এমন অনেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় বন্ধু ছিল, অতীত যুগের বিশ্বাসের প্রতি তাঁর বিষণ্ণ ও অদম্য অন্বিষ্ট থাকলেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিশ্বাসী ছিলেন। নিরীশ্বরবাদ বা জড়বাদে তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে কোন অন্ধ গোঁড়ামি ও সরলীকরণ ছিল না। সৌন্দর্য ও সমগ্রের জন্য সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে এক নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ খুব বেশী দিনের নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে আমি তাঁর সহকর্মী ছিলাম। তিনি একজন বড় শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে খুব ভালবাসত। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের এমন আকর্ষণ আমি খুবই কম দেখেছি। তাঁর বক্তৃতাকে প্রয়োজনীয় ও আকর্ষনীয় করার জন্য তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। তিনি সহজভাবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতেন, নিজের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের রচনা ও প্রবন্ধ সংশোধন করতেন, সব সময়ে উৎসাহ দিতেন, মুখে সব সময় স্বাগত ও সাহায্যকারী হাসি লেগে থাকত। ছাত্রছাত্রীদের কাছ তিনি একজন শিক্ষক থেকে একজন দিকদর্শনকারী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি যেমন তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতেন, তেমনি ছাত্রদের কাছেও অনেক কিছু চাইতেন ; তিনি পেয়েছেনও অনেক। তাঁর বক্তৃতা কঠিন হলেও এত আকর্ষণীয় ছিল যে, অন্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসত। তিনি তাঁর ছাত্রদের ভালবাসতেন, তারাও তাঁকে বুঝত। কবিতায় ও জীবনে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতোই দেশ ও দেশবাসীর সত্যিকারের প্রতিনিধি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার যুগে তাঁর জন্ম, যে যুগ সংঘাত ও আশঙ্কার জন্য তমসাচ্ছন্ন, নৈরাশ্য ও হতাশা যে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সৌন্দর্যের প্রতি অদম্য ভালবাসার জন্য সন্দেহ ও বিবমিষা সত্ত্বেও তিনি সমসাময়িক কালের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমগ্রের অনুসন্ধানে তিনি একক, শান্ত ও হাসিমুখে পারিপার্শ্বিকের অসহযোগিতা সত্ত্বেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সময়ের বীভৎসতা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস অটুট ছিল। তিনি একজন বড় শিল্পী এবং তার চেয়েও একজন বড় মানুষ ছিলেন।*

*র‍্যাডিক্যাল হিউমানিষ্ট, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যায় (আগষ্ট ২৮, ১৯৬০) প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুএকটি কথা

কবি সুধীন দত্তের অন্তরঙ্গ বান্ধবগোষ্ঠীর একজন আমি নই; তবু স্বল্পকালের জন্যও তাঁর সঙ্গে একটি সুনিবিড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চাকরীর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে একই জায়গায় কর্মনিযুক্ত ছিলাম আমরা অর্থাৎ অত্যন্ত গদ্যময় পরিবেশে আমরা ছিলাম সহকর্মী। দুজনেই তখন পঞ্চাশোর্ধে, বয়সেও প্রায় সমকালীন। আলাপচারী সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছিল একদিনেই, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে কবিতা আবৃত্তি আর অতি সুপরিচিত হাসি মুগ্ধ করেছিল আমাকে।

> আমি বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী, মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে বীর নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধেযুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে যত না পশ্চাৎপদ ততোধিক বিমুখ অতীতে……ভবিষ্যের নিষেধে অধুনা ত্রিশঙ্কু……

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব বলতেন না, বলতেন আমার গুরু—এর মধ্যে কথার চমক্ শুধু নেই, রয়েছে অন্তঃস্থলে একটা বিরোধের সমন্বয়—ট্রাডিশন মানিনা, অথচ সত্যের ধারাকেও অস্বীকার করিনা। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের অন্তর্নিহিত কথাটিও তাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে 'আকাশপ্রদীপ' উৎসর্গ করে হয়তো বলতে চেয়েছিলেন যে শুধু (Subjective-Objective Co-relationএর উপরই কাব্যের প্রতিষ্ঠা নয়, সেখানে বুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণ গ্রাহ্য hard-hitting চেতনার সঙ্গে বোধিদীপ্ত মননেরও সমন্বয় দরকার।) কবিগুরুর আশীর্বাদেও সেই কথা—

> ভালের তিলক্ হোক দুঃসহ দহন
> নরকাগ্নি হোক্ তব স্বর্ণ সিংহাসন
> … … …
> অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
> জলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্যপ্রায়

শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকে বলতে গেলে বলা যায় যে মনের নরকের ভিতর দিয়ে না গেলে মানস স্বর্গে পৌছানো যায়না। কবি সুধীন্দ্রনাথের ছিল একটা

অপ্রকট সততা— তিনি দেখছেন একটি কঠোর সত্য, ত্রিভুবন জুড়ে কালের উর্ণাজাল,

নীরব নশ্বর যারা অবজ্ঞেয় অকিঞ্চন যত
তাহারা আজিকে যেন লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা
আমার সংকীর্ণ আত্মা অতিক্রমি দর্শনের সীমা
ছুটেছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গমের মত

কবি সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে জল্পনা কল্পনার আরম্ভ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের দুই দশক পূর্বে। ভরা যৌবনের ফুল্ল কুসুমিত দিনে বারো-ইয়ারী বৈঠকের জমজমাটি আসরে সাহিত্য সংস্কৃতির আলোচনা করি আমরা—রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি হয়, শেষের কবিতার বিশ্লেষণ 'নিবারণ চক্রবর্তী'র সন্ধান, ইয়েটস্ ডন্ এজরা পাউণ্ডকে নিয়ে মারামারি। হঠাৎ একদিন এক বন্ধু বম্বশেল ছুড়লেন—সুধীন দত্তর কবিতা পড়েছিস, বলেই সরবে গম্ভীর কণ্ঠে সুরেলা আবৃত্তি—

হায় ক্ষেমঙ্কর
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে
আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ
নও তুমি নাম মাত্র
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান।
... ...
হে বিধাতা
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস
যেন পূর্ব পুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি ক্রীত পদানত—
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস···

সুধীন দত্তর সঙ্গে আত্মিক পরিচয়ের সুরু সেইদিন। তারপর পড়লাম তাঁর "তন্বী", তাঁর "অর্কেষ্ট্রা", তাঁর "দশমী", "সংবর্ত", "কুলায় ও কালপুরুষ", "স্বগত" ইত্যাদি। "পরিচয়ে"র মাধ্যমে ফুটে উঠলো আর একটি পরিচয়—পরিশীলিত মনের। ভাষা সংকটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগ সঞ্চিত পরিশীলন সম্পদের সহিত পরিচিত করিয়ে দেওয়ার কাজ নিয়েছিল 'পরিচয়',

যাতে জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণচিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে (তখনকার) ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' স্বেচ্ছায় সেই গুরুভার ও দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল। এবং তার পুরোধা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগিগণ। দীপ্ত মননের উত্তর সাধক সুধীন্দ্রনাথের উপর তার লালনের ভার পড়েছিল, কারণ উদ্যোক্তারা তিনটি গুণ নির্দেশ করেছিলেন – বাংলাভাষার অতীতকে শ্রদ্ধা করা চাই, বর্তমানকে দরদ দিয়ে দেখা চাই এবং তার ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে অকুণ্ঠ বিশ্বাস থাকা চাই। সুধীন্দ্রনাথের এই তিন বিশেষত্বই ছিল। কালানুগত্যের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে। বাক্যব্যয় না কমালে সমাজে উজ্জীবন অসাধ্য, এও ছিল তাঁর কথা। সাহিত্যের দুই ক্ষেত্রেই অর্থাৎ গদ্যে ও পদ্যে সুধীন্দ্রনাথ সব্যসাচী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও গদ্যের কাছে সেই অনুপাতে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কাব্যের যে নিটোল ছায়া পড়েছে তার অনবদ্য প্রমাণ 'লিপিকা'। সুধীন্দ্রনাথেও তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য লিপি কৌশল ?

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব কোন দেশে কোন সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হল ? অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো—কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ? জাগল কে ? নিভিয়ে দিলো সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা, এখানে এক দরজায় আগল পড়ল, আর এক জানলা গেলো খুলে, এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে, সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

কিন্তু সুধীন দত্ত হয়তো বলবেন যে আলঙ্কারিকের গণিত-সাপেক্ষ ছন্দ ব্যতিরেকেও কবিতা রচনা সম্ভব। আলঙ্কারিক যাকে ছন্দ বলে সে একটা যান্ত্রিক কৌশলমাত্র। সেই নাগরদোলার ঘূর্ণী লেগেই আমাদের মন অনেক সময়ে কবিতাবিশেষের মধ্যে ভাবের আর আবেগের অভাব দেখতে পায়না। সংস্কৃত কবিরা এই যন্ত্রবিদ্যাকে খুব ভালো করে আয়ত্তে এনেছিলেন। সংস্কৃতি কাব্যের প্রচণ্ড ফাঁকি (?) সেইজন্য অদ্যাবধি ধরা পড়েনি। সেই জন্য অজবিলাপের সেই বিখ্যাত শ্লোকটা শোকের সঙ্গে কোন সংস্রব না রেখেও আমাদের মনে একটা দারুণ বিষাদের মুগ্ধ মূর্তি ফুটিয়ে তোলে

স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহব
হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তিমাম্

বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ ভবেৎ
অমৃতং বা বিষমীশ্বর মেচ্ছয়া।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের খ্যাতি কবি ও মননশীল ব'লে। সহজাত কুন্তলকবচের মতো সত্যিকার কবি প্রতিভা নিয়ে তাঁর আগমন—তার পিছনে ছিল মনস্বী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আর সামনে ছিল পঠন-পাঠনের পরিশীলনে সহিষ্ণু মন। জীবনের ব্যবহারিক পৃষ্ঠায় হয়তো উচ্ছ্বাস, আতিশয্য, বর্ণাঢ্য সমৃদ্ধতার অভাব ছিল না, কিন্তু সাহিত্যের নিভৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে কঠোর ঋজু বিন্যাস মননের তীক্ষ্ণ রণন, সংযম, অনমনীয়তা। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইক্ষেত্রেই তিনি অমৃতপান সভার সখা। অদ্ভুত সামঞ্জস্যময় দ্বৈত ব্যক্তি সত্তা লক্ষ্য করবার বিষয়। হয়তো তাঁরই উপমায়, বার্ণার্ড শ এর মত দুনৌকোয় পা রেখে ভবনদী পেরোনোর সময়োপযোগী প্রবৃত্তি তাঁর ছিল। কর্মক্ষেত্রেও একদিকে দেখেছি তাঁর স্বাদু হৃদ্যতা, সম্ভ্রমবোধ, রুচিজ্ঞান, স্বচ্ছমনের হাসি ও আলাপ, আবার দেখেছি আত্মমর্যাদা রক্ষার দুস্তর প্রয়াস, যার জন্য এককথায় কর্মত্যাগ তাঁর কাছে সামান্য ব্যাপার।

রবীন্দ্রপ্রতিভার ভরা যুগে সুধীন দত্তের আবির্ভাব প্রতিশ্রুতিময় হয়েই এসেছিল। বাংলা-সাহিত্যে তাঁর প্রথম পদার্পণ অনেকটা কিছুদিন ধরে রিহার্সাল দেওয়া শখের রঙ্গমঞ্চে, তাঁরই কথায় নাটকী নায়কের মতো। স্থূল গদাঘোরানো ছিল না বটে, কিন্তু সাহিত্যের ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসবের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে সারথি করে তাঁরই পাঞ্চজন্যে প্রতিপক্ষকে আহ্বান করে নিপুণ শব্দভেদী বাণ, নতুন ছন্দবদ্ধতার শূল নিক্ষেপ ছিল। মর্ত্যের প্রতিভূ হিসাবে সে যুদ্ধ

…প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে……

রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের বাইরে এসে তিনি একদিকে ভাবের অনাবশ্যক কল্লোলকে ক্যানিউটের মত ঠেকাতে চেয়েছেন, অন্যদিকে একটা স্বাধীন চিন্তাগর্ভ মন নিয়ে কাব্যলক্ষ্মীকে সুষ্ঠু শব্দ চয়নের দ্বারা ছন্দ-বিন্যাসের বেদীতে বসিয়েছেন। তাঁর মেধা ও মনীষার জড়িত সংকলন "কুলায় ও কালপুরুষ"এর মুখবন্ধে ও অন্যত্র তাঁর কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলেছেন, তার বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় (১) কবিতার স্বাধিকার সহজ কবিত্বের পরাকাষ্ঠা (২) সেই বিচারে সুধীন্দ্রনাথ কবি বা কোবিদ্ নন্

পল্লবগ্রাহীদের পদাঙ্কচারী (৩) তাঁর রচনায় সংঘটনের সাক্ষাৎ এখন দুর্লভ (৪) তাঁর দীর্ঘজীবন শুধু অসমাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত নয়, রিলকের মত মাধুর্য ও তাৎপর্যের ধ্যান নিরাসক্তি-ঘটিত যে অপেক্ষা রাখে তার প্রয়োজন তিনি হৃদয়ঙ্গম করেননি (৫) তাঁর নীড় সংকীর্ণ ও শতছিদ্র এবং তাই অসীম ও চিরন্তন আকাশই তাঁর একমাত্র ভরসা—কারণ সেখানে কালপুরুষ ও ত্রিশঙ্কু (৬) সংবর্তএর ভূমিকায় তিনি বলছেন যে মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই তাঁর অন্বিষ্ট এবং পরীক্ষারূপে তিনি নানা শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কাব্যের প্রধানগুণ যে স্বাচ্ছন্দ্য এ কথা তিনি স্বীকার করতে চাননি কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে সহজ কবির সাক্ষর তাঁর কাব্যে ফুটেছে অনবদ্যভাবে যেমন

তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে, নবনীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে।
শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে
শ্যামসন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে
মুগ্ধনয়ান্—পেতে আছি কান
গান বিরচিব বলে

এতে রবীন্দ্র প্রভাবিত রোমান্টিক ভাবালুতা আছে, নির্বান্ধব শতাব্দীর জিজ্ঞাসার যন্ত্রণা নেই, তাই সুধীন্দ্রনাথ শুধু angst বা anxiety বা anguish এর কবি নন, তাঁর মনে একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের দাবী আছে

তাই মোর প্রজ্জলিত যৌবনের যজ্ঞাগ্নি মহান
রিক্তাকাশে
প্রসারে কম্পিত বাহু অনামিক দেবতার আশে
সে-চির অচেনা
জানি জানি কোনদিন আমার হবে না
তবুও নিশ্চয়
আমার উদ্যত অর্ঘ্য প্রেয়সী তোমার লাগি নয়

তিনি যে

কান পেতে শুনি যেখানে দিগন্তরে
পুরাতন বাঁধ ভাঙে বিদ্রোহবাণে
দেখি ঝঞ্ঝার আয়োজন অম্বরে
আমিও আহুত বুঝি মুক্তিস্নানে
অনুমতি দাও আরো কিছুকাল থাকি
বিশাল বিশ্বে বিস্তারিত দুই আঁখি
ডেকোনা মরণ এখন সন্নিধানে

দ্বন্দ্বে সংশয়ে দোলায়মান যে sceptic, atheist, agnostic মন, সে তো আধুনিক সমাজ মনেরই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতীক। তাই আজ আমাদের ভগবান শুধু অতীতের অলীক, আরণ্যিকের ভ্রান্ত দুঃস্বপন। সুধীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছিল শুধু উনিশ শতকের নাস্তিকতা নয়, ব্রহ্মবাদের ইতিস্বের প্রচেষ্টাও শুধু ল্যামার্কী অভিব্যক্তিবাদ নয়, ডারুইনী বিবর্তনবাদ নয়, এঙ্গেলস মার্কসীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণাও, অস্তিত্ববাদীর বিচারবিবেচনাও। একদিকে বৈজ্ঞানিকদের নব নব আবিষ্কার, প্রয়োগ বিদ্যার অপূর্ব-নিপুণতা, প্রাচুর্য, অন্যদিকে অনশন, অনটন, সাম্রাজ্যবাদ, ব্যবসাবাণিজ্যের নামে শোষণ ও শাসন এর মধ্যে বের্গসনী এলাভিতাঁল, আইনস্টাইনী রিলেটিভেটি সমাজতন্ত্রী ইতিহাসকে রক্তাক্ত করেছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবের মাঝে। কোথায় গেল হাইসেনবার্গপ্রডিঙ্গারের আনবিক তত্ত্ব আর জ্যাপলসাত্রে বা কামুর অস্তিত্ববাদ। সমগ্র পৃথিবীর মননশীল মানুষের মনে যে বৈরাজ্য উপস্থিত হোল তারই কিছু আভাস পাই সুধীনদত্তের কবিতায়, চিন্তার ধারায়। তাই তিনি মননের আর্টিষ্ট, সুষুপ্তিলোকের তন্দ্রাময় অনুভূতিময় কবি হতে চাননি, তবুও যদিও তিনি সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবিদের কবি, গণের নন, জনের নন, তবু বিচারবুদ্ধি বিশ্লেষণের নীচে বোধির যে স্নিগ্ধ মমত্বময় ছায়া পড়েছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। আমি তাই তাঁকে শুধু নির্বান্ধব শতাব্দীর জিজ্ঞাসার যন্ত্রণার কবি বলতে রাজী নই

ললাটে তোমার দিনের আশীষ দীপ্র
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিত হাস্য

ধ্যানমৌন রাত্রির সভায় যিনি সভাকবি হতে পারতেন, জীবনের গান যাঁর হাতে সহজ গীতা হতে পারতো, তিনি ধরলেন রুক্ষ কষ্টকল্পিত উপমার উপলব্যথায় শব্দস্রোতে রুদ্ধ অসহজের পথ। কাব্যের এই ধ্রুপদী দিক কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। বিদগ্ধ কবির বাকচাতুর্যও বহন করেছে সহজ অভিব্যক্তির অনলঙ্কৃত শ্যামলশ্রীরূপ, সেইটিই লক্ষ্য করবার বিষয়। সুধীন্দ্রনাথ বলতেন 'বন্ধু মহলে' আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরাজী ভাষার বর্ণসংকর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি বঙ্গভারতীর নাট মন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সে কথা ঠিক নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় "গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিষ্ট; তাঁর লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়। ওর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না, কিন্তু এক জায়গায় মেলে সে ওর পথ চলতি মন নিয়ে। এই সুধীন্দ্রনাথকেই আবাহন করি অস্তদিগন্তে আশীষ লাগুক শিহরণ জাগুক।

আগত আগত উদার সবিতা প্রাচী রঞ্জিতবাগে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটির প্রবক্তা আচার্য সুনীতিকুমার। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর তামিল দেশের এক পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, তাঁর 'শিবলীলার্ণব' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এই বলে যে শাব্দিক আর তার্কিক হলেই কবি হওয়া যায় না। তাঁর শ্লোকটি হচ্ছে

স্তোতুং প্রবৃত্তা শ্রুতির ঈশ্বরং হি
ন শাব্দিকং প্রাহ ন তার্কিকং বা
ব্রুতে তু তাবৎ কবিরিত্যভীক্ষং
কাষ্ঠা পরা সা কবিতা ততো নঃ

শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের স্তব করতে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে কখনও শাব্দিক বা তার্কিক বলেনি, সর্বদা তাঁকে কবি বলেই বর্ণনা করেছে। এইজন্য কবিতাই হচ্ছে পরাকাষ্ঠা।

সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখতে পাই। তিনি শাব্দিকও বটে কবিও বটে। শব্দ আর অর্থ আর তার ভিতরের ব্যঞ্জনা এই দুই মিলিয়ে বাগার্থসম্পৃক্ত হয়েই সুধীনদত্তের কাব্যজিজ্ঞাসা কাব্যমীমাংসার রূপ নিয়েছে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ ও শেক্‌স্‌পিয়র

কেউ যদি বলেন শেক্‌স্‌পিয়র 'শান্তিনিকেতনের কবি' বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'শান্তিনিকেতনের কবি' তবে আমরা নিশ্চয়ই সেকথা মেনে নেবো না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুজন কবির নামই 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক একটি সনেটের সংগে জড়িত। এই সনেটটির ইংরেজি বয়ান শেক্‌স্‌পিয়রের, এবং বাংলা সুধীন্দ্রনাথের। শেক্‌স্‌পিয়রের ১৫৪টি সনেটের সংগে আমরা কমবেশি পরিচিত। প্রথম যখন সনেটগুচ্ছটি ১৬০৯ খৃঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তখন প্রকাশক থর্প কোনো সনেটেরই শিরোনামা দেন নি। সনেটকে সাধারণত আরম্ভিক লাইন ধরেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। থর্পের সংস্করণে এক, দুই তিন করে সংখ্যা দেওয়া ছিল। সনেটগুলি সনাক্ত করার পক্ষে এই সংখ্যাগুলি পরবর্তীকালে অপরিহার্য হয়েছে। কোনো কাব্যচয়নিকায় কোনো কোনো সনেটের শিরোনামা পরবর্তীকালে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শিশুপাঠ্য বইয়ের এইসব নাম সনেটগুলির গায়ে কোনোদিন লেগে যায় নি। তাই সুধীন্দ্রনাথদত্ত-কৃত শেক্‌স্‌পিয়র সনেটের অনুবাদ পড়তে গিয়ে প্রথমেই পাঠক একটু বিস্মিত হন, কারণ সুধীন্দ্রনাথ সনেট-সংখ্যার উল্লেখ না ক'রে প্রত্যেকটি সনেটের একটি ক'রে আলাদা শিরোনাম দিয়েছেন। এই শিরোনামের পদগুলি কিন্তু সনেটের মধ্য থেকে নেওয়া নয়। অর্থাৎ, এই নামকরণ সম্পূর্ণ সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব। যেমন একটি সনেটের শিরেনাম 'শান্তিনিকেতন'! 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক একটি কবিতার নিচে বাংলা অক্ষরে উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র এই নামটি লেখা রয়েছে। একটু অবাক হতে হয় বৈকি! যদিও এটি শেক্‌স্‌পিয়রের ২৭ সংখ্যক সনেটের বাংলা অনুবাদ, তবু শেক্‌স্‌পিয়রের নামটি যদি না দেওয়া থাকতো তাহলে এই সনেটটিকে মৌলিক বাংলা কবিতা এবং তার কবি হিসাবে সুধীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে সম্ভবত কারোই কোনো দ্বিধা থাকতো না। 'বিশুদ্ধ', 'ত্বরা', 'বিদেহভ্রমণ', 'বীভৎসা', 'অমা', 'তমিস্রা', 'জঙ্গতী', 'বীতনিশা'—প্রভৃতি কথাগুলি যে-কবিতায় জ্বলজ্বল করছে তা সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারই বা হতে পারে? কবিতায় এসব শব্দের প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন উনিশ শতকে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিশ শতকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙালী পাঠকের কাছে এই শব্দগুলি জন্ম থেকেই 'দত্তকুলোদ্ভব'।

মোট তেইশটি সনেট সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন এবং গ্রন্থভুক্তির সময় তিনি সেগুলিকে থর্প-সংস্করণের অনুক্রমেই সাজিয়েছেন। কিন্তু সনেটগুলির ক্রম বা সূচকসংখ্যা না দেওয়ায় এই ক্রমানুবর্তিতা পাঠকের বিশেষ কাজে আসে না। বিশেষ ক'রে যখন এই অনূদিত সনেটগুলি শেক্‌স্‌পিয়র সনেটের সবগুলির তো নয়ই, খুব বড়ো একটা অংশেরও অনুবাদ নয়। শেক্‌স্‌পিয়রের সম্পূর্ণ সনেটগুচ্ছ—প্রকৃতপক্ষে একসূত্রে গ্রথিত দুটি পৃথক সনেটগুচ্ছের সমাহার; ক্রমন্বয়ে পড়লে তার মধ্যে একটি অন্তর্লীন সংযোগসূত্র, এমনকি একটি অগোচর নাটকীয় কাহিনীর অস্তিত্বও, অনুভব করা যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদগুলি পড়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। সুধীন্দ্রনাথ আসলে এই সনেটগুলিকে আলাদা আলাদা স্বাদনীয় স্বয়ংনির্ভর কবিতা হিসাবেই গ্রহণ করেছেন এবং সেইভাবেই পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন। এদের মধ্যেকার গুপ্ত নাটকটি বা নাটকের দৃশ্যাবলী তিনি মঞ্চস্থ করতে চাননি বা করার অবসর পাননি। অথচ শেক্‌স্‌পিয়রের মূল কবিতাগুলিতে অধিকাংশক্ষেত্রেই উত্তম ও মধ্যমপুরুষ অনামা প্রেমিক-প্রেমিকার সেই চিরন্তন আমি-তুমি নয়। নয়ই বা বলি কী ক'রে? এই সনেটাবলীর হৃদয়বিদারক আমি-তুমির মধ্যে একটি অব্যর্থ প্রেম-স্পর্শ তো সত্যিই রয়ে গেছে। বন্ধুত্ব ও প্রেমের সংগম শেকসপিয়রের সনেটে এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে এদের আলাদা করা খুব সহজ নয়। এগুলি যে সাধারণ প্রেমের কবিতা নয় তার একমাত্র রটনা রয়েছে সনেটের শেষে 'শেক্‌স্‌পিয়র' এই নামটির উল্লেখে। অর্থাৎ যে পাঠক শেক্‌স্‌পিয়রের সনেটগুচ্ছের সংগে পূর্বপরিচিত শুধু তিনিই কবিতা বা কবিতাবলীর অব্যবহিত প্রসংগ ধরতে পারবেন এবং তদনুযায়ী রসগ্রহণ করতে পারবেন। মনে হতে পারে, 'ধরা' রসটিই তিনি আবার ধরবেন; কারণ, মূল রচনা যিনি পড়েছেন এবং মূল রচনা থেকেই কাব্য প্রসংগটি জেনেছেন ও রসগ্রহণ করেছেন তিনিই এখন এই কবিতাগুলি পড়ছেন ধরে নিচ্ছি। তবু একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। কারণ যে-চিত্রকল্পের সাহায্যে পাঠক রসগ্রহণ করবেন তা মূলের চিত্রকল্প থেকে অনেকক্ষেত্রেই বেশ স্বতন্ত্র।

অনূদিত কবিতাবলীর প্রথম কবিতাটির দিকেই আপাতত মনস্ক হওয়া

যাক। এই সনেটটির শিরোনামা 'পুত্রেষ্টি'। এর চেয়ে ভারতীয় নাম বোধ করি অসম্ভব। 'পুত্রেষ্টি' কথাটি শুধু ভারতীয় নয় একেবারে মহা-ভারতীয়। ইংরেজি কেন, অভারতীয় কোনো ভাষা বা সাহিত্যেই এই 'পুত্রেষ্টি'র কোনো জুড়ি পাওয়া যাবে না, অসম্ভব। শেক্‌স্‌পিয়রের অসাধ্য এই শব্দটি সুধীন্দ্রনাথ সগৌরবে শেক্‌স্‌পিয়রের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে আমরা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারি সুধীন্দ্রনাথ আসলে শেক্‌স্‌পিয়রের সনেটগুলিকে নিয়ে কী করতে চাইছেন। 'পুত্রেষ্টি' অর্থ পুত্রকামনা, পুত্রকামনায় বিহিত যজ্ঞ। সুধীন্দ্রনাথ সাহসের সংগে যজ্ঞের পৌত্তলিক হিন্দু অনুষংগ খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সনেটগুলির নামকরণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যথাযথ হয়েছে কিনা সেবিচার মুলতুবি রেখে শুধু নামগুলির দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক। নামগুলি যথাক্রমে —পুত্রেষ্টি, ফাল্গুনী, নিত্যসাক্ষী, মিতভাষী, বিনিময়, শান্তিনিকেতন, দুর্দিনের বন্ধু, সান্ত্বনা, উত্তরাধিকারী, সৌরধর্ম, দুঃসময়, নির্বিকার, গুপ্ত প্রেম, পূরবী, অবিনাশ, প্রাণবায়ু, অনিবার্য, কালযাত্রা, অতিদৈব, কামরূপ, মৃন্ময়ী, জ্ঞানপাপী ও মৃত্যুঞ্জয়। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করা যেমন—ফাল্গুনী, শান্তিনিকেতন, দুঃসময়, গুপ্তপ্রেম ও পূরবী। এগুলি তো বটেই অন্য নামগুলিও পাঠকের প্রতি কবি-অনুবাদকের আশ্বাস যে এদের সম্পূর্ণ বাংলা কবিতা হিসাবেই উপভোগ করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে এই সনেটগুলির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের স্বয়ংপ্রবেশের সপক্ষেই এই শিরোনামার আয়োজন।

অনূদিত প্রথম সনেটটি ('পুত্রেষ্টি') বিচার করা যাক। এটি শেক্‌স্‌পিয়র সনেটগুচ্ছের ১৭ সংখ্যক সনেট। মূল সনেটটি এরূপ :—

Who will believe my verse in time to come,
If it were fill'd with your most high deserts ?
Though yet, heaven knows, it is but as a tomb
Which hides your life and shows not half your parts
If I could write the beauty of your eyes
And in fresh numbers number all your graces,
The age to come would say, 'This poet lies ;
Such heavenly touches ne'er touch'd earthly faces.'

So should my papers yellow'd with their age;
Be scorn'd, like old men of less truth than tongue,
And your true rights be term'd a poet's rage
And stretched metre of an antique song;
But were some child of yours alive that time,
You should live twice,—in it and in my rime.

সুধীন্দ্রনাথ সনেটটিকে অনুবাদ করেছেন এইভাবে :—

তোমার সদ্‌গুণে যদি ভ'রে ওঠে আমার কবিতা,
তবে তার বস্তুনিষ্ঠা মেনে নেবে কে আগামী কালে?
অথচ, ঈশ্বর সাক্ষী, এ-প্রসঙ্গে যা লিখি, তা বৃথা;
তোমার বিভূতি প্রায় অদৃশ্য এ-চৈত্যের আড়ালে।
সামর্থ্যে কুলাত যদি ও-চোখের সৌন্দর্য-বর্ণনা,
অথবা কীর্তনসাধ্য হতো যদি তোমার প্রসাদ,
তাহলে রটাত লোকে এ কেবলই কপোল কল্পনা;
কে কবে পেয়েছে মর্ত্যে অমৃতের সাক্ষাৎ সংবাদ?
আমার রচনা তাই ভবিষ্যতে বিদ্রূপই কুড়াবে,
সেই বৃদ্ধদের মতো, হ্রস্ব সত্য, দীর্ঘজিহ্বা যারা;
কবির উচ্ছ্বাস ব'লে, কনিষ্ঠেরা তোমারে উড়াবে,
ভাবিবে তোমার প্রাপ্য প্রশস্তির প্রচলিত ধারা।
কিন্তু যদি সে-সময়ে থাকে তব পুত্র উপস্থিত,
তোমারে দ্বিজত্ব দিবে তবে সে ও আমার সঙ্গীত।

কবিমাত্রেই পৌত্তলিক, কারণ বাক্ প্রতিমা নির্মাণ তার বিশেষ ধর্ম। সুধীন্দ্রনাথও পৌত্তলিক। সুধীন্দ্রনাথকে যখন পৌত্তলিক বলছি তখন তার বিশেষ মর্ম এই যে, তিনি ভারতীয় পৌরাণিক ও ধর্মীয় পরিবেশ, এবং পৌত্তলিক অনুষংগের মধ্যে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এবং শেক্‌স্‌পিয়র অনুবাদের বেলায় শেক্‌স্‌পিয়রকে এই নতুন গোপন পরিবেশের মধ্যে প্রায় দ্বিজত্ব দান করেছেন। এই সনেটে ব্যবহৃত কয়েকটি পদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার,—বিভূতি, চৈত্য, কীর্তন, প্রসাদ, অমৃত এবং দ্বিজত্ব। সাধারণ অনুবাদকের পক্ষে এই পদগুলির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে এই পদগুলির বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্য আছে। সুধীন্দ্রনাথ এখানে অনুবাদকের ভূমিকায় নামলেও নিজের স্রষ্টা-স্বরূপটি তিনি

বাতিল করতে নারাজ। অনুবাদক ও কবি এখানে সমান সহযোগিতায় শপথবদ্ধ। চতুর্থ পংক্তি 'তোমার বিভূতি প্রায় অদৃশ্য এ-চৈত্যের আড়ালে' একটি আশ্চর্য আবিষ্কারের তুল্য। Tomb-কে সমাধিস্তম্ভ না বলে তিনি 'চৈত্য' বলেছেন যাতে সহজেই ভারতীয় সংস্কারের সংগে একে সমন্বিত করা যায়। 'চৈত্য' কথাটি 'চিতা' থেকেই এসেছে, যদিও বৌদ্ধ মঠের সংগেই এটি বেশি সংশ্লিষ্ট এবং চৈত্যে চিতাভস্মও রাখা হত। 'সমাধি স্তম্ভ' বললে তাকে কবরখানা ছাড়া অন্যত্র স্থাপন করা যেত না ; তাই সুধীন্দ্রনাথ চমৎকার কৌশলে এমন একটি প্রতিশব্দ আমদানি করেছেন যার মধ্যে চিতাভস্মের আধার রাখা যায়, আবার যা সমাধিস্তম্ভের সংগেও মানায়। কিন্তু প্রতিভাবান কবি ছাড়া এই পংক্তিতে 'বিভূতি' কথাটি কোনো অনুবাদক ব্যবহার করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। 'বিভূতি' ভস্ম অর্থে চৈত্যে রক্ষিত ভস্মাধারের প্রতি ইংগিত করছে ; আবার 'বিভূতি'র দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, এবং তৃতীয় অর্থ অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি আট রকমের যোগলব্ধ অলৌকিক ক্ষমতা। মূল পংক্তিতে (which hides your life and shows not half your parts) এমন কোনো পদ নেই যার মধ্যে এতটা ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। শুধু parts কথাটিতে সামান্য একটু pun আছে। 'চৈত্য' এবং 'বিভূতি' কোনোটিই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ নয়, এবং 'বিভূতি' বলতে বিশেষভাবে অলৌকিক শক্তিই বুঝায়। শেক্‌স্‌পিয়রকে ভারতীয় পরিবেশ ও ধর্মানুষ্ঠানের খুব কাছে এনে সুধীন্দ্রনাথ একটি নতুন চেহারা ও দ্যোতনা এনে দিয়েছেন বলা যায়। ষষ্ঠ লাইনেও ('অথবা কীর্তনসাধ্য হতো যদি তোমার প্রসাদ') ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের অবতারণা করা হয়েছে, যদিও মূলে এসব একেবারেই নেই। শেক্‌স্‌পিয়রের সমগ্র সনেটগুচ্ছে প্রভু-দাস, ভূম্যধিকারী-ভূমিদাস, রাজা-প্রজা এই ধরণের সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের কথা বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও একে ভগবান ভক্তের সম্পর্ক বলে বর্ণনা করা হয় নি। কিন্তু grace-কে 'প্রসাদ' বলার পর সুধীন্দ্রনাথ numbers-কে সহজেই কীর্তনের আখরে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। অষ্টম লাইনের heavenly ও earthly বেশ সুন্দরভাবে অনুবাদে 'অমৃত' ও 'মর্ত্য' হয়েছে। 'অমর্ত্য' ও 'মর্ত্য' হতে পারতো, কিন্তু 'কীর্তন' 'প্রসাদ'-য়ের মধ্যেই 'অমৃতের' পূর্বস্বাদ দেওয়া হয়ে গেছে, কাজেই কবি অনুবাদক 'অমৃত' কথাটিই ব্যবহার করেছেন। শেষ পংক্তিতেও live twice-য়ের অনুবাদে 'দ্বিজত্ব' পদটি ব্যবহার করার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় যাওয়া যাচ্ছে। এখানেও সুধীন্দ্রনাথ সেই

পৌত্তলিকতার ধারাই অনুসরণ করেছেন যা এই সনেটটির সর্বত্র প্রকট। শেক্‌স্‌পিয়রকে কেউ 'পুত্রেষ্টি' নামক কবিতার কবি বললে আমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসে ভ্রুকুঞ্চিত কোরবো। কিন্তু ১৭ সংখ্যক সনেটের বাংলা অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়রকে ঠিক 'পুত্রেষ্টি' শীর্ষক কবিতার কবি হিসাবেই পরিণত করেছেন। শেক্‌স্‌পিয়র যদি ভারতবর্ষে জন্ম নিতেন এবং হিন্দু পৌত্তলিক পরিবেশের মধ্যে বড়ো হতেন তাহলে ১৭ সংখ্যক সনেট বর্ণিত পরিস্থিতিতে তাঁকে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদটিই রচনা করতে হ'ত, অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদ করতে বসে ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন সেই মূল বাংলা কবিতাটি রচনা করতে যা শেক্‌স্‌পিয়র বাঙালী হয়ে জন্মালে নিজেই রচনা করতেন! শেক্‌স্‌পিয়রের সাবধানবাণী ও অনুরোধও তিনি উপেক্ষা করে তাঁর লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন। কারণ ১০৫ সংখ্যক সনেটে শেক্‌স্‌পিয়র পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই ঘোষণা করেছেন :—

Let not my love be call'd idolatry,
Nor my beloved as an idol show ;

এর পর অনূদিত দ্বিতীয় সনেটটি ('ফাল্গুনী') বিচার করা যাক। এটি শেক্‌স্‌পিয়রের বিখ্যাত ১৮ সংখ্যক সনেট। মূল সনেটটি এরূপ :—

Shall I compare thee to a summer's day ?
Thou art more lovely and more temperate ;
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date ;
Sometime too hot the eye of heavn shines,
And often is his gold complexion dimm'd :
And every fair from fair sometime declines.
By chance, or nature's changing course untrimm'd ;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st ;
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

সুধীন্দ্রনাথ সনেটটি এইভাবে অনুবাদ করেছেন :—

বসন্তদিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা ?
তুমি আরও কমনীয়, আরও স্নিগ্ধ, নম্র সুকুমার :
কালবৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকচ কল্পনা,
ঋতুরাজ ক্ষীণ-প্রাণ, অপ্রতিষ্ঠ যৌবরাজ্যে তার ;
অলোকের বিলোচন কখনও বা চলে রুদ্রতাপে,
কখনও সন্নত বাষ্পে হিরণ্ময় অতিশয় ম্লান ;
প্রাকৃত বিকারে, কিংবা নিয়তির নূঢ় অভিশাপে,
অসংবৃত অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান।
তোমার মাধুরী কিন্তু কোনও কালে হবে না নিঃশেষ :
অজর ফাল্গুনী তুমি, অনবদ্য রূপের আশ্রয় ;
মানে না প্রগতি তব মরণের প্রগল্‌ভ নির্দেশ,
অমৃতের অধিকারী যেহেতু এ-পংক্তি কতিপয়।
মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, চোখ মেলে তাকাবে যাবৎ,
আমার কাব্যের সঙ্গে তুমি রবে জীবিত তাবৎ।

পূর্ববর্তী সনেটের 'অমৃত' এই সনেটের দ্বাদশ পংক্তি পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে দেখা যাচ্ছে। এখানে কবি পশ্চিমা ঋতুতে প্রাচ্যের সাজ পরাবার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। স্পষ্টতই, অনুবাদক বসন্ত ও বৈশাখের মধ্যে মনস্থির করতে পারেননি। Summer's day কে 'বসন্তদিন' বলেছেন, কিন্তু তারপরই rough winds কে বলেছেন 'কালবৈশাখী' এবং darling buds of May কে রূপান্তরিত করেছেন 'মাধবের বিকচ কল্পনা'য়। এখানে 'কল্পনা' একান্তই সুধীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা যার ফলে সহজেই May হয়েছে 'মাধব'। কবি সুধীন্দ্রনাথ কতো বড়ো পৌত্তলিক তার প্রমাণ চতুর্থ পংক্তির অনুবাদ। এখানে summer কে শুধু 'বসন্ত' বা 'মাধব' না ব'লে তিনি সম্পূর্ণ রাজমূর্তিই স্থাপন করে দিয়েছেন—'ঋতুরাজ'। বসন্তকে আমরা 'ঋতুরাজ' বলি, কাজেই তাতে চমকাবার কিছু নেই। কিন্তু ঋতুরাজকে কেউ কখনো যুবরাজ বলে কল্পনা করিনা। তাছাড়া রাজা ও যুবরাজা একই সংগে কল্পনা করাও কঠিন। আমাদের পুরাণে ও রূপকথায় রাজপুত্র বা যুবরাজের ছড়াছড়ি। সুধীন্দ্রনাথ শুধু রাজাতেই সন্তুষ্ট নন একটি যুবরাজও প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং ঋতুরাজ যে আসলে যুবরাজ এমন একটি কাব্যিক নব্যপুরাণ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী। অথচ মূলে এর নামগন্ধও নেই। Lease বলতে যে কার্যকাল বুঝায় তাকে সম্বল

করেই অনুবাদক এ ক্ষীণপ্রাণ যুবরাজ কল্পনা করে নিয়ে তার যৌবরাজ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন। সার্থক কবিমাত্রেই স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী; এইজন্যই সুধীন্দ্রনাথ summer কে বসন্ত, বসন্তকে ঋতুরাজ, ঋতুরাজকে যুবরাজ এবং যুবরাজকে ক্ষীণপ্রাণ ও যৌবরাজ্যে অপ্রতিষ্ঠ না করা পর্যন্ত নিরস্ত হন নি (summer = বসন্ত = ঋতুরাজ = যুবরাজ···)। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে মূলের পংক্তিটি যেখানে নিরাকার, অনূদিত পংক্তিটি সেখানে হয়ে উঠেছে রীতিমতো মূর্তিমান। মূল পংক্তিটি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রাণ, কিন্তু অনূদিত পংক্তিটি হয়েছে যথেষ্ট সবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত। পঞ্চম পংক্তিতে the eye of heaven-য়ের heaven কে সুধীন্দ্রনাথ সোজা 'আকাশ' অর্থ না ক'রে একেবারে 'স্বর্গ' অর্থ করেছেন, যদিও ইংরেজিতে এখানে স্বর্গের অনুষংগ একেবারেই আসেনা। হয়তো পূর্ববর্তী ১৭ সংখ্যক সনেটের heaven—যার অনুবাদ তিনি করেছেন 'ঈশ্বর'—তখনো তাঁর মনে অণুরণিত ছিল। অনুবাদ কবিতায় তাই অব্যর্থ-ভাবেই একটি অলৌকিক স্পর্শ লেগে গেছে—'আলোকের বিলোচন', এবং তারই সূত্র ধরে shines হয়েছে 'জ্বলে রুদ্রতাপে'। এখানে 'রুদ্র' শব্দের প্রয়োগ রীতিমতো ভারতীয় পুরাণস্পর্শী, যেন too hot-য়ের প্রাবল্য বুঝাবার জন্য অনুবাদক একাদশ রুদ্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত তাপ সংগ্রহ করেছেন। মনে হয় তৃতীয় পংক্তির 'কালবৈশাখী'র মধ্যে যে বৈশাখের আভাসন রয়েছে তারি প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে সুধীন্দ্রনাথের শ্রুতি ও স্মৃতি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের "হে রুদ্র বৈশাখ" পর্যন্ত নিয়ে গেছে। 'রুদ্র' বললেই শিবের সংহার মূর্তিটি আমাদের ধ্যানে এসে যায় এবং ভাষার ভাস্কর্য পাঠককে সহজেই পৌত্তলিক ক'রে তোলে। মূলে যা অপেক্ষাকৃত কমজোর ও অস্পষ্ট, সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় তা অতিরিক্ত জোরালো হয়ে উঠেছে। এটিও এক ধরণের ভাস্কর্যক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। ষষ্ঠ পংক্তির dimmed মাত্র এই একটি পদ অনুবাদে হয়েছে 'সন্নত বাষ্পে অতিশয় ম্লান'। 'সন্নত বাষ্প' সম্পূর্ণ সুধীন্দ্রনাথের কল্পনা, কারণ মূলে এর চিহ্নও নেই। তিনি সম্ভবত সমুন্নত ঋতুরাজের প্রসংগ মনে রেখেই 'সন্নতবাষ্পে'রও কল্পনা করেছেন। কুমারসম্ভবে কালিদাস যখন পার্বতীকে "সন্নতাঙ্গী" ব'লে বর্ণনা করেন তখন সেই দেহভংগিটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে; আবার বাল্মীকিরামায়ণের "সন্নতাঃ ফলভারেন পুষ্পভারেণ চ ক্রমাঃ" ও একেবারে দৃষ্টিগোচর বলে মনে হয়। এখানে সুধীন্দ্রনাথও কেবলমাত্র একটি বিশেষণে সুখী না থেকে সম্পূর্ণ একটি চিত্র বা ভাস্কর্য রচনায় ব্রতী। 'অতিশয় ম্লান'-য়ের আতিশয্য পরবর্তী পংক্তিতেও অনুসৃত হয়েছে—'অসংবৃত

অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান।' Declines এই একটিমাত্র পদকে তিনি শুধু 'অধঃপাত' বা শুধু 'প্রস্থান' না বলে দুটি সমার্থক শব্দই একযোগে ব্যবহার করেছেন, এবং তাছাড়া প্রত্যেকটির সংগে একটি করে অতিরিক্ত বিশেষণ জুড়ে মজবুত করেছেন, 'অসংবৃত অধঃপাত' ও 'অমোঘ প্রস্থান', যদিও মূলের sometime এবং অনুবাদের 'অমোঘ' এ দুটি পদের দ্যোতনা একেবারে পরস্পর বিপরীতধর্মী। Eternal summer কে সুধীন্দ্রনাথ 'অজর ফাল্গুনী' বলেছেন। মনে হয় 'ফাল্গুন' ও 'ফাল্গুনী' দুই অর্থই তিনি এই পদে সংহত করেছেন। Summerকে প্রথমে ফাল্গুনে রূপান্তরিত করেছেন এবং সংগে সংগে সেই ফাল্গুনকে আবার 'ফাল্গুনী' বা 'ফাল্গুন পূর্ণিমা'য় আরেকবার রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। শুধু 'ঋতুরাজ'-য়ের বেলাতেই নয়, 'মাধব' এবং 'ফাল্গুনী' এই পদ দুটিকেও কবি-অনুবাদক এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে এদের অর্থ অবিকৃত রেখেই এদের মধ্যে মূর্ত ব্যক্তিত্বের আভাস দেওয়া যায়। কবি 'মাধব'কে বসন্ত বা মধুমাস হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু 'মাধব' বললে প্রথমেই আমাদের যে-পুরুষের কথা মনে আসে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিতীয়ত, মাধব শুধু বসন্তকালই নয়; কামসখা বসন্তও। কুমারসম্ভবের রতিবিলাপে এই মাধবের নামই বারবার উচ্চারিত হয়েছে:—

অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনং স্মর পর্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে॥

তেমনি 'ফাল্গুনী' পদটি উচ্চারণ করলে সহজেই শব্দের অনুপ্রাসে 'ফাল্গুনি' বা অর্জুনের প্রতীতিও এসে পড়ে, এবং অর্জুন যৌবনেরই ধারক (summer = বসন্ত ঋতুরাজ = ফাল্গুন = ফাল্গুনী /মাধব/ ফাল্গুনি)। পদগুলি প্রাথমিক যে-অর্থেই ব্যবহৃত হোক না কেন, ধ্বনি ও পরিচয় সাদৃশ্যে এই সনেটের মধ্যে 'ঋতুরাজ', 'মাধব', 'রুদ্র' এবং 'ফাল্গুনী' মূর্তি হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যে-স্বেচ্ছাচারের দায়ে সুধীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করা যায় তার খানিকটা শেক্‌স্‌পিয়র নিজেও কি সনেট রচনা করতে গিয়ে করেন নি? হোরেস (Horace))-য়ের বিখ্যাত 'দিফ্‌ফুগেরে নিভেস্‌ '(Diffugere nives…)' ওডের উপাদান যে শেক্‌স্‌পিয়র এই সনেটটিতে ব্যবহার করেছেন তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কোনো কোনো লাইনে সেকস্‌পিয়র হোরেসের অনুবাদক বল্লেই হয়। হোরেসের ওডে আছে:—

Rough winter's blasts to spring give way ;
Spring yields to Summer's sovereign ray ;

And winter chills the world again.
Her losses soon the moon supplies,
But wretched man, when once he lies
Where Priam and his sons are laid,
Is nought but ashes, and a shade...

(Samuel Johnson—কৃত অনুবাদ)

হোরেস তাঁর বন্ধু তর্কোয়াতুস (Torquatus) কে ওডের মধ্যে সম্বোধন করেছেন : কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তর্কোয়াতুসয়ের উপর ততটা ন্যস্ত নয় যতোটা সাধারণভাবে মনুষ্যসাধারণের ভাগ্যবিবর্তনের উপর। হোরেসের বক্তব্য অনেকটাই নির্ব্যক্তিক বা public, কিন্তু শেকস্‌পিয়রের বক্তব্য অত্যন্ত ব্যক্তিগত। হোরেস কবিতার মধ্যে তাঁর বন্ধুর নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেকস্‌পিয়র তা করেন নি, তাঁর বন্ধুর নাম সর্বত্র উহ্য রেখেছেন। তবু কালের করাল স্পর্শ শেক্‌স্‌পিয়র শুধু একজনের মধ্যে—তাঁর অনামা বন্ধুর মধ্যেই—অনুভব করেছেন। আবার শেক্‌স্‌পিয়র সনেটের শেষ দুটি পংক্তিও হোরেসের কথাই স্মরণ করায়। কাব্য যে মহাকালকে অগ্রাহ্য করেই টিকে থাকতে পারে এবিষয়ে হোরেসের প্রসিদ্ধ 'এক্সেগি মনুমেন্তম্' (Exegi-monumentum···) ওডটি স্মরণ করা যায় :—

I've reared a fame outlasting brass.
Which in its more than kingly height
Shall Egypt's Pyramids surpass.
Unharmed by countless seasons' flight.
The wasting rain, the North wind's rage,
On it shall leave no lasting trace,
Nor shall it e'er grow dim with age
While Time runs his unfinished race.

(John Ordronaux—কৃত অনুবাদ)

দোনারেম পাতেরাস্ (Donarem pateras···) ওডেও হোরেস উল্লেখ করেছেন :—

But songs you delight in and songs I can give
And tell you their value in verse that will live

(Alfred B. Lund-কৃত অনুবাদ)

হোরেসের দৃষ্টিভংগি জ্ঞানীজনোচিত, নির্ব্যক্তিক, শেক্‌স্‌পিয়রের বলাই বাহুল্য বন্ধু বা প্রেমিকোচিত নিবিড় ও ব্যক্তিগত। হোরেসের আবেগ শেক্‌স্‌পিয়র যেভাবে শেক্‌স্‌পিয়রীয় আবেগে পরিণত করে নিয়েছেন বলে আমাদের বোধ হয়, সুধীন্দ্রনাথও যেন অনেকটা সেইভাবেই শেক্‌স্‌পিয়রের আবেগকে বেশ কিছুটা সুধীন্দ্রিয় আবেগে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। প্রভেদ এই যে শেক্‌স্‌পিয়র হোরেসের অনুবাদক নন, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়রের অনুবাদক এবং এজন্য তাঁর সীমিতি অনেক বেশি। এই গ্রাহ্য সীমিতি সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ ভাবান্তরের ক্ষেত্রে এবং ইমেজ রচনার বেলায় যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন হতে চেয়েছেন যাতে তাঁর পাঠক নিজের দেশীয় পরিবেশের মধ্যে শেক্‌স্‌পিয়রকে পেতে ও উপভোগ করতে পারেন। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র অনুবাদক না হয়ে অনুবাদক ও অনুস্রষ্টা দুইই।

অনূদিত পরবর্তী সনেটটি ('নিত্যসাক্ষী') শেক্‌স্‌পিয়রের ১৯ সংখ্যক সনেট। মূল পংক্তিগুলি এরূপ :—

Devouring Time, blunt thou the lion's paws,
And make the earth devour her own sweet brood ;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood ;
Make glad and sorry seasons as thou fleet'st,
And do whate'er thou wilt, swift-footed time,
To the wide world and all her fading sweets ;
But I forbid thee one most heinous crime ;
O, carve not with thy hours my love's fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen ;
Him in thy course untainted do allow
For beauty's pattern to succeeding men
Yet do thy worst, old Time : despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.

সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ :—

ওরে সর্বভুক কাল, খর্ব কর সিংহের নখর
ধরার জঠর ভরা তার যত স্বরূপ সন্তানে ;
উপাড়ি ব্যাঘ্রের দন্ত, হান তার জিঘাংসা প্রখর ;

অচিরে মরুক ডুবে রক্তবীজ নিজ রক্তবানে।
যা তুই উচ্ছল কাল, ইচ্ছামতো ছড়া গে জগতে
সুসময়, দুঃসময় নির্বিচার ঋতুচক্র থেকে ;
মাধুরীর অপমান হয় যদি, হোক্ পথে পথে,
আমার বারণ শুধু একটি পাপের অতিরেকে :
পুরাতন লেখনীতে কোনও দিন চাসনে অঙ্কিতে
আমার প্রিয়ার ভাল প্রহরের কুটিল রেখায় ;
তোর পঙ্কস্রোত যেন সে পারায় ময়ূরপঙ্খীতে ;
সৌন্দর্যের সাক্ষ্য ব'লে নিত্য যেন প্রতিষ্ঠা সে পায়।
না, তোরে সাধি না, কাল ; দেখি তোর ক্ষমতা কেমন :
আমার কবিতা দিবে প্রেয়সীরে অনন্ত যৌবন।

সুধীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়র সনেটের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যে বিশেষ ব্যগ্র নন, এই সনেটটিই তার প্রমাণ। এখানে দেখা যাচ্ছে শেক্‌স্‌পিয়র সনেটের ইমেজ তাঁকে অনুরূপ ভারতীয় চিত্রকল্প অনুমান, অনুসন্ধান ও নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাতে যখন তিনি কৃতকার্য হয়েছেন তখনই অনুভব করেছেন যে তাঁর অনুবাদচর্চা সার্থক। শেক্‌স্‌পিয়রের এই সনেটের ফিনিক্স (phoenix) পাখি য়ুরোপীয় মধ্যযুগের বহুপ্রচলিত পুরাণের অন্তর্গত। য়ুরোপীয় সাহিত্যের আকাশে এই ফিনিক্স সর্বত্রনামী। অ্যাংলোস্যাক্সন কবি রচিত দীর্ঘ 'Phoenix' কবিতা থেকে শেক্‌স্‌পিয়রের নিজের 'The Phœnix and Turtle' কবিতা পর্যন্ত এর অবিরাম উল্লেখ পাওয়া যাবে। অথচ প্রাচ্যদেশে এটি, এমনকি আধুনিককালেও, নিতান্তই বিদেশী রয়ে গেছে। ফিনিক্স অমর পাখি, বহু শতাব্দী জীবিত থাকার পর যখন চিতায় প্রবেশ করে তখন সেই চিতাভস্ম থেকেই আবার নবযৌবন নিয়ে ফিরে আসে আকাশে। শেক্‌স্‌পিয়র সনেটের Phoenix in the blood এই বর্ণনায় blood কথাটির মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথ তুলনীয় ভারতীয় পৌরাণিক ইমেজের ইংগিত পেয়ে গেছেন। 'রক্ত' থেকে তিনি সহজেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'রক্তবীজ' আখ্যানে চলে গেছেন। হতে পারে সনেটের প্রারম্ভিক 'সিংহের নখর'ও তাঁকে কিছুটা সহায়তা করেছে। কারণ শ্রীশ্রীচণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজবধের আখ্যানে আছে দেবী বরাহমূর্তি ও নরসিংহমূর্তি অবলম্বন ক'রে অসুর বিনাশ করেছিলেন, এবং সেখানে শুধু রক্তধারা নয়, সিংহ ও সিংহের নখরেরও উল্লেখ আছে—

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ॥
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥
নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা॥

—ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রশক্তিভূতা দেবীর বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে শত শত দৈত্যদানব রক্তস্রোতবর্ষণের মধ্যে ভূমিতলে পতিত হ'ল, তারা বরাহমূর্তিধারিনীর মুখাঘাতে বিধ্বস্ত হ'ল, দন্তাগ্রভাগের আঘাতে তাদের বুক বিক্ষত হল এবং চক্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিপতিত হ'ল। নরসিংহবেশিনী দেবী সিংহনাদে দশ দিক ও আকাশ পরিপূর্ণ ক'রে নখর দিয়ে অন্যান্য অসুরদের বিদীর্ণ ও ভক্ষণ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন। —সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি ইমেজ সন্ধানের সময় চেষ্টা করেন যাতে মূলের পূর্বাপর প্রসংগ বা ইমেজও অনুবাদে একটি কেন্দ্রীয় ইমেজের পাশে আবর্তিত করানো যায়। ভবিষ্যৎ অনুবাদাবিজ্ঞানীরা ভেবে দেখবেন, কোনো মূল বাংলা কবিতায় যদি 'রক্তবীজের' উল্লেখ থাকতো তবে কোনো ইংরেজ কবি-অনুবাদক রক্তবীজকে phoenix-এ রূপান্তরিত করতে পারতেন কি? যদি কেউ পারতেন তবে তেমন অনুবাদককে কি আমরা প্রতিভাধর ব'লে শিরোপা দিতাম না? সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শ যেমন তাঁর স্বরচিত কবিতায় তেমনি তাঁর অনুবাদকর্মে। কিন্তু প্রতিভা যখন তাঁকে স্বেচ্ছাচারী করে, তখন পাঠক তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন না। যেমন মূলের পুরুষবন্ধুকে তিনি অনুবাদে প্রেয়সীতে পরিণত করেছেন। মূলে নবম পংক্তিতে আছে My love's fair brow, অনুবাদে দশম পংক্তিতে পাই 'আমার প্রিয়ার ভাল' এবং সনেটের শেষ পংক্তিতে আবার my love হয়েছে 'প্রেয়সী'। 'প্রিয়া' বা 'প্রেয়সী' না বলে যদি তিনি মূলের মতো শুধু 'প্রেম' এই স্ত্রীপুরুষ নিরপেক্ষ কথাটি ব্যবহার করতেন তাহলে দোষাবহ হ'ত না। অবশ্য প্রতিভাবান স্রষ্টারা অনেকক্ষেত্রেই 'স্বাধিকার প্রমত্ত' হতে ভালবাসেন, এবং সুধীন্দ্রনাথ এখানে যদিও অনুবাদক তবু কবি হিসাবে তাঁর মৌল স্বাধিকার এমনকি স্বেচ্ছাচার তিনি পরিত্যাগ করতে রাজী নন। ত্রুটিশূন্য হবার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা বা সাবধানতার তিনি পক্ষপাতী নন। কাব্যলক্ষ্মী সুধীন্দ্রনাথকে আর যাই

কল্পন কৃপণ করেননি, অতিসাবধানী সঞ্চয়ী করেননি। শেক্‌সপিয়রের প্রতি যদি তিনি সম্পূর্ণ অনুগত থাকতেন তাহলে কখনই এতটা স্বাধীনতা নিতে পারতেন না, শেক্‌স্‌পিয়রের বন্ধুকে সুধীন্দ্রনাথ প্রেয়সীতে পরিণত করতেন না। মূলের একাদশ লাইনে him এই পুংলিংগবাচক সর্বনামটি এতই স্পষ্ট যে অনুবাদকের অনবধানতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনুবাদক যে স্বাধীনতা নিয়েছেন তা ইচ্ছে করেই নিয়েছেন। পাঠকদের কাছে এই অনূদিত সনেটটি যাতে প্রেমের কবিতা হিসাবে অধিকতর উপভোগ্য ও গ্রহনীয় হয় সেটাই তাঁর কাম্য। একাদশ পংক্তির himকে her-তো করেছেনই, তদুপরি সম্পূর্ণ লাইনটিই অনুবাদে এক আশ্চর্য নতুন পংক্তি হিসাবে সংযুক্ত হয়েছে। Him in thy course untainted do allow অনুবাদে হয়েছে 'তোর পঙ্কস্রোত যেন সে পারায় ময়ুরপংখীতে।' এটি একেবারে নতুন সৃষ্টি। বাংলা রূপকথার এই অনিন্দ্য 'ময়ুরপংখি'র সন্ধান কোনো শেক্‌স্‌পিয়রেরই মধ্যে ছিল না। কালের course বা গতিপথকে অনুবাদক প্রথমে 'কালস্রোত' তারপর সেই কালস্রোতকে বিশেষণে পংকিল ক'রে 'পংকস্রোত' করেছেন এবং তার উপর ভাসিয়ে দিয়েছেন কবিকল্পনার আশ্চর্যসুন্দর স্বদেশী ময়ুরপংখি। শেক্‌সপিয়রের অর্থ বা ইংগিতটুকু সম্বল ক'রে তিনি একটিমাত্র লাইনের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি চিত্রকাব্য রচনা করেছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের পুরুষবন্ধুকে সুধীন্দ্রনাথ প্রেমিকায় রূপান্তরিত করেছেন, তারপর সেই প্রেয়সীর জন্য একটি ময়ুরপংখি নৌকা ভাসাতে তিনি এতটুকুও দ্বিধা করেননি, এমনকি শেক্‌স্‌পিয়রের মুখ চেয়েও নয়।

এরপর সুধীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়রের ২১ সংখ্যক সনেটটি অনুবাদ করেছেন। মূল সনেটটি নিচে দেওয়া হল :—

So is it not with me as with that Muse
Stirr'd by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse,
Making a complement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea's rich gems,
With April's first-born flowers, and all things rare
That heaven's air in this huge rondure hems.
O let me, true in love, but truly write,

And then believe me, my love is as fair
As any mother's child, though not so bright
As those gold candles fix'd in heaven's air :
Let them say more that like of hearsay well ;
I will not praise that purpose not to sell.

'মিতভাষী' শীর্ষক সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ এরূপ :—

সেই কবিদের মতো ক্ষিপ্র নয় আমার কল্পনা,
চতুরার অঙ্গরাগে পরাশ্রীর স্বপ্ন যারা দেখে,
অতিমর্ত্য উপাদানে রচে যারা ডাকের গহনা,
সৌন্দর্যের প্রতিযোগে নষ্ট করে স্বার্থ একে একে,
ধূলার ধরায় যারা কোনও কালে নয় বদ্ধমূল,
পেড়ে আনে জ্যোতিষ্কেরে, মন্থে যারা সিন্ধু মণিময়,
অম্লান যাদের মাল্যে ফাল্গুনের আশুক্লান্ত ফুল,
বিজড়িত বাহুপ্রান্তে নীলকান্ত বায়ুর বলয়।
প্রেমে সত্যসন্ধ আমি, অপলাপে ফুরাব না মসী ;
মানো মোর নিবেদন—অন্য কোনও মনুষ্যদুহিতা
আমার প্রিয়ার চেয়ে নয় বটে অধিক রূপসী,
তথাচ রুচিরতর অমরার হৈম দীপান্বিতা।
প্রবাদবিলাসী যারা অতিকথা তাদেরই মানায় ;
আমি তো পসারী নই, গুণগানে আমার কি দায় ?

এই সনেটে প্রচলিত বা প্রথাসিক্ত কাব্যধারার বিরুদ্ধে একটি অনুচ্চ জেহাদ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়র এই ঘোষণাও গ্রহণ করেছেন পূর্বসূরীদের কাছ থেকেই সম্ভবত স্যার ফিলিপ সিডনির সনেট থেকে। সিডনি Astrophel and Stella সনেটগুচ্ছের ৩, ৬, ১৫ ও ৭৪ সংখ্যক সনেটে বলেছেন যে তাঁর প্রেয়সী Stella ছাড়া অন্য কোনো বাগ্‌দেবীর প্রেরণা তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয়। শুধু স্টেলাকে যথাযথ বর্ণনা করাই যথেষ্ট, অন্য কবি বা কাব্যের অনুকরণ অথবা বিস্তৃত উপমাদি অলংকারের কল্পনা করার তাঁর কিছুমাত্র দরকার নেই। কিন্তু সিডনি নিজেও সম্ভবত তাঁর সনেটের এই জেহাদী বক্তব্য তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকেই ধার করেছিলেন। সিডনির পূর্ববর্তী ফরাসী সনেটকার দুবেল্লে (Du-Bellay) এবং রঁজা (Ronsard) উভয়েই প্রায় একই ধরণের বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য হ'ল তথাকথিত

বাগ্‌দেবীর প্রসাদে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সনেট রচনা করতে বসেন নি। শ্লেষকাব্য। রঁজা তাঁর লিভ্‌র্‌ দেজামুজ (Liver des amours) কাব্য-গ্রন্থের ১৭৫ সংখ্যক সনেটে বলেছেন কাব্য সরস্বতীর প্রেরণায় তাঁর দরকার নেই, যেহেতু তাঁর প্রেয়সী কাসাঁদ্র (cassadre)-য়ের আয়ত চোখের দৃষ্টিই তাঁর চরম প্রেরণা। লাতিন কবি হোরেসের 'কোয়েমতুমেলপোমেনে' (Quem tu, Melpomene) ওডটিও এই প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে। লক্ষ্যনীয় যে, অতিশয়োক্তি বর্জন করার ঘোষণাও একধরণের অতিশয়োক্তি বা কাব্যিক উক্তি ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু বলা বাহুল্য, যদি কোনো একটিমাত্র সনেটেও শেক্‌স্‌পিয়র অতিশয়োক্তি ব্যবহার ক'রে থাকেন তবে সেটি এই সনেট। কবি-অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথও শেক্‌স্‌পিয়রের এই ঘোষণাকে শেক্‌সপিয়রের মতো ক'রেই অনুবাদের কাজে ব্যবহার করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদটি অনুধাবন করলেই তা স্পষ্ট হবে।

সুধীন্দ্রনাথ প্রথম লাইনে 'সেই কবিদের মতো ক্ষিপ্র নয় আমার কল্পনা' এই উক্তির পরই একেবারে দ্বিতীয় লাইনেই দেখছি তাঁর কবিকল্পনার ব্যবহারে রীতিমতো উদার ও ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছেন। 'অংগরাগ' 'ডাকের গহনা', 'মন্থে যারা সিন্ধু' 'দীপান্বিতা' প্রভৃতি পদাবলী সুধীন্দ্রনাথের 'ক্ষিপ্র' কল্পনারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ক্ষিপ্র কল্পনা ছাড়া দ্বিতীয় পংক্তিতে 'পরাশ্রীর স্বপ্ন' দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এজন্য তিনি অনায়াসেই 'শ্রী'কে করতে পেরেছেন 'পরাশ্রী'। মূলের painted beauty একটি নিষ্ক্রিয় দৃশ্যবস্তুমাত্র, কিন্তু অনুবাদে চতুরা' হয়ে উঠেছে ছলাকলাময়ী উদ্যোগপরায়ণা এক রমণী যে পুরুষকে উদ্দীপ্ত ও সম্মোহিত ক'রে তাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিহার করতে পারে। কালিদাস রঘুবংশে দশরথের মৃগয়ার প্রতি আসক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

পরিবৃদ্ধরাগমনুবন্ধসেবয়া
মৃগয়া জহার চতুরো কামিনী।

—'নানাবিধ উপচারে পুরুষের অনুরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চতুরা কামিনী যেমন তার চিত্ত সম্পূর্ণ হরণ করে নেয়, তেমনি মৃগয়াও দশরথকে একেবারে তন্ময় করে ফেলেছিল।' কালিদাসের এই 'চতুরা'কে অংগরাগে আরো শ্রীমতী ক'রে সুধীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়রের সনেটে এনে বসিয়েছেন পাঠকের চিত্তবিভ্রম ঘটানোর জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা প্রতিমাসজ্জার খ্যাত উপাদান 'ডাকের সাজ'ও আমদানি করেছেন, যাতে প্রতিমার

দেবীশ্রী মূলের heaven পদটির ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনের Making a couplement of proud compare,/with sun and moon, with earth and sea's rich gems সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে অনেক বেশি উদ্দীপ্ত হয়েছে—'পেড়ে আনে জ্যোতিষ্কেরে, মন্থে যারা সিন্ধু মণিময়।' চন্দ্রসূর্যের সংগে তুলনা করা অপেক্ষাকৃত নিরীহ কাজ, সমুদ্রের মণিমুক্তার সংগে তুলনা দেওয়াও তাই। কিন্তু আকাশ থেকে জ্যোতিষ্ক পেড়ে আনা বা মণিময়সিন্ধু মন্থন করা অনেক বেশি উদ্যোগী ও সবল কাজ। শুধু সবলই নয়, পৌরাণিক সিন্ধুমন্থনের পৌত্তলিক আখ্যানটি ভারতীয় পাঠকের কাছে অনেক বেশি পরিচিত ও জীবন্ত। অষ্টম লাইনের 'বিজড়িত বাহুপ্রান্তে নীলকান্ত বায়ুর বলয়'ও সম্পূর্ণ সুধীন্দ্রনাথের ক্ষিপ্র কবিকল্পনা, কারণ rondure বলতে এখানে ভূমণ্ডল', যদিও rondure যে কোনো গোলাকৃতি জিনিষকেই বুঝাতে পারে, এবং সে হিসাবে সুডৌল বাহু হতেও বাধা নেই। কিন্তু huge বিশেষণটি কি সত্যিই কোনো কোমল বাহুর পরিচায়ক হতে পারে? পারে না। অতএব সুধীন্দ্রনাথ মূলের এই অতিবৃহৎ huge বিশেষণটি বেমালুম বিসর্জন দিয়ে তাঁর সুন্দর 'নীলকান্ত বায়ুর বলয়'—যেটি প্রকৃতপক্ষে নীলকান্ত 'বাহু'র বলয়ই হয়ে উঠেছে—রচনায় অভ্রষ্ট থেকেছেন। কোমল বাহুবলয়টি তাঁর বিশেষ দরকার। কারণ ১৯ সংখ্যক সনেটের মতো এখানেও পুরুষ বন্ধুকে তিনি 'প্রিয়া'য় পরিণত করেছেন এবং সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য mothers child কে করেছেন 'মনুষ্যদুহিতা'। দ্বাদশ লাইনে অনুবাদ ও স্বাধীন কবিকল্পনা সুন্দরভাবে মিশে গেছে এবং 'দীপান্বিতা' পদটির সুষ্ঠুতর ব্যবহার ভাবাই যায় না। 'দীপান্বিতা'র মধ্যে যে দীপারতি তার বিশেষ অনুষংগটি একান্তই ভারতীয় উৎসবের, এবং এই সনেটে শেক্‌সপিয়রের মোমবাতি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যময় ভারতীয় দীপাবলী আলোকসজ্জা।

এলেন রায়

সুধীন দত্ত ও এম, এন, রায়

সুধীন দত্ত সম্বন্ধে আমাদের কমজানা ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে— এম, এন, রায়ের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব। রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক আন্দোলন ও আলোচনার বাইরে রায়ের বন্ধু বিশেষ কেউ ছিল না এবং এই সকল আন্দোলনের মধ্যে তিনি নিজের ভিতর দিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিক খুঁজে পেয়েছিলেন। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ তাঁকে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছিল। কিন্তু তিনি দৈবাৎ নিজের অখণ্ড নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার সংগে সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আর সুধীন দত্তই বোধ হয় এবিষয়ে বিশেষ ব্যতিক্রম। অবশ্য এমন নয় যে তাঁদের পারস্পরিক পরিচিতির সময় এম, এন, রায়ের ব্যক্তিগত বিশেষ কয়েকটি ভাবধারার সংগে সুধীন দত্তের বিরোধ ঘটেছিল। আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক ভাবধারা ও পছন্দ ও অপছন্দ বিষয়ে সুধীন দত্তের যদি কোন আগ্রহ বা ঝোঁক প্রকাশ পেত তবে সেটা এম, এন, রায়ের জন্য যতখানি হ'ত ততখানি আর কারো জন্য নয়। সুধীন দত্ত কখনও রায়ের কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ না নিলেও তিনি সেগুলি ভালভাবেই লক্ষ্য করতেন এবং সমালোচনাও করতেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনায় কখনও যে কোন বিকল্প মত প্রকাশ পেয়েছে তা আমার বিশেষ মনে পড়ে না। তাঁর প্রশ্নাবলী এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী রায়ের কাছে অনেকটা চ্যালেঞ্জ মনে হয়েছিল এবং রায়কে তাঁর নিজের মন্তব্য ও চিন্তাধারার যুক্তি বিশ্লেষণে ও নতুন সূত্র উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এবিষয়ে তিনি সর্বদা কৃতকার্য হয়েছেন। ১৯৪৫ সালে এই দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় "মার্কসিয়ান ওয়ে" এবং পরে "হিউম্যানিস্ট ওয়ে" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। পত্রিকাটি প্রকাশের আগেই-এর উদ্দেশ্য বিষয়ে যে বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল সেটা সুধীন দত্তেরই লেখা। কিন্তু কি তত্ত্বগত কি বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সুধীনের সাহিত্য চর্চার-ব্যাপক পরিধির মধ্যে রাজনীতির স্থান ছিল খুবই সামান্য। এইজন্যই এবং সম্ভবত তার সামাজিক এবং

পারিবারিক পটভূমি তাঁকে বাংলার প্রথম দিককার বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ এর মধ্য থেকেই রায়ের রাজনৈতিক জীবন এবং পরবর্তীকালের বুদ্ধিমত্তার উদ্ভব হয়েছিল। এই ধরণের ভিন্ন পটভূমিই সম্ভবত এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা পারস্পরিক বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। সুধীন দত্ত সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। রায় সুধীনের মার্জিত গুণ-গুলিকে শ্রদ্ধা করতেন। অপরদিকে সুধীন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রায়ের চিন্তাধারায় প্রথা-বিরুদ্ধ মৌলিকতা ও বলিষ্ঠ মননের প্রশংসা করেছেন। পারস্পরিক ঐক্য এবং মতবৈষম্য তাঁদের দুজনের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করেছে। এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার পটভূমি ও মানসিক গঠনের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। কারণ এম, এন, রায়ের জীবনের শেষ দশকে তাঁর যে পুরনো বন্ধুগোষ্ঠী ছিল, সুধীন দত্ত তার বাইরে তাঁর একজন ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ট বন্ধু হতে পেরেছিলেন। তাঁদের এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাঁদের পরিণত বয়সে এবং রায়ের রাজনৈতিক কাজকর্মের বাইরে। ফলে তাঁদের বন্ধুত্ব এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রকৃতিটি ছিল ভিন্ন ধরনের এবং সম্ভবত সেজন্যই আমরা বর্তমানে যাঁদের কাছ থেকে এম, এন, রায়ের জীবনী লেখা আশা করতে পারি, তাঁদের সকলের থেকে সুধীন দত্ত রায়কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে জেনেছিলেন।

১৯৫৪ সাল থেকেই আমি এই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তারও আগে আমার মনে হয়েছিল যে সুধীন দত্ত এম, এন রায়ের জীবনী যদি নাও লেখেন তবে যাঁরা তা লিখবেন তাঁদের সংগে তাঁর যুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু পরিহাসপ্রিয়, কৌতুকপ্রিয় এবং বাহ্য নৈরাশ্যবাদী হলেও আবেগযুক্ত বিষয়ে সুধীন ছিল লাজুক, প্রকাশবিমুখ এবং মৌন। তাই আমি ভালভাবেই জানতাম যে তাকে দিয়ে কাজটি এখনই করে নিতে চাইলে আমার ইচ্ছা ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন সেটা অত্যন্ত দেরি হ'য়ে গিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে ১৯৫৫ সালে আমি যখন লনডনে তখন ওখানকার একটি প্রকাশক রায়ের জীবনী লেখার জন্যে আমার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু প্রকাশক ও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কোন লেখকের নাম আমরা পাইনি। সুধীনও আমার সংগে ঐ প্রকাশকের কাছে যান। কিন্তু আমাদের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এই

বিষয়টি নিয়ে তখন আর আমি কথা বলিনি। আমি জানতাম, আমরা যে এম, এন রায় সংগ্রহশালা তৈরির কাজ আরম্ভ করেছি সেটির কাজ শেষ হলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে, পরবর্তীকালে তাঁর জীবনী লেখার ব্যাপারে সেগুলি খুবই সহায়ক হবে।

গত বছরের শেষদিকে যখন আমাদের ধারণা অনুযায়ী সংগ্রহশালার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল আমরা তখন তাঁর জেলে লিখিত অপ্রকাশিত পাণ্ডু-লিপিগুলির সম্পাদনার কথা ভাবছিলাম। দীর্ঘ দিন বিদেশে থাকার পর সুধীন তখন সবে ভারতে ফিরে এসেছেন। এই সময় রায়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলির সম্পাদনার কাজে যুক্ত থাকার জন্য আমি সুধীনকে অনুরোধ করি। ১৯৫৪ সালে এম, এন, রায় স্মৃতি তহবিলের জন্য যখন প্রথম আবেদন করা হয় তখনই সুধীন সংগৃহীত লেখাগুলো নিয়ে স্মারক সংস্করণ প্রকাশের বৃহত্তর পরিকল্পনার সংগে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এমন কি, সেই সময় তিনি রায়ের স্মৃতি কথার প্রথম কয়েকটি অধ্যায় সম্পাদনার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য স্মৃতিকথা প্রকাশের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। জেলে লেখা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। সুধীন ঐ নয়খণ্ড পাণ্ডুলিপির কথা জানতেন এবং কয়েকবার দেরাদুনে গিয়ে সেগুলি দেখেওছিলেন। আমার অনুরোধে তাঁর সাড়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ঐ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি-গুলির প্রধান অংশে এমন বিষয়ের আলোচনা ছিল যে বিষয়ের উপর তালিকাভুক্ত সম্পাদকদের কেউই সুধীন দত্ত অপেক্ষা যোগ্যতর ছিলেন না। কারণ একজনের পেশা রাজনীতি এবং অপরজনের পেশা সাহিত্য হওয়াতে পরস্পরের পেশার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল সামান্য। কিন্তু তাঁদের দুজনের আগ্রহ ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিধি এত ব্যাপক ছিল যে, দুজনের পেশাগত আগ্রহের মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা মিল ছিল অনেক বেশী। ছয় বছর ধরে জেলে এম, এন, রায় যা লিখেছিলেন তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি ফিলসফিক্যাল কন্‌সিকোয়েন্সেস অব মডার্ণ সায়েন্স।' ঐ পাণ্ডুলিপির আলোচ্য বিষয়ই ছিল তাঁদের দুজনের বহু রাত্রির আলোচনার বিষয়বস্তু যা তাঁদের দুজনকে গভীরভাবে ভাবনার রাজ্যে নিয়ে যেত এবং তাঁদের উভয়ের চিন্তাধারার বিনিময় ঘটাতো। ঐ সব রাত্রির আলোচনায় যাঁরা উপস্থিত থাকতেন এবং এই দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পর যাঁরা আজও জীবিত, তাঁদের স্মৃতিতে সেগুলি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

তাঁদের দুজনের জ্ঞান ও মানসিক বিস্তৃতি ছিল বিশ্বকোষের মত। কাজ ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের দুজনের মস্তিষ্কের যে পরিচয় পাওয়া যায় আমার কাছে তা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সুন্দরতম বিস্ময় বলে মনে হয়েছিল। এই ধরণের দুই ব্যক্তিত্বের মিলন কদাচিৎ ঘটে থাকে। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় এরকম অভিজ্ঞতা লাভ আর কেউ করতে পারব বলে মনে হয় না। প্রকৃতির কি বিরাট অপচয়! এই দুইজন তাঁদের রচনা এবং কাজের মধ্যে বিরাটত্বের বিস্ময়কর অবদান রেখে গেলেও, আমরা যারা তাঁদের চিনতাম তাদের কাছে তাঁরা জীবিতকালে কী ছিলেন, সে ধারণা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যাবে। দুজনের রচনা ও কাজের মধ্য দিয়ে বিরাটত্বের যে ছাপ তাঁরা রেখে গেছেন এবং জীবিতকালে তাঁরা যত বিরাট পুরুষই থাকুন না কেন এখন তার পরিমাপের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে দুঃখ এবং তাঁদের হারানোর বেদনা। স্মারক হিসাবে আমাদের মনে ভেসে উঠছে ছবির পর ছবি। মনে পড়ছে অজস্র দ্রুতগামী মুহূর্ত তর্কাতর্কি এবং অন্যান্য পরিবেশ। বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে ওইসব মুহূর্তের বাণী একেবারেই অর্থহীন। কারণ কোন ঘটনার নাটকীয়তা বা গুরুত্ব দিয়ে ওইসব মুহূর্তের তাৎপর্য বোঝা যাবে না। আলোচনা, তর্কবিতর্কে পরিবেশ ও মানসিক পরিবর্তনই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। খুব জোরে দুজন থারমোডাইনামিক্স অথবা অন্যকোন বৈজ্ঞানিক বিষয় অথবা ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতিবোধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কথা বলছেন, কথা বলতে বলতে নিজেদের আসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, চিন্তাধারার গতিশীলতার জন্য শারীরিক অস্থিরতা প্রকাশ, কথা বলতে বলতে হাঁটা এবং দুজনের কাছে গ্রহণযোগ্য নতুন চিন্তার হদিস পেয়ে হঠাৎ হেসে ওঠা—সমস্যাকে এক নতুন দৃষ্টি কোণ দিয়ে দেখা—এসব কী করে বর্ণনা করা সম্ভব।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্টোর রোডে বীরেন রায়ের ফ্ল্যাটে। সুধীন শীলা ব্যানার্জী—অডেনের সঙ্গে এসেছিলেন। পরে বীরেন রায়ের বেহালার বাড়ীতে বোন মৃণালিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যান। যত দূর মনে পড়ে সেদিন তাঁর সংগে একজন কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর পরিচয় পত্রিকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। ঐ সভাতেই ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সংগে আমাদের প্রথম উত্তেজনাহীন আলাপ আলোচনা হয়। কম্যুনিষ্টদের সংগে যুক্ত না থেকে সুধীন তাঁর পত্রিকার ভার কম্যুনিষ্টদের হাতেই

ছেড়ে দেন। পরিচয় পত্রিকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরেই সুধীন এস, কে দের সঙ্গে আমাদের চাঁদনী চক অফিসে আসেন। প্রথম দিনকার ঐ দেখা সাক্ষাৎ কতদিন অন্তর হয়েছিল আমার ঠিক মনে নেই। তবে ওইসব সাক্ষাতের মধ্যে ব্যবধান খুবই কম ছিল এবং তারপর থেকে আমাদের যোগাযোগ খুব নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ হয়। তার কিছুদিন পরে আমরা নববিবাহিত স্ত্রী রাজেশ্বরীসহ সুধীনের কলকাতা আগমনের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকি। ইতিমধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে গিয়েছি এবং প্রতিটি সন্ধ্যা হয় রাসেল স্ট্রীটে সুধীনের ফ্ল্যাটে নতুবা থিয়েটার রোডে এস, কে, দের বাসায় কাটত। সুশীল দে তখন কলকাতা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সুধীন দত্ত কাজের দিক থেকে সরকারীভাবে দে-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সুধীন পুরোপুরি অ-রাজনৈতিক ছিলেন না। অন্তত এই অর্থে যে ফলাফলের ব্যাপারে জনসাধারণের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন।

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পারটি অফিসের প্রথম কথাবার্তার পর যে প্রথম ধারণা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য দেখা গিয়েছিল, পরে আমরা সে সব কথা মাঝে মাঝে বলতাম। সেই সময় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পারটিই একমাত্র জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হিসেবে যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছিল। প্রথম পরিচয়ের পর তাঁর মনে আমাদের সম্পর্কে বিশেষ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই পরবর্তী এক দশক আমাদের বন্ধুত্বকে ঘনিষ্ঠ করে। সুধীন দত্ত বা এম, এন, রায় দুজনের কেউই বিতর্কের জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। তখন দুজনেই সুপরিচিত এবং কিছু লোক ছিলেন দুজনেরই বন্ধু। তাঁদের দুজনের বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে আশাতীতভাবে কিছু ঘটেছিল। রাজনীতিকের মধ্যে বিজ্ঞানে আগ্রহ ও জ্ঞান এবং মানুষের অস্তিত্বের মূল সম্পর্কে আগ্রহান্বিত দেখে কবি হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন। রাজনীতিকও দেখলেন, কবিতাও এক উৎস ও গতি থেকে প্রেরণা পেতে পারে। কলকাতার সেই উদ্দীপনাময় ও উৎসাহব্যঞ্জক রাত্রির আলোচনাগুলিই রায়ের শেষ ও বড় মৌলিক রচনা দুই খণ্ডে সমাপ্ত "রিজন্ রোম্যানটিসিজম্ অ্যাণ্ড রেভোলিউশন" গ্রন্থের ভাবধারা গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।

দুজনেই সব সময় কিছু না কিছু চিন্তা করতেন। চিন্তা ছাড়া তাদের এক মুহূর্তও চলত না। যুক্তি যে প্রেরণার উৎস হতে পারে,—সেকথা তাঁদের

জীবন প্রমাণ করেছে। ক্ষতি তো নয়ই বরং মানুষের আবেগকে আরও তীব্র করতে পারে। তাঁদের বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যেই সীমিত ছিল না। রাসেল স্ট্রীটে অথবা দেরাদুনে রায়ের 'সেকুলার আশ্রমে' (এক বন্ধুর উক্তি) তাঁরা নিভৃত আলোচনায় পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করলেও তাঁদের ক্রমবর্ধমান বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনায় সময় তাঁরা নিজেদের পূর্ণতাকে সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতেন এবং এইভাবে দুজনেই নতুন নতুন বন্ধু লাভ করতেন।

"র‍্যাডিকাল হিউম্যানিষ্ট" পত্রিকার 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' সংখ্যায় (২৮ আগষ্ট ১৯৬০) প্রকাশিত প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন: গণেশ শাসমল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কবিকে আমরা শ্রদ্ধা দান করি ; ব্যক্তিকে ভালবাসা। ভালবাসা প্রায়ই শ্রদ্ধাকে ছাপিয়ে যায়। একালের একজন কবির ক্ষেত্রে তাই গিয়েছে। তিনি সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যুর পর, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে, এমন অনেক রচনা আমাদের চোখে পড়েছে, নানাগুণান্বিত এই মানুষটি যার বিষয়বস্তু! সে-সব রচনার প্রত্যেকটিই যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এমন কথা বলি না ; কিন্তু, লক্ষ করেছি, কবিকে নিয়ে আলোচনা করাই যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত মানুষটিকে ভুলে থাকতে পারেন নি। কবির কথা বলতে বলতে তাঁরা, প্রায় অনিবার্য ভাবেই, ব্যক্তি-মানুষের কথায় এসেছেন ; এবং ব্যক্তির কথায় আসবার পর আর কবির কথায় ফিরে যান নি। ফলত, যা কিনা খুবই স্বাভাবিক, এই সমস্ত রচনাপাঠের পর, পাঠকের চোখে, কবির চাইতে ব্যক্তি-সুধীন্দ্রনাথের চেহারাই আরও স্পষ্ট, আরও সত্য হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করতে পারেন, এমনটি হওয়া সংগত ছিল না। সংগত ছিল—তাঁর উপরে নয়—তাঁর কবিতার উপরে লক্ষ রাখা। আমি তা মনে করি না। তার কারণ, আমি জানি যে, সার্থক কবিকৃতি যদিও সর্বকালেই অতি দুর্লভ ঘটনা, সার্থক ব্যক্তিত্বও বিশেষ সুলভ নয়। বিশেষত এই সর্বনাশা সময়ে, সবার রঙে রং মেশাবার প্রবণতাই যখন, বিকৃত অর্থে, প্রবল হয়ে উঠেছে ; স্বাধীন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই যখন অসহায় বোধ করছেন ; এবং—জনতা-জনার্দনের পায়ের তলায়—ব্যক্তিত্ব নামক বস্তুটাই যখন গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে।

এই যখন অবস্থা, তখন সুধীন্দ্রনাথের মতো এত নিঃসঙ্গ, এবং নিঃসঙ্গ বলেই এমন মহিমান্বিত, একটি ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে, যে-কোনও মানুষের পক্ষেই, ঈষৎ বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। বিস্মিত এবং আবিষ্ট। স্বীকার করব, আমি আবিষ্ট হয়েছিলুম। স্বীকার করব এখনও প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় যখন অসামান্য সেই মানুষটির কথা আমার মনে পড়ে, তখন প্রধানত, তাঁর মনুষ্যত্বের কথাই আমার মনে পড়ে। সহৃদয়, সচ্ছল সেই মনুষ্যত্বের কথা, বড়ো বেশী স্বাভাবিক বলেই যা এই যুগের পক্ষে বড়ো অস্বাভাবিক ছিল। না, তাঁর কবিতার কথা তত প্রবলভাবে আমার মনে পড়ে না। অন্তত তাঁর

জীবদ্দশায় যতখানি মনে পড়ত, তার চাইতে বেশী নয়। এবং একথা যে তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর মধ্যে একমাত্র আমার ক্ষেত্রেই সত্য, এমনও আমি মনে করি না। সুতরাং, আমি কেন বিস্মিত হব, সুধীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনায় যদি আজ তাঁর কবিকৃতির চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে, অথবা তাঁর মনুষ্যত্বের উপরে, বেশী আলো পড়ে?

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশী দিনের ছিল না! বড়ো জোর বছর পাঁচেকের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক কবি-সম্মেলনে, তাঁকে আমি প্রথম দেখি। তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন! আমার একত্রিশ। মাঝখানে প্রায় পঁচিশ বছরে ব্যবধান। এই ব্যবধানকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছিলুম; তিনি, স্নেহের চোখে। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর, অনায়াসেই তাই, বয়সের বাধা পেরিয়ে, তিনি আমার কাছে এলেন (যেমন আরও অনেকের কাছেই তিনি সেদিন গিয়েছিলেন): বসলেন (যেমন আরও অনেকের কাছেই তিনি সেদিন বসেছিলেন) ; এবং, সেদিনকার আবহাওয়া নয়, তখনকার কবিতা সম্পর্কে, আমার অপ্রতিভ অনিচ্ছাসত্বেও, আমাকে দিয়ে দু-চার কথা বলিয়ে নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, "আমার ওখানে আসবেন—যখনই ইচ্ছে হয়।"

ইচ্ছে প্রতিনিয়তই হত। কিন্তু, স্বীকার করা ভালো, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের পর, বিগত পাঁচ বছরে মাত্রই বার দশেক তাঁর রাসেল স্ট্রীটের বাসায় আমি গিয়েছি। ভুল হল। মাত্রই বার দশেক নয়, অন্তত বার দশেক। 'অন্তত' শব্দটা এখানে এই কারণে ব্যবহার করছি যে সংখ্যা হিসেবে দশও এ-ক্ষেত্রে সামান্য নয়; এই কারণে যে সুধীন্দ্রনাথ যে কেমন মানুষ, তা বোঝার জন্যে, বার দশেক কেন, পাঁচ বার যাবারও কোনও দরকার ছিল না। এমন কিছু-কিছু মানুষ থাকেন, প্রথম দর্শনেই যাঁদের চিনে নেওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথকে যেত।

কথাটা একটু দাম্ভিক শোনাচ্ছে, আমি জানি। জানি যে, মানুষমাত্রেরই চরিত্র এ-কালে শতধাখণ্ডিত। প্রথম দর্শনে সুতরাং মানুষ চেনা যায় না। চেনার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। একটু একটু করে তাঁর কাছে গিয়ে, একটি একটি করে তাঁর অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নিতে হয়। এবং অনেক মাস, অনেক বছর কেটে যাবার পরে, সবে যখন সেই মানুষটিকে আমার চেনা-চেনা লাগছে, ঠিক তখনই হয়তো আবিষ্কার করতে হয় যে, তখনও তাঁকে, সম্পূর্ণ তাঁকে, চেনা যায় নি। এ-সবই আমি জানি। জেনেও তবে

কেন সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত অনায়াসে আমি বলতে পারলুম যে, প্রথম দর্শনেই তাঁকে চেনা যেত ? স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথই তার কারণ। বলতে পেরেছি, কেননা তাঁকে দেখামাত্রই মনে হত যে, তাঁকে চেনার জন্যে কাউকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে না। মনে হত যে, তাঁর ইচ্ছাগুলিকে কারও আলাদা ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, দেখবার কোনও দরকার নেই। মনে হত, তাঁর সমগ্র সত্তাই যেন তাঁর দৃষ্টিতে এসে ধরা দিয়েছে। কিংবা বলতে পারি, নিঃশব্দ নির্মল সেই হাসির মধ্যে, তাঁর চোখে—প্রায় অশ্রুর মতোই--যা টলটল করত।

কেমন মানুষ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ? তাঁকে যাঁরা দেখেন নি, কিংবা দূর থেকে দেখেছেন, কেউ যদি আজ এই প্রশ্ন তোলেন, তবে—তাঁর চরিত্রের মৌল লক্ষণ সম্পর্কে যেহেতু আজ আর বিন্দুমাত্র সংশয় আমার নেই—একটি মাত্র কথায় আমি তার জবাব দেব। বলব, তিনি শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক কথা, তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য মেধা ইত্যাদি সম্পর্কে আরও অসংখ্য কথাই হয়তো বলা যায়। কিন্তু সে-সব আমি বলব না, তার কারণ এই গুণাবলীর মধ্যে যদিও প্রত্যেকটিই আমাদের সবিস্ময় সম্ভ্রমের যোগ্য, এর একটিও আমি তাঁর চরিত্রের আদি অভিজ্ঞান বলে গণ্য করিনা। তাঁর চরিত্রের, তাঁর ব্যক্তিত্বের আদি অভিজ্ঞান ছিল শ্রদ্ধা; এবং সেই শ্রদ্ধা কোনও ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ ছিল না।

না, নির্বাচিত কয়েকটি মানুষকে নয়, সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। স্বজন, বন্ধু, সঙ্গী, সতীর্থ, সহকর্মী—সকলকেই। এমন কী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসব তরুণ ছাত্র, যাঁরা তাঁর কাছে পাঠ নিতে যেতেন, অথবা অল্পবয়সী সেইসব কবি, রাসেল স্ট্রীটে সন্ধ্যাযাপন যাঁদের অন্যতম আনন্দ ছিল, তাঁদেরও প্রায় প্রত্যেকেই—প্রায় প্রত্যহ—তাঁর শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

কেন ?—এই প্রশ্নটা এখানে না-উঠেই পারে না। সত্যিই তো সবাই কিছু শ্রদ্ধালাভের যোগ্য নয়। তবু কেন, যে-কোনও বয়সের, যে-কোনও বৃত্তির, যে-কোনও বিদ্যার মানুষকে উপলক্ষ্য করে তাঁর শ্রদ্ধা এত অনায়াসে ক্ষরিত হত ? ক্ষরিত হত তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কর্মে ? নিজে তিনি রাজার চালে চলতেন ? অবশ্য। কিন্তু, আশ্চর্য, এমন কথা কখনও কারও মনে হয়নি যে, আর-কাউকে তিনি প্রজার ভূমিকায় দেখতে চান। অন্যেরা যখন কথা কইত, তিনি শান্ত হয়ে শুনতেন। নিজে যখন কথা কইতেন, তাঁর গভীর কণ্ঠস্বরে এক আশ্চর্য নম্রতার স্পর্শ ঘটত। ভেবে

এখন বিস্ময় লাগছে যে, তাঁকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি। বিতৃষ্ণ, বিরক্ত গলায় কথা বলতে শুনিনি। বরং, সাহিত্য কিংবা সমাজ বিষয়ক কোনও আলোচনার অন্ত্য অধ্যায়েও যখন আমাদের অস্থিরতার অবসান হত না, সেই অস্থিরতাকে যখন আমরা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করতুম, ব্যক্ত করে বিদায় নিতে চাইতুম, তখনও—অস্বস্তিকর সেই মুহূর্তটিতেও—তিনি সহাস্য মুখে উঠে দাঁড়াতেন; দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে শান্ত সহিষ্ণু গলায় বলতেন "কথা কিন্তু শেষ হ'ল না। আর একদিন এ নিয়ে আলোচনা করা চাই। ইতিমধ্যে আপনার যুক্তিগুলিকে আমি আবার ভেবে দেখব।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কথায় মনে পড়ল, এই প্রত্যুদ্গমনও আসলে আর কিছুই নয়, তাঁর রাজকীয় নম্রতারই একটি প্রতীক। মস্ত বড়ো কোনও অতিথি না-এলে কি আমরা প্রত্যুদ্গমন করি? বিদায়দান অথবা অভ্যর্থনার জন্য খানিকটা পথ এগিয়ে যাই? সুধীন্দ্রনাথ যেতেন। যে-কেউ তাঁর কাছে যাক খবর পেলেই তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন, এগিয়ে গিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে আসতেন, এবং আগন্তুক যতক্ষণ না আসন গ্রহণ করছেন, নিজে তিনি আসন গ্রহণ করতেন না। অনেকে একে সৌজন্য বলবেন; আমি একে শ্রদ্ধা বলি। লক্ষ করেছি, এবং লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি যে, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে এই শ্রদ্ধা ক্ষরিত হত। এবং ক্ষরিত হত নির্বিচারে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় দু-একটি মাত্র মানুষের জন্য নয়, সর্বজনের জন্য।

সকলকেই শ্রদ্ধা করতেন সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু কেন করতেন? হয়তো এইজন্যে যে, না-করে তাঁর উপায় ছিল না। উপায় ছিল না, কেননা তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের জন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা পোষণ করতে হয়। কেননা, তিনি জানেন যে, প্রতিটি মানুষই আসলে স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—একটি অস্তিত্বের প্রতীক। স্বতন্ত্র একটি আকাঙ্খা এবং স্বতন্ত্র একটি সমগ্রতার প্রতীক। কেননা, তিনি জানেন যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই এক্ষেত্রে একের শূন্যতাকে কখনও আর কাউকে দিয়ে ভরাট করা যায় না। কোনও দিনই না। নব-নব জন্মের মধ্য দিয়ে যদিও নিয়ত আরও অসংখ্য অস্তিত্বের সূচনা হয়ে চলেছে, নব-নব পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যদিও নিয়ত আরও অসংখ্য অস্তিত্বের আমরা সান্নিধ্য পাচ্ছি, তবুও না। একের সৃষ্ট সেই শূন্যতা তবু থেকেই যায়।

প্রতিটি মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতেন সুধীন্দ্রনাথ, আমার মনে হয়, সে শুধু এই কারণেই। এই সহজ বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে যে, কারও অভাবই অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হয় না। "কারও অভাবই অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হয় না।" —কথাটা আমি তাঁরই কাছে শুনেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানুষমাত্রেই মহৎ। মহৎ, কেননা অ বিকল্প। মহৎ, কেননা স্বতন্ত্র। এবং, সন্দেহ নেই যে, সর্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, বস্তুত, সর্বজনের এই স্বাতন্ত্র্যকেই তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

গদ্যশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'ঘরে ডাকাত পড়লে তার সঙ্গে মিষ্ট ও শিষ্ট আলাপ করা সম্ভবতঃ দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের পক্ষে নয়'—প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি সকল গদ্য-লেখক সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিই কি স্বভাবানুগ ও প্রয়োজন-ভিত্তিক? এর উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় 'হ্যাঁ' বলতে অনেক সময় আমাদের আটকায়। কারণ বীরবলী গদ্য দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য মুখের ভাষা নয়, তার শিষ্ট ও সে-কারণে কিছুটা কৃত্রিম গদ্য। এই গদ্য সকলকে মানায় না। প্রমথ চৌধুরী তা ব্যবহার করেছিলেন এবং সেটা তাঁকেই মানাত। কিন্তু উৎকৃষ্ট গদ্য বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন?

উৎকৃষ্ট গদ্য বলতে সারল্য, যাথার্থ্য, স্পষ্টতা, ভারসাম্য—এই চারিটি আবশ্যিক গুণের প্রতি ম্যাথ্ আর্ণল্ড এক সময় তর্জনী সংকেত করেছিলেন। এই গুণগুলি অবশ্য পালনীয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা তা মনে করেন নি। প্রমথ চৌধুরীও তা মনে করেন নি। অথচ ফরাসি গদ্যের অনুকরণে 'সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট' গদ্য লেখার অভিপ্রায় প্রমথ চৌধুরী প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য, প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। তিনি বুঝেছিলেন, ভাষা যখন কথ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দও তা বুঝেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী সে কথাই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। সেকারণেই সবুজপত্রের গদ্য-আন্দোলন অভিনন্দনযোগ্য।

লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল অভিপ্রেত দায়িত্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দায়িত্ব থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতে। কিছু মুদ্রাদোষ তাঁর ভাষায় বর্তেছিল। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির কালানুক্রমিক পরিচয় নিলে এ সত্য স্বীকার করতে হয় যে, বীরবলী গদ্যরীতি আটপৌরে সংলাপ ও গদ্যভঙ্গি থেকে ক্রমশই দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম শিষ্ট অতি-মার্জিত ভাষা-সংলাপে পরিণত হয়েছে। বীরবলী গদ্যের পর পর

সাতটি উদাহরণ বর্তমান লেখকের "বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস" গ্রন্থের (১৯৬৯) চতুর্বিংশ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে :

(১) তেল-নুন-লকড়ি, ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ১৯০৬

(২) চার-ইয়ারি কথা, ১৯১৬

(৩) আমরা ও তোমরা, ভারতী ১৩০৯ বীরবলের হালখাতা ১৯১৭

(৪) প্রাণের কথা, সবুজপত্র ১৩২৪, নানা কথা ১৯১৯

(৫) আহুতি ১৯১৯

(৬) ফরমায়েসি গল্প ১৯১৯

(৭) আত্মকথা, রূপ ও রীতি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ১৯৪০

সবুজপত্র পর্বেই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য হয়ে আসছিল, তার প্রমাণ 'প্রাণের কথা' (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২৪, ১৯১৭ / 'নানাকথা'য় সংকলিত ১৯১৯)। এর কিঞ্চিৎ নমুনা :

"জার্মান বৈজ্ঞানিক হেগেল এবং জার্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপন জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এসব দার্শনিক হাতসাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজ্‌রুকি এক নজরে ধরা পড়ে না তার কারণ, সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখেছেন। তবে দেহমনের প্রত্যেক যোগসূত্রটি ছিন্ন করে মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয়না। দর্শন বিজ্ঞানের মনগড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্ব সমাসে পরিণত হয়।"

বীরবলী গদ্যরীতির ত্রুটিগুলি এখানে সহজেই চোখে পড়ে ও কানে লাগে। প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌ভণিতি, বৈদগ্ধ্য, পরিহাসকুশলতা, বক্র কটাক্ষ ও তির্যক প্রকাশভঙ্গি মিলে এই ভাষারীতিতে সর্বজনের পক্ষে দুরূহগম্য করে তুলেছে। ব্যঙ্গোক্তি ও বক্রোক্তি গদ্যরীতির শেষ কথা নয়, অলংকার-প্রযুক্তি কথ্যরীতির নিত্যসঙ্গী উচ্চাঙ্গের শিল্পী স্বভাবের সার্থক বিকল্প নয় ; বাক্‌চাতুরী ও চটক ভাষার দার্ঢ্য ও লাবণ্যের উপযুক্ত বিকল্প নয়,—এই সত্য এখানে প্রতিভাত।

বীরবলী গদ্যের এইসব ত্রুটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে প্ররোচিত করেছিল এই এই মন্তব্য করতে—

"তাই মাইকেলের অনুস্বর-বিসর্গবর্জিত সংস্কৃত একখানা যে-কোনও

অভিধানের সাহায্যেই আপামর সাধারণের বোধগম্য ; অথচ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিতান্ত চলতি বাংলা বহুভাষাবিদ্ পাঠকের অপেক্ষা তো রাখেই, এমনকি একাধিক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হলে, বীরবলী সাহিত্যের গূঢ় তাৎপর্য অনাস্বাদিত থেকে যায়।" (অন্তঃশীলা)।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্য সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ সমালোচনা সুধীন্দ্রনাথ করেছেন, সুধীন্দ্র-গদ্য কি তা এড়াতে পারে ? ত্রৈমাসিক পরিচয় (১৯৩১) পত্রিকার সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম স্বতন্ত্র কবি গদ্যশিল্পীরূপে যে কৃতিত্ব রেখেছেন, তা সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। 'স্বগত' (১৯৩৮/২য় সংখ্যা ১৯৫৭) ও 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭) গ্রন্থদুটিতে সংকলিত গদ্যরচনা সুধীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চার পরিচয়স্থল।

আপন গদ্যভাষার চারিত্র্য বিচারে সুধীন্দ্রনাথ যে নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন, তা সাধারণত আত্মাভিমানী বাঙালি লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না (উজ্জ্বল ব্যতিক্রম : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়)।

সুধীন্দ্র-গদ্যের প্রকৃতি বিচারে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেন সুধীন্দ্রনাথ। নিজের গদ্য রচনা সম্পর্কে তাঁর নিরাসক্ত বিশ্লেষণ স্মরণযোগ্য :

"আমার পূর্বতন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল ; এবং সেজন্যে কৃতজ্ঞতাভাজন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্নিকর্ষ, যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য। অর্থাৎ 'স্বগত'-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্য সত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ ; এবং আপন ভুল ভ্রান্তির উচ্ছেদ সে তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় বলে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়। ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয় তো আছে ; এবং ফরাসী সমালোচকদের মতে রীতি আর রচয়িতা অভিন্ন বটে। তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোঝে, যখন বাধে বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্বোপলব্ধির বিবাদ। তার পর শিল্পী যে-শৈলীর শরণ নেয়, বিষয়ীর বিষয় নিষ্ঠাই তার উপজীব্য ; এবং উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ যেমন সাহিত্য নামে পরিচিত, ব্যক্তিস্বরূপ তেমনই আত্ম-পরের সন্ধি।" ('পুনশ্চ', ১৮ জুন ১৯৫৬, স্বগত, ২য় সং)

এই প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের ত্রুটি সমূহের উল্লেখ করেছেন—শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণ বিভ্রাট, অপটু বাক্যবন্ধের দোষে অর্থের নিপাত্য। এখানেই তিনি জানিয়েছেন, "আমার চিন্তাপ্রণালী অন্তত তাঁদের কাছে বঙ্গীয় লাগবে, যাঁদের অভিজ্ঞতায় ভাব ও ভাষা যমজ।" তাঁর লেখাকে ইংরেজি অনুবাদের ছকে ফেলা যায় না, এটা তাঁর দাবী। ইংরেজি নয়, সংস্কৃত

সুধীন্দ্রনাথ ভাষার ভিত্তি। তাঁর ভাষারীতিকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন সংস্কৃত বহুল গৌড়ীরীতি। 'জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাসে'র কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ তিনি কবুল করেছেন। এ প্রবন্ধেই সুধীন্দ্রনাথ আর একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন :

"যে ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে শুধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুদ্ধি অচল।"

প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁর পক্ষপাত এখানে ব্যক্ত। গদ্য শিল্পী সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর একটি কথা অবশ্য কর্তব্য—তিনি গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ চেয়েছিলেন। অবশ্যই সুধীন্দ্রনাথ তার পথিকৃৎ নন। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সাধু গদ্যের কৃত্রিম শুদ্ধি থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। গদ্যের অদ্বৈতচর্চায় বিশেষ উল্লেখ্য নাম ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ।

সুধীন্দ্রনাথ এই পথে অবনীন্দ্রনাথের মতো সজ্ঞানে চলতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর সাধনা স্বীকৃত :

বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিবোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিস্ময়, ইত্যাদি বাংলা কাব্যের অনেক অভ্যাস দোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল। (সংবর্ত, ভূমিকা, ১৯৫৩)। (বাংলা গদ্যরচনায় গদ্য পদ্যের অদ্বৈত সন্ধান-প্রয়াসের উদাহরণ পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের 'বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস' গ্রন্থে !)

সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাহিত্যতীর্থ গদ্য-পদ্যের সঙ্গম স্থল।' এলিঅট গদ্য-পদ্যের যে ঐক্য বোধ লক্ষ্য করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাকে বাংলা সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন।

এলিঅট একদা বলেছিলেন, কবিরা স্বভাবত গদ্যের সুলেখক। তাঁর মতে, গদ্যরচনায় কবিদের সিদ্ধি তাঁদের বিচিত্রগামী প্রতিভাকে প্রমাণ করে না, এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে শিল্পচর্চা প্রকার ভেদের মুখাপেক্ষী নয়। কবি যখন গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন স্বকীয় চিন্তাধারার সরল বাহন হিসেবে তিনি গদ্যকে গ্রহণ করেন না, তার মধ্যে কাব্যশোভন লাবণ্যের আবিষ্করণে

যত্নশীল হন। এবং তা থেকেই প্রমাণ হয় যে গদ্য পদ্য আসলে একই উৎসজাত, গদ্যচর্চা ও শিল্পচর্চা।

গদ্য পদ্য পরস্পরবিরোধী ত নয়ই, বরং একে অন্যের পরিপুষ্টি সাধন করে, সেক্সপীয়রের শিল্পস্বভাবে তা প্রথম ধরা পড়লো। তাঁর সনেটগ্রন্থ ও নাটকের সংলাপ তার প্রমাণ। গদ্য ও পদ্যের স্বতোবিরুদ্ধতায় যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরাই গদ্য পদ্যের অদ্বৈতচর্চায় উৎসাহী। সেক্সপীয়র ওয়েবষ্টার, কলিন্‌স, পোপ, বার্নস, ওঅর্ডসওঅর্থ, বাইরন, টেনিসন, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, এমিলি ডিকিনসন, এলিঅট সে কাজ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সুধীন্দ্রনাথ সে পথেই এগিয়েছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, এলিঅট কাব্যে কথ্যরীতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, কবিতায় গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পর্শ রক্ষা করেছেন। আমাদের মানতেই হয়, কথ্যরীতি এলিঅট-এর কবিতার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, এবং তা উন্নত চৈতন্যেরই ভাষা। এলিঅট-এর মতো সুধীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন, কবিতা কবির আত্মসংগ্রামেরই বাণী মূর্তি ; আত্মসংগ্রাম যত তীব্র হবে, কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝুঁকবে, কবি-প্রসিদ্ধির কুসুমশয়ন ছেড়ে গদ্যেই কঠিনোজ্জ্বল ধর্মের মধ্যেই পাবে অবিষ্ট উৎসকে। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রকৃতি অনুধাবনে এই সত্য সর্বদা স্মরণযোগ্য॥

শামসুর রাহমান

নৈঃসঙ্গবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

(অংশ বিশেষ)

আধুনিক ধনতন্ত্র এমন এক ধরনের মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদের মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম বলেছেন the automation, the alienated man. এই পরিস্থিতিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেছেন আধুনিক ধনতন্ত্রের সন্তানের ক্রিয়াকাণ্ড এবং শক্তি তার নিজেরই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে—সেগুলো যে আর তার শাসনাধীন থাকছে না শুধু তাই নয়, এমনকি তার বিরুদ্ধাচরণ পর্যন্ত করছে। বস্তুত তারা শাসিতেব ভূমিকা ছেড়ে খোদ শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ধনতন্ত্রের সন্তানের জীবনধারা বস্তু ও প্রতিষ্ঠানের দিকেই প্রবাহিত। এবং এইসব বস্তুর উপাচার তার কাছে অধিষ্ঠিত দেবতার মত যেন। সেগুলি নিজের প্রয়াসের ফলশ্রুতি হ'য়ে তার অভিজ্ঞতায়—সঞ্জাত হচ্ছে না, বরং মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। একে সে পূজো করে, আত্মসমর্পণ ক'রে এরই কাছে। এই বিচ্ছিন্ন মানুষ তার স্বহস্তে তৈরি বস্তুর কাছেই মাথা নত করে শেষ পর্যন্ত। 'Alienated man' এর কাছে প্রেমও অর্থহীন। কেননা যন্ত্রচালিত মানুষ ভালবাসে না, বিচ্ছিন্ন মানুষের কিছুতেই কিছু এসে যায় না। প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি সুবিধাজনক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত ; হয়তো নৈঃসঙ্গের থাবা থেকে নিস্তার পাওয়ার অন্যতম উপায় মাত্র।

পরিবর্ধমান উৎপাদন শক্তি ও জীবন উপভোগের রকমারি উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ আত্ম-চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুতঃ গোটা জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন ঠেকে। অবশ্য এ ধরণের অনুভব অনেকাংশেই অচেতনতার ফল। উনিশ শতকের অন্যতম চিন্তা ছিল ঈশ্বরের মৃত্যু—কিন্তু বিশ শতকের সমস্যা আরো মারাত্মক ; কেননা এই শতক ঈশ্বর নয়, মানুষেরই মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করলো। উনিশ শতকে অমানুষিকতা ছিল নির্দয়তার নামান্তর। অন্যপক্ষে বিশশতকে এর অর্থ দাঁড়ালো আত্ম-বিনাশী উন্মত্ততা। সে ক্রীতদাস হয়ে যাবে, অতীতে এমন শঙ্কা দানা বেঁধেছিল মানুষের মনে। ভবিষ্যতে কোনদিন মানুষ হয়তো যন্ত্রমানবে পরিণত হবে, এই আশঙ্কার ছায়া বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের মনেই যে পড়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সত্যি, যন্ত্র মানুষেরা বিদ্রোহ করে না। কিন্তু তাদের যান্ত্রিক সত্তায় মানবিক প্রকৃতির স্পর্শ লাগলে তারা আর সুস্থ মস্তিষ্কে বাঁচতে পারবে না। তারা দানবে রূপান্তরিত হবে। তখন তারা তাদের পৃথিবীকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে, আত্ম-সংহারে লিপ্ত হবে। কেননা অর্থহীন জীবনের একঘেয়েমি তারা সহ্য করতে পারবে না আর। আমরা জানি, আদিম মানুষ খেয়ালী প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় লীলাক্ষেত্রে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করতো—ঠিক তেমনি আধুনিক মানুষও তার নিজের গড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়ানক অসহায় বোধ করে। স্বহস্তে গড়া বস্তুকেই অর্ঘ্য অর্পণ করে,—সূর্য ও বৃক্ষবন্দনার প্রাক্তন অভ্যাস ছেড়ে নতুন দেবকুলের নিকট মাথা নত করে। যে ঈশ্বর তাকে পুতুল ধ্বংসের মন্ত্র জপিয়েছিলেন, তার নামে দোহাই দিয়েই পুতুল পূজার কাজটি সারে।

এই ঈশ্বরহীন, বিপন্ন, নিঃসঙ্গ মানুষ প্রায় এই প্রথম হতাশায় এলিয়ে যেতে যেতে দেখলো যে তার জীবন বস্তুতঃ ক্রম-বিচ্ছিন্নতার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। জন্মলগ্নে যে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হয় তার সমস্ত জীবন এক ক্রমিক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। শৈশবে অচেনা জগতের সংগে পরিচয় লাভের বাসনা এবং ভয় তাকে তার চেনা জগতের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনে। বয়স বাড়লে পরে কর্মজীবনে এসে দেখে যে আত্মলোপী প্রতিবেশীকে এতদিন সে বড় একটা লক্ষ্য করেনি, জীবিকার ক্ষেত্রে সে-ই তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বার্থের সংঘাতে, সেই তীব্র প্রতিযোগিতার মুহূর্তে বাইবেলের সেই অনুজ্ঞা 'Love thy neighbour' অসহ্য ও উপহাস্য ঠেকে। জীবিকার পেছনে জিভ বের ক'রে ছুটতে ছুটতে সে এক সময় বার্ধক্যে এসে পৌঁছায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পুত্রকন্যার জীবন থেকে। বার্ধক্যের নৈঃসঙ্গের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবে সে মৃত্যুর শূন্যতার কথা। মৃত্যুকে সে তার সৌভাগ্যবান পূর্ব-পুরুষের মতো নতুন এক জীবনের দ্বার ভেবে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কেননা, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান এই বিরূপ বিশ্বে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভূমি সে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আধুনিক কবি কণ্ঠে এই ঘোষণা প্রাক্তন স্বর্গচ্যুতির আর্তনাদের মতো আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে স্পর্শ করে।

> অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই
> অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্ব-ধর্মেই,
> বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
>
> (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

কিংবা স্মরণ করুন এলিয়টের "দি ককটেল পার্টির" সেই চরিত্রটির উক্তি যাতে ধ্বনিত হয়েছে নিঃসঙ্গতারই স্বর :

"...What has happened has made me aware
That I've always been alone. That always is alone...
...it isn't that I want to be alone,
But that every one's alone—or so it seems to me,
They make noises and think they are talking to each
other ;
They make faces, and think they understood each other
And I'm sure that they do not..."

উপরে যেসব কথা বিবৃত হলো তাতে অভিনবত্ব কিছু নেই, তবু যে এতগুলি কথার পুনরুক্তি ঘটালাম তার উদ্দেশ্য আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মনে করি আলোচনা-প্রসঙ্গে আধুনিক চৈতন্যের এই মৌল বোধটির বিশ্লেষণ জরুরি ছিল। নয়তো আমরা আধুনিক কবির ভাবমণ্ডলের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারব না। আগেই বলেছি, আধুনিক মানুষের তীব্র, তীক্ষ্ণ নিঃসঙ্গ বোধ আধুনিক বাংলা কবিতায় বহু চিত্রকল্প ও প্রতীকে রূপায়িত হয়েছে। আমি এখানে কয়েকজন কবির রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ—উদ্ধৃত করছি।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন

—জীবনানন্দ দাশ

বুদ্ধিজীবী রুদ্ধ ঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।

—বুদ্ধদেব বসু

আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

—সমর সেন

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আমি
নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

—সমর সেন

অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়
দেখিতেছি ভ্রমি ভ্রান্ত চোখে
গতাসু আলোয় প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে।

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই,
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই,
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবেনা পদরেখা।
প্রাণপুরাণির বাল্য বন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমগ্ন তরণী ছেড়ে ঝাঁপাতে পারি না তবু জলে।
বিশাল কৌশলে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেঁড়াপাল সযত্নে খাটাই;
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি; সঙ্গে ছিল যারা,
প্রলুব্ধ বন্দরে কিংবা পথ কষ্টে আজ আত্মহারা,
কে কোথায় প'ড়ে আছে, জানিনা ঠিকানা।
শূণ্য মনে ভূত দেয় হানা:
প্রকীর্ত্তির-ছায়াচ্ছবি নিরাশ্রয় চোখে ফুটে ওঠে।

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

নিত্যকাল ধ'রে এই—দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন
রাত্রিও প্রশান্তি হীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।
—বিষ্ণু দে

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এসে দেয় ভয়াল নিবিড় শূণ্যতার ছবি।
—বিষ্ণু দে

এখানে বিভিন্ন কবির কবিতায় যে-সব বিক্ষিপ্ত চিত্রকল্প উদ্ধৃত হলো সেগুলোতে আশা করি, আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ ও আধুনিকতা বোধ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা থেকে একটু বেশী উদ্ধৃতি দিয়েছি। কেন না আমি মনে করি, তাঁহার কাব্যে আধুনিক চৈতন্যের যে রূপ ধরা পড়েছে, তা বাংলা কবিতায় দুর্লভ। একজন সমালোচকের মতে, সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবন দর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এমন কি আধুনিক কাব্যের অনেকগুলি লক্ষণ যদিচ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ কালে মনে হয় কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূণ্যতা নৈরাশ্য ভারাতুর নয়নে আলোচনা করছেন।*

---

* হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত "প্রতিক্রমী প্রসঙ্গ" গ্রন্থে প্রকাশিত শামসুর রাহমানের প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

আশিস সান্যাল

অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ

"ভাষার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।" সুধীন্দ্রনাথ কথিত এই উক্তিই বোধ হয় সুধীন্দ্রনাথকে বিদেশী কবিতার বঙ্গানুবাদে অনুপ্রাণিত করে এবং বলতে দ্বিধা নেই, সুধীন্দ্রনাথের এই অনুপ্রেরণা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে অনেকাংশে সুসজ্জিত করেছে। কাব্যানুবাদ ছিল সুধীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস। তাঁর পূর্বসূরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা 'ভারতী' দলের অন্যান্য কবির অনুবাদ সামর্থ্যের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তুলনা করলেই বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ আহরণ মনোযোগী। তাই কাব্যরচনায় বা অনুবাদে তিনি যত পরিশ্রমী ছিলেন, তত অনুভূতিপ্রবণ- ছিলেন না। তাই তাঁর অনূদিত কাব্যে কাব্যাদর্শের সচেতনতা তেমন লক্ষ্য করা যায় না এমন কি সূক্ষ্ম সতর্কতারও অভাব কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নজরুল ইসলাম প্রমুখও কম বেশি এ পথেরই অনুসারী। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে ছিলেন একটি ব্যতিক্রম। তাঁর সমকালীন বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়ে। এঁরা কেউ-ই এলোমেলোভাবে নানান দেশ কালের কাব্য ভাণ্ডার থেকে আমদানী-উৎসাহী প্রতিনিধি হয়ে ঘুরেননি। বিষ্ণু দে এলিয়টের অনুবাদে বিশেষ আগ্রহপোষণ করেছেন। বুদ্ধদেব যেন র্যাঁবো এবং বোদ্‌লেয়রের অনুবাদেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন বেশি। প্রেমেন্দ্র মিত্র অনায়াস বিচরণ করেছেন হুইটম্যানের কবিতায়। আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত কবিতাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁর আগ্রহ ছিল শেকস্‌পীয়র আর হাইনেতেই বেশি। মালার্মের প্রতিও বোধহয় তাঁর আগ্রহ ছিল কিছুটা। কিন্তু মালার্মের বঙ্গানুবাদে যে বিস্তর অসুবিধা ছিল, তা অনুভব করেই বোধ হয় মাত্র কয়েকটি অনুবাদ করেই সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্বভাষ্যই উল্লেখ করা যাচ্ছে।—"কবি হিসেবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন, এমন কি বিপরীত আবেগের আস্রবন, অথবা অস্‌মোসিস ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকল্প যে রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তাঁর অনুকরণ স্বভাব নিগ্রন্থ বাংলায় একেবারে অসম্ভব ;

এবং স্বয়ং আল্‌ডাস হাক্সলি বর্তমান কবিতার ইংরেজি তর্জমায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন—এ দুটো দোষের কোনওটা এড়িয়ে যেতে পারেন নি।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথের রুচি এবং সতর্কতা তাঁকে যে কোনও ভাষা থেকে এলোমেলোভাবে অনুবাদে উৎসাহিত করেনি। কেননা, সে ধরনের অনুবাদ যে শেষ পর্যন্ত সফল হয় না, কাব্যানুবাদ করতে গিয়ে তিনি এসত্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে, এজরা পাউণ্ড ইতালীয়, ফরাসী, চৈনিক, জাপানী ইত্যাদি ভাষা থেকে ইংরেজিতে তো স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। চীনা কবিতার ভাবগত সংযম ও সারল্য নাকি পাউণ্ড যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, এমন কি এলিয়টের ভাষায়—"He has grasped certain things in Provence, which are Permanent in human nature." আসলে পাউণ্ডের মানসিকতায় এই সমস্ত ভাষার কবিতার একটা প্রভাব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিক মননে তা সম্ভব ছিল না। কেননা, অনুবাদ বলতে তিনি কেবল রূপান্তর বোঝেন নি, বুঝেছিলেন আন্তরভাষ্য। এল ডব্লু ট্যানকক কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "যখন মূল কবিতার অর্থ, প্রকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ হয়ে যাবে, তখন কবিতাটির পরিমণ্ডল নিয়ে ভাবা দরকার। আর সেই মুহূর্তে সবটাই ব্যক্তিগত হয়ে যায়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদক কবির ব্যক্তি মানস এতে সঞ্চারিত হয়।" তাই দেখা গেছে, মূল কবির সঙ্গে অনুবাদক কবির মিল যেখানে ব্যাহত, সেখানে অনুবাদ আন্তরভাষ্য না হয়ে হয় ভাষান্তর। সুধীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে সে পথ পরিহার করেছেন। তাঁর বিশিষ্ট কবি-স্বভাব ও দার্শনিক মানসিকতার জন্য এই কারণেই তাঁর আহরণের ক্ষেত্র যেমন হয়েছে সীমিত, তেমনি আহরণের ক্রিয়াটিও হয়েছে সতর্ক। এই অনুধাবনা থেকেই বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

॥ এক ॥

'প্রতিধ্বনির ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব;…।" কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তিটি বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। ষোড়শ শতকের ফরাসী কবি ড্যু-ব্যেল বোধ হয় এই কারণেই কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ইতালীয়

ভাষায় অনুবাদ করা বিশ্বাসঘাতক প্রবাদটিও বোধ হয় এই সমস্যা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। 'একালের মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট' তো স্পষ্টতঃই বলেছেন —"কবিতা অনূদিত হলে তার রসচ্যুতি ঘটে।" এ সমস্ত উক্তির যাথার্থ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ফরাসীদেশে রমাঁ রোঁলার সঙ্গে কথোপকথনের সময় রবীন্দ্রনাথ কীটসের কবিতা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—"Although keats cannot be translated into our language, but we can presume the heauty of his language."

কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে সহৃদয় জনের এইসব অনীহার মৌল কারণ মনে হয় কবিতার অনুবাদকে মূলতঃ তাঁরা ভাষান্তর বা রূপান্তর মনে করে থাকেন। পতুব্রিয়াঁ নির্দেশিত রীতির অনুসরণে শব্দ ও পংক্তি ধরে অনুবাদ করতে যাওয়াই এই বিপত্তির প্রধান কারণ। স্প্যানীয় অনুবাদক অ্যানিব্যাল গালিন্দো এই পদ্ধতিটি অনেক আগেই অস্বীকার করে বলেছেন, এতে অনুবাদ literal না হয়ে verbal হয়ে এক রুগ্ন রূপ ধারণ করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদের এই মৌল সমস্যাটি অনুধাবন করেই বলেছিলেন—"ইংরেজির ব্যাকরণ স্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি ফরাসীর মোহ, অথবা জার্মানের অন্বয়, তথা সমাস বাহুল্য, যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর বঙ্গবাণীর মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান। অন্ততঃ পক্ষে ভুক্তভোগীরা জানেন যে পাশ্চাত্ত্যের কোনও কোনও সদর্থক বক্তব্য যেমন আমাদের বোধগম্য হয় নেতির সাহায্যে, তেমনি আমরা এমন অনেক কথা প্রত্যহ ব্যবহার করি যা পশ্চিমে বাগাড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা।" এই কারণেই কবিতার ভাষান্তর বা রূপান্তর অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কান্তিচন্দ্র ঘোষের ফিট্‌জেরাল্ড-এর 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'এর অনুবাদ সম্বন্ধে একটি চিঠিতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে লিখেছিলেন। "এ রকম কবিতা একভাষা থেকে অন্যভাষার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান জিনিসটা বস্তু নয়, গতি। জেরাল্ডও তাই ঠিকমত তর্জমা করেন নি—মূলের ভাবটা নিয়ে সেটাকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। ভাল কবিতা মাত্রকেই তর্জমায় নতুন করে সৃষ্টি করা দরকার।" এই নতুন সৃষ্টিই হল আন্তরভাষ্য। মধ্যযুগের বাঙালী কবি আলাওলকেও "পদ্মাবৎ" অনুবাদ করতে গিয়ে বলতে হয়েছে— "স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজ মন উক্তি।"

কবিতার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিই একদিক থেকে তাকে অনুবাদের ক্ষেত্রে

আত্মরভাস্থ করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই শব্দের কথা উল্লেখ করতে হয়। Yeats কবিতার ব্যাপারে বলেছিলেন "Words alone are certain good." সত্যিই তাই। এই শব্দই তো কাব্যের প্রাণ। যে শব্দ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করতে সক্ষম। Sir H. Idris Bell এর ভাষায়— "Words are three-fourths of any poem ; one of the three principal qualities which give value to a word, sense, sound and emotional quality." সুধীন্দ্রনাথও কিন্তু কবিতার শব্দের এই অভিধা সম্বন্ধে সচেতন থেকেই কাব্যানুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। গদ্যে এবং কাব্যে শব্দ ব্যবহার যে নিছক বিলাস নয়, এ-সত্য তাঁর অধিগত ছিল। "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—শব্দমাত্রেরই দুটো দিক আছে: একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে পদ্যের সম্পর্ক এই প্রথম দিকটার খাতিরে। গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার; কিন্তু কাব্যে শব্দের স্মরণ নেয় এই দ্বিতীয় গুণের লোভে। কাব্যের শব্দ আবেগবাহী।" শব্দের এই রসপ্রতিপত্তির দিকটি ভাষান্তরে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, শব্দের এই রসপ্রতিপত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশীয় ঐতিহ্য, যুগচেতনা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা। প্রখ্যাত রুশ কবি ভাসিলি ফায়োদরভ মস্কোতে এক আলোচনা সভায় শব্দের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে—"প্রতিটি শব্দই জনগণের আধ্যাত্মিক শক্তির ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে, যেমন একটি গাছ বা কয়লা সৌরশক্তিকে প্রতিফলিত করতে চায়। কবির দায়িত্ব সেই আধ্যাত্মিক শক্তির নিষ্কাষণ।"

তাছাড়া এমনও দেখা গেছে, এক ভাষার প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় নেই। এম. পি. ভাস্করণ মালয়ালম কবি কুমারণ আশানের "সীতা" কাব্যগ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে এমন কিছু কিছু অসুবিধায় পড়েছিলেন। কবি সীতার বর্ণনায় এমন কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। যেমন সীতাকে তিনি সুন্দরী, অলসঙ্গী, মহামনস্বিনী, ললিতাঙ্গী, অবনীশ্বরী ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন। এর মধ্যে সুন্দরী এবং অবনীশ্বরী শব্দ দু'টির ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্যগুলির ক্ষেত্রে অনুবাদক কি করবেন? এর একটা সুন্দর উত্তর আছে বিষ্ণু দের "হে বিদেশী ফুল" গ্রন্থখানির ভূমিকায়। তাঁর ভাষায়—"যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে

মেজাজ অনুবাদে আভাসে বহন করতে।" এই "আভাস" সৃষ্টিইতো অনুবাদকের প্রধান কর্তব্য। সুধীন্দ্রনাথ কবিতার অনুবাদে এই দাবী পূর্ণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাঁর অনূদিত কবিতাবলী আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হবে।

॥ দুই ॥

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনুবাদের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ আগ্রহ দেখিয়েছেন শেকস্‌পীয়র ও হাইনের কবিতা প্রসঙ্গেই। কবি-স্বভাবে এই দুই কবি স্বতন্ত্র হলেও বোধ হয় তাঁদের কবি মনীষা ও দুরবগাহী কল্পনাশক্তিই সুধীন্দ্রনাথকে তাঁদের কবিতা অনুবাদে আগ্রহী করেছিল। কল্পনা হলো আসলে সেই মানস শক্তি যা প্রকৃতিবিশ্ব ও মানববিশ্ব থেকে বর্ণসমারোহ ও উপকরণ আহরণ করে, তাকে ভাবগর্ভ রূপ দেয়। সেক্সপীয়রের সনেটের সঙ্গে পরিচিত মাত্রেই জানেন যে তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য কত স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ভাবানুভূতি ছিল নির্দিষ্ট চিত্রকল্পে ও রূপে আকৃষ্ট এবং তাঁর চিত্রকল্প ছিল সর্বদাই সমাধিস্থ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—"যিনি যাই বলুন, শেকস্‌পীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত-ভাবশরীরী শেকস্‌পীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বিরাগ, অনুরাগ, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মত চতুর্দিকে বিচিত্র শাখায় বিচিত্র বর্ণে—বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে, যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডিমনার প্রতি প্রীতি, ফলস্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেকস্‌পীয়রের মানব হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করেছে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০শ খণ্ড] তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায় প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্বের মুক্তিলাভের আকুতি।

আর হাইনে, জার্মানীর দার্শনিক কবি হাইনের মানস জগতেও তো মানব-মুক্তির একটা তীব্র আকুতি বর্তমান। জার্মান সাহিত্যে রোমান্টিক প্রকৃতির তিনি যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার ইংরেজি রোমান্টিকতার ব্যবধান ছিল বিস্তর। কিন্তু কবিতায় তীব্র আকুতিতে, শব্দের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এবং সর্বোপরি মানব মুক্তির নির্যাসে অভিষিক্ত।

অতএব, এই দুই কবি যে সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মালার্মেও তাঁর প্রিয় কবি ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু

তাঁর অনুবাদ সার্থক হবে না জেনেই তিনি মালার্মের খুব বেশি অনুবাদ করেন নি বলে মনে হয়। যাই হোক, এই দুই কবির কবিতা অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার তুলনা বিরল। তিনি ভাষান্তর বা রূপান্তর করেন নি। কবিতার ভাষান্তর বা রূপান্তর অসম্ভব তা আগেই বলা হয়েছে। ফলে অনুবাদের নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে অনুসরণ করেই বলা যায়—"এমন সার্থক লেখা বিরল যার অভিপ্রায় যুগে যুগে বদলায় না, অথবা যাতে পাঠক বিশেষের ব্যাপক বোধশক্তি প্রশ্রয় পায়না ; এবং সেইজন্যে একই কবিতার একাধিক তর্জমা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনই একই অনুবাদকের চোখে তা চিরদিন এক রকম দেখায় না।…বারংবার পরিবর্তনের পরেও কোনটা মূলের ত্রিসীমানাতে পৌঁছুতে পারেনি বটে, তবু এগুলো যে মহাকবিদের প্রতিধ্বনি, তাঁদের সঙ্গে আমি নিরন্তর সংশোধনের ফলেই একলব্যের সম্পর্ক পাতিয়েছি।"

সুতরাং যাঁরা সুধীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদে মূলের স্বাদ আস্বাদন প্রয়াসী, তাঁরা নিশ্চিত ক্ষুণ্ণ হবেন। কেননা, সুধীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল মূলের আভাস দেওয়া বা একটা প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা। কিন্তু যাঁরা ব্যর্থ অনুবাদক তাঁরা এক্ষেত্রে একটা মারাত্মক ভ্রম সৃষ্টি করেন। মূল কবিতার আভাস দিতে গিয়ে তাঁরা ভাবানুবাদে চলে যান। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, অনুবাদক যতই দক্ষ হোননা কেন, তিনি মূল কবির সমান্তরাল স্রষ্টা নন ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এদিক থেকে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। তিনি মূল কবির সমান্তরাল স্রষ্টা ভূমিকায় নিজেকে কখনও প্রতিষ্ঠিত করেন নি। কিংবা শতুব্রিয়াঁ নির্দেশিত রীতির অনুসরণে ভাষান্তর বা রূপান্তর করেন নি। শেকস্‌পিয়র বা হাইনের কবিতা তাঁর ব্যক্তি মানসে উদ্ভাসিত হতে পেরেছে বলেই অনূদিত কবিতাগুলি এত সার্থক, স্বচ্ছল হতে পেরেছে। যেমন শেক্‌স্‌পিয়রের ১৭ নং সনেটটির কথা ধরা যাক। মূল সনেটটি হল—

Who will believe my verse in time to come,
If it were fill'd your most high deserts ?
Though yet, heaven knows, it is but as a tomb,
Which hides your life and shows not half your parts.
If I could write the beauty of your eyes.
And in fresh number all your graces,

The age to come would say 'This poet lies ;
Such heavenly touches ne'er touched earthly faces'.
So should my papers, yellowed with their age,
Be scorn'd, like old men of less truth than tongue ;
And your true rights be tem'd a poet's rage.
And stretched metre of an antique song.
But were some child of yours alive that time.
You should live twice in it, and in my rhyme,

সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ :—

তোমার সদ্‌গুণে যদি ভ'রে ওঠে আমার কবিতা,
তবে তার বস্তুনিষ্ঠা মেনে নেবে কে আগামী কালে ?
অথচ, ঈশ্বর সাক্ষী; এ প্রসঙ্গে যা লিখি, তা বৃথা ;
তোমার বিভূতি প্রায় অদৃশ্য এ-চৈত্যের আড়ালে।
সামর্থ্যে কুলাত যদি ও-চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা,
অথবা কীর্তন সাধ্য হতো যদি তোমার প্রসাদ,
তাহলে রটাত লোকে এ কেবলই কপোলকল্পনা ,
কে কবে পেয়েছে মর্ত্যে অমৃতের সাক্ষাৎ সংবাদ ?
আমার রচনা তাই ভবিষ্যতে বিদ্রূপই কুড়াবে,
সেই বৃদ্ধদের মতো, হ্রস্বসত্য, দীর্ঘজিহ্বা যারা ;
কবির উচ্ছ্বাস বলে, কনিষ্ঠেরা তোমারে উড়াবে,
ভাবিবে তোমার প্রাপ্য প্রশস্তির প্রচলিত ধারা।
কিন্তু যদি সে-সময়ে থাকে তব পুত্র উপস্থিত,
তোমারে দ্বিজত্ব দিবে তবে সেও আমার সঙ্গীত ॥

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মূল কবিতার ভাষানুসঙ্গ থেকে অনূদিত কবিতাটির ভাষানুসঙ্গের পার্থক্য কত বিস্তর এবং সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচর্যায় তৃতীয় পংক্তির life কত সহজেই 'বিভূতি'তে অনূদিত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে নিজস্ব বক্তব্য হল : "উদাহরণও উল্লেখযোগ্য শেক্‌স্‌পীয়র থেকে অনূদিত সনেট্‌গুচ্ছ ; এবং একই কথা হাইনের সম্বন্ধেও সত্য। বিশ-বাইশ বছর আগে যখন এঁদের প্রতি প্রথম মন দিই, তখন কলম বেশ দ্রুত চললেও, ইংরেজি বা

জার্মান দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো এত শক্ত লেগেছিল যে কেবল পাদপূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু রূপ গ্রহন ও বর্জন, তথা আরো অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ এড়িয়ে যেতে পারিনি ; এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে মাত্রা গণনায় কম পড়েছিল, সেখানে অগত্যা যে পুনরুক্তি বা বিশেষণ বাহুল্যের শরণ নিয়েছিলুম, তাতে ওই কবিযুগলের মতিগতি প্রকাশ পায়নি, ফুটে উঠেছিল তদানীন্তন বাংলা কাব্যের মুদ্রাদোষ। তথাচ কুড়ি বৎসরে গ্রন্থভুক্ত পদকর্তাদের বিষয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা জমিয়েছি, তা হয়তো এখানে অপেক্ষাকৃত সুপ্রকট ; সেই জন্যে, পরবর্তী পদ্য আমার লেখা হিসেবে বিচার্য জেনেও, প্রত্যেক রচনার নিচে আদি কবির নাম আর বইয়ের শেষে মূলের আদ্যপংক্তি লিপিবদ্ধ করেছি।" এই উক্তির মধ্যেই অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হাইনে, মালার্মে বা অন্যান্য যে সব কবিতা সুধীন্দ্রনাথ বঙ্গানুবাদ করেছেন, সেখানেও তাঁর এই একই মানসিকতার প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অনুবাদ একদিক থেকে সমালোচনারই একই ধারা বা উপায়। কোন একজন বিশেষ কবির কবিতাই যখন যুগে যুগে পাঠকচিত্তে নতুন অর্থদ্যোতনা সঞ্চার করে, তখন অনুবাদেও যে তার প্রভাব পড়বে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং কাব্যানুবাদে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। লিওনার্দ ফ্রস্টার বোধ হয় এই কারণেই অনূদিত কবিতাকে একটি কাঁচের পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই পাত্রটি স্বচ্ছ হতে পারে, ভগ্ন হতে পারে, রঙিন হতে পারে। সেই পাত্রের ভেতর দিয়ে যেমন অন্য জিনিসকে পাত্র অনুযায়ী স্বচ্ছ, বিকৃত বা রঙিন দেখা যায়, তেমনি অনূদিত কবিতাও যেন একটি পাত্র। পাঠক-এর ভেতর দিয়ে নিজেকে এভাবেই উপলব্ধি করেন। সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত কবিতাতেও যেন এরই অনুসরণ। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তিনিই প্রথম সুসম সচেতন রীতির প্রবর্তন করেন। আশা করা যায়, তাঁর অনুসৃত রীতি অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের ব্যঞ্জনা আরো সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

দীপক গুহরায়

মার্কস, সুধীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ দর্শন

এক

পৃথিবীব্যাপী বহু প্রগতিবাদী লেখকের নিকটই এক সময় রুশ-বিপ্লব সাম্য ও স্বাধিকারের বার্তাবহরূপে উপস্থিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনে বীতশ্রদ্ধ ভারতীয় মনীষার এক বৃহদংশও এই বিপ্লবের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল নিপীড়িত মানুষের শৃংখলমুক্তির সঞ্জীবন মন্ত্র। আকর্ষণের আতিশয্যের ফলে রুশ-বিপ্লবের অন্তর্নিহিত স্বার্থবোধ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তখন অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়েনি। বিপ্লব-কাণ্ডারীদের ভাবজগতে মার্ক্সীয় দর্শন ছিল একচ্ছত্র আধিপত্যে অধিষ্ঠিত। সার্ত্র-প্রমুখ চিন্তানায়কদের মতো সুধীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন যে 'মনুষ্যধর্মের শাশ্বত সমস্যা মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিকের সাহায্যে সমাধানসাধ্য' অবশ্য অন্ধ বিশ্বাসে চিরস্থায়ী আত্মসমর্পণ সন্ধানী মননের ধর্ম নয়। যে প্রখর চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণী প্রতিভা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ঐতিহ্যের আবহাওয়ায় মানুষ সুধীন্দ্রনাথকে জড়বাদে আকৃষ্ট করেছিল, তা-ই তাঁকে রুশ-বিপ্লবের ক্রম-পরিণতি নিয়ে ভাবিয়ে তোলে। এগিয়ে চলা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিমূলেই আঘাত হানল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতি এবং সমতা ও স্বাধিকারের পারস্পরিক পরিপূরণের ভূমিকার পরিবর্তে পরিদৃশ্যমান বিরোধ বহু মনস্বীদের মতোই সুধীন্দ্রনাথের মনেও নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের অবতারণা সৃষ্টি করে। ফলে সুধীন্দ্রনাথ এমনকি মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন।

মনীষী মার্ক্সের দর্শন মূলতঃ দ্বন্দ্ব ভিত্তিক। জড় ও জীবজগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ থেকে শুরু করে মানবিক কর্মপ্রবাহ পর্যন্ত মার্ক্স দ্বন্দ্বের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য প্লেখানভের বিশ্লেষণাত্মক সংযোজনের পরেও অভিধানটি মার্কসের স্বপ্রদত্ত নয় বলে মার্ক্সীয় দর্শনকে বর্তমানে অনেক মার্ক্সবাদী দার্শনিকও 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' নামে চিহ্নিত করতে নারাজ। মৌলসত্তায় লোকোত্তরের পরিবর্তে বিবর্তন ভিত্তিক প্রকৃতিকে বসালেও ঘটনা-প্রবাহে মানুষের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা মার্ক্সের নিকট ছিল অচিন্তনীয়। অপরিণত বুদ্ধি ভাষ্যকাররা হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে জেহাদ নিয়ে বহু গোরগোল

তুলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্ক্‌স ও হেগেল প্রমুখ মনস্বী ব্যাখ্যাত দ্বন্দ্বভিত্তিক জার্মাণ দার্শনিক ধারারই উত্তরসূরী। পক্ষ, বিপক্ষ এবং উভপক্ষ বা সমন্বয়ে এই দ্বন্দ্বের ক্রমিক বিকাশ। অবশ্য জাগতিক জড় সত্তা থেকে ধারণার উদ্ভাসে মার্ক্‌স আস্থাশীল ছিলেন যা হেগেলীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার জড়সত্তার আধারে মানবমননকে বাঁধা হলেও ঘটনাপ্রবাহের রূপায়নে তার কোন ভূমিকাই নেই, জাতীয় নেতিবাচক চিন্তায় মার্ক্‌স সচরাচর গুরুত্ব আরোপ করেননি। যান্ত্রিক জড়বাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক সংঘাতের সময় অধিকাংশ মার্ক্‌সবাদী ভাষ্যকার মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে ম্যাক্‌সীয় স্বীকৃতিতেই আশ্রয় খোঁজেন, অথচ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির কর্ণধাররা প্রতিকূল পরিবেশের দোহাই দিয়ে শিল্পী সাহিত্যিক সমেত সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতার সংকোচনে বিন্দু-মাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাছাড়া ক্ষমতার উত্তরোত্তর কেন্দ্রীকরণের পর কম্যুনিজম্‌-অভিপ্রেত সার্বিক বিকেন্দ্রীভূত সমাজে ঐতিহাসিক উত্তরণ কীভাবে সম্ভব হবে উঠবে? অনেক তাত্ত্বিকের উপেক্ষা কুড়োলেও উদ্দেশ্য ও উপায়ের এই বৈপরীত্য সুধীন্দ্রমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়—"…বামাচারের উদ্দেশ্য ও উপায়ের বৈপরীত্য তখনও আমাকে দুঃখ দিত; এবং বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে সে বিরোধের শেষ নেই।"

কলাকৈবল্যের যুক্তিতে দণ্ডায়মান নিরবলম্ব সহিত্য সুধীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় লাভ করেনি। কিন্তু রচয়িতার স্বাধীনতাই যে মহৎ সৃষ্টির প্রাণবায়ু তা তাঁর অবিদিত ছিল না। তাই রাষ্ট্রশক্তির পদতলে স্বাধিকারের আত্মসমর্পণকে তিনি কোন যুক্তিতেই গ্রহণ করেন নি। সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কিকে সাধুবাদ জানিয়ে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"…প্রাপ্যর অধিক পূজা পেয়েও তিনি নিজের গন্তব্য ভোলেননি, আমরণ মনে রেখেছিলেন যে গ্রাসাচ্ছাদনে, আহ্লাদে-আমোদে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে শুধু প্রতিভাশালীর আয়ত্তি যথেষ্ট নয়, সর্বসাধারণের উৎকর্ষ সাধনই সভ্যতার একমাত্র ব্রত।"

এ আদর্শ যে মহান, অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির চেয়ে অকৃপণ সমাজসেবা যে অনেক বেশী উদার, সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তা সত্ত্বেও ঐ সিদ্ধান্ত সম্ভবত অর্ধসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং অর্ধসত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক। অন্ততঃ পক্ষে এ-সংবাদ সকলেরই জানা থাকার কথা যে, অনুরূপ যুক্তির জালেই জার্মানি ও ইটালির স্বাধিকার প্রমত্ত রক্ষণশীলেরা তথাকথিত অসামাজিক সৌন্দর্যজ্ঞান বা শ্রেয়োবোধের উদ্বোধন ঘটাচ্ছে; এবং স্বৈরতন্ত্রের

প্রতিবাদেই যখন গর্কির সারা জীবন কেটেছে, তখন তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে কখনও প্রজ্ঞাবিসর্জনের কুমন্ত্রণা মিলবেনা, স্বাবলম্বী বিচারবুদ্ধিকেই অপরিহার্য লাগবে। কারণ ফাসিজম্ আর কম্যুনিজম-এর উভয়সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যৎকিঞ্চিৎ কম অসৎ ব'লে আমাদের অবশ্য বরণীয় নয়; এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্যপন্থাই হয়ত অগতির গতি; এবং সে-পথে চলতে গিয়ে বুরিদান-এর গাধা অনাহারে মরেছিল বটে, কিন্তু তার দু-পাশে যে-দুই বিপরীত মুখী গড্ডালিকাস্রোত প্রবাহিত, তাদের পরিসমাপ্তি একেবারে প্রলয়পয়োধিতে। অর্থাৎ স্বাধীন-স্বতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণের অধিকারকে সামাজিক শ্রেয়বোধের প্রতিযোগীরূপে সুধীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি।

সাধারণত মোহভঙ্গের পর পুরোনো আশ্রয়ের প্রতি অন্ধবিদ্বেষ যুক্তির ধার ধারে না। তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যবধানসঞ্জাত বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া কিন্তু সুধীন্দ্রনাথকে যুক্তিনিষ্ঠা বিসর্জনে উদ্যত করেনি। তাই তাত্ত্বিক পুনর্বিবেচনায় সুধীন্দ্রনাথ মন্থরগতি। 'একাধিক ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য' তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে 'একেবারে নিষ্প্রমাদ মানুষ আজ পর্যন্ত জন্মায়নি।' মনীষার উৎপত্তি ও উপসংহার যেহেতু জাগতিক, মনীষীর মননও সীমিত এবং তাঁর বাণী স্বভাবতঃই দৈববাণী নয়। ধনতন্ত্রের অমোঘ বিনাশ মার্কসের অভিলষিত হলেও তা 'এ-যাবৎ অনাগত।'

যে বিষম সমাজব্যবস্থায় মানুষ যন্ত্রের অংশবিশেষে পরিণত হয়, তার অবসান ঘটিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন নিয়েই সমাজতন্ত্রের যাত্রা সুরু। মার্কসও এ স্বপ্নই দেখেছিলেন। অন্যভাবে বললে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, খণ্ড মানুষকে মহত্তর মানবিক সংস্কৃতিতে বিধৃত করাই হল সমাজতন্ত্রের নৈতিক প্রেরণা। কিন্তু বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতি-সাধকদের অবদান সম্বন্ধে প্রাগুক্ত তত্ত্বের সিদ্ধান্ত কি? সংস্কৃতি সাধকদের মূল্যায়ণ সম্বন্ধেই বা এর বক্তব্য কি? যুগার্জিত সংস্কৃতিকে জনসাধারনের লভ্য করে তোলাই কাম্য হলে সংস্কৃতিচর্চার অবাধ অধিকার থাকবে না কেন? সুধীন্দ্রনাথও সর্বদা জানতে চেয়েছেন যে 'সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতিও তেমনই অনিবার্য কিনা;' এবং সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আমার আশঙ্কা যে নিছক স্বার্থবুদ্ধির দৈববাণী

নয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ লাইসেঙ্কো, ফাদাইয়েভ প্রভৃতির অস্থায়ী প্রতিপত্তি, এবং আমার আস্থা যবেই ম'রে থাক, বুদাপেস্তের সদর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তার ভূত আবার আন্দাজ করেছে যে দু-এক ক্রোর রুশবাসীর অকালমৃত্যু আর সে-দেশের সাধারণ সমৃদ্ধিবৃদ্ধি তৎকালিক বটে, তবু যে হেতু কার্য কারণের ধার ধারে না, তাই খ্রুশ্চেভের রাষ্ট্র ভূতপূর্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যের মতোই পদানতের শোষণে পরিপুষ্ট।' অবশ্যই শোষণমুক্তির শপথ নিয়ে যে মতাদর্শের যাত্রা সুরু, নবতর শোষণে আত্মসমর্পণ তার কাম্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মার্কসের সঙ্গে পত্রালাপে এঙ্গেলস্ এই স্বীকৃতিও জানিয়েছেন যে বাস্তবজীবনে উৎপাদন ও প্রত্যুৎপাদন শেষ পর্যন্ত নির্ধারকের ভূমিকা নিলেও বিভিন্ন সমান্তরাল শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই ঐতিহাসিক ঘটনার উৎপত্তি এবং এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মভিত্তিক তত্ত্ব-নিচয়ের ন্যায় উপরাবয়বের উপাদানগুলিও এই সৃজন প্রক্রিয়ায় অস্পৃশ্য নয়। অবশ্য তরুণতর লেখকদের অর্থনীতি-কৈবল্যের প্রতি অত্যধিক আস্থাপোষণের দায়িত্ব যে তাঁর ও মার্কসেরই তাও তিনি মেনে নিয়েছেন। এ বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

প্রকৃতপ্রস্তাবে, মার্কস কেন, যত দার্শনিক অনেকান্ত জগৎকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের সকলে অসংখ্য গেরো পাড়িয়েছেন বটে, কিন্তু কেউ সারা সংসারকে বাগ মানাতে পারেননি ; এবং সেই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানের বিতরণ যাদের ব্যবসায় নয়, অন্তত তারা নানা মুনির নানা মত মনে রেখে পরিণামী সত্যের অভিমুখে আস্তে আস্তে এগোয়। এদিক থেকে দেখলে মার্কসবাদ আদ্যন্ত নিরর্থক বা অসার্থক নয় ; এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ব্যাপক প্রয়োগের পরীক্ষা না পেরিয়ে থাক, তার সাহায্যে গত একশ, দেড়শ বছরের বহু ব্যাপারকে সরল লাগে। অবশ্য গোড়ায় গলদ শেষ রক্ষার পরিপন্থী ; এবং যুক্তিই যদিচ অনুরূপ অপচেষ্টার আদর্শ প্রতিকার, তবু জ্যামিতির মূলানুসন্ধান করে একদল ভাবুক উপরন্তু ভজাতে চেয়েছেন যে শুধু স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের সংক্ষেপ তথা অন্তঃসঙ্গতি যথেষ্ট নয়, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীতে খাটাতে খাটাতেই প্রতীত্য—সমুৎপাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে।' তত্ত্বের পরিকল্পনায় সংযোগের পরিবর্তে বিয়োগের প্রাধান্য সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মার্কসীয় তত্ত্বের 'গোড়ায় গলদ।' হয়ত ঐতিহাসিক কারণেই তাত্ত্বিক পরিকল্পনায় ধনবাদের অবলুপ্তির বিয়োগান্ত দিকটি সম-সমাজের গঠনমূলক দিকের চাইতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল।

কিন্তু আজও এই নেতি ও ইতির তুলাসাম্যহীনতার ফলভোগ থেকে সম-সমাজের তত্ত্ব রেহাই পায়নি।

মার্ক্সীয় ইতিহাস-বীক্ষণে দ্বন্দ্ব ইতিহাসের প্রাণপুরুষ। পরিণামী সত্যে আস্থাবান মার্ক্সের কল্পনায় গতানুগতিক দ্বন্দ্বের অবসান রাষ্ট্রহীন ও শ্রেণীহীন মানবিক সমাজে। অবশ্য শ্রেণী সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষ যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুধীন্দ্রনাথের মতে এই 'প্রাণপাত দ্বৈরথে উভয় পক্ষের বিলুপ্তি অমোঘ ব'লেই, তার প্রত্যেক পর্যায়ে অনাহূত স্বৈরীদের অন্তর্বিগ্র' অনিবার্য। আজকের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনকামী অগ্রদূতদেরও ক্ষমতা বিস্তৃতির দিকে দৃষ্টিকটু আগ্রহ দেখে নিরাসক্ত বুদ্ধি মানতে বাধ্য যে 'দুর্মর শ্রেণী স্বার্থের মতো স্বয়ংবশ চিত্ত-বৃত্তিও জড়বাদে বদ্ধমূল।

মার্ক্স 'শুভবাদী ভাবিকথক।' শুভবাদী প্রবণতা ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা—এই দুইএর সংমিশ্রণজাত আত্মপ্রত্যয়ের ফলে 'সদসদের নিরন্তর দ্বৈত মার্ক্সের তত্ত্বে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। যে কোন স্তরেই মানুষের ইতিহাস মানুষের কর্মপ্রবাহেরই ইতিহাস। তাই যে কোন পর্যায়েই ইতিহাস অবিমিশ্র মঙ্গলের আবির্ভাবে ধন্য নয়, বরং মানুষের 'ধর্মে, কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর'। ফলে তাত্ত্বিক অনীহা এমনকি সাম্যভিত্তিক সমাজেও সর্বশক্তিমান একনায়কের আবির্ভাব রোধ করতে পারেনি। অবশ্য আশাহত সুধীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি। সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা সত্ত্বেও প্রাগুক্ত দায়িত্ববোধ এবং কোন বিশেষ রাষ্ট্রশক্তির স্তুতিভাষণে সমার্থ টেনে আনা যুক্তিবাদী সুধীন্দ্রনাথের বিদগ্ধ মননে অসহ্য ঠেকেছে। তাঁর ভাষায়—"...কলাকৈবল্য পশ্চিমেও এত অল্পদিন বেঁচেছিল যে অনেকের মতে ওই কমঠবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের অন্বয়ব্যতিরেক ; এবং হিন্দুর বিশ্ববীক্ষা থেকে অদ্বিতীয়ের আত্মরক্ষা যেহেতু আবহমান কাল দুষ্কর, তাই ভারতবর্ষের কান্তিবিদ্যা হয়তো এখনও ব্রহ্মাস্বাদের অন্যতম মার্গ। তৎসত্ত্বেও রসসৃষ্টির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, বরং বিপজ্জনক ; এবং আরও অনিষ্টকর ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীভুক্ত ক্লৈব্যের জন্য রাজশক্তির বিদূষণ।" আর সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপের অবাধ অধিকার দাবিই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রশক্তি বারবার পেশ করছে ফাসিস্ত্ রাষ্ট্রের মতোই।

দুই

'নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক' পিতৃদেবের অভিমত মেনে না নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ 'অদ্বিতীয়ের অনির্বচনীয় আতিশয্যে'র বিকল্পরূপে অনেকাংশ জড়বাদের আশ্রয়

নিয়েছিলেন। মানসপ্রক্রিয়ায় অলৌকিকের উদ্ভাদের অস্তিবাদী সিদ্ধান্তে তিনি বরাবরই অসম্মতি জানিয়ে এসেছেন। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নির্ধারিত হয় বেদপ্রমাণের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির নিরিখে এবং এমনকি আস্তিক ভারতীয় দর্শনও সৃষ্টিপ্রসঙ্গে লোকাতীত সত্তা ও জড়ের অগ্রাধিকার নিয়ে উগ্র মতান্তরের অবাঞ্ছিত উপদ্রব-সম্পৃক্ত নয়। সবকিছুই এখানে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বিধৃত এবং বেদান্তও প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা ও সৃষ্টির অদ্বৈত ঘোষণায় তৎপর। কিন্তু ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যানে এই তুলাসাম্য রক্ষিত হয়নি এবং কালক্রমে দর্শনজাত ব্রহ্ম ও লৌকিক ঈশ্বর সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ব্রহ্মকৈবল্যের অন্তরালে সর্ববিধ জাগতিক ব্যাপারে ঔদাসীন্য ভর করায় জাতীয় জীবন নানাবিধ অসামঞ্জস্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এই বিড়ম্বনাময় ঐতিহ্য থেকে মধ্যবিত্ত মানসিকতা আজও নিষ্কৃতি পায়নি। সুধীন্দ্রনাথ এই উদ্যমহীনতাকে লক্ষ্য করে লিখেছেন—"...বাংলা ভুলে গেছে, অথচ ইংরাজী শেখেনি—এমন ইঙ্গ-বঙ্গ জীব এখনকার আবহে অভাবনীয় হলেও, ইদানীং সেই শ্রেণীর মানুষই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, যাদের কাছে প্রাচ্যবিদ্যা কিংবদন্তি আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবিকাসংগ্রহের অবান্তর উৎপাত। সুতরাং স্বাস্থ্যতত্ত্বের কলেজী বক্তৃতায় জীবাণুর বিভীষিকা দেখিয়ে, বাড়িতে চরণামৃত খেতে আমরা আজও অভ্যস্ত; এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অধিষ্ঠানের মনান্তর যখন আর ঢাকা যায় না, তখন ভারতীয় দর্শনবিশারদেরা আধ্যাত্মিক আর্যাবর্তের তুলনায় জড়বাদী পশ্চিমের অপকর্ষ ভজান ব্র্যাডলী-প্রমুখ বৈনাশিকদের দোহাই মেনে। অর্থাৎ হিন্দুর বিবেক মন্ময়; এবং জীবন্মুক্তেরা অন্তর্যামীর নিকটে সদাচারের যত প্রেরণাই পাননা কেন, লোকাচারের উন্নয়নে তাঁরা স্বভাবত নিরুদ্যোগ। ফলত এখানে মধ্যপন্থার স্থান নেই; এবং যাঁরা এই অহং সর্বস্ব দেশের পরিচালক, তাঁদের কপালে অকথ্য দুরুক্তি আছেই, এমন কি অপঘাতও অসম্ভব নয়। অন্ততঃ গান্ধিহত্যা হিন্দুধর্মে বাধেনি; এবং সে-ঘটনার আগেও রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব যে-পরিমাণ অবারিত, জাতিসংগঠন ততোধিক ব্যাহত।"

মানুষের বাস্তব অবস্থার উন্নয়নে লোকাতীত সত্তার ভূমিকা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকায় সুধীন্দ্রনাথ হয়ত রুশবিপ্লবের কারয়িত্রী ক্ষমতায় অত্যধিক প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মোহভঙ্গের পরেও সুধীন্দ্রনাথের আধুনিক মনন যুক্তিনিষ্ঠ জড়বাদ বর্জন করেনি। অবশ্য বহুবিষয়ের মতোই মনস্বীরা কালের সর্বসম্মত সংজ্ঞানির্ধারণে সক্ষম হননি এবং আধুনিকতা নিয়ে মতান্তরের

বিস্তৃতি নেহাৎ উপেক্ষনীয় নয়। যদি গোঁড়ামিমুক্ত মন আধুনিকতার অন্যতম শর্ত হয় তবে 'প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে' পীড়িত কবি-প্রবন্ধকার সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আধুনিক। 'কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষের মূল্য' তাঁর নিকট ক্রমশঃই বেড়েছে। ফলে তাঁর বহু কবিতাই দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছে—

'মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে—
আমার আমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিত বসন উরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার ;
নব দূর্বার চিকন পুলক ও-বর দেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে॥
মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে ;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু ;
সন্নিধি তব সৃজন-আকৃতি পরানে ভনে।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে॥'

(অর্কেস্ট্রা)

কিন্তু সুধীন্দ্রকাব্যে প্রায়শঃই নাস্তিবোধ দেহাত্মবাদের তীব্র আবেগের সমসাথী—

'তবু মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয়।
জানি তুমি মরীচিকা, তোমাসনে প্রাণবিনিময়
কোনও দিন হবে না আমার।
আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে ;
আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
একদিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম॥'　　(নাম)

এই নাস্তিবোধ আধুনিক মননের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের জড়-প্রবাহে মানুষের বিকল্পরূপে অপর কোন সমবোধশক্তি সম্পন্ন সত্তার অনুপস্থিতির যন্ত্রণা আজকের ভাবনায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বাসীর ঐশীস্তুতিতেও আজ সে পরাঙ্‌মুখ। সর্বগ্রাসী শূন্যতায় ভাবনার রাজ্য টলমল! 'বিরূপ

বিশ্বে' মানুষের নিয়ত একাকীত্বের দুঃসহ বেদনায় সুধীন্দ্রনাথও নানা প্রশ্নের আবর্তে পড়েছেন—

> 'হেথা যারা পরাজিত, বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?
> তোমার স্মারকস্তম্ভে অমর অক্ষরে
> লেখা রবে তাহাদের নাম ?
> নাম ——শুধু নাম
> কোন্ ফল সে-অমৃতে ?
> পারিবে কি তাহা ফিরে দিতে
> পৃথিবীর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া, সিদ্ধি ও সাধনা ?
>
> (প্রশ্ন)

বলা বাহুল্য, সুধীন্দ্রনাথ এ-সব প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই পেয়েছেন। এই নাস্তি প্রাবল্যই কালক্রমে 'উদগ্র জড়বাদী' সুধীন্দ্রনাথকে ক্ষণবাদী বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কালের বিচারে বৌদ্ধ-দর্শন প্রাচীন হলেও এই আকর্ষণে আধুনিকতার বিচ্যুতি ঘটেনি, কারণ সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক হলেও নিরবলম্ব নন।

'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মহাকবিরা নাকি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর পোষ্য পুত্র ; এবং তাঁদের পাশে আমি শুধু উদ্বাহু বামন নই, এমন কি তাঁরা যদি রসস্রষ্টা হন, তবে রসজ্ঞ উপাধিও আমাকে সাজেনা। অন্তত পক্ষে আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট ; এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে-দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ, তখন না মেনে উপায় নেই যে আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী। কিন্তু অচির আর অনীহ একই বিশেষণের প্রকারভেদ নয় ; এবং বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক ব'লেই, আমি যেমন কর্মে আস্থাবান, তেমনই আমার বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ—সংসারের মূলাধার।' পুরাতন মূল্যবোধের অবলুপ্তি অথচ নতুন মূল্যবোধের অনুপস্থিতির হাহাকার সাম্প্রতিক কালের মানুষ সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধকেও স্পর্শ করেছে। লোকাতীত ঈশ্বরে আধুনিক মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে না। মানুষের সভ্যতা বার বার সংকটের আবর্তে পড়ছে। ধ্বংস থেকে সৃষ্টির পুনরভ্যুত্থান মানবিক প্রয়াসেই সংঘটিত হচ্ছে, যদিও সব সৃষ্টিই প্রাক্তনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুনরবলুপ্তির দিকেই ধাবমান্! অমঙ্গলের আধিক্য দেখেও মানুষের স্বকীয় প্রয়াসে আস্থাস্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর কোথায় ?

জীব ও জড়ের বৈনাশিক পরিণতি মনে রেখেও 'অন্তরাগেই উজ্জীবনের প্রেরণা' খুঁজে পেতে হবে।

অবশ্য বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যা নিয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতানৈক্যের সীমা নেই। অস্তিবাদী ব্যাখ্যাতারা বৌদ্ধ সাধনমার্গের শঙ্খশুভ্র ব্রহ্মচর্য, নির্বাণ ও পরাশান্তির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের পিতাও বৌদ্ধদর্শনকে ক্রমাগত নাস্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থক অস্তিতে উত্তরণে বিশ্বাসী বলে মনে করেছেন, আধুনিক পুত্র অবশ্য এই অস্তিবাদী এবং পরাশান্তি-মূলক সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করেননি। জগৎ-ব্যাখ্যানে 'সর্বং ক্ষণিকং', 'সর্বং শূন্যং' প্রভৃতি নেতিবাচক বৌদ্ধ ধারণাগুলিই সুধীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

সুধীন্দ্রনাথের কোন প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা নেই, কিন্তু 'দশমী' গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ক্ষণবাদী উত্তরণের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট—

> 'আমি ক্ষণবাদী ; অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
> নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা
> তাতে যার জের, সে সংসারও।'
>
> (উত্থাপন)

ভারতীয় যুক্তিশাস্ত্রের আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকেরা কারণে সামগ্রিক বিনাশে কার্যের উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। বৌদ্ধদর্শন অনুসারে চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব নেই। জগতের সব কিছুই ক্ষণিক। অনাত্মবাদী বৌদ্ধ দর্শন তাই আরম্ভবাদকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোন ঘটনাই আবার প্রবাহবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় কারণের ও কার্যের বিনাশের এবং উদ্ভবের ধারা নিরন্তর বইছে। কার্য-কারণতত্ত্বের নিরবিচ্ছিন্ন আরম্ভবাদী যুক্তি সুধীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছেন—

> 'অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর
> অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার
> অনাদি আমাকে আনে আমাদের গোচরে ;
> পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,
> সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,
> মমতার জোট পাকায় এ চরে, ও চরে॥

অভাব হয়ত স্বভাবেরই অগ্রজ ;
নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—
প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে ;
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,
পৃথিবী অনাথ ; যথেচ্ছ পরমাণু ;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে ॥

(প্রতীক্ষা)

নৈরাশ্য থেকে মুক্তির আর্তি সুধীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধে ও কবিতায় প্রতিফলিত, কিন্তু 'সনাতন অমৃত' তাঁকে আশ্বস্ত করেনি। মার্কসীয় দ্বন্দ্বেও তিনি মানুষের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে পাননি। তাই জড়বাদী সুধীন্দ্রনাথ ভারতীয় উৎসসম্ভূত নিরীশ্বর বৌদ্ধদর্শনে ভাবনা-সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য দর্শনকে তাঁর পক্ষে 'অনধিকার চর্চা' বলে মেনেছেন, কিন্তু তাঁর বহু প্রবন্ধে ও কবিতায় দর্শনের অনায়াস গমনাগমন পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না।

প্রবাল দাশগুপ্ত

সুধীন্দ্র-প্রতিন্যাস কতটা সার্ত্রীয়

উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে পারীর ক্ল্যাব ম্যাতনাঁতে প্রদত্ত 'অস্তিতাপন্থা মানববাদী'-শীর্ষক ভাষণে ঝাঁ পোল সার্ত্র কয়েকটি বড় দামী কথা বলেছিলেন :

এবং বিবিক্তি—কথাটা হাইডেগারের খুব প্রিয়—বলতে আমরা এ-ই বুঝি যে ভগবান নেই, এবং তাঁর না থাকার দুর্ভোগ পুরোটাই পোয়াতে হবে। যতটা কম খরচে সম্ভব ঈশ্বরকে ছাঁটাই ক'রে দেবার ধান্দায় যে-সব লোকায়ত নীতিকেরা ঘোরেন, অস্তিতাপন্থী তাঁদের দু চক্ষে দেখতে পারে না। আঠার শ আশী নাগাদ একটা লোকায়ত নীতিশাস্ত্র চালাবার উদ্‌যোগ ক'রে ফরাসী অধ্যাপকবর্গ এই গোছের একটা কথা রটিয়েছিলেন :— ভগবান ধারণাটা অকারী অপচয়ী উপকল্প মাত্র, ঈশ্বর ছাড়াই চালাব। অবশ্য নীতি, সমাজ, আর আইন-মানা জগৎ রাখতে হলে, গুটিকতক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতেই হয় ; ওদের উপর আ প্রিওরি অস্তিতা আরোপ করা দরকার। সৎ হওয়া, মিথ্যে কথা না বলা, বউকে না পেটানো, বাচ্চাদের মানুষ করা ইত্যাদি আ প্রিওরি কর্তব্য ব'লে মানতে হবে ; তাই আমরা বিষয়টি নিয়ে একটু গবেষণা ক'রে দেখাব এ-মূল্যবোধগুলো এখনও সবই আছে, বোধ্য কোনও স্বর্গগাত্রে খোদাই করা, যদিও ভগবান অবশ্য নেই। অর্থাৎ—এবং ফরাসীদেশে যাকে আমরা রাদিকালিস্ম বলি তার সার কথাটা মনে হয় এই—ঈশ্বর না থাকলে কিচ্ছু বদলাবে না ; আমরা সততা, প্রগতি ও মনুষ্যতার একই প্রতিমান খুঁজে পাব ফের, আর বিগামী জমানার উপকল্প হিসেবে বর্জিত ভগবান ধারণাটা চুপচাপ যাবে মিইয়ে। পক্ষান্তরে অস্তিতাপন্থীর বরঞ্চ মনে হয় ঈশ্বর নেই এ-ব্যাপারটা খুবই মুশকিলের, কারণ ওঁর সঙ্গে গেল কোনও বোধ্য স্বর্গে মূল্যমান খুঁজে পাওয়ার সকল সম্ভাবনা। আর রইল না তাহলে কোনও আ প্রিওরি শুভ, কেননা সেটা ধারণা করার জন্য পরমপ্রকৃষ্ট অসীম কোনও চেতনা নেই। লেখা থাকল না কোথাও যে 'শুভ' আছে, সৎ হওয়া যে চাই বা মিথ্যে যে বলা চলবে না, কেননা আমরা এখন এসে পড়েছি সেই পর্যায়ে যেখানে লোকই আছে শুধু। দস্তয়েভ্‌স্কি একদা লিখেছিলেন 'ভগবান যদি না থাকতেন তাহলে সবই করা চলত' ; আর এখানেই অস্তিতাপন্থার শুরু।

ভগবান যদি নেই তাহলে সবই চলে করা, মানুষ তাই সঙ্গবিরহিত, নিজের ভিতরে কিংবা বাইরে কোথাও সে যে নির্ভর করার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। সে তখনই আবিষ্কার করে, কোনো অজুহাত নেই তার। কারণ সত্যিই অস্তিতা যদি স্বরূপের প্রাগ্‌বর্তী তবে উপাত্ত কোনো সুনির্দিষ্ট মনুষ্যস্বভাবের দোহাই দিয়ে নিজের কাজের জবাবদিহি কখনোই দেওয়া যাবে না; বাচনান্তরে, নিয়তি নেই—মানুষ মুক্ত, মানুষই হ'ল মুক্তি। ওদিকে, ভগবানের অবর্তমানে, আমাদের আচরণকে বৈধ ব'লে দেখানোর মতো কোনও প্রতিমান বা প্রত্যাদেশও জুটবে না। মানে, কৈফিয়ত বা অছিলার কোনো সম্বল আমাদের পিছনেও নেই, নেই পুরোভাগেও, মূল্যবানের কোনও জ্যোতির্লোকে। আমরা পরিত্যক্ত একা, ব্যপদেশবিহীন। এ-ই বোঝায় যখন বলি মানুষ মুক্ত হতে বাধ্য। বাধ্য: সে ত নিজেকে বানায় নি, তা সত্ত্বেও মুক্ত, এ-জগতে এসে পড়ার মুহূর্ত থেকে যা-কিছু করে তার জন্য সে দায়ী।' (১)

স্বর্গীয় পিতা উইল না ক'রেই সন্তানদের অনাথ রেখে মারা গেলেন। নীচে-র সময় থেকে এ-দুঃখ অনেকেই পেয়ে আসছেন। তবে প্রতীচ্য দুনিয়ার সর্ব ঘটে এই কষ্টের পরিব্যাপনা অনেকটা সাম্প্রতিক ব্যাপার, বিশ শতকের ঘটনা। বিবিক্তির যন্ত্রণা, সঞ্চারী অভিজ্ঞতা ও সম্পৃক্ত অনুভূতি মিলে যাঁদের মনে বিশেষ এক নঙাত্মক প্রতিন্যাস গ'ড়ে ওঠে নি, তাঁদের পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের রচনা ঠিক ভাবে পড়াই বোধহয় শক্ত। কারণ সার্ত-বর্ণিত ঈশ্বর-বিরহ যদি কোন বাঙালীর বিশ্ববীক্ষায় অঙ্গীকৃত হয়ে থাকে তবে তিনি সুধীন্দ্রনাথ। বিশ্ববীক্ষা-গঠনে তাঁর দার্শনিক উত্তমর্ণদের মধ্যে সার্ত প্রধান, এমনকি উপস্থিত, এ-ইঙ্গিত করছি না, শুধু বলতে চাইছি আমার প্রিয় এই দু জন লেখকের রচনায় সন্ধান পেয়েছি, অনেকটা সমধর্মী মেজাজের যদি-বা আবহের বড় বেশী প্রকট-মূর্ত প্রভাব এসে পড়ে থাকে স ং ব র্ত-ভুক্ত উ জ্জী ব ন প্রভৃতি কবিতায়, ক্র ন্দ সী-র ন র ক-এ আলোচ্য বোধের পরাকাষ্ঠা নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট। এ-ধরনের রচনা ছিঁড়তে গেলে বাজে, কিন্তু নাম মাত্রের উল্লেখ আর সামগ্রিক উদ্ধৃতির মাঝামাঝি একটা রফা করতেই হয়:

> বমনবিধুর
> আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
> মৌন নিরালোকে
> ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।

[···]
অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ॥
ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত আমার পটভূমি ;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন-কি বিভীষিকা তুমি ॥

যে-নঙ্‌ময় আবহ সার্ত্রীয় সাহিত্যে মেলে তার সঙ্গে সুধীন্দ্রীয় রাগিণীর তফাত সহজেই অনুভূত। এ-পার্থক্য কথায় বোঝানো শক্ত, তবু চেষ্টা দেখি ; ভগবান যে রিক্ত নাম কেবলই এটা উভয়ের দৃষ্টিতেই অবাঞ্ছনীয় ; কিন্তু সার্ত্র যেকালে অনুষঙ্গ মস্তকে শিরোধার্য ক'রে নিয়েছেন যে ব্যাপারটা গোলমেলে হ'লেও এ নিয়েই বাঁচতে হবে, 'আকারী আবেগ' স্বরূপ ঈশ্বরত্বপিপাসী মানুষের নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত না রাখলেই নয়, একটা কোনও নিরর্থক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বীয় জগৎকে তাৎপর্যমণ্ডিত ক'রে তোলা চাইই,—

মহাকালের যে ভয়ানক বোঝার চাপে কাঁধ ভেঙে তোমায় দিচ্ছে নুইয়ে সেটা টের না পাবার জন্য তোমার অবিরাম নেশায় বুঁদ হওয়া চাইই।

কিন্তু কীসের নেশায়? মদের, কাব্যের বা সাধুতার, তোমার যা খুশী। কিন্তু মাতাল হও। (২)

সেক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ কিছুতেই অনিকেতের জীবন ঠিক মেনে নিতে পারেন নি, বিপ্রলব্ধ তরুণের স্তিমনহীন আর্তি পুষে রেখেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত ঘটতে দেন নি অ র্কে স্ট্রা-র ঘোষণা থেকে কোনও অপেরণ :

যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী ॥

এমনকি যে-কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের কেন্দ্রীয় অনুভবের বহিঃপ্রকাশ বুঝি সবচেয়ে নিরঞ্জন, সেই প্র তী ক্ষা য়-ও তাঁর মৌল যন্ত্রণাকে তিনি সার্ত্রের

মতো কৌতুকের সাহায্যে সহনীয় করার প্রয়াস আদৌ পান নি, শুধু স্বল্পাভরণ দার্শনিক পরিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন :

মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত,
বিবিক্তি আজ বেষ্টনীবিবহিত ;
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী ;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই ॥

অন্যভাবে বলতে গেলে, 'ঈশ্বর নেই এ-ব্যাপারটা খুবই মুশকিলের' এরকম হালকা প্রকাশভঙ্গী সুধীন্দ্রনাথের ধাতে সয় না ; তিনি হয় পূর্ণ তীব্রতায় তাঁর দশার সম্মুখীন :

অপমৃত ভগবান ; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গ

নয় গাইবেন একেবারে উলটো সুর :

দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি তত বুঝছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল।

নয়ত মানবদশার মৌল যন্ত্রণাকে স্রেফ এড়িয়ে যাবেন :

নিমেষ পরে
আমার মনেও অধৈর্য ফের আসবে ফিরে, জানি,
আরোগ্যহীন রোগের বিষে ছটফটিয়ে উঠবে আবার দেহ,
এই নিরালা স্বপ্নমগন ঘর
লাগবে অন্ধকূপের সমান, ঘরকরনার খুঁটিনাটি
বসবে চেপে বুকের উপর, মনে হবে শ্বাসচলাচল দায়।
মৃত্যুকে ফের অচল ভেবে, জানি,
দেব আবার তাড়া, তাগিদ, ত্রাহি-স্বরে করব ডাকডাকি ॥

কিন্তু তবু এই গোধূলিবেলায়,
বহুরূপী রঙের খেলা চোখের আগায় চলছে যত ক্ষণ,
সাঁচ্চা কেবল হালকা হাওয়া বক্ষে পুঁজি করা ;
নেহাৎ মেকী দুর্ভাবনাগুলো।

তবে শেষোক্ত মূল্যায়ন নিয়ে আমি কিছুটা সন্দিহান। কথাগুলোর অভিধার্থ গ্রহণীয় হবার সম্ভাবনাই বেশী বলে আমার এখন মনে হচ্ছে, কিন্তু

এই মনে হওয়াটা আত্মসচেতন, কাজেই অনিঃসংশয়: কবিতাটির অন্তিম স্তবকের ঠিক কী তাৎপর্য সেটা না বোঝা পর্যন্ত সংশয় ঘুচবে না—

সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা ॥

'পশুর মতো' শব্দবন্ধটির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা যদি দেওয়া যায় কেবল এ-কথা ধ'রে নিলেই যে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে শ্লেষ অর্থাৎ লেখক জেনে-শুনে উলটো কথা বলছেন, তাহলে 'হালকা হাওয়া বক্ষে পুঁজি করা'-য় যে 'হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো'-র শ্লিষ্ট প্রতিধ্বনি অন্বেষ্য (৩), এ-সিদ্ধান্ত এড়ানো দুষ্কর, অর্থাৎ রৈবিক বো ঝা প ড়া-র মেজাজ বি রা ম-এর মধ্যে দেখতে পেয়ে সেই একই অধ্যাসে পড়েছি যা আবদুল মান্নান সৈয়দের বীক্ষায় প্রার্থনা-র অংশ বিশেষ শাশ্বতীর সমগোত্রীয়। পক্ষান্তরে প্রা র্থ না র চতুর্থ স্তবকে অভিধার্থই আসল এটা যেরকম স্পষ্টতই অচিন্তনীয়, বিরাম-এ শ্লেষের ব্যবহার কতখানি ব্যাপক সে-কথা বোঝা ততটা সহজ নয়, অন্তত আমার পক্ষে। লক্ষণীয়, নানা মাত্রার এ-শ্লেষের লক্ষ্য কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের স্থায়ী নেতিবাদ নয়, প্রেম শিল্প সমাজ সম্বন্ধে সেই সকল ছোট বড় আশা যা তাঁর কবিতার রসের উপাদান:

নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে
বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাতি
যৌবরাজ্য;

হ্যাঁ, যৌবরাজ্য। কিন্তু এই শ্লেষ বড় ধারাল। যে-প্রক্রিয়ার সাহায্যে লে মো প্রভৃতি সাহিত্যকর্মে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেয়ে উৎপন্ন হয়েছে সুসহ লঘু রস, এখনও তার হদিশ পাই নি সুধীন্দ্রনাথের কোনও রচনায়। তার মানে হয়ত সার্ত্রের তুলনায় এঁর অনুভূতি ঐকান্তিকতর, মেকী ভাবনার পোষণে বা অভিব্যক্তিতে গাল্লীয় সার্ত্র অপেক্ষাকৃত অকুণ্ঠ? বিপ্রতীপ ব্যাখ্যাও সম্ভব, সার্ত্রের অভিজ্ঞা প্রাতিস্বিক ব'লেই নির্ভার স্বচ্ছন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথের নেতিবাদ তাই আত্মসচেতন—হাসান আজিজুল হকের (৪) সমপন্থীরা তা-ই বলবেন। এ-ধরনের কোনো একপেশে ব্যাখ্যাতেই কিন্তু সায় দিতে পারি না, কারণ এতে হয় সার্ত নয় সুধীন্দ্রনাথের আন্তরিকতার অভাব স্বীকার্য হয়ে দাঁড়ায়, অথচ এঁদের কারুর সাহিত্যেই, বিসংবাদ স্ববিরোধের প্রতুল সত্ত্বেও, মৌলিক কৃত্রিমতা কিংবা মোহ্বেজ. ফোআ অনুভব করি নি এক বারও। তবে, (কারণের নয়) নিদানের স্তরে সার্ত্রের উপর পিতৃহীনতা ও শরীরের খুঁত এবং

সুধীন্দ্রনাথের উপর পৈত্রিক বেদান্ত ও মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শন যে-সোজা এবং তেরচা প্রভাব ফেলেছিল তার গুরুত্ব জেনেও (৫), 'তুপেশে' কোনও স্থির সিদ্ধান্তে এখনও পৌঁছই নি, শীগ্‌গির তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনাও কম।

শুধু এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা কেন, সুধীন্দ্রকাব্য-বিষয়ে কোনও নির্বিশেষ তাত্ত্বিক প্রশ্নের বিবেচনাই আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা, যে-আমি পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের অভাব আর বুদ্ধি ও কল্পনার জড়তা-বশত সুধীন্দ্রনাথের অনেক রচনার, আরও অনেক রচনাংশের সাথে অপরিচয়ের ব্যবধান আজও কাটাতে পারি নি, যেটুকু পেরেছি তা-ও বেশ খানিকটা স্বশ্রমে নয়, বুদ্ধদেব বসু, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও শামসুর রাহমানের সাধনা ধার ক'রে (৬)। তবে অংশত পরের মুখের মধ্যস্থতায় চাখলেও সুধীন্দ্র-রসের আস্বাদ আমি নিয়েছি, নিয়ে ভাল লেগেছে, ঝালটা কী'রকম তা-ও যে একেবারে বুঝি নি তা নয়। এ-প্রেক্ষিতে, সুধীন্দ্রকাব্য-উপভোগ আমার সুধীন্দ্রপ্রতিন্যাস-উপলব্ধির চেয়ে অনেক বেশী মূর্ত অনুভূতি হলেও আমি যে এক্তিয়ার-বহির্ভূত জমি চষলাম (যার ফলে ক্ষেত্রটির দশা হয়ত এখন হনুমান-বাদিত চঞ্চরীক-বীণার অনুরূপ), তার জন্য শুধু আমার প্রদিদৃক্ষাকে দায়ী করা অন্যায়ঃ মুখ্য কারণ হ'ল, পাঠকের বোধ তথা অনুকম্পার উদ্রেকে সক্ষম রীতিতে নিজের ভাল লাগার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন আমার সাধ্যের অতীত ; উপরন্তু সেরকম বর্ণনা যোগ্যতর একাধিক কলম থেকে অনেক আগেই বেরিয়েছে ব'লে কাজটা অপ্রয়োজনীয়ও। অন্যদিকে সার্ত্রে'র আত্মজীবনী, গুটি কয় নাটক ; এবং বি ব মি ষা আর স ত্তা ও না স্তি-র যতটা পড়েছি, আমায় অপূর্ব আনন্দ দিয়েছে সে-অনুভূতি সুধীন্দ্রকাব্য-উপভোগের সমগোত্রীয় ; কেন ও কীভাবে, তা নিয়ে কিছু ধারণাও জন্মেছে। সে-ধারণা যতই অস্পষ্ট হ'ক না কেন, সেটি উপস্থাপনের মাধ্যম যে-বিমূর্ত, তুরীয় স্তরের পরাভাষা তার উপযোগী ঋজুতা ও বৈশদ্য আমার যতই অনধিগত হ'ক না কেন, তবু এ-উপস্থাপনা নয় একেবারে অকারী ; মাধ্যমিক বৌদ্ধ ক্ষণবাদ আর হেগেলোত্তর ডায়ালেক্টিকের ছায়া দেখেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ 'সুধীনের রচনাতে' কিন্তু সার্ত আর সুধীন্দ্রনাথের কোনও প্রতিতুলনা আমার অদ্যাবধি' চোখে পড়ে নি : অথচ বিষয়টা আলোচনায়, সূত্রপাত হ'ওয়া একান্তই দরকার, অযোগ্য হাতে হ'লেই বা ক্ষতি কী।

অবশ্য নানারকম অযোগ্যতার ফলও বিভিন্নপ্রকার। ভাবনার অনবধান বা বৈকল্য কখনোই শেষ রক্ষায় বাদ সাধে না ; ভুল শোধরানোর জন্য যে

প্রতিপক্ষ রয়েছেন, এটাই ত বিমর্শের সবচেয়ে বড় সদ্‌গুণ ; কিন্তু যে-অযোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ অভিব্যক্তির অসংলগ্নতায়, তার প্রতিকার কেবল অপরাধী লেখকের পক্ষেই সম্ভবপর। দেখা যাক, তারও সাধ্যে কুলোবে কিনা :

আমার পঠিত সুধীন্দ্র-কাব্য ও সার্ত-সাহিত্য উভয়েতেই মেলে নভাত্মক মেজাজ, দুজন লেখকই ঈশ্বরের অভাব বোধ করেন ; আবার 'অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা', 'মানুষ অকারী আবেগ' জেনেও এমন একটা স্ববিরোধী প্রত্যয় দুজনেই পোষণ করেন যে 'স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার', সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিবিধ প্রকল্পে নিজেকে নিয়োজিত রেখে জগতের জন্য মূল্যবোধ এবং অস্তিতার জন্য ব্যপদেশের নিরন্তর সৃজনেই নিহিত মানবজীবনের সার্থকতা। কিন্তু সার্ত্রের প্রকাশভঙ্গী প্রায়ই একটু যেন তির্যক, ফরাসী লঘুতায় সিঞ্চিত ; সুধীন্দ্রনাথের শ্লেষ খুবই বিরল, যেখানে প্রযুক্ত হয়েছে সে-সব জায়গায় এমনই তার তীব্রতা যে মৌল আর্তির নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির ফাঁকে ক্ষণিকের রেহাইও সে দেয় না। এ-পার্থক্য কতটা গভীর বলা শক্ত। তবে সুধীন্দ্রনাথের দু-একটি পঞ্চাশোর্ধ্বে লেখা প্রবন্ধে বিসংবাদী সুর অত্যন্ত প্রকট, শোনার জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট করতে হয় না, এতই স্বীকারী কথাগুলো : পূর্বোদ্ধৃত '...সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল' (স্ব গ ত-র পু ন শ্চ) ; তাছাড়া 'রবীন্দ্রনাথ...সূর্য, উদয়াস্ত নির্বিকার : আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি ; সদ্‌গতির আগেই হয়তো তমসায় আবার তলাব।' (অ র্কে স্ট্রা-র ভূ মি কা)। বৈবিক সৃষ্টির দায়ভাগে অংশীদারী হয়ত বাঙালী কোনও মতেই কাটাতে পারে না, সে-দুর্মর স্বীচিকীর্ষার প্রভাব বুঝি অনিবারণীয়ভাবে অধঃখনিষ্ণু, নাস্তিককে ফিরিয়ে আনে ধীরে ধীরে সদাত্মক প্রত্যয়ে। পক্ষান্তরে সত্তা ও না স্তি-র উপসংহারে একাধিক সন্দেহজনক অনুচ্ছেদ থাকলেও সার্ত্রের লেখায় সোজাসুজি স্বীকারী কোনও উক্তি আজও আমার চোখে পড়ে নি। স্বীকারী মন্তব্য ক'রে ধর্মচ্যুত হওয়া, আর না-হওয়ার তফাতটাকেই মৌল প্রভেদ ধরলেই কি কোন সিদ্ধান্ত টানা যায় ? আবার রবীন্দ্রনাথ আর নাস্তিকদের মধ্যে আমি যে-সার্বিক বৈপরীত্য কল্পনা করছি মেকী হয় যদি সেটাই ? গড্ডলিকার মাঝারি নিরপেক্ষতা থেকে যে-কোনো জাতের বিশ্বাসের দূরত্বের তুলনায় যে গভীর প্রত্যয় থেকে তুঙ্গ অবিশ্বাসের দূরত্ব যৎসামান্য এ-কথাটা গতানুগতিক ; কিন্তু পুরোনো কথা মাত্রেই ত ফেলা নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূল উপস্থাপনায় যা কোনও রকমে ঠেকিয়ে

রেখেছিলাম, সারাংশ করতে গিয়ে সেই রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিকই এসে পড়ল। বাঙলা সাহিত্যের যে-কোনও আলোচনায়…কে বলে নিয়তি নেই। সার্ত্র? অনেক বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হ'লেও, উনি কি বাঙলা জানেন?

পাদটীকা

(১) Jean-Paul Sartre, **Existentialism and humanism,** Translation and Introduction by Philip Mairet. London: Methuen. 1952. 32-34. বাঙলা অনুবাদ বর্তমান লেখক।

(২) Charles Baudelaire, **Le Spleen de Paris,** 1864 **Enivrez-vous** কবিতাটির ভগ্নাংশ। বাঙলা অনুবাদ বর্তমান লেখক।

(৩) প্রলাপ-এর উপান্ত্য স্তবকের সূচনায় রবীন্দ্র পঙ্‌ক্তির অবিকল উদ্ধৃতি তুলনীয়।

(৪) হায়াৎ মামুদ-সম্পাদিত ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ (ঢাকা পাকিস্তান বুক করপোরেশন্, ১৩৭৭) সংকলনের অন্তর্ভুর্ত বিষাদ ও নৈরাজ্যের সাহিত্য প্রবন্ধে হক সাহেব দাবী করেছেন (১৮৮:) 'পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যিকরা …তাঁদের বিদগ্ধতা এবং পাণ্ডিত্যের জোরে কিংবা বলা যায় সুযোগ এবং সম্ভবত জীবনবীক্ষার অপ্রতুলতার ওপর একটা রঙিন আবরণ সৃষ্টিতে বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে আসা [বহির্বিশ্বের সর্বব্যাপী] নেতিবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।' হক সাহেবের সুধীন্দ্র-মূল্যায়নও কতকটা এই ধাঁচের হবে ব'লেই অনুমেয়।

(৫) আরও অনেক ব্যাপার অনুক্ত রয়ে গেল—সিদ্ধান্তে যখন পৌঁছব না, প্রাসঙ্গিক কারকের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে আলোচনার অযথা কলেবর-বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? শুধু জানিয়ে রাখি বন্ধনীর মধ্যে, সার্ত্র যে কবি নন গদ্যকার, মাধ্যম হিসেবে কাব্য ও বাগ্মিতার পার্থক্য যে আধেয়কেও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে, 'অস্তিত্বাপন্থা মানববাদী'-র সঙ্গে কোনো কবিতার সরাসরি তুলনা যে অসম্ভব, এ-সকল ব্যাপার আমার নজর এড়ায় নি।

(৬) সুধীন্দ্র-কাব্য সংগ্রহের ভূমিকা ও কালের পুতুল-এর অন্তর্ভুর্ত আলোচনা-তিনটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ, এদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার শামিল। কিন্তু ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ ভুক্ত আবদুল মান্নান সৈয়দের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কালো সূর্যের নিচে বহ্নুৎসব' এবং শামসুর রাহমানের নাতিদীর্ঘ, সান্দ্র নৈঃসঙ্গবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা আলোচনা-দুটির কাছে আমি যতখানি কৃতজ্ঞ, এগুলোর অস্তিত্ব এপার বাঙলায় প্রায় ততটাই অজ্ঞাত। সুতরাং আবদুল মান্নান সৈয়দ কুড়ি বছর বয়সে এ-প্রবন্ধ লিখে থাকলেও তাঁর পাণ্ডিত্য, অনুভূতির গাঢ়তা, ও পঠন-পরিধির বিশালতা যে সমমাত্রায় প্রতীয়মান, এ-খবরটুকু নিবেদন করার জন্য আমার অধিকারসীমা-লঙ্ঘনের দরকার পড়ে না।

মধুসূদন চক্রবর্তী

রাজনৈতিক মঞ্চে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা

সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে। ১৯৪০ সাল। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতৃগোষ্ঠীর মতবাদের সঙ্গে সুভাষের বিরোধের ফলে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। ফরওয়ারড ব্লক নামে আলাদা দল গঠন করেছেন। বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস তখন সুভাষগোষ্ঠীদের দখলে। বাঙলার জনমানসে সে সময় সুভাষচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব। হাজার হাজার লোক সমবেত হতো সুভাষগোষ্ঠী কংগ্রেসের আহূত সভাগুলিতে—কি শহরে, কি গ্রামে, সর্বত্রই বিপুল সমাবেশ।

এরূপ জনসভাগুলিতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা দিতেন নবদ্বীপের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, নাট্যকার ও রাজনৈতিক কর্মী শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য। সে সময় তাঁর মতো বাঙলায় এত ভালো বক্তৃতা—বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তৃতা কম লোকেই দিতে পারতেন। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে, ভাষা বিন্যাস এবং বাগ্মিতায় তিনি ছাত্র ও যুব মনের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারতেন। নিতাই ভট্টাচার্যের কণ্ঠে তখন শুনতাম কবি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত করতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার কখনও দু'এক লাইন—কখনও পংক্তির পর পংক্তি অথচ খাপছাড়া লাগতো না। মনে আছে তাঁর কবিতার একটি পংক্তি : "তাই অসহ্য হয়েছে আত্মরতি, অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে?" এতকাল পরে অবশ্য মনে নেই কোন্ পটভূমিকায় বা কি পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওই লাইনটির উল্লেখ করতেন। শ্রীভট্টাচার্য তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নদীয়ার তারক-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারে সারা বাঙলা চষে বেড়াচ্ছেন। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে দেশাত্মবোধের আদর্শ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একের পর এক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা আবৃত্তি করতে এর আগে কোনও রাজনৈতিক বক্তাকে দেখিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতাও আবৃত্তি করতেন। দেশাত্মবোধ প্রচারে এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার

আহ্বান জানিয়ে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সেদিন ছিল নিতাইবাবুর প্রধান হাতিয়ার।

সে সময় সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণ লোকের মধ্যে তেমন প্রচার না হলেও বিদগ্ধ সমাজে, রবীন্দ্র পরবর্তী পর্যায়ের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সমাদৃত ছিল। অনেককে বলতে শুনেছি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য! কিন্তু নিতাইবাবু বলতেন, "না, তাঁর কবিতা প্রাণধর্মী, জীবন্ত।" কূপমণ্ডুকতা থেকে মনকে উদ্ধার করে সুরুচি ও স্নিগ্ধতায় তাকে ভরে তোলার প্রয়াস ছিল সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আসরে তাঁর কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনার অর্থ উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু সাহিত্য আসরের চৌকাঠ পেরিয়ে সে কবিতা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে এটা অভাবনীয়। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়েছিল। সেদিন রাজনৈতিক সভামঞ্চ থেকে তাঁর কবিতা লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। তারিফও করেছে। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি এবং আমার মতো অনেকে।

একটি বাঙলা দৈনিকের প্রতিবেদকরূপে এই সব সভায় আমাকে যেতে হতো। বক্তৃতার বিবরণও সংগ্রহ করতাম। সে সময়ের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা-গুলি ঘাটলে ওইসব সভার বিবরণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার উল্লেখ পাওয়া যেতে পারে। নিতাইবাবুর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর কবিতার এত বড় সমঝদার আমি কমই দেখেছি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। অভিভূত আমরাও হতাম যেমন প্রাণময় ছন্দ, তেমনি ভাষার মাধুর্য, বলিষ্ঠ তো বটেই।

একদিনের ঘটনার কথা মনে পড়ে। রসা রোডে দেশনেত্রী হেমপ্রভা মজুমদারের বাড়িতে আমরা ক'জন বসে আছি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা সুশীল মজুমদারের মাতা। নিতাইবাবু, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আমরা ক'জন হেমপ্রভা বৌদি সহ যাবো বেলিয়াঘাটায় একটি সভায়। সময় অপরাহ্ণ। আকাশ মেঘে ঢেকে এসেছে দেখে যাত্রা-বিলম্ব। ততক্ষণ আমরা বসন্তদার (সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুরাগী বিপ্লবী নায়ক বসন্ত মজুমদার—হেমপ্রভা মজুমদারের স্বামী) মুখে সেকালের দেশনেতাদের মজার মজার গল্প শুনছি। এমন সময় বৃষ্টি নামলো। অঝোরে বৃষ্টি। বসন্তদা কি একটা বলার জন্য ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। নিতাইদা আপন মনে গুণ গুণ করে কি যেন আওড়াচ্ছেন। দৃষ্টি

উদাস। জিজ্ঞেস করলাম, 'গান?' "না, কবিতা" বললেন নিতাইদা। সুধীনদত্তের কবিতা।"—অনুরোধে তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন :

মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসীবেলায়,
সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে।
আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অম্বরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশ মুকুরে,
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে—

*　　*　　*　　*

যেমনি কণ্ঠ, তেমনি বলার ভঙ্গী, সেই সঙ্গে কবিতার ভাষা ও ছন্দ। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, রাজনৈতিক সভা দূরে থাক। হোক না আজ এক কবিতার আসর, এমন পরিবেশ তো পাওয়া যাবে না। তারকদাও নিবিষ্টমনে শুনছিলেন কবিতা। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা প্রবীণ দেশনেতা বসন্তদাও দেখছি বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে শুনছেন। বেলিয়াঘাটার সভাটি বানচাল হওয়ার আশংকায় তারকদার মন খুস্ খুস্ করছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তিনিও স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে নিতাইবাবুর দিকে।

তারকদার মতো 'বে-রসিক' রাজনৈতিক নেতাকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কবিতা শুনতে দেখে নিতাইদার উৎসাহ আরও বেড়ে গেলো। হেমপ্রভা বৌদি আসরে এসে বসেছেন—আরও দু'তিন জন, তাঁদের কথা মনে নেই। বাইরে মেঘের গুরু গুরু আওয়াজ। নিতাইবাবু একটু চড়া গলায় শুরু করলেন :

বরষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
জনশূন্য হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটি
স্মরণের চলাচল করিলাম সহজ, সরল
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সম্মত আকাশে
এই মত আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহ-সম্ভাষণ।
অর্গলিত বাতায়নে ঝটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাখানিল ক্ষুব্ধ অক্ষমতা
নির্বিকার, নিরুত্তর, রুক্ষ বিধাতারে॥

* * * *

এল সন্ধ্যা রিক্ত বরিষণ ;
দিগন্তের মুমূর্ষু বর্তিকা
প্রাক নির্বাপণ দীপ্তি প্রজ্জলিত করিল সহসা
তারপর অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিল শবপ্রাবরণী ॥

তখন আমার বয়স অল্প, কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। অন্যান্যরা তাই। তবে শুনতে ভালো লেগেছিল। কবিতার যে মোহিনী শক্তি আছে, তা উপলব্ধি করেছি। আর একটা কথা তখন মনে হয়েছিল :

কবি আপনার মনে যত গান গাহে।
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি।—

আমরাও নানা অর্থ টেনে এনে সেই কবিতা গুচ্ছের রস সংগ্রহ করেছি। নিতাইদা তখন ভাবে বিভোর। বৃষ্টি ততক্ষণে থেমেছে, তারকদা উঠি উঠি করার উপক্রম করেও সাহস পাচ্ছেন না, নিতাই ভট্টাচার্য না গেলে সভা জমবে না। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য লোকের ভিড় হতো বেশি। নিতাই বাবুর ওঠার নাম নেই। চা এলো, এলো সেই সঙ্গে গরম গরম মুড়ি ও নারকেল কুচি। আর যায় কোথায়? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো রাত্রি। সভার উদ্যোক্তারা ফোনে জানালেন বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় বেশ কিছু লোক আসতে শুরু করেছে কিন্তু এদিকে সভা করার 'মুড' নিতাইদারও নেই—নেই অন্যদেরও, এভাবে রাজনৈতিক সভা হলো পণ্ড। সুধীন দত্তের কবিতা দিয়ে যে সভার আসর জমে উঠতো, সে কবিতাই মূলতঃ ওই দিনের সভা পণ্ডের জন্য হলো দায়ী।

* * * *

তখনও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসিনি, দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। তাঁর কবিতাও কিছু কিছু পড়েছি। 'পরিচয়ের' পৃষ্ঠা ঘেঁটেছি। ১৯৪০ সাল থেকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি বেশি ঝোঁক এলো। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটলো এর প্রায় এক বছর পর। রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে, এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল, সে বিতর্ক সীমাবদ্ধ থাকতো কবি ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে, আমি কবিও নই—সাহিত্যিকতো নই-ই। নিতান্তই এক অনুরাগী পাঠক।

সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটলো যখন তিনি ডিভিসি-র চিফ ইনফরমেশন অফিসার। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাস। ডি. ভি. সি. অঞ্চল

সফরের আগে ও পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, সেই সাক্ষাৎকারকে আমি আমার জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছি। কথা বলার সুযোগ হয়নি—চেষ্টা করার সাহসও হয়নি। তিনি তো ঋষি কবি; আমাদের কল্পলোকের রাজকবি। দূর থেকে কল্পনা করেই আমরা ধন্য। (কবি নরেন দেবের (সর্বজনশ্রদ্ধেয় নরেনদা) নিকট ছিল সকলের অবারিত দ্বার। সে দ্বার উন্মুক্ত ছিল আমার ক্ষেত্রেও। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রাজেন দেবের মারফত তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ।) কিন্তু কবি সুধীন দত্তের কবিতার একজন সমঝদার হয়েও তাঁর সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ না পেয়ে নিজেকে দুর্ভাগা মনে হয়েছিল। সুযোগ যখন এলো তার প্রতিটি মুহূর্ত সদ্ব্যবহার করলাম। তাঁর কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক শুনে তিনি বরং লজ্জাবোধ করলেন। সলজ্জ হাসিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বিনয়ে ও সুভদ্র আচরণে তাঁর মধ্যে দেখতে পেলাম এক সুরুচিসম্পন্ন বিদগ্ধ বাঙালীকে। তাঁর কথাবার্তা—চালচলনের মধ্যে মিশে ছিল এক সংস্কৃতিবান প্রাণময় পুরুষের সত্তা।

মনে পড়ে তার আগে সুধীন দত্তকে দেখেছি থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে তাঁর স্বনামধন্য পিতৃদেব হীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি বাসরে। সভা চলছিল, সুধীন্দ্রনাথ এক কোণে একাগ্রে বসে আছেন। তাঁকে সভার পুরোভাগে এনে বসাবার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষে চেষ্টা হলেও তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন অনুরোধ। পিতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে অংশীদারী হয়ে সকলের শেষে সভাকক্ষ থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেলেন। একজন তরুণ অধ্যাপককে বলতে শুনেছিলাম: বাবা মনীষী ছিলেন; কিন্তু ছেলে সুধীন্দ্রনাথের মনীষাও কম নয়। পিতা বৈদান্তিক—তত্ত্ববিদ্যায় পারঙ্গম। পুত্র আধুনিক যুগের শক্তিমান এবং বাস্তবধর্মী কবি।

তাঁর কবিতার মধ্যে সংস্কৃত বহুল শব্দের অজস্র সন্ধান মেলে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথই সম্ভবতঃ কবিদের মধ্যে প্রথম—যিনি বাংলা কবিতায় সংস্কৃত বহুল শব্দ ব্যবহার করে, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে সাহায্য করেছেন। বলতে কি প্রথম প্রথম তাঁর কবিতা সংস্কৃত বহুল শব্দের প্রাধান্যে আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলেও পরবর্তীকালে সেগুলি যখন মুখে মুখে প্রচলিত হলো তখন তাঁর কবিতার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হলেন; যে আকর্ষণের ক্ষমতা শূন্যগর্ভ কবিতার স্রষ্টা অনেক আধুনিক কবির ছিল না বা নেই। সুধীন্দ্রনাথ একদিক দিয়ে একটি যুগের স্রষ্টা—রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রভাব মুক্ত হয়ে যে কবির ছন্দোময়, প্রাণময় ও প্রেমময় কবিতা যুগ যুগ ধরে বাঙলার জনচিত্তে রস সঞ্চার করবে।

নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথের উপমা ও চিত্রকল্প

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্যজগতের এক বিপন্ন বিস্ময়। জ্ঞানের প্রগাঢ়তায়, চিন্তার অভিনবত্বে, বিচারবুদ্ধির আভিজাত্যে; স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম স্বতন্ত্র কবি—সুধীন্দ্রনাথ। তাঁকে 'ক্লাসিকধর্মী' বা 'ধ্রুপদী' বললে ভুল বলা হবে, আবার পুরোপুরি 'রোম্যান্টিক' অথবা "উগ্র-আধুনিক' বলাও সমীচীন নয়; বরঞ্চ কিছুটা সমন্বয়পন্থী—অল্পকথায় স্বাতন্ত্র্যবাদী। জন্মসূত্রে তিনি নিষ্ঠাবান্ বৈদান্তিকের পুত্র, কিন্তু তিনি নিজে জড়বাদী,—আধ্যাত্মিকতায় তাঁর অনীহা, দেহচ্যুত দেহাতীতের প্রতি তাঁর অনাস্থা। সমাজের প্রতি, নীতিধর্মের প্রতি তাঁর ছিল না তেমন মমত্ববোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই গ্রহণ করেছিলেন জীবনের চরম লক্ষ্য হিসাবে। জীবন-চিন্তায় নিঃসঙ্গ কবি সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনকে দেখেছেন নিঃসীম শূন্যতায়, নৈরাশ্য-ভারাতুর চোখে। তাঁর বর্তমান জীবনে নেই আশা, পরলোকের অনন্ত সুখে নেই বিশ্বাস, জন্মান্তরবাদে নেই আস্থা; নেই মুক্তির প্রতি আকর্ষণ, নেই কোন কিছুতে সান্ত্বনা,—নৈরাশ্যের ভ্রুকুটি কুটিল অন্ধকারেই তাঁর যাত্রা। রোম্যান্টিক প্রেমের স্বর্গরাজ্য তাঁর কাছে মিথ্যা, স্বপ্ন ব্যর্থ, স্বর্গ অর্থহীন। দেহের রক্তমাংসের বেড়া ডিঙিয়ে মনোরাজ্যকে তিনি দেখতে চান না,—নাস্তিকতার অন্ধকারে নিজেকে করে দেন নিঃশেষ। বর্তমান তাঁর কাছে অর্থহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়,—অতীতের স্মৃতিবিজড়িত বেদনা তাঁর জীবনপথের সাথী। কোনো কিছুতেই যেন তাঁর তৃপ্তি নেই, অথচ সব কিছুতেই তাঁর নিবিড় আগ্রহ, অবিচল অনুসন্ধিৎসা। এই হ'ল সুধীন্দ্রনাথের কবিমানসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ইনিই ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর গঠনের পরিধি ছিলো বিরাট ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য

ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন,—ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী।”

প্রশ্ন জাগে, সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে কেন এই আপাত-অসংগতি। তার একমাত্র উত্তর বোধ হয়,—তিনি মুখ্যত কবি, জাতকবি—তাঁর রক্তে কবিতার স্রোত, দু'চোখে কবিতার নেশা, তাঁর সত্তা কবিসত্তা। বুদ্ধদেব বাবু যাঁকে বলেছেন—“স্বভাবকবি নন, স্বাভাবিক কবি,” যাকে বলে, তিলে তিলে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়করা পরিশীলিত ও পরিমার্জিত কাব্যপ্রেম। তাঁর কাব্যসৃষ্টি, প্রেরণার তাগিদে ভাবাবেগের আতিশয্যে নয়,—তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। একমাত্র ‘তন্বী’র কবিতাকে বাদ দিলে ‘অর্কেস্ট্রা’ ‘ক্রন্দসী’ ‘উত্তরফাল্গুনী’, ‘সংবর্ত’, ‘প্রতিধ্বনি,’ দশমী’—সব ক'খানি কাব্যগ্রন্থের কবিতার পিছনে এ-সত্য নিহিত। আর, এদিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ কম সৌভাগ্যবান ছিলেন না। তাঁর প্রথম জীবন কাটে একটি শিক্ষিত, মার্জিত রুচিবান পরিবেশে। আর, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও স্নেহাশীর্বাদ তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পথে কম সহায়তা করেনি। এর উপর ছিল বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি দেশী সংস্কৃত সাহিত্যপাঠ এবং ফরাসী, জার্মান, ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশী' সাহিত্য থেকে জ্ঞানার্জন। সবচেয়ে বড় কথা ছিল, বেশ কয়েক বার তাঁর ব্যাপক বিশ্বপরিক্রমা। এর ফলে, তিনি অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে “কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনি মাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তিনি পরম নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, গভীর শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে এই পথেই অগ্রসর হলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে আমৃত্যু তাঁর লেখনী নিঃসৃত কাব্যশরীরে ছিল অষ্টধাতুর' রূপ লাবণ্য ও স্থায়িত্বের সুস্পষ্ট পরিচয়, যার তুলনা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে, বোধ করি, বিরল। বর্তমান নিবন্ধটি সুধীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি দিকের ওপর আলোক সম্পাতের প্রয়াস।

উপরোক্ত আলোচনার পটভূমিকায় বিচার করলে প্রথমেই চোখে পড়বে, সুধীন্দ্রনাথের অদ্ভুত শব্দ-উদ্ভাবনা শক্তি, যার ফলে তাঁর কবিতায় এসেছে উপমার অন্তর্দীপ্তি, উৎপ্রেক্ষার নিগূঢ় আকুতি। চিত্রকল্পের মধুর আত্ম-তন্ময়তা ;—সমস্ত কাব্যশরীরে এক অনাস্বাদিত ক্ষণ-শাশ্বত অনুভূতি। তিনি বলেছেন : “মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট : আমিও মানি যে

কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।" এ-কথার মানে এই নয় যে তিনি মালার্মের মতো কবিতাকে বিশুদ্ধ সুরের সমকক্ষ ক'রে তুলতে চেয়েছেন। আসলে, সুধীন্দ্রনাথের শব্দবোধ শব্দ-সংগ্রহে নয়, শব্দ-প্রয়োগে। এখানেই সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য। আর, এই শব্দপ্রয়োগের নৈপুণ্যে তিনি তাঁর কাব্যে কী যাদুই না সৃষ্টি করেছেন!

"তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজের ক্ষতি
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।" [উটপাখী : ক্রন্দসী]

আত্মবিমূঢ় ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও আত্মহননকে 'উটপাখী'র প্রতীকধর্মে কী সুন্দর রূপায়িত করেছেন এই কাব্যে। ছন্দের মাধুর্যে, 'অন্ধ' ও 'বন্ধ' শব্দদুটির অন্ত্যানুপ্রাসে, 'ভ্রান্তিবিলাস' শব্দটির চমৎকার প্রয়োগে,—এক কথায় কল্পনার নিখুঁত ঐক্যবোধে কবিতাটি সর্বাঙ্গসুন্দর। আর, এমনিধারা সুন্দর সুন্দর কবিতার স্রষ্টা কবি সুধীন্দ্রনাথ।

শব্দের চাতুর্যে অভিনব উপমাসৃষ্টি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের এক অপূর্ব সম্পদ। সুদক্ষ শিল্পীর তুলির টানে অতি সাধারণ ঘটনা, যেমন—রূপময়, ছন্দোময়, প্রাণময় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিধারা সামান্য কয়েকটি শব্দের ব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন উপমার অন্তর্দীপ্তি, এবং উৎপ্রেক্ষার নিগূঢ় আকুতি। যখন কবি তাঁর 'শর্বরী' কবিতায় বলেন—

"সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে।"

তখন স্পষ্টতই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আধুনিক সভ্যতার এক নগ্নরূপ। হেমন্তের সন্ধ্যার মতো আধুনিক সভ্যতা জরাগ্রস্ত, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অবক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান। রূপজীবী জরতী যেমন অত্যধিক রঞ্জনের সাহায্যে জরার চিহ্ন ঢেকে রেখে অপরের সঙ্গে নিজেকেও প্রতারণা করে, আধুনিক সভ্যতাও তেমনই প্রতারক ও আত্মপ্রবঞ্চক।

কবির অন্যান্য কবিতা থেকে আরও দু'একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

(১) "মনে হয় একা আমি—পরিত্যক্ত ভিটার জঙ্গালে
পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে।"
[অহৈতুকী : উত্তরফাল্গুনী]

(৩) "দীর্ঘায়িত নিশা
বয়ঃস্ফীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হ'য়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।" [নরক : ক্রন্দসী]

ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে-শূন্যতা কবি অনুভব করেছেন, প্রেমের বিচ্ছেদে ও তার নিষ্ঠাহীনতার প্রতীতিতে যে-নরকযন্ত্রণায় হৃদয় জর্জরিত হয়েছে, সুন্দর উপমার সাহায্যে তারি অনিবার্য বিষণ্ণতা ও নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার উদ্ধৃতাংশ কবিতা দু'টিতে পরিব্যাপ্ত। এখানেই কবি সুধীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর উৎকর্ষ।

জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আস্থাবান কবি সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্য নাটক-পুরাণের নানা কাহিনী থেকে ও তাঁর কবিতায় অনেক উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারে দ্বিধা করেন নি। এর ফলে, তাঁর কবিতায় এসেছে নোতুন রূপ, ক্লাসিক-কাহিনীর ঘটেছে আধুনিকীকরণ, সমগ্র বাংলা কাব্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে এক নোতুন দিক।

"পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।" [শাশ্বতী : অর্কেষ্ট্রা]

অথবা,

"শ্লথনীবি যৌবন তোমার।" [হৈমন্তী : অর্কেষ্ট্রা]

কিংবা "...অভিশপ্ত অহল্যার মতো,
তরুণের পদস্পর্শে উজ্জীবিত, শিলাস্তূপে আজি
অঙ্কুরিছে আচম্বিতে হর্ষোত্থিত নব রোমরাজি।"

[বর্ষপঞ্চক : ক্রন্দসী]

উদ্ধৃত অংশগুলিতে তো শোনা যায় আমাদেরই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু, কী অসামান্য দক্ষতায় সুধীন্দ্রনাথ সেই সব কাহিনীকে আধুনিক কালের পটভূমিকায় বিশিষ্ট অর্থের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন! সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানেই।

এমনিধারা অজস্র সুন্দর সুন্দর উপমার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সুধীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায় যার কয়েকটি উদ্ধৃতি বোধ করি, এখানে অসঙ্গত হবে না।

(১) "আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই।"

[উজ্জীবন : সংবর্ত]

(২) "আদর্শের দৈববাণী প্রতিধ্বনি প্রবৃত্তি-গুহার" [প্রতীক : ক্রন্দসী]

(৩) "চাহিনা থাকিতে বর্তমান
নির্বিকার পটে আঁকা নিরালোক দীপের সমান।"

[প্রলাপ : অর্কেস্ট্রা]

শব্দচয়ন ও উপমাসৃষ্টির ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের আর একটি অবদানের কথা স্বীকার্য। রবীন্দ্রোত্তর যুগে তিনিই, বোধ করি, প্রথম যিনি কবিতা রচনা করতে গিয়ে সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাঁকে স্বীকার করতে হবে,—স্বীকার করতে হবে দেশের সম্পদ হিসেবে, আমাদের নানা অনুবাদের রূপকারী হিসেবে, আমাদের বহু নির্বাক অনুভূতির বক্তা হিসেবে। প্রেমের অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ অকপটে লিখলেন—

"নীলনবঘন চঞ্চল আঁখি
যে-তড়িৎময়ী কালবৈশাখী।" [চপলা : অর্কেস্ট্রা :

"নীলনবঘন" শব্দরূপটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সুধীন্দ্রনাথ এই শব্দরূপটিকে তাঁর কাব্যে স্বাঙ্গীভূত কোরে এক নূতনত্বের আস্বাদ সৃষ্টি করেছেন। এখানেই সুধীন্দ্রনাথের সার্থকতা।

চিত্রকল্প সৃষ্টি কাব্যদেহের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবি ভাষা দিয়ে যা দেখেন, তার এক অপূর্ব ছবি মনে-মনে এঁকে সেই চিত্রে তাঁর মনের সৌন্দর্য-সুরভি মিশিয়ে দিয়ে, ছবিটিকে জীবন্ত ক'রে তোলেন। আমাদের দেখা ছবিও কবির কাছে অন্য রকমে ধরা পড়ে; তাঁর বর্ণনার ধারা অনুসরণ ক'রে, তাঁর উপলব্ধি আলোকসম্পাতের দিকে লক্ষ্য রেখে যখন সেই দেখা ছবি আবার দেখি—বুঝি, এ ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে,—শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে কবি সিদ্ধকাম, কবির সৃষ্টি সার্থক সৃষ্টি।

কবি সুধীন্দ্রনাথ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। তাঁর মানসিকতাই বিশেষভাবে চিত্রকল্প সৃষ্টির অনুকূল। তাঁর অদ্ভুত শব্দ চয়ন, অনুশীলিত বাক্-সংযম এবং অপূর্ব পরিমিতিবোধ স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের উচ্চ চূড়ায়। ফলত, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় কিছু না কিছু চিত্রকল্প বর্তমান; আর এই সমস্ত চিত্রকল্পে বৈচিত্র্যেরও তুলনা নেই,—সময় সময় মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ একজন জাত চিত্রশিল্পী। এক সময় তিনিও এজরা পাউণ্ডের মত বিশ্বাস করতেন অসংখ্য সৃষ্টির লোভ

দমন ক'রে সারাজীবনে একটি ভাল চিত্রকল্প তৈরী করা অনেক কৃতিত্বের পরিচায়ক।

"ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে।"

[শাশ্বতী : অর্কেষ্ট্রা]

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি। এখানে, 'প্রতিনিধি' এই একটিমাত্র শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে বর্ষার দু'কূলপ্লাবী নদীর মতো অন্তরের আবেগ এক অভিনব চিত্রকল্পে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

আর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"তোমার উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্তস্পর্শে ধ্যানসম কেলিপরায়ণ।"

এটি-একটি প্রেমের কবিতা,—কিছু গুরুগম্ভীর শব্দের ব্যবহার এখানে পরিলক্ষিত। কিন্তু, সমগ্র কবিতাটিতে এমনই একটি স্নিগ্ধ ছবি পরিস্ফুট, যা পাঠকচিত্তকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ক'রে তোলে।

আরও একটি কবিতার দু'টি স্তবক তুলে দেওয়া গেল যেখানে চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে যথোচিত ও সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিশেষণের মাধ্যমে।

"নাথু-সংকটে হাঁকে তিব্বতী হাওয়া।
প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুমলহরি।
ছঙ্গু-সায়রে কার বহিত্র বাওয়া
অপর্ণ বনে দিয়েছে রহস ভরি॥
সুহৃদ আগুন নিবে গেছে গৃহ কোণে;
শ্রান্ত সাথীরা স্বপনে আপনহারা;
আমি শুধু ব'সে তুষারিত বাতায়নে
প্রহরে প্রহরে গুণি খসে কত তারা।"

[জাতিস্মর : ক্রন্দসী]

পাহাড়ী দেশের হিমেল রাতের বর্ণনা;—"প্রাকৃত তিমির", "অপর্ণ বনে", "সুহৃদ আগুন" প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ্য বিশেষণের মাধ্যমে একটা পার্বত্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস এখানে বর্তমান। কিন্তু, চিত্রের সীমাকে ছাড়িয়ে যা অনুভূতির রাজ্যে এসে পৌঁছয়, তা হচ্ছে "তুষারিত বাতায়ন"—এ যেন প্রাকৃতিক চিত্রকে অতিক্রম ক'রে মানসিক বিষাদজনিত নিঃসঙ্গতাবোধের প্রতীক। এক কথায়, চিত্রকল্পটি চমৎকার।

সুধীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প সম্বন্ধে একটা কথা অবশ্য স্মর্তব্য। তাঁর কাব্যের চিত্রকল্প সম্যক্ উপলব্ধি করতে হ'লে সব সময় শুধু চোখ দিয়ে দেখলে চলবে না। মন দিয়ে একটু ভাবতে হবে এবং কানও রাখতে হবে সজাগ। বস্তুত, অপরাপর চিত্রকল্প সাধারণতঃ যেমন আমাদের দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দিয়ে তবে অনুভূতির কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বুদ্ধির সমর্থন ও শ্রুতির সাহচর্য না পেলে তাঁর চিত্রকল্প অনেক সময় আমাদের দৃষ্টির পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে না।

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মেলে :

> "বিশ্ব স্বাধীন : অম্বরে মীন ;
> মাটির মমতা-মুক্ত তিমির পৃথুল কায়া।"

শরৎকালের নির্মল স্বচ্ছ আকাশের গায়ে জলকণাহীন মেঘ যেন মাছের পিঠের মত স্তরে স্তরে জমা হয়ে থাকে। এই চিত্রকে "অম্বরে মীন" ঐ দু'টি শব্দে ধ'রে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। চিত্রকল্পটি সুন্দর, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচারসাপেক্ষ নয় কি ?

এই জাতীয় আরও একটি উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। যেখানে চিত্রকল্পে ছবির বাহুল্য নেই, কিন্তু রং-এর প্রগাঢ়তা বর্তমান :

> "রহস্যের অনচ্ছ অভিধা
> মুকুরিত সরোবরে ; হতবাক্ ক্রমে
> প্রবিষ্ট নিবিড় ছায়া, বহিরঙ্গে বিশীর্ণ মলিদা ;
> অবলুপ্ত জনপদ ইন্দ্রনীল ধূমে।
> ঘরে ঘরে প্রদোষের দ্বিধা।" [অগ্রহায়ণ : দশমী]

এখানে কবি কয়েকটি শব্দচিত্রের ধ্বনি সামঞ্জস্যে অগ্রহায়ণের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু, তা মানুষের মানসিক একাকিত্ব তথা তার আত্মপরিক্রমার অন্ধসুখকে ব্যক্ত করেছে। চিত্রকল্পটি যতখানি অনুভূতিগ্রাহ্য, ততখানি চিত্রধর্মী নয়। তবুও এর চিত্র-মাধুর্য অপূর্ব।

কোথাও আবার, সুধীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প অদ্ভুত কাব্যগুণ সম্পন্ন। 'নান্দীমুখ' কবিতার উদ্ধৃতাংশটি তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর—

> তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে,
> বসেছি বিজনে, নব নীপ বনে।
> পুষ্পিত তৃণদলে।

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে ;
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে ;
শ্যামসন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়নে, পেতে আছি কান,
গান বিরচিব বলে॥

কবি রোম্যান্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দার্শনিক সত্যের আলোয় পরিশুদ্ধ হয়ে কাব্যসৃজনের জন্যে যে পরিবেশ প্রার্থনা করেছেন—তার এক চিত্তহর আলেখ্য অংকিত হয়েছে এখানে। সমগ্র কবিতাটি চিত্রমাধুর্যে ভরপুর।—কবির অন্তরের আকুলতার মনোরম কাব্যিক প্রকাশ।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে এমনিধারা অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রকল্পের নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে, যা থেকে স্পষ্ট ধারণা হবে তিনি কতখানি সক্ষম কবি ছিলেন। বাহুল্য বর্জনের প্রয়োজনে সে-কাজে বিরত হলাম।

এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের তিনি যে শুধু একজন সার্থক কবি ছিলেন তাই-ই নয়,—অনেক বিষয়ে বাংলা কাব্য-জগতের তিনিই ছিলেন প্রথম ও প্রধান, যার জন্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

নিরঞ্জন হালদার

সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও চিন্তানায়ক

"A great writer's errors rescue him from oblivion by first whetting the critical faculty of detractors and then leading them to his ultimate virtues."—Sudhindranath Datta in "Hugo and Others". (Quest, July-September 1960.)

ভিক্টর হুগোর ৭৫ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ফরাসী কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে-কথা বলেছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের নিজের সম্পর্কেও সে-কথা প্রযোজ্য। কোন মহৎ লেখকের ত্রুটিগুলিই তাঁকে বিস্মৃতির অতল থেকে পুরোভাগে নিয়ে আসে। কুৎসা রটনাকারীদের অপপ্রচার শেষ পর্যন্ত লেখকের রচনার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনা দুর্বোধ্যতার অপবাদে নিন্দিত। সেজন্য হয়তো তাঁর নাম মাঝে মাঝে জনপ্রিয় বা বহু-পঠিত বাঙালী কবিদের তালিকায় থাকে না। দুর্বোধ্য কবি বলে নস্যাৎ করারও চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি, প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান এতই বিশিষ্ট যে, বাংলা সাহিত্যের কোন সীরিয়াস পাঠকের পক্ষে তাঁকে অবহেলা করা অসম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথের রচনার দুর্বোধ্যতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—"সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস-সাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ বা বাংলায়

---

* ১৯৬২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদানের পর থেকে অর্থনীতি, নগর-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশুনার জন্য অনেক বেশী সময় দিতে হয়। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, সাহিত্য-বিষয়ে আমি আর কখনও কোনও প্রবন্ধ লিখব না। এই প্রতিজ্ঞার জন্য 'কলকাতা' পত্রিকার 'বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা'-য় লেখার প্রলোভনও সংবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অজস্র অভিযোগ শুনে শুনে সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে বাধ্য হয়েছি। এই প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—সংখ্যা, 'মার্কসিয়ান ওয়ে' এবং হিউমানিষ্ট ওয়ে পত্রিকার ফাইলগুলি দেখতে দেওয়ার জন্য শ্রীঅনাথ মিত্রের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। —নিরঞ্জন হালদার

অপ্রচলিত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন : তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হল বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দ সমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথার্থ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পঙক্তিসমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার এবং শব্দ প্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না করলে, তাঁর কবিতা হ'তো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ তাঁর চরিত্রই প্রকাশ পেতো না।" (সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগ্রহ-এর ভূমিকা, পৃঃ তেরো।) বুদ্ধদেব বসুর লেখা পড়ে মনে হতে পারে যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আপাত দুর্বোধ্যতা কেবল অপরিচিত বা অজানা শব্দের জন্য। কিন্তু শব্দের মানে জানলেই কি কবিতার অর্থ বোঝা যায়? অর্কেস্ট্রা তো বটেই, সংবর্তের কোন কোন কবিতা কিংবা দশমী বা প্রতিধ্বনির অজস্র কবিতায় অনেক পাঠক একটাও দুরূহ শব্দ খুঁজে পাবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতা মাত্রই নাকি দুর্বোধ্য! জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অপরিচিত শব্দের সংখ্যা তো খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের নিকট জীবনানন্দ দাশের কবিতার অর্থ উদ্ধারের জন্য বুদ্ধদেব বসুকেও দীর্ঘকাল কলম ধরতে হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, সুধীন্দ্রনাথ ধ্বনি মাধুর্যের কথা ভেবেই অনেক শব্দ চয়ন করেছেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "যে শব্দ কোনও ভাষার অন্তর্গত নয়, যে-শব্দ নিরর্থ ধ্বনির সাহায্যে আবেগ জাগায়, কাব্যের চেয়ে মন্ত্রেই তার প্রয়োগ প্রশস্ত। লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যের শব্দ চিরদিনই অভিধানের মুখাপেক্ষী থাকবে।" (কাব্যের মুক্তি। স্বগত। পৃঃ ৩১)। কিন্তু শব্দ কেবল অভিধানিক অর্থেই শব্দ নয়। শব্দ কোন কিছুর প্রতীকও বটে। অবশ্য, সুধীন্দ্রনাথের মতে, কাব্যে ও গদ্যে শব্দের ব্যবহার এক নয়। ..."গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে; আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে; গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি; আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা। রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে ছবি আঁকে, গোটা কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ মাত্রেরই দুটো দিক আছে।

একটা তার অর্থের দিক, অন্যটি তার রস প্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যের শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে, কাব্যের শব্দ আবেগ-বাহী।" (কাব্যের মুক্তি। স্বগত। পৃঃ ২৯)। কিন্তু কাব্যে যে-শব্দ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত, পরপর শব্দ সাজিয়ে যে চিত্রকল্প রচিত, তা সব পাঠকের চোখে ধরা পড়ার কথা নয়, পড়েও না। কবি ও পাঠক প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে কোন প্রতীক বা চিত্রকল্প পাঠকের চোখে ধরা না পড়াই স্বাভাবিক। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা সব সময়ে বাস্তব-অভিজ্ঞতা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোলরিজের 'অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' কবিতা উপলব্ধির জন্য আমাদের সমুদ্রে যাওয়ার দরকার হয় না, কোলরিজ আমাদের যে জগতে নিয়ে যেতে চান তাঁর সঙ্গে আমরা সেই জগতে যেতে রাজী থাকলেই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে কোলরিজের ভাষাতেই ইচ্ছাকৃতভাবে অবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে (willingly suspend our disbelief) রাখলেই চলে।

আজ একথা কারও জানতে বাকী নেই যে, সুধীন্দ্রনাথ ভিন্ন মেজাজের কবি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মানসিক পরিমণ্ডল চর্চা ও চর্যা আর সব বাঙালী কবি থেকেই ভিন্ন। এজন্য কিন্তু তাঁকে কল্লোল-যুগের লেখকদের মতো রবীন্দ্র-বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরতে হয়নি। এটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। তিনি নিজেই লিখেছেন "বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাংলাদেশে বৃথাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন।...রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দে পয়ার, ত্রিপদী একাবলীর উপযুক্ত মধুর মনোভাব ব্যক্ত করেই আধুনিক বাঙালী কবির রক্ষা নাই, যুগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ তার অবশ্য কর্তব্য। (ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ। কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ৪৭)। কেবল বক্তব্য নয় রবীন্দ্রনাথের পরে লিখতে আরম্ভ করায় শব্দচয়ন, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার দিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়েছে। অন্যত্র "মার্লার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ" সুধীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট হলেও, "কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে" রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর "অদ্বিতীয় গুরু।" (দিনান্ত, কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ৭৩)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকেও অমিয় চক্রবর্তী ভিন্ন অর্থে আধুনিক। জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম

ও মোহিতলাল মজুমদার সরাসরি বিদ্রোহের পতাকা না তুললেও তাঁদের কবিতা রবীন্দ্রনাথ থেকে কত ভিন্ন!

সুধীন্দ্রনাথ নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে-প্রবেশ করেন। তাঁর বাবা তাঁকে এটর্নী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইন বা এটর্নীশিপ কোন পরীক্ষাই দেননি। তার আগে ক্লাসে অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে তর্কাতর্কি হওয়ায় ইংরেজীতে এম, এ, পড়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কী লিখবেন, এ প্রশ্ন তাঁকে কম আলোড়িত করেননি! এ-বিষয়ে তিনি লিখেছেন,---"মানবচৈতন্যের ধারা না বদ্‌লাক, তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে; এবং ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রম-বিভাগে বাধ্য নয়, এমন কি এণ্ট্রোপির প্রক্রিয়ায় পুরাতন স্থৈর্যটুকু এখন অচিন্ত্য। সুতরাং শেকসপীয়র-এর যুগ দূরের কথা, টেনিসন এর আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষা, দণ্ড ইত্যাদি নির্বিশেষ বিষয়ে যত সহজে কবিতা লেখা যেত, সাম্প্রতিকদের কলম আর তত অনায়াসে চলে না; এবং সাবেকী বিলাস বস্তু ইদানীং যেমন নিত্যব্যবহার্য আসবাবের কোঠায় নেমেছে, তেমনই প্রাচীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য আবেশ আর কারও মুখে রোচে না, পাঠকমাত্রেই খোঁজে অনুভূতির বৈচিত্র্য। (শিল্প ও স্বাধীনতা। কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ১২৯)। আধুনিক জীবনে অনুভূতি ক্ষণভঙ্গুর হলেও, এই অনুভূতিই সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয়। আর এই অনুভূতি তিনি খুঁজছেন সমসাময়িক জীবনযাত্রার মধ্যে। কারণ তাঁর মতে, "সৎসাহিত্যের মায়া মুকুরে অ্যারিস্টটল ও ম্যাথু অর্নল্ড-এর মতো সমসাময়িক জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব দেখেন।" (ঐ, পৃঃ ১২৬)।

আমি আগেই বলেছি, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার তথাকথিত দুর্বোধ্যতা শব্দের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য নয়। সমসাময়িক যুগের যে-বিরাট ক্যানভ্যাসের উপর সুধীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছেন, তা অনুধাবন করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। এটা আরও কঠিন হয় এই জন্য যে, প্রতীক ব্যবহারের জন্য তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত-সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছেন। এবং এই জাতীয় কবিতা পড়বার সময় ভাষার দিক থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছাকাছি মনে হয়। ক্রন্দসীর 'বর্ষপঞ্চক' কবিতা বা সংবর্তের নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

অশক্য পিতা; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী-ব্যাভিচারে আজ মগ্ন;

ক্ষাত্র শোণিত অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে।   (নান্দীমুখ, সংবর্ত)।

একটাও দুরূহ শব্দ নেই, এমন কিছু কবিতার অংশ উধৃত করা যাক।

আমগ্ন তরণী ছেড়ে ঝাঁপাতে পারিনা তবু জলে।
বিফল কৌশলে
ভঙ্গ হাল ধরে থাকি ; ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই ;
লুপ্ত প্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি ; সঙ্গে ছিল যাবা.
প্রলুব্ধ বন্দরে কিংবা পথ কষ্টে আজ আত্মহারা,
কে কোথায় প'ড়ে আছে, জানিনা ঠিকানা।

অথবা,

তবু তার গভীর মায়ায়
পারিনি তলিয়ে যেতে, কৃষ্ণপক্ষ চোখের ছায়ায়
সিন্ধুর উষর জ্বালা চাইনি জুড়োতে।
বিপরীত স্রোতে
সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও,
ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্মই শ্রেয়।   (জেসন, সংবর্ত)

কিংবা,

সহেনা, সহেনা
আর দিনগত পাপের জ্বালনে নিত্য অনুতাপ ;
বদ্ধমুষ্টি পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায়ে সধর্মার
সঙ্গে বিপ্রলাপ ; গোঠে বা শিকারে উদয়াস্ত বৃথা
কায়ক্লেশ ; বুভুক্ষু প্রদোষে ফেরা পৈতৃক কারায় ;
মিটাতে বংশের দাবি মধ্যরাত্রে অভ্যস্ত আশ্লেষ ;
(পথ, প্রাক্তনী)

এই ধরনের আর্তির সাক্ষাৎ মিলবে অন্যত্রও।
সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,

সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলা বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা। (বিরাম, ক্রন্দসী)।

এরই পাশে তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন 'অর্কেষ্ট্রা'-র কবিতাগুলিও স্মরণ করা যেতে পারে :

চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই।
আজও বলি,
জনশূন্যতার কানে কানে রুদ্ধ কণ্ঠে, আজও বলি
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর,
ভবিষ্যৎ বদ্ধ অন্ধকার
কাম্য শুধু স্থবির মরণ। (নাম, অর্কেষ্ট্রা)

অথবা,

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসংগত চির প্রেম ; সংবরণ অসাধ্য অন্যায় ;
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়। (মহাসত্য, অর্কেষ্ট্রা)।

অর্কেষ্ট্রায় প্রেম উপজীব্য। কিন্তু সে-প্রেমের প্রকাশের ধরন কত স্বতন্ত্র! ক্রন্দসীতে বিশ্ব সংসারের সকল প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। আর সংবর্ততে বিশ্ব-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানবসমাজের প্রতি নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। আবার অন্যদিকে মনে হয়, তিনি অন্য গ্রহ থেকে নির্লিপ্তভাবে পৃথিবীর সব সমস্যা অবলোকন করছেন। সংবর্ত কবিতাটি পড়বার সময় আমরা পাঠকেরাও একবার কবির সঙ্গে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পাই। কিন্তু যাঁরা ঐ কবিতার বিরাট ক্যানভাসের কথা ভাবতে পারেন না বা জানেন না এবং ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সামান্য, তাঁরা নীচের কয় লাইন থেকে কী অর্থ উদ্ধার করবেন ?

"রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কি না, তা স্বচ্ছ জানি না।
(সংবর্ত)।

সমকালীন ঘটনা নিয়ে এই বাংলাভাষাতেও কবিতা লেখার নজীর কম নেই। মহাচীন, ভিয়েতনাম বাংলাদেশ নিয়ে তো কম কবিতা লেখা হয়নি! কিন্তু ঐসব কবিরাও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গভীরতায় প্রবেশ করতে অসমর্থ। আশ্চর্যের ব্যাপার, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি কখনও বিষয়বস্তু হয়নি। সূর্যাস্ত তাঁর মনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরে না, তাঁকে আরও নিঃসঙ্গতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

সহসা সবুজে আবীরের আভা লাগে
মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত যায় :
নীলের বিকার ধূসর পূর্বভাগে ;
অলস সাগর ; আকাশেও তার সায় ॥

দূর দিগন্তে সংবৃত শর্বরী,
শুক্র যুদ্ধ এখনও দেয়নি দেখা ;
নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী ;
নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা ॥

একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে,
ত্রিসীমায় নেই অন্ত্যেস্তের দিশা :
টল টল জল সচল চক্রবালে ;
সন্ধিলগ্নে সংগত দিবা-নিশা ॥　　　　(ভ্রষ্ট তরী, দশমী)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো অতটা না হলেও জীবনানন্দ দাশও ইতিহাস সচেতন। কিন্তু দুজনের মধ্যে এর বেশী মিল নেই। সুধীন্দ্রনাথ সমকালীন সমাজে মানুষের আশা-নিরাশা দুর্ভাবনা, আর্তি, নিঃসঙ্গতা সহজভাবে প্রকাশ করেছেন আর জীবনানন্দ দাশ এই ক্লান্ত পৃথিবী থেকে আশ্রয় খুঁজেছেন,, এক স্বপ্নের জগতে, রূপসী বাংলায়। অমিয় চক্রবর্তীর বাংলাও স্বপ্ন-জড়ানো একটি দেশ।

বর্তমান কবিরাও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিরাট পটভূমিকা সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারেন না, তাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁদের মনে কোন আনন্দের শিহরণ তোলে না। হয়তো এজন্যই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সাময়িকীতে যে-সব বয়স্ক ও তরুণ কবি

সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয়ের জাবর কেটেছিলেন।

দুই

কবিতার তুলনায় সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক কম। অসমাপ্ত আত্মজীবনী ধরলেও ইংরেজী রচনার সংখ্যাও অবিশ্বাস্য রকম কম। কিন্তু কবিতা ও প্রবন্ধের স্বল্পতা দিয়ে সুধীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা অসম্ভব। মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ লেখার ব্যাপারে তাঁর প্রিয় লেখকদেরই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি যে-লেখকদের অনুরাগী, তাঁরা যেমন স্বল্পসংখ্যক, তাঁদের গ্রন্থাবলী তেমনই নাতিবহুল।" (স্বগত। পৃঃ ১০৭)। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য পড়তে গিয়ে অনেকেই স্বগত-এর শেষ প্রবন্ধ, কুলায় ও কালপুরুষ-এর কোন কোন প্রবন্ধে এবং কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাগুলিতে হোঁচট খান। বক্তব্যের গুরুভার অনুসারে অনেক জায়গায় ভাষাও দুরূহ। সুধীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্বগত-এর বেশীর ভাগ প্রবন্ধ এবং কুলায় ও কালপুরুষ-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাষার পার্থক্য কম নয়। এই প্রবন্ধেই আগে সুধীন্দ্রনাথের রচনার যে-দুটি অংশ উধৃত করা হয়েছে, অমন সুললিতভাষা কম লেখকই লিখতে পারেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি-নির্ভরতা ও চিন্তার ঠাসবুনুনি দেখলে অবাক হতে হয়। সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য কোন বিশেষ বিষয়ে সীমবদ্ধ ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তাই কোন ইংরেজ ঔপন্যাসিক সম্পর্কে লিখতে গিয়েও তিনি ওয়াটসন, প্যাভলভ প্রমুখ আচরণবাদীর সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পার্থক্যের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করা বিষয় ও পটভূমি সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা না থাকলে সুধীন্দ্রনাথের রচনা দুর্বোধ্য মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কুলায় ও কালপুরুষ-এর 'উদয়াস্ত' প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক্। তিনি ব্রজেন্দ্রশীলের দার্শনিক অবদান আলোচনা করতে গিয়ে শীল মহাশয়কে "সক্রেটিস-বংশের শেষ কুলপ্রদীপ" আখ্যা দিয়েও তিনি রায় দিলেন। দর্শনে শীলের অবদান প্রায় নাস্তির কাছাকাছি। কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত সমেত ভারতীয় দর্শনের ধ্বজাধারীদের সম্পর্কেও মন্তব্য করতে ছাড়েননি। যেমন, "এ জনরব একেবারে

অমূলক নয় যে, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মতো বিদ্বানও দার্শনিক নন, দর্শনের ঐতিহাসিকমাত্র, এবং তার প্রসাদগুণ অবশ্যস্বীকার্য বটে, কিন্তু সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের বিরাট পাণ্ডিত্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল বক্তব্যটুকুও বাংলায় বিশদ করতে পারেননি।" আবার, "ঈশোপনিষদ আওড়াতে আওড়াতে কামিনী-কাঞ্চনের ধ্যান কখনও আমাদের বিবেকে বাঁধবে না, এবং সেইজন্য দিনের পর দিন গলার আওয়াজ চড়াতে চড়াতে আমরা অম্লান বদনে রটাতে পারব যে প্রাচ্যের সর্বময় সত্ত্ব-গুণ তামসিক পাশ্চাত্যের স্বপ্নাতীত। ···হাজার বছরের নিরন্তর দুর্দশাও যেহেতু আমাদের শেখায়নি যে উপায় ও উদ্দেশ্যের সমীকরণ ভিন্ন সুস্থ সংসারযাত্রা অসম্ভব, তাই ভারতীয় মনীষীদের জানিয়ে লাভ নেই যে পশ্চিম অধঃপাতে গেলে পূর্বের পুনরুত্থান অনিবার্য নয়, বরঞ্চ মানব সভ্যতার সমূহ বিপদ।" (কুলায় ও কালপুরুষ-পৃঃ ২০৩-৪)। তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত এই ভাষা আদৌ দুরূহ নয়। কিন্তু যাঁরা ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বা সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের নামটুকুই শুনেছেন, ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকদের ভণ্ডামীর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন, তাঁরা এই প্রবন্ধ পড়ে কোন মজা পাবেন না।

সুধীন্দ্রনাথের রচনার আর কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাক্।

"আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাদের আস্থা আছে, তারাই লরেন্স-এর সমর্থন করবেন। কিন্তু ওয়াটসন, পাভলভ ইত্যাদিকে উদ্‌ভ্রান্ত লাগলেও লরেন্স আমাদের প্রণম্য। সংসার দেহপ্রধান হোক, আর আত্মা-প্রধান হোক, দুই নৌকোয় পা রেখে জীবন-নদী পেরোনো সকলের মতেই অসম্ভব এবং এ-সত্যকে আমরা যদিও বুদ্ধি দিয়ে মানি, তবু কার্যত একাগ্র-নিষ্ঠা আজ আমাদের উপহাস জাগায়। যারা শতমুখ, সহস্রাক্ষ, তাঁরা— বর্তমান কালের প্রবক্তা; এবং এই নৈরাজ্যের যুগে, এই বিক্ষোভের মধ্যে অখণ্ডতা ও অবৈকল্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকা এত বড় কথা যে লরেন্স-এর দেহবাদে আমরা কান না পাতি, তাঁর দিব্যদৃষ্টির গুণ গাইতে আমরা বাধ্য। তবে অবৈকল্যের আদর্শ শুধু জীবনে অবশ্য গ্রাহ্য নয়, সাহিত্যও সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত; এবং যেখানে বক্তব্য আর উক্তি দ্বিধাবিভক্ত, সেখানে সাহিত্যসৃষ্টি তো অসম্পূর্ণ বটেই এমনকি বক্তৃতাই অচল।" (ডি. এইচ. লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উলফ। স্বগত। পৃঃ ৬২)।

আবার, "যাদের চোখে সোভিয়েট শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্টিকের চরম ও পরম সমন্বয়, তারা নিশ্চয়ই আমাকে ধমকে বলবেন যে, ম্যাকসিম গর্কি শুধু বৃদ্ধ

বয়সে নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার গুণ গাননি, ১৯০৫ সনের সশস্ত্র রাজদ্রোহেও তিনি সর্বান্তকরণে যোগ দিয়েছিলেন। তথাচ তাঁকে হিংসাব্রত বোলশেভিকদের সমপাংক্তেয় ভাবা আমার পক্ষে অসাধ্য। কারণ তৎকালীন জার্মান দার্শনিকদের সংসর্গদোষে গর্কি ১৮৯৪ খৃস্টাব্দেই মার্কসবাদে আস্থা খোয়ান এবং উক্ত সমাজতন্ত্রের শোষনকল্পে কাপ্রি ও বোলানোতে দুটি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করে সহকর্মী লুনাবার্স্কির সঙ্গে লেনিন-এর কটু-কাটুব্য কুড়ান॥ (ম্যাক্‌সিম্ গর্কি। স্বগত। পৃঃ ৯৯)। সুধীন্দ্রনাথ এখানেই থামেননি। গর্কি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হোমর, শেকস্‌পিয়র, য়ুক্লিড, ন্যুটন এডগর এ্যালেন পো, বোদলেয়র, বাইরণ, এলিয়ট, বুয়োর যুদ্ধ, জাপানের অভ্যুদয়, ফাশোদার উপদেশ, শ-প্রমুখ ফেবিয়ান, মার্কস, টেনিসন, সোভিয়েট শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্টিক, কাপ্রি ও বোলানোর বিদ্যাপীট, লুনাচার্স্কি, লেনিন, শেভি, কৌটস, বুরিদান এর গাধা—এত সব নাম ও বিষয় এসে গিয়েছে। বার্ণার্ড শ সম্পর্কে আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ স্টাইনাক—ভোরোনোভ-এর অস্ত্র-চিকিৎসা, কাভিডা, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস, ওয়েলস, গলস ওয়ার্দি, কৌটসের নেগেটিভ কেপেবিলিটি, ইবসেনী নাটক, শেক্‌স্‌পিয়র, ল্যাম্ব, কোলরিজ, ডাউডন-ব্র্যাডলীর অন্ধ ভাব-বিলাস ও উচ্ছসিত স্তবস্তুতি। সুইনবর্ণ ও সাইমন্স, মোলিয়ের, বের্গসনী এঁলা ভিতাল, নীটশে, ভলতেয়ার প্রভৃতি নাম ও প্রসঙ্গ টেনেছেন।

শিল্পী ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের ৩৬ জন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, দার্শনিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীর নাম টেনেছেন। লিখেছেন, "এমন কি মার্কস-ও জন্মের গুণে অন্ধ নিয়তির অঞ্চলধারী।" কিংবা "মার্কস-ও আমার বিবেচনায় যথেষ্ট জড়বাদী নন। সংস্কারযুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র, তবু মনীষা আর অনুকম্পা অভিন্নহৃদয় এবং সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী। (কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ১৩৩)।

এখানে যে-প্রবন্ধ কয়টি উল্লেখ করা হল, যে-কোন সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেগুলি ধৈর্য ধরে পড়া খুবই কঠিন। কারণ সুধীন্দ্রনাথ ডি-এইচ লরেন্স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লরেন্স-এর উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করেননি, উপন্যাসে ব্যবহৃত মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও বিহেভিয়ারিষ্ট স্কুলের কতটা মিল বা পার্থক্য, লরেন্স-এর সাহিত্য-আদর্শ, সাহিত্যের প্রকৃতধর্ম প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনা করেছেন। গোর্কি, বার্ণার্ড শ ও শিল্প-স্বাধীনতা প্রবন্ধ তিনটিতে উল্লেখ করা নাম ও বিষয়ের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে,

তিনি কেবল ঐ নামগুলি নয়, তাঁদের রচনা, সাহিত্য ও শিল্প-কীর্তি, বিজ্ঞানে ও দর্শনে অবদানের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং নানান বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য এত ব্যাপক ছিল যে, একটি বিষয় আলোচনা করতে গেলে অজস্র সমস্যা তাঁর মনে এসে ভিড় করত। মার্কস-এর 'ডিটারমিনিজম' ইহুদী নিয়তিবাদ থেকে এসেছে কিনা জানতে হলে ইহুদী ধর্মটাও ভাল করে জানা চাই। যাঁরা ব্যক্তি ও শিল্পী স্বাধীনতার সমস্যার তত্ত্বগত আলোচনার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে এই প্রবন্ধে কুলায় ও কালপুরুষ-এর ১৩৩ পৃষ্ঠার উধৃতি বক্তব্য প্রকাশে শব্দের সুমিত ব্যবহার বলে মনে হবে। আসলে সুধীন্দ্রনাথ পাঠকদের নিকট থেকে অনেক বেশী আশা করতেন।

একই সংস্কৃতির মধ্যে স্তর-ভেদ বর্তমান। তাই কোন কোন শ্রেণীর কবিতার পাঠক নজরুল বা সুকান্তকে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করে থাকেন। আবার অনেকেই নজরুলকে একজন বড় গীতিকার হিসাবে মনে করেন, বড় কবি হিসাবে নন। সুকান্তকে অনেকে কবি হিসাবেই গণ্য করেন না। প্রবন্ধ-লেখককেও পাঠকের কথা মনে রাখতে হয়। তাই দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে-ভাষা ব্যবহার করা হয়, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষা তা থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে দুরূহ বিষয় সহজ ইংরেজীতে প্রকাশের যে-রীতি, মাসিক "এনকাউণ্টার" চালু করেছেন, বাংলাভাষাতেও তা চালু হওয়া উচিত। বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায় সাধারণের বোধগম্য-ভাষায় মননশীল প্রবন্ধ লিখে থাকেন। সুধীন্দ্রনাথ যদি ঐ-ভাষায় সব প্রবন্ধ লিখতেন, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হতাম। পাঠকের কথা মনে রেখে সুধীন্দ্রনাথও লিখতেন। স্বগত-এর বেশীর ভাগ প্রবন্ধের সঙ্গে কুলায় ও কালপুরুষ-এর প্রবন্ধগুলির পার্থক্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি ("ক্যালক্যাটা") প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'এনকাউণ্টারে' এবং দুটি ('দি লিবারেল রিট্রোসপেক্ট' এবং 'ফ্রীডম অব এক্সপ্রেশান') ত্রৈমাসিক 'মার্কসিয়ান ওয়ে' পত্রিকায়। দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষা থেকে বোঝা যায় সুধীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই দুই-পত্রিকার পাঠকের কথা মনে রেখেছিলেন। বক্তব্য ও প্রকাশের মাধ্যম নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এজন্য তিনি নিজের ও অনূদিত বহু কবিতার পরিমার্জনা করেছেন এবং সব কবিতার ক্ষেত্রে তার ফল যে ভাল হয়নি, এ অভিযোগ অনেকেরই।

যুক্তি-নির্ভরতা গদ্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে তিনি মনে করতেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিভিন্ন 'ভাষা এবং সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর যুক্তির ধরণও ভিন্ন হতে বাধ্য। জনপ্রিয়তা অর্জনের বাসনা কখনও তাঁকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাঁর পরিচয়-গোষ্ঠীর কম্যুনিস্ট-বন্ধুদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য কোন কিছু লেখা অর্থহীন, ওরা যাই পড়ুক না কেন, যে-তথ্যেরই মুখোমুখী হোক না কেন, নিজেদের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে সাবালক হতে তারা একেবারেই অনিচ্ছুক। এরিক ফ্রম তাঁর 'ফীয়ার অব ফ্রিডম' লেখার আগেই সুধীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ একই ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধ বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠকের জন্য। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মতো প্রবন্ধগুলি পড়তে গেলেও এক ধরণের মানসিক-প্রস্তুতি দরকার। তিরিশের সেই মার্কসবাদী ঢেউ-এর মধ্যে মাথা উঁচু করে নিজের যুক্তি-নির্ভর বিশ্বাস নিয়ে যিনি হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন, মার্কসবাদী যুক্তি জালে জারিত সাধারণ বাঙালী পাঠকের নিকট সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা অনেকটা অপরিচিত ঠেকবারই কথা। এখানেও অপরাধ ততটা ভাষার নয়, যতটা বক্তব্যের। কবিতার উপলব্ধিতে একই ধরণের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আগ্রহের সঙ্গে জ্ঞান ও মননশীলতা। বাংলাভাষায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ একটি অমূল্য সম্পদ। যাঁরা শিক্ষিত; বহুবিষয়ে যাদের আগ্রহ ও জ্ঞান রয়েছে, সমাজ ও পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তিত এমন ব্যক্তিদের জন্যও বাংলাভাষায় পঠনযোগ্য রচনা থাকা দরকার। বাংলাভাষায় এখনও পর্যন্ত একমাত্র সুধীন্দ্রনাথই এই শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজন মিটাতে পারেন যাঁরা তাঁদের মননকে শানিত করতে চান; কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতির ফলে ভবিষ্যতেও যাঁরা জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হবেন, সুধীন্দ্রনাথের রচনা তাঁদের নিকট দিকদর্শনের কাজ করবে। এই বাংলায় মননশীল প্রবন্ধের জন্য যাঁদের খ্যাতি, সেই বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ু, অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায় বা জ্যোতির্ময় দত্ত ব্যক্তিগতভাবে বা চিন্তার জগতে সুধীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে ও কাছাকাছি এসেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অনেকটা রাজনৈতিক কারণেও। মানুষের স্বাধীনতায় আস্থাশীল, কমিউনিস্ট-বিরোধী অথচ নন কনফরমিস্ট এবং স্ট্যাটাস কুয়ো-বিরোধী এই চিন্তানায়কের লেখার

সঙ্গে বেশী লোক পরিচিত হলে কম্যুনিস্টদের কিছুটা অসুবিধা হওয়ার কথা। তা না হলে খুবই কম চিন্তার খোরাক আছে অথচ সত্যিকারের দুর্বোধ্য ভাষা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে'র গদ্য-রচনা সম্পর্কে অত তীব্র অভিযোগ ওঠে না কেন? এই জাতীয় সন্দেহ কেন উঠেছে, নীচের কয়েকটি উধ্বৃতি পড়লেই বোঝা যাবে :

"আমার জানতে বাকী নেই যে, সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্যায়ে।" (স্বগত। পৃঃ ৯৮)।

"শুনেছি ডস্টয়ভস্কি-র রচনা রুশ-কর্তৃপক্ষের বিচারে অপাঠ্য; এবং এখনও কোন বলশেভিক কথাসাহিত্যিক আমার একাধিক বন্ধুকে তিলার্ধ আনন্দ দিতে পারেনি।" (দোটানা। স্বগত। পৃঃ ১০৬)।

"ফ্যাসিজম আর কম্যুনিজম-এর উভয় সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যথেষ্ট কম অসৎ বলে আমাদের অবশ্য বরণীয় নয়; এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্যপন্থাই হয়তো অগতির গতি।" (ম্যাক্‌সিম্ গর্কি। স্বগত। পৃঃ ১০৩।)

আসলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যারা স্বাতন্ত্র্য খোয়ায়, হয় তাদের ভিতরে ব্যক্তি স্বরূপের বালাই নেই, নয় তারা কার্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত। অন্ততঃপক্ষে ফলিত মনস্তত্ত্বের মতে বিনা ধাক্কায় চৈতন্য জাগে না, এবং প্রতিকূল পরিবেশের উপর স্বাবলম্বীর স্বাক্ষরই যেহেতু রূপসৃষ্টির অনন্য অভিজ্ঞানপত্র, তাই জার্মান ও ইটালিয়ান সাহিত্যসেবীরা এখনও একেবারে লোপ পাননি। তবে দাউলিও অগন্য ইটালীয় মনীষীর মতো স্বদেশ পলাতক কিনা জানিনা; এবং মাতৃভূমিতে থাকলে, তাঁর অবস্থা হয়তো ক্রোচের চেয়েও বেশী সঙ্গীন।" (দোটানা। স্বগত। পৃঃ ১০৯)।

উপরের উধ্বৃতিগুলি সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুলতে পারেন, এমন পাঠকের সন্ধান না-মেলারই সম্ভাবনা। সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বজন-বিদিত। তাই কোন তরুণ কম্যুনিস্ট-ছাত্রদের মনে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে পাছে কোন প্রশ্নের উদয় হয়, সেই ভয়েও সুধীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতায় অভিযোগ তোলা হয় বলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

॥ ৩ ॥

কবি অরুণ ভট্টাচার্য, এডোয়ার্ড শিলস, শিবনারায়ণ রায় ও আরও অনেকে টি এস এলিয়ট সম্পাদিত 'ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ

দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকার ভূমিকার তুলনা করেছেন। এলিয়ট ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইংরেজ কবিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছেন, ইংরেজী কবিতাকে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন এবং অজস্র প্রবন্ধের মাধ্যমে আধুনিক কবিতাকে সাধারণ মানুষের নিকট জনপ্রিয় করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' কেবল আধুনিক কবিতা ও কাব্য-ধারণাই প্রচার করেন নি, একেবারে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস-পর্যালোচনা করে অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে 'পরিচয়'এ প্রকাশিত প্রবন্ধের বক্তব্য ইংলণ্ডে বামপন্থী মতামত অপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের ছিল। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারেও ক্রাইটেরিয়ানের ভূমিকার সঙ্গে পরিচয়ের ভূমিকার তুলনা পুরোপুরি সঙ্গত নয় এই কারণে যে, প্রায় একই সময়ে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' বাংলা আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় ও আরও আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করেছে। ওই সময়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পূর্বাশা'ও বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা প্রচারে সচেষ্ট ছিল।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনার সময় তাঁর মেজাজ, অনুভূতির বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তো কেবল কবি ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন না। তিনি একজন চিন্তানায়কও ছিলেন। অজস্র ব্যক্তি তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যের কী স্বরূপ, তাঁর কী জীবন-দর্শন, বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধে কোন্ রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা বলেছিলেন ; একজন মানুষকে তিনি কোন্ চোখে দেখেন, ভারতের রাজনৈতিক-দর্শনের বিবর্তনে তাঁর কোন ভূমিকা আছে কিনা, কম্যুনিস্ট-বন্ধুদের নিয়ে পত্রিকা বের করতে আরম্ভ করেও শেষ পর্যন্ত কেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, এ-সব প্রশ্ন নিয়ে বাঙালী সমালোচকদের ভাবতে দেখা যায় নি। সুধীন্দ্রনাথের ১৯৩০ সনে তন্বী, ১৯৩৫ সনে অর্কেষ্ট্রা, ১৯৩৭ সনে ক্রন্দসী, ১৯৪০ সনে উত্তর ফাল্গুনী প্রকাশিত হয়। তারপর সংবর্ত প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সনে। সংবর্ত-কাব্যগ্রন্থে আমরা চল্লিশ-দশকের কিছু কবিতা পাই। প্রতিধ্বনিতে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সনে পরিমার্জিত কবিতাগুলির অনুবাদের তারিখ ১৯৩১ সন থেকে ১৯৪১। দীর্ঘ তের বৎসর সুধীন্দ্রনাথ বড় একটা কবিতা লেখেন না। এই সময়টা কি তাঁর জীবনের বন্ধ্যা-কাল? না, এই সময়ে তাঁকে

কবিতার চেয়ে অন্য একটি ব্যাপারে বেশী ব্যাপৃত দেখা যায় এবং সে-ব্যাপারে তাঁর সার্থকতা নজীর বিহীন। ১৯৪৫-৪৬ সন থেকে সুধীন্দ্রনাথ ও এম. এন, রায়ের যৌথ-উদ্যোগে এবং এম, এন, রায়ের সম্পাদনায় "মার্কসিয়ান ওয়ে' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সন পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু থাকে। তবে শেষ দুই বৎসর পত্রিকাটির নাম বদলে 'হিউমানিস্ট ওয়ে' হয়। ১৯৪১ সন থেকে ১৯৫৪ সনে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এম. এন. রায় এলেন রায় প্রতি শীতকালে কলকাতায় এসে কয়েক মাস কাটাতেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁরা হয় রাসেল স্ট্রীটে সুধীন্দ্রনাথের ফ্ল্যাটে নতুবা স্টোর রোডে আই-সি-এস সুশীল দে'র বাসায় মিলিত হতেন। বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির এত বেশী ফারাক ছিল যে, তারা কেউ খোঁজই রাখতেন না, সুধীন্দ্রনাথ এই সময়টা কী নিয়ে কাটাচ্ছেন! অথবা, সাহেব পাড়ায় ছয় নম্বর রাসেল স্ট্রীটের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার বসবার ঘরে র‍্যাকে সাজানো রাশি রাশি বই দেখে হয়তো সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলার সাহসটুকু হারিয়ে ফেলতেন? সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতা বোঝার ব্যাপারে 'মার্কাসিয়ান ওয়ে'তে প্রকাশিত 'লিবারেল রিট্রোসপেক্ট' এবং 'ফ্রীডম অব এক্সপ্রেশন' প্রবন্ধ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথের দি ওয়ার্ল্ড অব টুইলাইট' নামক ইংরেজী গ্রন্থের সম্পাদনা-কারীদেরও প্রবন্ধ দুটির বিষয় জানা ছিল না। তা না হলে ভূমিকা-লেখক এডোয়ার্ড শিলস নিশ্চয়ই ঐ দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতেন বা প্রবন্ধ দুটি ঐ সংকলনে গৃহীত হত। এম. এন. রায়ের মতো দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, রাজ-নৈতিক ও দার্শনিককে যিনি মার্কসবাদী থেকে মানবতাবাদ-দার্শনিকে রূপান্তরে সাহায্য করেছেন, তিনি যে কত বড় চিন্তানায়ক, তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। মনে রাখা দরকার, এম এন. রায় লক্ষ্ণৌতে সুধীন্দ্রনাথের বন্ধু মার্কসবাদী ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বার বার প্ররোচিত করা সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ কখনও রায়ের সামনে মুখ খুলতে সাহসী হননি। যে-চিন্তানায়ক সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি, তাঁর চিন্তাধারার বিবর্তন কেমনভাবে হল, সে-সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জানা দরকার। তাছাড়া, কবিকে জানলে তাঁর কবিতা বোঝার সুবিধা হয়। সুধীন্দ্রনাথের বাড়ির পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যের কথা সকলেরই জানা আছে। বাবা হীরেন দত্ত ভারতীয় দর্শনে পণ্ডিত হলেও

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিরোধী ছিলেন, ৺প্রফুল্লকুমার সরকারের 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' পড়লে তা জানা যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে বিদেশ-যাত্রায় পাঠালে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরার পরেও তিনি ইউরোপে থেকে যান। অধিকাংশ বুদ্ধিমান শিক্ষিত যুবকের মতো সুধীন্দ্রনাথও যৌবনে রুশ-বিপ্লবের দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও মার্কসবাদী হননি। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের নামে ব্যক্তির বিকাশের পথ বা মতামত প্রকাশের সুযোগ রুদ্ধ করার ব্যাপারে কোনদিন তাঁর মন সায় দেয়নি। ইউরোপ থেকে ফেরার আগে সুধীন্দ্রনাথ জার্মানীতে নাৎসীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। 'হের হিটলার' ধ্বনি দিতে অস্বীকৃতির জন্য তাঁর ঐ লাঞ্ছনা। (দি ওয়ার্ল্ড অব টুইলাইট-এ এডোয়ার্ড শিলস। পৃঃ xvi) জার্মানিতে ইহুদী-নিধনের তাণ্ডবও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ইউরোপ থেকে প্রধানত নাৎসী-বিরোধী হয়েই দেশে ফেরেন। এই সময় রুশ সরকারের নির্দেশে দেশে দেশে কম্যুনিস্টরা ফ্যাশিজয়ের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের রাজনীতি করছে। কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' পত্রিকা বের করেন ওই সময়েই। সুধীন্দ্রনাথ এত বেশী ফ্যাসি-বিরোধী ছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। (এডোয়ার্ড শিলস ঐ। পৃঃ xiv) কিন্তু বেশী বয়সের জন্য তাঁর সে-চেষ্টা সফল হয়নি। তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য এ-আর-পি-তে যোগ দেন। স্টালিন তখনও হিটলারের সুহৃদ। তাই কম্যুনিস্টরা ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন করতে রাজী হয়নি। এই সময়ে এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সমর্থন করত। সুধীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে স্টোর রোডে ও পরে বেহালায় বীরেন রায়ের বাড়িতে এম. এন. রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তার আগে তাঁর একটি লেখায় এম. এন. রায়ের মতামত উধৃত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "মানবেন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে, ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শেষ আস্ফালন হলেও ফ্যাশিষ্ট দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের সমবয়সী এবং কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক ক্রসম্যান ভজিয়েছিলেন যে আসলে প্লেটোই এই অনর্থের জন্মদাতা। ('প্রগতি ও পরিবর্তন (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ২৫৬-৭।) এম. এন. রায়ের জীবিতকালে তাঁর মতামত সুধীন্দ্রনাথের রচনায় দ্বিতীয়বার

দেখি 'ফ্রীডম অব এক্সপ্রেশন' প্রবন্ধে। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিকদের চাঁদনী চকের অফিসে যাওয়ার পর থেকেই সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে এম. এন. রায়ের প্রথমে বন্ধুত্ব এবং পরে তা আরও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি কম্যুনিস্টরা সমর্থন জানালেও তিনি আর কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। পরিচয়-পত্রিকাটি সম্পর্কেও তাঁর আর আগ্রহ থাকে না এবং পরে ওটা কম্যুনিস্ট-মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

তাঁর বাড়িতে তাঁর পরিচয়-গোষ্ঠীর বন্ধুদের সাপ্তাহিক আড্ডা বসলেও ম্যালকম ম্যাগারিজ বলেছেন, ১৯৩৪ সনে প্রায় প্রতিদিন সুধীন্দ্রনাথের আড্ডায় যাঁরা মিলিত হতেন, তারা হচ্ছেন তুলসী গোস্বামী, অপূর্ব চন্দ, শাহেদ সোহরাওয়ার্দি, ম্যালকম ম্যাগারিজ ও সুধীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথের আড্ডায় বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুশীল দে, অবনী চ্যাটার্জি, এম. এন. রায়, লিগুসে এমার্সনও থাকতেন। যামিনী রায়, সত্যেন বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ, বিষ্ণু দে, হীরেন সান্যাল, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রভৃতি তাঁর পুরানো বন্ধুদের কথা তো জানাই আছে। এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে মতামত আদান-প্রদান করেও সুধীন্দ্রনাথ নিজের স্বকীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। অন্যান্যদের চেয়ে সুধীন্দ্রনাথ একদিকে ভাগ্যবান ছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সরাসরি জার্মাণ ও ফরাসীতে বই-পত্তর পড়তে পারেন, অন্য সবাইকে ইংরেজদের চোখে বা ইংরেজী-অনুবাদে। সেই সময় ইংলণ্ডের প্রগতিশীল মহলে রুশ বা কম্যুনিস্ট-বিরোধী কোন লেখাই ছাপা হোত না। জরজ অরওয়েলের স্পেনের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে হোমেজ টু ক্যাটালেনিয়া ছাপতে কী অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, তা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু ইউরোপের ঘটনা জানার জন্য সুধীন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডে প্রকাশিত বইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। কোন কোন ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অরওয়েলের মতামতের মিলও চোখে পড়ে। ম্যাগারিজ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও অরওয়েল, দুজনেরই বন্ধু।

যুদ্ধের পর থেকে সুধীন্দ্রনাথ চারিদিকের অবস্থা দেখে বিশেষ অসুখী বোধ করতে থাকেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধের অবসানে দাঙ্গা, দেশ-ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, গান্ধী হত্যা কীভাবে তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করেছিল, ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত প্রবন্ধে তার কিছুটা আভাস মিলবে। যুদ্ধের সময় জাপানী বোমার আক্রমণে ডকে এক হাজারের ওপর শ্রমিক মারা যায়। কোন সংবাদ

পত্রে সে-খবর সেদিন ছাপা হয়নি। সুধীন্দ্রনাথ কলকাতা-প্রবন্ধেই আমাদের সে-কথা জানালেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতেন, তাই হিন্দু বেশী মরেছে না মুসলমান মরেছে, এ-জাতীয় জঘন্য চিন্তার কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। অনেক আগেই তিনি লিখেছিলেন,

> সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
> সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলা বাঁচা,
> বাঁচা, কেবল বাঁচা।

এই অনুভূতিই তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। তিনি একবার লণ্ডনের স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ বাংলা পড়াবার চাকরির জন্য দরখাস্তও করেছিলেন। (শিলস। ঐ। পৃঃ XX)। তিনি মারা যাওয়ার পরেই তাঁর এই দরখাস্তের কাহিনী জানা যায়।

সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে এমন কিছু লাইন আগেই উধৃত করা হয়েছে। সংবর্তে—কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। বর্তমান অবস্থায় তিনি অত্যন্ত অসুখী। তিনি পরিবর্তন চান। কিন্তু সে পরিবর্তনের রূপ কী হবে অনুমান করতে না পারলে বর্তমানকে ছাড়তে রাজী নন। 'আমগ্ন তরণী ছেড়ে পারি না ঝাঁপ দিতে সাগরের জলে' লাইনটিতে তাঁর মনের ভাব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর অজস্র প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, দোষ গুণ মিলিয়েই প্রতিটি মানুষ। এলিয়ট, যিনি ইংরেজী কবিতার জগতে বিপ্লব এনেছেন, তিনিও গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। সুধীন্দ্রনাথ এলিয়টের চিন্তা-ভাবনাকে নিন্দা করেও কবি-এলিয়টকে শ্রদ্ধা করতেন। মিলটন একদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, অপর দিকে ক্যাথলিক-নিধনকেও সমর্থন জানিয়েছেন। মালার্মে-কে তিনি গুরু বলে স্বীকার করলেও ভিকটর হুগোকে সবচেয়ে বড় ফরাসী কবি বলে মনে করতেন। অথচ হুগোর ব্যক্তিগত নীতি-হীন জীবন সম্পর্কে ব্যঙ্গ করতে পিছপা হননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদি গুরু, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বলতাগুলি একাধিক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এজন্যই তাঁর কাছে প্রতিটি ব্যক্তিই মূল্যবান। একজনের বদলে আর এক জন মানুষের কথা তিনি কল্পনাই করতে পারতেন না। তিনি ঐ একই প্রবন্ধে বলতে গেলে নিজের জীবন দর্শনের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন: A true liberal is a confirmed rationalist who realizing that instructive behaviour is impersonal, bases his individuality on the

integral logic he has taught himself. He, is, therfore, unafraid of opposition which he welcomes. as a corrective to his possible dogmatism ; and since his need is development and not progress, he tends to become a solitary weighing pros and cons of questions wholly outside the scope of absolute answers, consequently, liberals are much better guides,

এ থেকে বোঝা যাবে, কেন তিনি প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন, তাঁর ব্যবহারের মধ্যে মার্জিত রুচি ও নিরহঙ্কার প্রকাশ পেত। তাই তিনি যাঁদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আসলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যারা স্বাতন্ত্র্য খোয়ায়, হয় তাদের ভিতরে ব্যক্তি স্বরূপের বালাই নেই, নয় তারা কার্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত; তাদেরও সঙ্গে তিনি সহজভাবে বন্ধুর মতো মিশতেন। জীবনে একবারই তাঁর রাগের ঘটনার কথা শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক সম্পাদিত একটি কাব্য সংকলনে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বিনা অনুমতিতে ও ভুল ছাপানোর জন্য উকীলের চিঠি দিয়েছিলেন।

এম, এন. রায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা ও জোর তর্কাতর্কির কথা মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে ১৯৬০ সালের ২৫ জানুয়ারি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এম. এন. রায় স্মৃতিসভায় বলেন। তিনি সভ্যতার অগ্রগতির কোন সিদে রাস্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এ-বিষয়ে তিনি লিখেছেন।

…as, in company with whitehead, I believe that in every civilization each real advance has been invariably acheived through sub-ordination of coercion to persuasion, so to me, liberalism is an universal and timeless tendency… liberalism…elevates personality over character, and, whereas the latter is an unsolicited gift of nature passively received, the former is the reward actively won for acquired merit." (The liberal Retrospect in the Marxian Way. Vol. I. P. 12-13).

সমাজের বিবর্তনে আর্থিক সমৃদ্ধির ভূমিকা স্বীকার করেও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে একটি গোটা সভ্যতা বিশ্লেষণ তিনি অসম্ভব মনে করতেন। কারণ সমাজে মানুষের কাজকর্ম, মনোভাব কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয় না। তিনি মার্কসবাদীদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

সম্পর্কে বলেছেন, "…I suspect that the "scientific" determination of the latest school of historians is. at least potentially; as conducive to slavery as the astrological predestination taught by theoratic tyrannies of old." (ঐ, The Marxian way, P. 4,)

কম্যুনিস্টরা ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলে। অথচ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ব্যক্তি অবদমিত করার যে কোন প্রচেষ্টাই সমর্থন করে। এদের সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন. "Since theirs was the gospel of equality arrived at by introspection alone, the intellectuals of the 1920's wasted their spendid substance in freeing the individual in order that the group could accept totalitarianism without compunction.…If there is no god, one must be inverted immediately." (ঐ P-15). মার্কসবাদী থেকে মানবতাবাদীতে রূপান্তরের পর এম. এন. রায়ের দুই খণ্ডের রিজন, রোমানটিসিজম ও রিভোল্যুশন"—গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তঃ কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব

সেটা ছিল ১৯১৪-র মধ্যগ্রীষ্ম, যখন য়োরোপে ছোট্ট একটি যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে অচিরেই মহাদেশের পাঁচটি বৃহৎ শক্তিকে জড়িয়ে ফেললে শীতোষ্ণ নাগপাশে, আর তারপরই দ্রুত-ঘন করতালে পৃথিবী ভ'রে শুরু হ'য়ে গেলো এই শতকের প্রথম প্রধান যথেচ্ছ তাণ্ডব। এতদিনে বিচূর্ণ হ'লো শান্ত, সোনালী, সুখদ, বরদ ও শুভদ উনিশ শতক; একটি আস্ত বিশ্বযুদ্ধ যেন পাল্টে দিলো একই সঙ্গে প্রাক্তন ফিজিক্স আর ফিলসফি।

আকাশ-পাতাল তোলাপাড়ার মধ্যদিয়ে এক নতুন ভুবন জেগে উঠবে—এই মতো ধারণা আলো হ'য়ে ছিলো সব ভালো মানুষের মনে; কিন্তু বিশ্বব্যাপী এইসব স্বপ্নরঙা সুধী-চিত্ত মারাত্মক ভুল বুঝে এক সময় খাঁচার ভিতরে চমকে উঠলো, উদ্যোগের ময়ূরপঙ্খী গতি হারালো বাস্তবের পঙ্ককুণ্ডে এসে; এই বঙ্গভূমিতেও প্রতিশ্রুত বিপ্লব চিন্ময় মেরুদণ্ড ভেঙে ফিরে এলো। অর্থনৈতিক মায়াদণ্ড পৃথিবী ভ্রমণে বেরোলো :—ক্ষুধা ও আশরফির কিমাকার দ্বৈতনৃত্য; 'বুম' যেন ক্ষুৎকাতর মানুষেরই স্বপ্নের ফানুষ, স্বপ্ন তবু সত্যও বটে : মুদ্রা আর মাংস, উল্লাস আর সম্ভোগ, হীরের ঝড় আর খুশীর চীৎকার, 'কাল ছিলো ডাল খালি, আজ গেলো ফুলে ভরি।'

তখন কে জানতো ঐ আলো মৃত্যুর আগে মুমূর্ষুর শেষ জ্ব'লে ওঠা। শেয়ার মার্কেট আছড়ে প'ড়ে শতচূর্ণ হ'য়ে গেলো, হাজার বাতির ঝাড় লণ্ঠন গেলো এক ফুঁয়ে তমসায় তলিয়ে, দেখা দিলো 'গ্রেট ক্র্যাশ' তথা নিরালম্ব শনির সময়। সদাগর, স্বৈরাচারী আর এক নায়কের একচ্ছত্র শাসনের তলায় হীরের ভিতরকার বিষের মতো লুকিয়ে ছিলো দারুণ যে-সংকট এবার তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূর্তি ধরে বেরিয়ে এলো; এসে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যার ভিৎ ফাটিয়ে দিয়েছিল, সেই দ্বিধা-টলোমলো বিশ্বাসের মাটি দিলে একেবারে সরিয়ে; 'ধর্মনামক বিশ্বাসের যে-দুর্গে অন্তিম এতকাল ছিলো মানুষের আশ্রয়, তাও ধ্ব'সে পড়লো; প্রাক্তন পৃথিবীর যাবতীয় তরু ও প্রদীপ ও জল ছেড়ে দিয়ে অন্য এক পাতাশূন্য গাছ ও বিমর্ষ আলো ও ঘোলা ডোবার শোচনীয়তায় এসে উপস্থিত হলো এই গ্রহের মানুষ।

যেহেতু কোনো লেখকই সময়সীমা ও দেশ পরিধির বাইরের অধিবাসী নন, অতএব স্বভাবতই তাঁর উপর কালের শাসন প'ড়ে থাকে। অন্যান্য দেশের মতো, বাংলা ভূমির কবি-কথকদের উপরেও এই সময় শাসন লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিক ভাবেই। বিশ-শতকীয় বাংলা কাব্যের তিন প্রধান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ—উপযুক্ত সময়কে ছুঁয়ে আছেন, ঐ যুগের স্বাক্ষরও আছে তাঁদের রচনা ধারায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত[১] ছিলেন 'বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী', 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে' বেড়ে উঠেছেন, 'বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি' দেখেই হয়তো তাঁর হাত থেকে আস্তে আস্তে ঝড়ে পড়েছে 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস।' অবশ্য, একথা কখনোই বলা যাবে না যে, এই কবি নিছক সময়ের দান; কোনো শিল্পীই তা হ'তে পারেন না—তাঁর সমকালে অন্য যেসব কবি কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর মানস ও কবিতার ব্যবধানই তা'হলে সম্ভব হ'তো না। কবির রচনা ধারায় সময়ের ছাপ স্পষ্ট, তত্রাচ একথা কখনোই বলা যায় না সময়ই কবিতার ছাঁচ গড়ে তোলে। বস্তুত কোনো এক অলৌকিক, অচেনা আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপই কবিতার জন্মদাত্রী।

বাংলা কাব্যে নৈরাশ্যবাদ

কবির বাল্যবেলা কেটেছে যুদ্ধের নান্দীরোলের ভিতর, দেশে ও বিদেশে এক প্রবল ঝটিকা যখন পণ করে বসেছে সনাতন মানবচিত্তকে সে বিদীর্ণ করবেই। কিন্তু কেবলমাত্র বহির্জগতের সাধ্য নেই কবির কাব্য নিরূপণের। তা'হলে তাঁরই সমকালীন বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ কিভাবে কালো সময় প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন? বুদ্ধদেবের নির্দ্বন্দ্ব নন্দন সর্বস্ব স্নিগ্ধতা, অমিয় চক্রবর্তীর ঈষদ্ বিদীর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও বিষ্ণু দে-র উদ্বেল বিশ্বাস কিভাবে সম্ভব হলো? একমাত্র জীবনানন্দ দাশের সঙ্গেই তাঁর মনোজগতের কিছু ঐক্য দ্রষ্টব্য: জীবনানন্দ সারা জীবন ক্লান্তির কথা বলেছেন। তারই ফলে ধরা দিতে চেয়েছেন 'স্বপ্নের হাতে'; সুধীন্দ্রনাথের মতোই মৃত্যু কামনা করেছেন, অবশ্য জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' এরকম আশাই রেখে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথের এই নিখিল নিবিড় নৈরাশ্যের পিছনে কারণ ছিল একাধিক: ঐ শনিতে-পাওয়া সময়, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আর সর্বোপরি তাঁর কবি হৃদয়ের উন্মুখিতা সত্যিকার অন্তঃপ্রেরণা না

থাকলে ঐ নিরাশাকে তিনি আজীবন আগলে রাখতে পারতেন না। তত্রাচ, কোনো কবিই স্বয়ম্ভু নন, প্রথমত কোনো কবিকে যতই অভিনব লাগুক একটু মনোযোগ দিলেই তাঁর পিছনে অন্তত কিছুকালের রচিত ইতিহাস দেখা যাবে। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথই এই নৈরাশ্যের প্রথম শিকার নন, এবং তা নিতান্তই বিদেশ বাহিতও নয়: এই স্বদেশই, তাঁর পূর্বে ও সমকালে অন্তত কোনো কোনো কবি, অন্তত কোনো কোনো সময়ে এই নৈরাশ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরিপূর্ণ আশাবাদী ছিলেন—এ কথা মানতে আমি প্রস্তুত নই। সত্য, উনিশ শতকী উজ্জীবনের দিনে তাঁর জন্ম, এবং তাঁর রচনাতেও প্রচুর উজ্জ্বল সাক্ষ্য আছে তার; তবু তাঁর মনোজগৎ যেখানে বিদীর্ণ, সেখানে তিনি বিশ শতকী নাগরিক আমাদেরই একজন, এবং তাঁর বিদ্রোহ যদি অধিকতর অন্তর্ময় ও 'সাহিত্যিক হতো, তাহ'লে তিনি নিরন্তর যে-অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন, যে 'আশার ছলনে' পতিত হয়েছিলেন, তা দুরতিক্রম্য ও নৈরাশ্য-নিবিড় হ'তো সন্দেহাতীত ভাবে। মাইকেলের কোনো প্রতিভাবান অনুসরিক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি— হেম-নবীন-কায়কোবাদ শুধুমাত্র প্রতারক বহিরঙ্গের ছদ্মবেশে ম'জেছিলেন—তা না হলে তাঁর অজাত সন্তানের ভিতরে উপযুক্ত মনোভাব প্রকাশ পেতে পারতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাট প্রভাবই হয়তো সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল; এবং তাই যত দিনে সূর্যাস্ত হ'লো তারপরে মাইকেলের ঐ আভ্যন্তরীণ প্রভাব আধুনিক পোষাকে মুড়ে এসে সুধীন্দ্রনাথে ফ'লে উঠল।

বস্তুত, উক্ত লুক্কায়িত নৈরাশ্য বাদ দিলে, বাংলা ভূমির সমগ্র উনিশ শতকী সাহিত্য শতবিচিত্র মঙ্গলের প্রসঙ্গে উন্মুখর। রবীন্দ্রনাথ, কিন্নরকণ্ঠ, এসে ঐ কল্যাণের মন্ত্র—একান্ত বাংলা ভূমির কল্যাণের মন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন বিশ্ব সংসারে। পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসেন, এই একটি কথাই কতবার কত ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, আশি বছর ধ'রে বললেন বারবার 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই', ক্লান্তি হীন পুনরাবৃত্তিতে এক জীবনে শুধু ভালোবাসা তাঁকে রোজ রোজ জন্ম দিয়ে গেলো। শুধু কল্যাণ—মঙ্গল ভালো, শুধু সুখদ ভাবনার অত্যধিক প্রজননেও ক্লান্তি তাঁকে পেড়ে ফেলতে পারলো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুখের বিষয়, আমার পূর্বোক্তিই অসাধ্য হ'তো এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মহত্বলাভ করাতে

পারতেন না, যদি না তিনি উত্তর-জীবনে হঠাৎ-প্রায় হঠাৎ জীবনের অন্য একটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে উঠতেন : চিত্র পর্যায় ; 'সে', 'খাপছাড়া,' ও 'গল্প সল্প' ছোটদের উদ্দিষ্ট এই তিনটি গ্রন্থ, ল্যাবরেটরি' গল্পটি ; 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাস ; 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ ; একেবারে শেষ জীবনের কোনো কোনো কবিতা। উনিশ-শতকী বাস্তবতা ও সৌন্দর্যধ্যান থেকে মধ্য-বিশ শতকের অবচেতনা পর্যন্ত তাঁর মহাকবির হাত প্রসারিত হ'লো অন্ত-জীবনের নিরর্থ সুন্দর কাটাকুটিতে কি দুঃস্বপ্নপ্রতিম চিত্র পারম্পর্যে : চাঁদ, গোলাপ ও নারীর মুখের কবি এক ভীষণ-সুন্দর ভূতলাবাসের ইতিকথা রচনা ক'রে দিলেন—যা দেখলে আমাদের রক্তে ভিতরে ভয় করে।—তবে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনিও মানুষ, প্রাণপণে চাপাদিয়ে রেখেছিলেন নিজের একটি অংশ, যা, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে হঠাৎ বেরিয়ে এলো নিগূঢ় ভিতর থেকে" 'ল্যাবরেটরি' ও 'চার অধ্যায়ের' কোনো কোনো অংশ যৌনতায় আরক্ত হ'য়ে উঠলো। 'সে', 'খাপছাড়া' ও 'গল্পসল্পে' মহাকবির সমুদ্রপ্লাবী করুণা মুখ ফিরিয়ে থাকলো, আদর্শ রোধে ও পবিত্র ঘৃণায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তাঁর রচনা, দেখলেন : 'সিভিলাইজেশনের সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের', এমনকি এমন কথাও তাঁর মনে হ'লো, 'মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা'। এই সব রচনার জন্য—তাঁর অন্তর্জীবন যেমন, তেমনি তাঁর সমকালও সমান ভাবে দায়ী। একদিন দেখেছিলেন 'জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা', তারা যে কী সর্বনেশে সন্তান এতদিনে বুঝতে পারলেন যেন। তাঁর পক্ষে আশ্চর্য 'মালঞ্চ' উপন্যাস রচনা করলেন, বৈবিক মালঞ্চে বুঝি বিষপুষ্প ফুটে উঠতে চাচ্ছে তখন—নির্মম ঐ গ্রন্থ, দয়াহীন তার কুশীলবেরা : আদিত্য, নীরজা, সরলা সকলেই তাই, তার উপসংহার ক্ষমাহীন :

> 'হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অদ্ভুত গলায় বললো, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত"। ব'লেই প'ড়ে গেল মেঝের উপর।'

এই মনই ভীষণ রেগে উঠেছে 'সভ্যতার সংকট' নামক বহ্নিমান প্রবন্ধে :

> 'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে-বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হ'য়ে গেল।'

কোনো কোনো কবিতায় 'কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত' উঠেছে ঘনিয়ে, দেখলেন ততই সৃষ্টির পথ আকীর্ণ হয়ে রয়েছে বিচিত্র ছলনা জালে :

রূপ নারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য সে কঠিন
কঠিনেরে ভালো বাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যে কজন কবি তাঁর সর্বগ্রাস থেকে নিজেদের কোনো রকমে স্বতন্ত্র রূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন : নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। স্মরণীয় তিরিশের কবিরা প্রথমাবস্থায় এই সব বিধর্মীদের শরণ নিয়েছিলেন। নজরুল বলীয়ান যৌবনের, মোহিতলাল তীব্র দেহবাদের ও যতীন্দ্রনাথ তিক্ত দুঃখবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কোনো দিক থেকেই মিল নেই, এবং শেষোক্তের তুলনায় প্রথম জন অনেক অগভীর। অথচ, যতীন্দ্রনাথের নাম এ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই প্রথম স্পষ্টভাবে তির্যক-ভাবে মানব জীবনকে দুঃসহ নৈরাশ্যের কথা বলেন—অবশ্য তা জীবনের উপরিস্তরের, বাস্তবতার ; তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' 'মরুমায়া' ইত্যাদি নামের মধ্যেই তাঁর 'জীবন দর্শন' বিম্বিত।

তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি ও বাংলা কাব্যেতিহাসের অন্যতম প্রধান, জীবনানন্দ দাশও[২] অফুরান নৈরাশ্যের অধিগত হয়েছিলেন, তার চিহ্ন ছড়ানো আছে তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের অন্তরে ; হয়তো সেজন্যেই তিনি বাংলাদেশের নামে এমন এক অসম্ভব দেশে বাস ক'রে গেছেন যা মানচিত্রে অদৃশ্য। অবশ্য কোনো কবিই মানচিত্রের জগতে অবস্থান করেন না, তাঁরা মনোজগতের

অধিবাসী। যে সর্বাত্মক বিনষ্টির অমর গল্প বেদনাময় রেখায় ধরা পড়েছে তাঁর সূক্ষ্ম তুলির আখরে, যে মৃত্যু চৈতন্যে তিনি সারা জীবন ক্ষ'য়ে গেছেন ভিতরে ভিতরে, অবিরল যে ক্লান্তির কথা বলেছেন—তারাই সমবেত হ'য়ে এসে সাক্ষ্য দিয়ে যায় যে তিনি এ কালেরই পতিত বাসিন্দা।

---

(১) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: জন্ম, ১৯০১। কাব্য, তন্বী, ১৯৩০; অর্কেস্ট্রা, ১৯৩৫ ক্রন্দসী, ১৯৩৭; উত্তর ফাল্গুনী ১৯৪০; সংবর্ত ১৯৫৩; দশমী, ১৯৫৬; প্রবন্ধ: স্বগত, ১৩৪৫, ১৩৬৪; কুলায় ও কালপুরুষ ১৩৬৪। মৃত্যু, ১৯৬০।

(২) ১৩৫২ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: 'তিনি আধুনিক বাংলাকাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশা করোজ্জ্বল চেতনা। ...আধুনিক সাহিত্যের প্রায় বারো আনা তথাকথিত প্রাগ্রসর কবিতার চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা অনেক বেশী প্রবীণ; তাঁর নিজের এষণার কবিতালোকে তিনি আধুনিক প্রায় সকল কবির চেয়েই বেশী আন্তরিক নন কি?

['উত্তর রৈবিক বাংলাকাব্য', 'কবিতার কথা', জীবনানন্দ দাশ]

এই রচনার দ্বিতীয় অংশ পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত হবে।

অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

সুধীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট

"To write poetry which should be essentially poetry, with nothing poetic about it, poetry standing naked in its bare bows, or poetry so transparent that we should not see the poetry, but that which we are meant to see the poetry, poetry so transparent that in reading it we are intent on what the poem points at, and not on the poetry, this seems to be the thing to try for. To get beyond poetry, as Beethoven, in his later works, strove to get beyond music." টি. এস. এলিয়ট

কবি সুধীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কি ?

এর উত্তর 'কুক্কুট'।

'কুক্কুট প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজে কবিতাটি ছাপাবার জন্যে সুপারিশ করে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একদিন পরিহাসের সুরে সুধীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, মোরগের ওপর কবিতা লেখ। সুধীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন, তিনি মোরগের ওপর কবিতা লিখবেন এবং সেই কবিতাটি কবিগুরুর মনোনয়ন পাবে।

তারপর কটা দিন কেটে গেছে। সুধীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছেন, কবিতার নাম দিয়েছেন 'কুক্কুট'। তিনি কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি সুধীন্দ্রনাথকে বললেন, তুমি জিতেছ, এরপর তিনি 'কুক্কুট' পাঠিয়ে দিলেন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদকের কাছে।

সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'কুক্কুট' আর টি. এস. এলিয়ট লিখেছেন 'হিপোপটেমাস'। এলিয়ট বলেছিলেন, কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই এটি পড়ে অবাক হন, অবশ্য পরে সব ঠিক হয়ে যায়। এলিয়ট হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের ছেলে এলিয়ট। কেউ খবর রাখেনা তিনি সাহিত্যচর্চা করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এলিয়ট সম্বন্ধে বললেন, he was recognised as able and witty, not influential. at the time, rather aloof and silent.

হার্ভার্ড অ্যাডভোকেট পত্রিকা প্রকাশিত হল। পত্রিকার সম্পাদক হন

টি. এস. এলিয়ট। তিনি অ্যাডভোকেট পত্রিকায় কবিতা লিখতে স্থরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতার নাম 'Song'। পরের কবিতাটির নাম "Before Morning।"

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরম আগ্রহের সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা টি. এস. এলিয়ট সংস্কৃত শেখেন, তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পড়াশোনা করেন। এলিয়ট চার্লস ল্যানমানের কাছে সংস্কৃত এবং জেমস্ উডের কাছে পতঞ্জলির মেটাফিজিকস পড়াশোনা করেন। তিনি এক বক্তৃতায় মন্তব্য করেন, Two years spent in the study of sanskrit under Charles Lanman and a year in the mazas of Patanjalis' metaphysics under the guidance of James woods, left me in a state of enlightened situation.

এলিয়ট গভীর আগ্রহের সঙ্গে দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি দর্শনের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে তিনি ইংলণ্ড থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। এলিয়ট কবি হতে চাইলেন। তিনি কবি এজরা পাউণ্ডের পরম ভক্ত ছিলেন।

কবি সুধীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯০১ সালে। তাঁর বাবার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক ও এ্যাটর্নী। সুধীন্দ্রনাথ কাশীতে অ্যানি বেশান্তের কাছে সংস্কৃত শেখার সুযোগ পান। তিনি ১৯১৮ সালে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯২২ সালে সুধীন্দ্রনাথ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। বাবা মনে মনে চেয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ অ্যাটর্নী হবেন কিন্তু সরস্বতীর পরম আশীর্বাদ নিয়ে যিনি পৃথিবীর শ্যামল মাটিতে এসেছিলেন তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপি হাতে ধরবেন কেন ?

১৮৮৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে টমাস স্টার্ণস এলিয়টের জন্ম। এলিয়টের মা ছিলেন সুকবি। তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন। তিনি গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং শিক্ষকতা করতেন। ১৯০৬ সালে এলিয়ট হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১০ সালে তিনি এম. এ. পাশ করেন। তিনি ভালভাবে গ্রীকভাষা শেখেন। এলিয়ট ল্যাটিন পরীক্ষায় সোনার মেডেল পান। তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তিনি বার বার দান্তের 'ডিভাইন কমে'ডি পড়েন। এলিয়ট জার্মান ও ফরাসী ভাষা ভালভাবে শেখেন।

কবি সুধীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: "যারা কবিতাকে ছুটির সাথী বলে ভাবে, কবিতার প্রতি ছত্র পড়ে হৃৎকম্পন অনুভব করতে চায়, তাদের কবিতা না পড়াই উচিত।...ভাব শুধু মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলন ইত্যাদি জরাজীর্ণ শব্দের করতলগত নয়, শুধু প্রেম বেদনা ও প্রকৃতিকে নিয়েই কাব্যের কারবার চলে না, তার লোলুপ হাত দর্শন বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে। আজকের এই 'বিশেষ জ্ঞানের' দিনে কাব্যের তরফ থেকে আমি পাঠকের কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন ভিক্ষা করি যেটা সাধারণতঃ অর্পিত হয় অন্যান্য আর্টের প্রতি।"

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'তন্বী'। বাংলায় ১৩৩১ সালে 'তন্বী' প্রকাশিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। সুধীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভূমিকায় লেখেন: রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে লজ্জিত নই। কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে চোরকে পাপের পথে ডাকে সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। এই লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তারিত এইখানে দিতে পারলে হয়তো, মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত। কিন্তু সে লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ।

রবীন্দ্রনাথ 'তন্বী' পড়ে খুশি হন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ, ভাষা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কবি সুধীন্দ্রনাথকে লিখেছেন তোমার কবিতাগুলি হঠাৎ আমার মনটাকে বাংলামুখো করে দিলে। চলেছিলুম একেবারে উল্টো দিকে। ভালো লাগল। ছন্দে ভাষায় ব্যঞ্জনায় লেখাগুলি বেশ জমাট হয়েছে।

১৯২০ সালে এলিয়ট তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'The waste Land' উৎসর্গ করার সময় লেখেন, there is no more useful criticism and no more precious praise for a poet than that of another poet. প্রথমেই কবি স্মরণ করেছেন এক শহরকে যে শহরকে তিনি অবাস্তব বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই শহরই লণ্ডন শহর। একজন সমালোচক এলিয়টের দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডকে বলেছেন এ মিউজিক অফ আইডিয়াজ।

Unreal city,
Under the brown fog of a winter dawn,

A crowd flowed over London bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.

এলিয়ট যখন দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড লেখেন তখন তিনি অসুস্থ। তাঁর শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু তিনি লেখায় কিছুমাত্র অবহেলা করেন নি। তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্য লিখে গেছেন। এলিয়টের মা কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি বলেছেন, সুলিখিত কাব্য। আর কবি এলিয়ট নিজে বলেছেন, that it is big, that it is new, that it contains the germs of colossal growth. এলিয়টের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম Four Quartets। চারটি কবিতা রয়েছে ফোর কোয়ার্টেটস্ গ্রন্থে। চারটি কবিতার নাম বার্ণ ট নর্টন, ইস্ট কোকার, দি ড্রাই সালভেজেস আর লিটল গিডিং।

'অর্কেষ্ট্রা' সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩৪ সালে অর্কেষ্ট্রা প্রকাশিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ অর্কেষ্ট্রা বইখানা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে এক চিঠিতে লেখেন, "আমার নতুন বইখানার মধ্যে প্রশংসার কোনো কারণ যদি সত্যিই আপনার চোখে পড়ে থাকে তাহলেও তার জন্যে আমার আত্মপ্রসাদ অশোভন। কেননা এবারেও আপনার ছন্দ, আপনার শব্দ, এমন কি আপনার পদ ভেঙ্গে-চুরেই আমি আমার কবিতাগুলো লিখেছি; এবং এই ভাঙ্গাভাঙ্গির পরেও যদি অর্কেষ্ট্রায় রূপের সন্ধান মেলে তবে আমার গুণ গাইলে চলবে না, বলতে হবে আপনার সৌন্দর্যসৃষ্টিই অবিনশ্বর। শত রকমের ভাগ বাটোয়ারাতেও তার মর্যাদা ঘোচে না, বরং তারই অমৃত স্পর্শ পারিপার্শ্বিক আবর্জনাকে ঐশ্বর্যবান করে।"

তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়;
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারই তনুর মদিরা ভরা;
পথপার্শ্বের অপরাজিতা সে
তোমারই দৃষ্টি লক্ষ্যহরা 'চপলা' অর্কেষ্ট্রা'

সুধীন্দ্রনাথ কবি। তিনি প্রবন্ধশিল্পী। টি. এস. এলিয়ট কবি। তিনি প্রবন্ধশিল্পী। এলিয়ট বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সবক'টি প্রবন্ধই সুচিন্তিত। তাঁর ভাষা সহজ, সরল, সুমার্জিত, কলাসম্মত। তাঁর মহাকবি দান্তের

ওপর লেখা প্রবন্ধ 'দান্তে' কবি ড্রাইডেনের ওপর লেখা প্রবন্ধ 'জন ড্রাইডেন, কবি বোদলেয়ারের ওপর লেখা প্রবন্ধ 'বোদলেয়ার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থটির নাম 'স্বগত'। ১৩৪৫ সালে 'স্বগত' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'স্বগত'এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন সম্প্রতি 'স্বগত' নাম দিয়ে আমি এক বই বের করেছি যাতে আমার গদ্য লেখার কতকগুলো পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। জানি আমার গদ্য দোষবহুল, এবং সেইজন্যে তা কোনোদিনই আপনার অনুমোদন পায়নি। তবু আপনার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন না করলে সকল বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনাই পণ্ড হতে বাধ্য। তাই এক কপি স্বগত আপনাকে পাঠিয়েছিলুম...।

টি. এস. এলিয়ট ও সুধীন্দ্রনাথ দুজনেই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দুজনেই সম্পাদক দিলেন। এলিয়ট যখন কলেজের ছাত্র তখনই তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাস থেকে 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। 'পরিচয়' ছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে লিখেছেন তোমার কাগজখানি বেশ মর্যাদাবান হয়ে দেখা দিয়েছে—কালিদাস আষাঢ় সম্বন্ধে যে বর্ণনা করেচেন সেটা একে মানায় —সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ। এই উন্নত ধ্বনিতে যাতে স্বর ঠিক থাকে তা চেষ্টা করতে হবে।"

শুভ মুখোপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথ : পরিচয়লিপি

দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি, তত বুঝছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথি বৎসল ['পুনশ্চ', 'স্বগত', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট: আমিও .মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমন কি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে-অনুসন্ধানও হয়তো কোন কোন কবিতায় রয়েছে; এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দো ব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানন্তীন ঘটনা ঘটন। [মুখবন্ধ, 'সংবর্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

তাঁর নিজের এষণার কবিতালোকে তিনি আধুনিক প্রায় সকল কবির চেয়েই বেশী আন্তরিক নন কি? —সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

['উত্তর রৈবিক বাংলাকাব্য' কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ]

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন এক আবহমান প্রোজ্জ্বল স্তম্ভ। পাণ্ডিত্য ও কাব্যচেতনাকে সমাহারে বেঁধে দেওয়ার জন্য যাঁর শিল্পের কথা বাংলায় কিংবদন্তী হয়ে আছে সেই প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভাস্বর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমগ্র রচনাবলীর নাম, প্রথম প্রকাশ সন ও জীবনপঞ্জী নিম্নে উল্লিখিত হলো।

রচনাবলী

কবিতা : তন্বী : প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৭ (১৯৩০)

অর্কেষ্ট্রা : প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫

ক্রন্দসী : প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৪ (১৯৩৭)

উত্তর ফাল্গুনী : প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৭

সংবর্ত : প্রথম প্রকাশ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২

প্রতিধ্বনি : হিউ মেনাই, জন্ মেস্‌ফীল্ড্, সীগফ্রিড্ সসুন্ ডি-এইচ লরেন্স্, সি ফীল্ড্, উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র [ইংরেজী] হান্স্ কারোসা, হাইন্‌রিখ হাইনে, য়োহান্ ভোল্‌ফ্‌গাংগ্ ফন্ গ্যেটে [জার্মাণ] পোল ভালেরি, স্তেফান মালার্মে [ফরাসী] এর কবিতার অনুবাদ গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশ; ১৩৬১ (১৯৫৪)

দশমী : প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ : প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯ (১৯৬২),
সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা : প্রথম প্রকাশ ১৯৭০

The world of Twilight [Essays and Poems] with a foreward by Malcolm Muggeridge and introduction by Edward A. Shills. Published by Oxford University Press in 1970. Price Rs. 40·00

প্রবন্ধ : স্বগত : প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ ১৩৬৪
কুলায় ও কালপুরুষ : প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইংরেজী প্রবন্ধ :

1. The New war (1933)
2. The Art of Jamini Roy (Longmans Miscellany, 1943)
3. The Liberal Retrospect (The marxian way, 1945)
4. Freedom of Expression (1946)
5. Bengal To-day (Thought, April, 1949)
6. World Cities : Calcutta, (Encounter, June, 1957)
7. Hugo and others (Quest, July.-Spt, 1960)
8. Tagore as a Lyric Poet (Quest, Tagore Number, April-June 1961)
9, M. N. Roy in 'M. N. Roy : Philospher-Revolutionery' Edited by Shibnarayan Roy (1956)

জীবনপঞ্জী

জন্ম : ৩০ অক্টোবর, ১৯০১। কলকাতা। পিতা : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; মাতা : ইন্দুমতী বসুমল্লিক।

শিক্ষা : অ্যানি বেসান্ত-প্রতিষ্ঠিত থিয়সফিক্যাল হাইস্কুল, বারাণসী, (১৯১৪-১৭), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি (কলকাতা) (১৯১৭-১৮) ম্যাট্রি-কুলেশন, ১৯১৮। স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৯১৮-২২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে এম. এ, ১৯২২-২৩, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ১৯২২-২৪; বাবার কাছে অ্যাটর্নিশিপ শিক্ষানবীশী,

১৯২২-২৭। এম. এ, বি. এল বা অ্যাটর্নিশিপ কোন পরীক্ষাই দেননি।

বিদেশ যাত্রা : প্রথমবার—ফেব্রুয়ারী-ডিসেম্বর, ১৯২৯ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ; একাকী য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ।

দ্বিতীয়বার—এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ : য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ।

তৃতীয়বার—১৯৫৫-৫৬ : য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ।

চতুর্থবার—১৯৫৭-৫৯ : জাপান, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত মাস কাটান)

বিবাহ : প্রথমবার—শ্রীমতী ছবি বসু। ২২ জুলাই ১৯২৪। (১৯২৫ সালের মে মাসে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, জন্ম মুহূর্তেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে)।

দ্বিতীয়বার—শ্রীমতী রাজেশ্বরী বাসুদেব, ২৯মে, ১৯৪৩।

সাংবাদিকতা : 'ফরোয়ার্ড' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে অবৈতনিক কাজ, ১৯২৮-২৯। স্টেট্‌স্‌ম্যানের সহকারী সম্পাদক, ১৯৪৫-৪৯।

"পরিচয়" প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৩৮ (১৯৩১)। ত্রৈমাসিক অবস্থায় পাঁচ বছর ও মাসিক অবস্থায় সাত বছর সম্পাদনা করেন। ১৩৫০ সালের আষাঢ়ের পর সম্পর্কত্যাগ। ১৯৩২ সালের আগে সবুজ পত্রের নব পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এম. এন. রায়ের সঙ্গে যুগ্ম উদ্যোগ : এম. এন. রায় ও সুধীন্দ্রনাথ যুক্ত-উদ্যোগে (১৯৪৫-১৯৫২) ইংরেজী ত্রৈমাসিক "দি মার্কসিয়ান ওয়ে" (সম্পাদক এম. এন. রায়) প্রকাশিত হয়। শেষ দুই বছর পত্রিকাটির নাম বদলে "দি হিউমানিস্ট ওয়ে" রাখা হয়।

অন্যান্য কাজ : ১৯২৯ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে প্রচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। লাইট অব এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত : ১৯৩০-৩৩। এ. আর. পি : ১৯৪২-৪৫। ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক ওপিনিয়ন এর কলকাতা শাখার পরিচালক : ১৯৫৪-৫৬। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক : ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৯-৬০। ১৯৫৪ সাল থেকে এম. এন. রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এম. এন. রায়ের স্মৃতিকথার কয়েকটি অধ্যায় সম্পাদনা করেন।

মৃত্যু : অতিশিথিল অতি তরল কাব্য রচনার দেশে ভাবসংহতি এবং বিন্যাসের সচেতন কারিগর সুধীন্দ্রনাথ ১৯৬০ সালের ২৫ জুন পরলোকগমন করেন।

স্বরূপ জানার ইচ্ছে :

আপনারে অহরহ খুঁজি।
কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রম্ভালাপে বুঝি,
অন্বিষ্ট সে নয়।—

(সন্ধান, ক্রন্দসী, প্রথম সং, ১৩৪৪ সাল)

যেখানে তাঁর সোহংবাদের সুরু 'ক্রন্দসী'তে পরিসমাপ্তি 'দশমী'তে সেখানে কখনোই তিনি বিক্ষিপ্ত হন নি, শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল একই। আপতিক দৃষ্টি বিস্তারে এ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে তাঁর ঝোঁক ছিল বিদেহ শব্দের প্রতি। তাই এক মৌল বিষাদগ্রস্তরূপ ও ব্যাসকূটের ব্যবহার অন্যভাবে Syllogistic Pattern তাঁর হাতে এত নিপুণ। নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সুধীন্দ্র-রচনা সমগ্রের সংগোপনে এলে কেবলমাত্র বৌদ্ধ দর্শন নয়, বরং পশ্চিমী অস্তিত্ববাদীদের কথাই মনে পড়ে বেশী। বিপর্যস্ত নয়, স্থির প্রজ্ঞায় বীজ শব্দের এই অধিকারীর সামনে রাখা অন্তরাল তাই আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে।

তারাপদ লাহিড়ী

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কংগ্রেসে গান্ধী নেতৃত্বের অভ্যুদয় ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক রূপপরিবর্তন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক'লকাতায় লালা লাজপত্ রায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ ঐ সময় থেকে কংগ্রেস সংগঠনের উপরে বুদ্ধিজীবি বক্তৃতাবাগীশ নেতাদের কর্তৃত্বের যুগ শেষ হয়। এই অধিবেশনে, অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তার ফলে প্রাক্তন বুদ্ধিজীবি নেতাদের অনেকেই কংগ্রেস থেকে দূরে স'রে যান্—এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের যে নরমপন্থী অংশ "মডারেট" নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস "স্বরাজের" দাবীতে ভারত-ব্যাপী গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এই সময় থেকেই জনসাধারণের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিন মাস পরে, ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে, নাগপুরে সিংবিজয় রাঘব আচারিয়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে, এবং ঐ অধিবেশনে কংগ্রেসের গঠনবিধি সম্পূর্ণরূপে পাল্‌টে দেওয়া হয়। নূতন গঠন বিধি কংগ্রেসকে প্রকৃত গণ-সংস্থায় পরিণত করে। নূতন গঠনবিধিতে নিয়ম করা হয় যে, যে কোন ভারতবাসী কংগ্রেসের উদ্দেশ্যপত্রে স্বাক্ষর করে বার্ষিক চা'র আনা চাঁদা দিলেই কংগ্রেসের সভ্য হ'তে পারবেন। এবং এই সভ্যরাই ভোটের দ্বারা কংগ্রেসের স্থানীয় কমিটি, মহকুমা কমিটি, জেলা কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশের নির্দিষ্ট কোটা অনুসারে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হবে' এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলির ভোটে (অর্থাৎ প্রতি প্রাদেশিক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে একটি ভোট হিসাবে বিবেচনা ক'রে-এ প্রকার ভোটের সংখ্যাধিক্যের বনিয়াদে) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবেন—এবং তিনি সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার পর একবৎসরকাল—(অর্থাৎ পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত) কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রধানরূপে

কাজ করবেন। তিনি তাঁর মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবেন। এই ওয়ার্কিং কমিটিই হবে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদ—যদিও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সমূহ ওয়ার্কিং কমিটির উপর বাধ্যকর হবে। এই সকল নিয়ম করা হয়।

খিলাফৎ আন্দোলন

এই সময়ে খিলাফৎএর ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন। খিলাফতের সমস্যা ছিল সমগ্র মুসলিম জাহানের ধর্মীয় সমস্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। যুদ্ধান্তে মিত্রশক্তিবর্গ শাস্তি-স্বরূপে প্রাক্তন তুর্কীসাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেন। তুর্কীর সুলতান্ সমগ্র মুসলিম জগতের খালিফারূপে স্বীকৃত ছিলেন। মিত্রশক্তির ব্যবস্থায় খাস তুর্কীরাজ্য প্রায় ইংরাজের অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। খালিফার পদমর্যাদার অবনতি ঘটানো হয়। তা ছাড়া মুসলমানগণের কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান তুর্কীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অমুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। মক্কা, মদিনা প্রভৃতি পবিত্র ঐতিহাসিক তীর্থস্থানগুলি ইংরাজের তাঁবেদারীর অধীনে নবগঠিত হেদাজ রাজ্যের (Kingdom of Hedaj—) অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানে যে আন্দোলন গ'ড়ে ওঠে—তারই নাম খিলাফত্ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী এই খিলাফত্ আন্দোলন সমর্থন করেন—এবং খিলাফতের প্রতি অবিচারকে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কারণ ব'লে ঘোষণা করেন। এ'র ফলে মুসলিম রাজনীতিরও পটপরিবর্তন ঘটে—এবং প্রচুর সংখ্যক মুসলমান জাতীয় কংগ্রেসে এবং কংগ্রেস-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। নিখিলভারত খিলাফত্ কমিটি, নিখিলভারত মুসলিম লীগ এবং জমিয়াত্-উল্-উলেমা-ই-হিন্দ্—এ সকল প্রতিষ্ঠানও কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করবার জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান্। ভারতী'য় রাজনীতির ইতিহাসে কংগ্রেস, ও মুসলিমলীগের একতাবদ্ধ সংগ্রামের এটাই প্রথম ও শেষ ঘটনা। মুসলমানগণের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জমিয়ত-উস্-উলেমা-ই-হিন্দ্ কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। এই সময়ে কিছু দিনের জন্য মুসলিম লীগের কর্তৃত্বও কংগ্রেসী মুসলমানদের হাতে আসে। একই সামিয়ানার নীচে কংগ্রেস, খিলাফৎ কমিটি ও মুসলিম

লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। এই তিন সংগঠনে প্রায় একই ধরণের প্রস্তাব পাশ হ'তে থাকে। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে একই বাড়ীতে এই তিন সংগঠনের কার্যালয় স্থাপিত হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি এই তিন সংগঠনেই কর্মকর্তা বা কর্মীরূপে কাজ করতে থাকেন।

সম্প্রদায়বিশেষের—ধর্মীয় দাবীকে ভারতবাসীর রাজনৈতিক দাবীর সাথে যুক্ত ক'রে রাজনৈতিক আন্দোলনের বলবৃদ্ধি ঘটাতে গিয়ে গান্ধীজী ঠিক কাজ করেছিলেন কি ভুল কাজ করেছিলেন সে আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে একথা স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত যে ১৯২১ সালের আগে বা পরে আর কোন সময়েই মুসলমানগণ এত বিপুল সংখ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন নাই। অসহযোগ আন্দোলন সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মুসলমানকে আকর্ষণ ক'রেছিল এটা মিথ্যা নয়। নামী নেতাদের মধ্যে পাঞ্জাবের আলি ভ্রাতৃদ্বয়, লাহোরের 'জমিন্দার' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলি, ডাঃ সইফউদ্দিন কিচলু, ইউপি'র চৌধুরী খালিকুজ্জমান, তাসউদ্দিক আহম্মদ শেরওয়ানী, মৌলানা হসরত মোহানী, বিহারের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মজহরুল্ হক্; ডাঃ সৈয়দ মাহ্মুদ, দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আন্সারী, ব্যারিষ্টার আসফ আলি, বিখ্যাত উলেমা দেওবন্দের মৌলানা হোসেন আহ্মদ মাদানী, বাংলার মিঃ ওয়াহেদ হোসেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মুজিবর রহমান্। নোয়াখালির হাজি আব্দুর রসিদ খাঁ। চট্টগ্রামের মৌলানা মনিরুজ্জমান ইস্লামাবাদী। ঢাকা নবাব পরিবারে খাজা আব্দুল করিম ও খাজা সোলেমান কাদের। করটিয়ার চাঁদ মিঞা। বর্ধমানের ইয়াছিন সাহেব। রংপুরের মহীউদ্দিন সাহেব। দিনাজপুরের মৌলানা আব্দুল্লা হিল্বাকী। ফরিদপুরের পীর বাদ্শা মিঞা, তমিজউদ্দিন খাঁ। খুলনার জালাল উদ্দিন হাসেমী। মৌলানা আহম্মদ আলি। নদীয়ার সাম্সউদ্দিন আহম্মদ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রচুর সংখ্যায় গ্রামীন মুসলমান এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এমন কি আঞ্জুমান্-ই-ইস্লামিয়ার সভাপতি প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা ফুরফুরা সরিফের পীর সাহেব মৌলানা আবু-বকর সিদ্দিকীও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফতের ব্যাপারকে সংযুক্ত করণের অযৌক্তিকতা।

ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সাথে খেলাফতের ধর্মীয় দাবীকে যুক্ত করা উচিত হ'য়েছিল বলে আমি মনে করি না। জাতীয় আন্দোলনের হিন্দু

নেতৃবর্গ বরাবরই মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার ক'রবার উদ্দেশ্যে 'কন্‌সেশন' প্রদানের পথ অনুসরণ ক'রে এসেছেন। এটা ভুল পথ। এ'র দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে এই ধারণার সৃষ্টি ক'রে দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় আন্দোলনের গরজ হিন্দুদের, এবং মুসলমানগণ শুধু তাঁদের সাম্প্রদায়িক দাবীগুলির পুরণের সর্তাধীনে সেই আন্দোলনে যোগদান ক'রে হিন্দুদের সাহায্য করতে পারেন। এই ধারণা সৃষ্টির ফলে তাঁদের দাবীর সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমাগত বে'ড়ে চ'লেছে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল স্বাধীনতাকামী মুসলমান নিছক্ দেশপ্রেমের তাগিদে জাতীয় প্ল্যাটফর্মে যোগদান ক'রেছিলেন—পূর্বোক্ত তোষণনীতি অনুসরণের দ্বারা তাঁদেরকে বে-কায়দায় ফেলা হয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হ'য়েছে যে সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতারাই মুসলমান সমাজের যোগ্য প্রতিনিধি কেন না তাঁদের আন্দোলনের ফলেই সাম্প্রদায়িক দাবীগুলির স্বীকৃতি হিন্দুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা যাচ্ছে। ফলে খাঁটী জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থন হারিয়েছেন। কংগ্রেসের এই ভ্রান্তনীতি মুসলিম জনতাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের কোলে ঠেলে দিয়েছে।

নন্‌কোঅপারেশন আন্দোলন যতদিন ভাটার পথে যায় নি ততদিন মুসলিম রাজনীতির পৃথক প্ল্যাটফর্ম নামে অস্তিত্ব রক্ষা করলেও প্রকৃতপক্ষে সাস্‌পেণ্ডেড্ অবস্থায় ছিল। কিন্তু নন্‌কোঅপারেশন্ আন্দোলন স্তিমিত হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম এবং মুসলিম রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম আবার পৃথক হ'য়ে যায়। ইতিমধ্যে খিলাফতের উন্মাদনাও শান্ত হয়ে আসে—কারণ কামাল পাশা ক্ষমতা দখল কর'বার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খালিফাকে দেশছাড়া করেন। যাঁরা ১৯২১ সালে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্মে এসে সংগ্রামের অংশীদার হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই অল্পদিনের মধ্যে কংগ্রেস পরিত্যাগ ক'রে আবার সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মে ফিরে যান্।

মিঃ জিন্না কর্তৃক সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ

জিন্না সাহেব প্রাক্-নন্‌কোঅপারেশন যুগে প্রথম সারির কংগ্রেসনেতা ছিলেন। বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধির প্রাখর্য, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ইত্যাদি গুণে জিন্নাসাহেব যে সমকালীন ভারতীয়গণের মধ্যে অতি উচ্চস্থানের অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। এককালে মুসলিম লীগে যোগদানের আহবান্ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সম্পূর্ণ বিলাতী কায়দায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত বোম্বাইয়ের মালবার হিল্‌সের প্রাসাদোপম

দুর্গের বাসিন্দা। ডাকসাইটে ব্যারিষ্টার জিন্নাসাহেবের পক্ষে গান্ধীনেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের আসন বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। ফলে নন্‌কোঅপারেশন যুগে কংগ্রেস থেকে স'রে যাওয়ার দরুণ জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে। তিনি কিছুকাল নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু তাঁর মত ক্ষমতাশালী খ্যাতিমান্ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন নেতার পক্ষে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করাও সম্ভবপর ছিল না। জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম থেকে স'রে আসার পর তিনি নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার বিকল্প ক্ষেত্র খুঁজ্‌তে থাকেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের দিকে তাঁর নজর যায়। এবং ১৯২৪ সাল থেকে, মুসলিম লীগের মাধ্যমে বিকল্প নেতৃস্ব অর্জনের সাধনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পূর্ব মুসলিমলীগের একাধিপত্য তাঁর করতলগত হয় নি।

স্বরাজ্য পার্টির জন্ম

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে দেশবন্ধু "কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি" গঠন করেন। ১৯২০ সালের স্পেশাল কংগ্রেসে নন্‌কোঅপারেশনের যে 'পঞ্চবিধ-বয়কট্' (fivefold boycott) কর্মসূচী গৃহীত হয়, তার মধ্য থেকে 'কাউন্সিল-বয়কট'-কর্মসূচীটা সংশোধন ক'রে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডশাসন সংস্কার পরিকল্পনার অঙ্গীভূত "দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা" (diarchy) ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল-প্রবেশের অনুমোদন চেয়ে গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মতিলাল নেহেরু ভিঠলভাই প্যাটেল, আজমল খাঁ, এন্ সি কেলকার, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। পক্ষান্তরে যাঁরা 'পঞ্চবিধ বয়কট' কর্মসূচীর পরিবর্তনের বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজাগোপাল আচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, টি প্রকাশম্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেশবন্ধু স্বয়ং ঐ গয়া অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। নূতন কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। তার ফলে অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশবন্ধু কংগ্রেস-সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে, কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থনকারী কংগ্রেসসেবীদের নিয়ে ঐ নূতন দল গঠন করেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, এবং ঐ অধিবেশনে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন

সভাসমূহে স্বরাজ্যপার্টির নামে প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারে স্বরাজ্যপার্টিভুক্ত কংগ্রেসীদেরকে অনুমতি প্রদান ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় তার নাম "১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন"। ১৯২৩ সালের নভেম্বরে ঐ আইন অনুসারে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে স্বরাজ্যদল কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে উল্লেখযোগ্য জয় অর্জন করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় তৎকালে প্রচুর সংখ্যক মনোনীত সদস্য এবং বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর মারফতে নির্বাচিত খয়ের খাঁ সদস্য থাকা সত্ত্বেও স্বরাজ্যদল প্রচণ্ড শক্তিশালী বিরোধীদের ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হন। বাংলায় নির্বাচিত সদস্যদের বেশীরভাগ আসন স্বরাজ্যপার্টি দখল করেন। ঐ সময়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৪০টি আসন সরকার-মনোনীত সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীসমূহের মারফতে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও অর্দ্ধেকের বেশী আসন স্বরাজ্যদলের আওতায় আসে।

কিন্তু অচিরেই মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক দাবীসমূহ প্রবল থে'কে প্রবলতর হ'তে থাকে। মুসলিম সদস্যদের চাপে প'ড়ে দেশবন্ধু ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে এক হিন্দু-মুসলিম চুক্তিপত্রের খসড়া প্রকাশ করেন এবং ঐ সালেই সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রবল বিতর্কের মধ্য দিয়ে ঐ চুক্তিপত্র অনুমোদিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। ঐ চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে বিখ্যাত। এ'তে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী চাকুরীর একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত ক'রে রাখ্‌বার নীতি স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় এবং গো-কোরবাণী ও মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনাবন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এ'তে প্রশমিত হয় না—এবং ইংরাজ-অনুগত সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্ম থেকে নূতন নূতন দাবী ও অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত থাকে।

জাতীয়তাবাদী সংগঠনের অভ্যন্তরে পৃথক মুসলিম cell

সুতরাং ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক গতানুগতিক পথে চলতে লাগলো। অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়াবাদ গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা না করে জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতীয়তাবাদী প্লাটফর্মের

মধ্যেও একটা স্বতন্ত্র মুসলিম প্রকোষ্ঠ (cell) গঠনের ব্যবস্থা করে দিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একের পর এক কন্‌সেসন ও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার নীতি অব্যাহত রইল!

বলাবাহুল্য, এই প্রকার নীতি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ গ'ড়ে তোলার পথ সুগম করে না—বরং ঐ পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে। 'স্বাধীনতা শুধু হিন্দুস্বার্থের ব্যাপার—এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দুরা যদি মুসলমানগণের সাহায্য চায়, তা হলে দাবীকৃত কন্‌সেসন সেফগার্ড, ইত্যাদির বিনিময়েই তাঁরা সেই সাহায্য মঞ্জুর করতে পারেন—এই রকম একটা জাতীয়তাবাদবিরোধী ধারণা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দানা বাঁধার ব্যাপারে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত নীতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে এক জাতির মধ্যে দুর্বল সংখ্যাল্প ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য সেফগার্ড থাকা উচিত কি না। এর উত্তর হচ্ছে এই যে—যেখানে সংখ্যাল্প ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী অসম প্রতিযোগিতায় নিশ্চিত পরাজিত হবে ব'লে জানা আছে, সেখানে সমাজের ঐ অনগ্রসর অংশকে অগ্রসর ও বলশালী অংশের সমপর্যায়ে এ'নে দাঁড় করানোর জন্য তাদের অনুকূলে কিছু কিছু বিশেষ সুযোগ ও অধিকার সংরক্ষিত রাখা—অবশ্যই যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা। মানবদেহের একটি বিশেষ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ অপুষ্টিদুষ্ট ও হীনশক্তি হ'লে তার ফলে যেমন সমগ্র মানবদেহেরই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনি জাতির একাংশ দুর্বল ও অনগ্রসর হয়ে পড়ে থাকলে তার ফলে সমগ্রজাতির পুষ্টি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সুতরাং জাতির দুর্বল অংশ যাতে এগিয়ে এসে বলশালী অংশের সম-পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া জাতির বলশালী অংশের একটি বিশেষ দায়িত্ব। এইজন্য অনগ্রসর অংশের অনুকূলে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা হবে সাময়িক। সে ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে জাতীয় স্বার্থের তাগিদে—কোন শরিকী অংশ বণ্টনের দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে থাকবে না। সমাজের কোন অংশের চিরন্তন নাবালকত্ব সামাজিক স্বার্থের পক্ষে হানিকর। যে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির স্বার্থে পূর্বোক্তরূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, ঐরূপ ব্যবস্থার চিরস্থায়ীকরণ তাঁদের পক্ষেও শুধু যে অসম্মানজনক তাই নয়, ওর ফলে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকার ফলে তাঁদের মনে আত্ম-

শক্তির প্রতি বিশ্বাসের দার্ঢ্য সঞ্জাত হয় না। স্বকীয় শক্তি অনুশীলনের দ্বারা উর্দ্ধে ওঠার প্রবণতা জন্মে না এবং তাঁরা কোন দিনই নিজেদেরকে সমাজের অগ্রসর অংশের তুল্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন না। কতকগুলি সেফগার্ড ও বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় জাতির একাংশ চিরন্তন নাবালকত্বের গণ্ডীর মধ্যে নির্বোধ আত্মসন্তুষ্টিতে মগ্ন থাকলে, সেই অবস্থা জাতির শেষ সেফগার্ডের আশ্রয়পুষ্ট অংশকে এবং সমগ্র জাতিকে তুল্যভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। সুতরাং অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে জাতির প্রাগ্রসর অংশের সমমর্যাদায় উন্নীত করবার উদ্দেশ্য সেফগার্ড ও কতকগুলি সংরক্ষিত সুযোগ সুবিধার সাময়িক প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় হলেও—সে ব্যবস্থার চিরস্থায়ীকরণ অকল্যাণকর। কিন্তু মুসলমান সমাজ কখনই তাঁদের সাম্প্রদায়িক দাবীদাওয়াগুলিকে সাময়িক ব্যবস্থাহিসাবে কিংবা পূর্বোক্তরূপ জাতীয়দৃষ্টিভঙ্গীসম্মতরূপে উপস্থিত করেন নি। তাঁদের দাবীগুলি বরাবরই রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাগুলির সরিকী ভাগবাঁটোয়ারার দাবী হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারী চাকুরী সমূহে সম্প্রদায়বিশেষের জন্য আসন সংরক্ষণ। পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন। —এগুলি স্পষ্টতঃই সরিকী স্বত্ব আদায়ের দাবী। এই প্রকার সরিকানাবোধ একজাতীয়তাবোধের পুষ্টির পথে প্রবল অন্তরায়।

দ্বিতীয়তঃ—অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ ও অধিকার সংরক্ষণ কখনই কোন জনগোষ্ঠি দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদানের সর্ত হিসাবে দাবী করতে পারেন না। দেশটা শুধু হিন্দুরও নয়, শুধু মুসলমানের নয়। সকলেরই যেমন অধিকার আছে—সকলেরই তেমনি দায়িত্বও আছে। স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদানের দায়িত্বপালন সম্পর্কে দরকষাকষির অবকাশ নেই।

তৃতীয়তঃ—সাম্প্রদায়িক চুক্তির মাধ্যমে ঐ সকল দাবী দাওয়া আদায় সম্ভব নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিবর্দ্ধন, পরস্পরের স্বার্থের প্রতি পরস্পরের মানসিক আনুকূল্যকে পুষ্ট করা, পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব সৃষ্টি, পরমতসহিষ্ণুতার প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে তোলা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, জাতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্মে এবং জাতীয় অকল্যাণ প্রতিরোধের সংগ্রামে একত্রে অংশগ্রহণ করা—এই উপায়েই বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন যোগ্য মর্যাদা

লাভ করতে পারে। এটাই একজাতীয়তাবোধকে পুষ্ট করবার পথ। দেশের নেতারা সে দিকে লক্ষ্য রাখেন নি। তাঁরা সাময়িক সুবিধার তাগিদে জোড়াতালি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়ে পুনঃপুনঃ সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জটিল করে তুলেছেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্যের ফলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রবল ও বিপজ্জনক আকারে আত্ম-প্রকাশ করতে পেরেছে। যে সকল বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দানা বাঁধে, সেগুলি প্রায়শঃ উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ। পক্ষান্তরে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নবিত্ত জনশ্রেণী, বিশেষ আর্থিক পরিবেশে, যে সকল যৌথ স্বার্থের সূত্র দিয়ে পরস্পরের সাথে বাঁধা থাকে, তাদের সেইসব যৌথস্বার্থের বনিয়াদে যৌথ-অভিযান পরিচালনার দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের ইমারতকে নীচুতলা থেকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া হয় নি। তার ফলে নীচুতলার জনশ্রেণী সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতাদের হাতের ক্রীড়নক হয়েছে।

যে সকল বরেণ্য মুসলিম নেতা বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মের—অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃপদ লাভ করেন, তাঁদের অনেকেরই বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। মৌলানা মহম্মদ আলি ১৯২১ সালের সেই প্রচণ্ড আলোড়নের সময়েও এক ভাষণে এই কথা বলেন যে—"আমি আগে মুসলমান, পরে ভারতবাসী"। ঐ সময়ে তাঁর ঐ উক্তি সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। কংগ্রেসপন্থী অন্যান্য মুসলিম নেতারাও বে-কায়দায় পড়ে যান্—এবং শেষ পর্যন্ত ঐ উক্তির একটা গোঁজামিল দেওয়া ব্যাখ্যা খাড়া করা হয়। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের কোকোনদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মৌলানা মহম্মদ আলি পৃথক নির্বাচন প্রথার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর মতে পৃথক নির্বাচন প্রথা সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটায়। (The creation of a seperate electorate did a good deal to put a stop to intercommunal warfare). যে প্রথায় হিন্দু প্রার্থীগণকে মুসলিম ভোটের উপর নির্ভরশীল হ'তে হয় না—এবং মুসলমান নির্বাচন প্রার্থীকে হিন্দু-ভোটের উপর নির্ভরশীল হ'তে হয় না, সে প্রথা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পুষ্টিকারক হ'তে পারে না। অথচ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে মৌলানা সাহেব ঐ প্রথার প্রশস্তিবাদ ঘোষণা করেন! এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও এই পৃথক নির্বাচন প্রথার নিঃসর্ত

প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ ক'রেছেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে যে মন্তব্য করা হ'য়েছে তা থেকেই এটা প্রমাণিত হবে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়:—
"Much as we regret the necessity, we are convinced that so far Mahomnadans at all events are concerend, the present system (Seperate electorate) must be maintained until conditions alter, even at the cost of slower progress towards realisation of common citizenship".

মিঃ জিন্না কর্তৃক পৃথক নির্বাচন প্রথা সমর্থন

কিছুদিন রাজনৈতিক স্বেচ্ছানির্বাসনের পর ১৯২৪ সালে মিঃ জিন্না মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের অন্যতম নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়ে রাজনীতি সচেতন ভারতীয়দের একাংশের মধ্যে, ভাবী শাসনতন্ত্রে, পৃথক নির্বাচন প্রচা বাতিল ক'রে হিন্দুমুসলমানের যৌথ নিবাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা সম্পর্কে দাবী সোচ্চার হ'য়ে ওঠে। নিখিলভারত মুসলিম লীগ এই দাবীর বিরোধিতা ক'রে ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে লীগের সাধারণ অধিবেশনে পৃথক নির্বাচন প্রথা বজায় রাখার অনুকূলে সুস্পষ্ট অভিমত ঘোষণা করে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে লীগের যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়—সেখানে জিন্না সাহেব বলেন—"There is no escaping from the fact that cmmunalism does exist in the country. By mere time and sentiment it could not be removed. Nationalisation cannot be created by having a mixed electorate".

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন মতে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে। নন্‌কোঅপারেশন যুগে যে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম নেতা ও কর্মী কংগ্রেসে 'যোগদান ক'রেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদী প্ল্যাট্‌ফর্ম পরিত্যাগ ক'রে সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মে ফিরে গিয়েছিল। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এ'র কিছু পূর্বে কংগ্রেস পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে অনেক বিশিষ্ট মুসলিম নেতা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ইতোমধ্যে ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে নন্‌কো-অপারেশন কর্মসূচী প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। অতঃপর স্বরাজ্যদলের প্রয়োজন লোপ পায়—এবং ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাবনে কংগ্রেস নিজ নামেই কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রার্থী দাঁড় করায় এবং প্রায় ১৯২৩ সালের মতই সাফল্য অর্জন করে। তখনকার নিয়ম অনুসারে কোথাও কংগ্রেসের পক্ষে

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ কেন্দ্রে ও প্রদেশে সর্বত্রই প্রচুর সংখ্যক মনোনীত সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল।

১৯২৬ সাল থেকে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতাবৃদ্ধি ও হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি

১৯২৬ সালের সমকাল থে'কে ভারতবর্ষে-রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি ছিল যে, ঐ পরিকল্পনা অনুসারে দশ বছর কাজ চল্‌বে এবং দশ বছরের অভিজ্ঞতার বনিয়াদে, ভারতবাসীদের হাতে আর কি পরিমাণ শাসনতান্ত্রিক অধিকার ন্যস্ত করা যায় তা পরীক্ষা ক'রে দেখে আবার একটা নূতন শাসনসংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। সুতরাং সকল পক্ষই আশা করছিলেন যে ১৯৩০-৩১ সাল লাগাত ভারতবাসীর হাতে অনেক নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতা আস্‌বে। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রায় সম-সাময়িক কালে ভাবী শাসনসংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল ক'রবার জন্য স্যর আলেকজেণ্ডার মুডিম্যানের নেতৃত্বে সরকারের পক্ষ থেকে এক কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রবল আক্রমণ চালানো হয়। তার ফলে ঐ কমিটির রিপোর্ট ধামাচাপা প'ড়ে যায়। অতঃপর পরবর্তী ধাপের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সালের শেষ ভাগে প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিক স্যর জন সাইমনকে সভাপতি ক'রে এক স্ট্যাটুটরী কমিশন গঠন করেন। ঐ কমিশনের সমস্ত সদস্যই ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিক—কোন ভারতীয় সদস্যকে ঐ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল না। এই কমিশন "সাইমন কমিশন" নামে পরিচিত। কমিশনের সদস্যরা তথ্যানুসন্ধান এবং ভারতীয় জনমত নির্ণয়ের জন্য ভারতবর্ষে এ'লে কংগ্রেস থেকে ঐ কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং দেশবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয় যেন কোন ভারতবাসী ঐ কমিশনের সমক্ষে কোন সাক্ষ্য না দেন্—এবং কোন প্রকার সহযোগিতা না করেন। কংগ্রেসের দাবী ছিল—ভারতের ভাবী শাসন পরিকল্পনা ভারতের লোকেরাই প্রস্তুত করবে—ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দ্বারা প্রণীত কোন পরিকল্পনা ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসিদের হাতে নূতন নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনার পটভূমিকায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অধিকতর তিক্ত ও বিস্ফোরণশীল হ'য়ে ওঠে। কংগ্রেসের মনোভাব ছিল এই যে ঐ সময়ে সরকারের উপরে তীব্র চাপ সৃষ্টি ক'রে অন্ততঃ কানাডা,

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের" মর্যাদা (dominion Status) আদায় ক'রে নেওয়া। (কংগ্রেসের মধ্যে নীচুতলার নেতা ও কর্মীদের অ্যাস্‌পিরেশন ঐ সময়ে "পূর্ণ স্বাধীনতা"য় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু উপরতলার নেতারা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন। এমন কি, মহাত্মা গান্ধী নিজেও। স্বাধীনতার সারবস্তু অর্থাৎ Substance of Independence পে'লেই খুসী হবেন,—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন)।

পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মভুক্ত মুসলিম নেতাদের উদ্যোগে নিয়োজিত হ'ল—অপরের চেষ্টায় যে সকল নূতন শাসনতান্ত্রিক অধিকার আস্‌ছে—তা থেকে, তাঁদের সাম্প্রদায়িক দাবীদাওয়ার বনিয়াদে, বড় একটা টুক্‌রো নিজেদের জন্য কে'টে বের ক'রে নেওয়ার দিকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এটা প্রায় চিরন্তন ফীচার। জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রামের চাপে কতক কতক রাজনৈতিক অধিকার ভারতবাসীদের হাতে ন্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যখনই নিকটবর্তী হ'য়েছে—মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দাবী দাওয়া তখনই তীব্রতর হ'য়ে, পিছন থেকে রাশ টেনে জাতীয় আন্দোলনের শক্তিকে খর্ব করবার চেষ্টা করেছে।

খিলাফতের সমস্যাকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করবার সময়ে মহাত্মা গান্ধী হয় ত ভেবেছিলেন যে—ধর্মীয় কারণে ইংরাজের বিরুদ্ধে মুসলিমসমাজের মনে যে বিক্ষোভ জমা হ'য়েছে, তাকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার সাথে একত্র ক'রে নিলে—মুসলিম সমাজকে কংগ্রেসে টে'নে আনা যাবে, এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিন্দু-মুসলিম একতা প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার দিকে গান্ধীজীর নজর ছিল না। তাঁর ধর্মঘেঁসা কথাবার্তা রাজনীতির মধ্যে ধর্মীয় ধারণার অনুপ্রবেশের সহায়তা করেছে। রাজনৈতিক কর্মীদের সাত্ত্বিক জীবনযাপনের প্রতিষ্ঠান-সমূহে উপাসনা, ধর্মগ্রন্থপাঠ ইত্যাদির প্রচলন—গান্ধী-প্রভাবের ফল। তিনি হয়ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধর্মীয় আন্দোলনের রঙে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই লক্ষ্যের সার্থকতার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারের সাম্য চেয়েছিলেন। এ'র ফলে জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মে কিছুদিন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম এ'সে—গলাগলি ক'রে সহাবস্থান করলো। সমস্ত রাজনৈতিক সভার সূচনায় গীতা ও কোরাণ পাঠ চল্‌তে লাগ্‌লো। বন্দেমাতরমের সাথে 'আল্লা হো আকবর' জাতীয় আওয়াজের স্বীকৃতি পে'লো। রাজনৈতিক সভা চলা কালে নামাজের বিরতির প্রবর্তন হ'লো।

এ-দিকে, মহাত্মা গান্ধী লোকের মনে এক বছরে স্বরাজলাভের' যে স্বপ্নাতুর নেশা সৃষ্টি করেছিলেন, সে নেশা ছুটে গেল। এক বছরে স্বরাজ হ'ল না। ২।৪ বছরের মধ্যে যে স্বরাজ হবে, সে সম্ভাবনাও দৃশ্যমান্ হ'লো না। চৌরীচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাতে মহাত্মা গান্ধী অকস্মাৎ তাঁর প্রতিশ্রুত আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। এ'র পর থেকেই নন্‌কোঅপারেশনের বেগ ক্রমশ: স্তিমিত হ'য়ে এ'লো। পরিশেষে ১৯২৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেলগাঁও কংগ্রেসে নন্‌কো-অপারেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। ওদিকে, কামাল পাশা তুরস্কে ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে স্বয়ং খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করায় ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলনেরও আর কোন সার্থকতা রইলো না। ১৯২১ সালে যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান কর্মী জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মে এ'সে ভীড় জমিয়েছিলেন, উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অনেকেরই মোহভঙ্গ (?) হ'লো, এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আকাশ থে'কে মুসলিম তারকা রাজি একে একে খ'সে পড়তে লাগ্‌লো,—আর যাঁরা এইভাবে খ'সে পড়লেন তাঁরা সবাই তাঁদের সাম্প্রদায়িক মঞ্চে ফিরে গিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পায়ে মাথা মুড়িয়ে দিলেন।

হিন্দু সম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও হিন্দুমহাসভার জন্ম

এভাবে মুস্লিম রাজনীতিকে পুনরায় প্রবলবেগে সাম্প্রদায়িকতার খাতে প্রবাহিত হ'তে দেখে হিন্দু সম্প্রদায়িকতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা গঠন করলেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভামণ্ডপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ একই সময়ে ঐ সহরেই ১৯০৫-এর যুগের খ্যাতনামা স্বদেশী নেতা মৌলানা ইস্মাইল হোসেন সিরাজীর উদ্যোগে মুস্লিম সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ দেশের প্রচুর সংখ্যক মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্তে নিমজ্জিত ক'রে জাতীয় সংগ্রামের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে—কিন্তু জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে লোক টেনে নিতে পারে নি। গোড়ার দিকে, একই ব্যক্তির পক্ষে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা এই উভয় সংস্থার সভ্য হওয়ার বিরুদ্ধে কোন নিয়মগত বাধা ছিল না। তৎস্বত্বেও পরিচিত কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক লোক হিন্দুমহাসভায় যোগদান

করেন। হিন্দুমহাসভা প্রধানতঃ সেই সব লোকদের নিয়ে গঠিত হয় যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিজেদেরকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, কিছু সংখ্যক খেতাবধারী রাজভক্ত, কিছু ব্যবসায়ী। এমন কিছু আইনজীবি যাঁদের পলিটিক্যাল প্রমিনেন্সের লোভ আছে—কিন্তু সংগ্রামের নাম শুন্‌লে বুক কাঁপে, হিন্দুমহাসভা এই লোকদের মিলনস্থল হ'য়ে পড়ে। পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ, মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বঙ্গদেশের আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি যে কতিপয় খ্যাতনামা প্রাক্তন বিপ্লবী হিন্দুমহাসভার মঞ্চে অধিষ্ঠিত হয়ে তার গৌরব বৃদ্ধি করেন, বহুদিন আগেই তাঁদের বিপ্লবী চরিত্র ক্ষয় হ'য়ে গিয়েছিল। হিন্দুমহাসভার মঞ্চের অলঙ্করণের পক্ষে এঁদের উপযোগিতা থাকলেও রাজনীতি সচেতন হিন্দু সমাজে এঁদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রায় শূন্যের কোঠায় এ'সে দাঁড়িয়েছিল। মদনমোহন মালব্য, ডঃ মুঞ্জে বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মত অতি সল্পসংখ্যক নেতা হিন্দুমহাসভায় এ'সেছিলেন—যাঁদেরকে লোক মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতো—কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক মতামতকে শ্রদ্ধা করতো না। হিন্দুমহাসভা কোন দিনই রাজনীতি-সচেতন হিন্দু পাব্‌লিকের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নাই। কিন্তু মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতা একে একে বড় বড় নেতাদেরকে জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম থেকে টেনে বে'র ক'রে নিয়ে গিয়েছে। এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পরিণামে গোটা মুস্লিম সমাজকেই গ্রাস করেছে। তৎস্বত্বেও, একদল শ্রদ্ধেয় নেতা ও কর্মী নিষ্ঠার সাথে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় সংগ্রামে নিজেদরকে যুক্ত রে'খেছেন। এ কথাও মিথ্যা নয়। এঁদের সংখ্যা বেশী নয়, এবং সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতারা মুস্লিম সম্প্রদায়ের উপর এঁদের প্রভাবের ক্ষেত্র এতদূর সঙ্কুচিত ক'রে ফেলেছিলেন যে, এঁদেরকে মুস্লিম সমাজের প্রতিনিধি ব'লে মনে করা হ'ত না।

(ক্রমশঃ)

বাবা, তোমরা বাধ্য, অনুগত অবনত জীবনের স্তিমিত অনুশীলন ক'রে এসেছ বলে আমাদের কাছেও তোমাদের দাবী বাধ্যতার, আনুগত্যের। আমরা ঠিক ভারতবর্ষের প্রথম অবাধ্য অনানুগত জেনারেশন নই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও বাধ্য, অনুগত। তথাপি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক্ষেত্রেও একটা গুণগত তফাৎ এসে গেছে। তোমাদের বাধ্যতা আনুগত্য দাবী করার মত সমাজের কিছুটা দাপট ছিল ; তোমাদের পিতৃকুল স্বস্থানে অনেকবেশি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যে-সব সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক অবস্থা, এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সমাজের মানুষগুলিকে বাধ্য, অনুগত, শান্ত সুশৃঙ্খল ক'রে রাখে, তারা সতেজ হ'তে পারে, হ'তে পারে নিস্তেজ, তাদের মধ্যে জীবনের জলন্ত আগুন থাকতে পারে, আবার থাকতে পারে মৃত্যুর তুহিন শীতলতা, সেগুলো তোমাদের কালে ছিল, তাই তোমরা মানতে, আমাদের কালে তারা দুর্বল, জীর্ণ, অনেকস্থানে ভেঙ্গে-পড়া, তাই আমাদের মধ্যে নেই সে বাধ্যতা, সে আনুগত্য। আমরা যখন মানি, মাথা নত ক'রে তোমাদের পথে চলি, সে-কেবল আমাদের অন্য পথ জানা নেই বলে, তোমাদের পথে বিশ্বাস করি বলে নয়।

তুমি বলবে, কথাটা সত্যি নয়, তোমরা যদি বাধ্য হ'তে, মেনে নিতে, বিদ্রোহ-বর্জন না করতে, তাহ'লে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ত না, তোমরা অত বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে অপসরণে বাধ্য ক'রে তোমাদের বর্জন-ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছ, যার ধারে কাছেও আমাদের অবাধ্যতা পৌঁছতে পারে নি, অতএব আমাদের বর্জন কেবল একটা শূন্য আন্দোলন, তার ভেতরে সার নেই, বাইরে যতই থাকুক না বুদ্ধির চাকচিক্য।

কিন্তু, বাবা, তোমরা কি সত্যি সাম্রাজ্যবাদকে বিদ্রোহ-বর্জনে দেশ থেকে উৎখাত করেছ?

না কি সাম্রাজ্যবাদের চরম সংকট সময়ে তার সঙ্গে একটা বিরাট ও

ব্যাপক "ব্যবস্থা" তৈরী ক'রে তোমরা স্বাধনীতার সৌধ বানিয়েছ, যার মধ্যে যেটুকু সার আছে তার ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে তোমাদের একটা ছোট্ট অংশের মধ্যে, বাকী আর অনেকে পেয়েছ তোমরা ছিটে ফোঁটা, যারা পায়নি কিছুই, অথবা সামান্য, তারা দেশের সংখ্যাহীন মানুষ, যারা মাঠে চাষ ক'রে এবং একবেলা খায়, যাদের আমি, আমরা চিনি নে, কোন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পাই, তারা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, অথবা তারও বেশি! আজও, এই শতাব্দীর সাত দশকে, মাসে পঁচিশ টাকা কামায়, যদিও তারা নির্বাচনে অন্ধ ভোট দিয়ে তোমাদের ধারাবাহিক কর্তৃত্ব বহাল রাখে।

১৯৪৭ সালে যে ঘটনার দিন কয়েক আগে আমি জন্মেছিলাম, তাকে স্বাধীনতা বলতে আমার বুকে যেমন একটা তীব্র স্পন্দন হয়, কিন্তু আমি তো আরও দু'একটা স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছি, তাই আমি জানি, তোমরা সেদিন স্বাধীন করেছিলে ভারতবর্ষের হয়তো একশ জনের মধ্যে পাঁচ সাত বড়জোর দশজনকে, যার মধ্যে ছিলে তোমরাও, বাকী মানুষদের নয়, এবং আজও তারা পরাধীন, তোমাদের অধীন, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বোধকরি আজও শুরু হয় নি, কিম্বা সবে হয়েছে শুরু। তোমরা সাম্রাজ্যবাদকে 'বর্জন' করে সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সঙ্গে ধ্যানধারণার, ভাবের, বুদ্ধির, অন্তরের পাকাপোক্ত মিতালি স্থাপন করেছিলে, করো নি কি?

তুমি পলিটিশিয়ান নও, স্বদেশী ক'রে জেলে যাও নি, তুমি সাধারণ বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, তোমার নিজের ঘটনাটাও বিশ্লেষণ ক'রে দেখ না, বাবা, আমি যা বলতে চাইছি তার মানে কিছু আছে কি নেই!

তোমার ঠাকুর্দা এক ধরণের স্বদেশী ছিলেন। ১৯০৫ সালের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বদেশী। হঠাৎ সেদিন বাঙ্গালী আত্মচেতনায় উন্মাদ হ'য়ে গানে, মননে, ভাষায়, সাহিত্যে, ধর্মে একসঙ্গে ফেটে পড়ছিল। তোমার ঠাকুর্দার মাধ্যমে তোমাদের সেই পুববাঙ্গলার দূরস্থ প্রাচীন গ্রামেও নতুন প্রাণের উত্তাপ গিয়ে পেঁৗছেছিল।

একই সঙ্গে তোমার ঠাকুর্দা ছিলেন ইংরেজের নিরেট ভক্ত। তোমার মুখেই শুনেছি, তিনি বলতেন, ইংরেজের মত মানুষ নেই পৃথিবীতে, সবার সেরা জাত ইংরেজ।

তোমার বাবা ছাপোষা শিক্ষক ছিলেন, রাজনীতির ধার ধারতেন না। তবু তাঁর তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল তুমি ইংরেজের কাছে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাও। তাই তুমি যখন জলপানি পেয়ে আই. এ, পাশ করলে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে, উত্তীর্ণদের তালিকার শীর্ষে নাম বেরুল তোমার, দরিদ্র স্কুল শিক্ষক হ'য়েও, বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অতিরিক্ত স্কলারশিপের লোভ কাটিয়ে তিনি তোমায় ভর্তি ক'রেছিলেন স্কটিশচার্চে. যাতে ইংরেজ অধ্যাপকদের সঙ্গলাভে তুমি ধন্য হ'তে পার।

আর তুমি? ছাত্রকালে তুমি সাম্যবাদের প্রভাবে এসেছিলে, রাজনীতিও একেবারে করো নি তা নয়, কর্মজীবনে তুমি সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবি গ্রন্থকার, রাজনৈতিক চেতনা তোমার ক্ষুরধার, তুমি সমাজবাদে বিশ্বাসী। তুমি এবং আমাদের মা তোমরা আমাকে আর মিতুকে ভর্তি ক'রে দিলে নয়া দিল্লীর সেরা মিশনারী স্কুলে, যার পরিচালনা করেন আইরিশ ব্রাদার্স, যাতে আমরা ছোটবেলা থেকে ইংরেজী বলতে পারি অনায়াস পরিচ্ছন্নতায়, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত!

শুধু তো তুমি নও, বাবা, তোমরা সবাই। প্রধান মন্ত্রী থেকে নিচের দিকে যতটা সম্ভব তাকিয়ে তো একই চেহারা দেখতে পাই! যাদের সঙ্গতিতে কোনও রকমে সুযোগের নাগাল মেলে তারা পড়াতে চায় ছেলেমেয়েদের সাদা চামড়া মানুষ পরিচালিত মিশনারী স্কুলে। প্রথম কনভেন্ট, তারপর সবচেয়ে ভাল দিশী স্কুল।

আমার আজও মনে আছে তুমি যেদিন আমাকে কনভেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলে ভর্তির উদ্দেশ্যে। গোল ডাকখানার সংলগ্ন সেণ্ট কলম্বা স্কুল, লাল ইঁটের বাড়ীটার ফাটক পেরিয়ে ঢুকতেই মেরী মাতার প্রস্তর মূর্তি, তারপর গির্জা, বাঁদিকে সেণ্ট কলম্বা, ডান দিকে জীসাস-মেরী।

স্কুলের বাড়ীটার হলঘরে শ' পাঁচেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের নিয়ে সাহেব প্রিন্সিপালের দর্শনপ্রার্থী। কে কি ক'রে কাকে ডিঙ্গিয়ে আগে দর্শন পাবে তার জন্যে কি দারুণ নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা!

আমি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম।

বলেছিলাম, 'আমি পড়ব না এ স্কুলে।'

তুমি বলেছিলে, 'পড়বার সুযোগ পাবে ব'লে মনে হচ্চে না।'

তখন এক মহিলা, ববছাট চুল, চোখে চশমা, ঠোঁটে লাল রং, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেটাকে এক রকম ছুড়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপালের কোলে, আর

বলছেন তারস্বরে চেঁচিয়ে, 'ফাদার এ ছেলে আমার নয়, আপনার, আপনি ওকে না নিলে কে আর নেবে বলুন !'

প্রিন্সিপাল ও'কনারের শৃঙ্খলা রাখবার ক্ষমতা ছিল না। সেদিন শ'পাঁচেক পিতামাতাপুত্র পরিবৃত তাঁকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি তাদের ভারে তিনি মাটিতে পিষে যাবেন।

তুমি বলে উঠেছিলে, "অসম্ভব! এখানে তোমার পড়া হবে না। প্রিন্সিপালের কাছাকাছিও আমি যেতে পারব না।"

কিন্তু তুমি গিয়েছিলে। সেদিন নয়, সেদিন আমাকে নিয়ে তুমি তখুনি বাড়ী ফিরে এসেছিলে। মাকে বলেছিলে, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না কেতুকে সেন্ট কলম্বাতে ভর্তি করা।"

সম্ভব হয়েছিল। তিনদিনের মধ্যেই প্রিন্সিপাল ও'কনার সাহেবের সঙ্গে তাঁর খাস দপ্তর ঘরে তোমার দেখা এবং কথাবার্তা হ'য়েছিল। চতুর্থ দিন আমি সেন্ট কলম্বাতে ভর্তি হ'য়েছিলাম। বড় স্কুলে নয়। করোলবাগে স্কুলের নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হ'য়েছিল। সে ব্রাঞ্চ স্কুলে।

মিতুকে জনডেন্ট অব জীসাস অ্যাণ্ড মেরীতে ভর্তি করাতেও তোমাকে কষ্ট করতে হয় নি। তোমার দপ্তরের চাপরাশী শেষরাত্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনডেন্ট স্কুলের আপিসের সামনে ভর্তি-প্রার্থীদের লাইনে। ফর্ম নিয়ে এসেছিল। ফর্ম ভর্তি ক'রে তুমি গিয়েছিলে স্কুলে মিতুকে নিয়ে। মিতু সোজা গিয়ে বসেছিল কিণ্ডার গার্ডেন ক্লাসের নিম্নতম শ্রেণীতে।

মনে আছে, তোমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম কি ক'রে তুমি আমাকে ভর্তি করলে।

তুমি বলেছিলে, 'আমরা এমন একটা ব্যবস্থা তৈরী করেছি যাতে ধরাধরি না করলে, কলকাঠি না নাড়লে কিচ্ছু হবার সম্ভাবনা নেই। ভাল স্কুলে সংখ্যা সামান্য, চাহিদা অনেক। অতএব, এই নিদারুণ প্রতিযোগিতার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যার যেটুকু প্রতিপত্তি, ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার না করলে প্রতিযোগিতায় হার হবেই।"

"তুমি কি ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলে বাবা?"

"দিল্লীর বিশপের সঙ্গে কোনও সূত্রে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁকে অনুরোধ করতে তিনি ও'কনারকে বলেছিলেন। ও'কনারকে ফোন করতেই সাক্ষাৎকারের নিমন্ত্রণ এসে গেল। বাকীটা হ'য়ে গেল খুব সহজে।"

"তুমি আমাকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করলে কেন?" প্রশ্ন করেছিলাম।

"শিক্ষা ভাল হয়, তাই।"

"তুমি তো পড়ো নি মিশনারী স্কুলে!"

"না। আমি গ্রামের স্কুলে প'ড়েছিলাম। শেষ দুবছর আমাদের হেডমাষ্টার ছিল না। ইংরিজী পড়াবার শিক্ষক আর কেউ না থাকায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে ওটা স্কুলে পড়ানই হয় নি।"

"তুমি তো তিনটে বিষয়ে 'লেটার' পেয়ে পাশ করেছিলে!"

"তখনকার দিন অন্য ছিল। তোমরা যখন বড় হবে তখন দেখবে তীব্র প্রতিযোগিতা। ভাল স্কুল থেকে ভাল পাশ না করলে ভাল কলেজে ভর্তি হ'তে পারবে না। ভাল চাকরী পাবে না।"

"কিন্তু ইংরিজী কলেজে প'ড়ে দশজনের একজন হ'তে পারব না! সবার কাছ থেকে আলাদা হ'য়ে যাবো না কি আমি? দেশের ক'টা ছেলেমেয়ে ইংরিজী স্কুল কলেজে পড়তে পারছে?"

"একশ' জনের মধ্যে একজনও নয়।"

"তবে?"

"বাকী নিরানব্বুই জন আমার ছেলে নয়। তুমি আমার ছেলে। মিতু আমার মেয়ে।"

"অতএব আমরা বাকীদের থেকে আলাদা!"

"নও কি! এদেশে ক'জন লোকের গাড়ী আছে! বাড়ীতে টেলিফোন!"

"মানে, আমরা আলাদা হ'য়ে জন্মেছি। আমাদের রেহাই নেই।'

"মানে, আমরা আর তোমরা এক নই। আমি দরিদ্র বাবা-মা'র ছেলে। আমার বাবা বড় হ'য়ে আমি কি করব কোনওদিন ভেবে দেখেন নি, প্ল্যান করা তো দূরের কথা। সন্তান জন্ম নিত ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও নির্দেশে, বেঁচে থাকত অথবা ম'রে যেত, বেঁচে থাকলে নিজের নিয়মেই বড় হত, স্কুল কলেজ পাশ ক'রে কোনও মতে একটা চাকরী পেয়ে গেলে জীবন সার্থক হ'ত। চাকরীই বা ক'টা ছিল! অতিশয় প্রতিভাবান ও তারও চেয়ে ভাগ্যবান ছেলেরা আই. সি. এস. হত। তারপর বি. সি. এস., নয়তো স্কুল কলেজে মাষ্টারী, তা নইলে সরকারী অথবা বেসরকারী কেরানী। আমার সঙ্গে যারা পড়ত তাদের মধ্যে কত মেধাবী তুখোড় ছেলে ছিল, তারা কে কোথায় ভেসে গেছে, বেঁচে আছে জীবনের বেনামী নেপথ্যে, আমি জানিও নে। শুধু দু'এক জন নিতান্ত ভাগ্যের জোরে নেপথ্য থেকে মঞ্চে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের সাফল্য এক একটা এ্যাকসিডেণ্ট, হ'য়ে গেছে তাই হয়েছে, হবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ

ছিল না। তোমাদের জীবন অন্যরকম হবে। বিত্তবান না হলেও তোমরা গরীব ছেলেমেয়ে নও। অনেক কিছু তোমরা ছোটবেলা থেকে পাচ্ছ যা দেশের বিপুল জনসংখ্যার সন্তানরা পায় না, বহুদিন পাবেও না। তোমাদেরই মধ্যে জীবনের ভালটুকুর জন্যে কঠিন প্রতিযোগিতা চলবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ আমরা প্ল্যান করবার সুযোগ পাব। তুমি যদি ইন্‌জিনীয়র বা ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক হ'তে চাও, তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। যদি বিদেশে গিয়ে পড়তে চাও তারও সুযোগ পাবে, ভাল স্কুল কলেজ য়ুনিভারসিটি থেকে ভাল পাশ করতে পারলে। যদি গভর্ণমেণ্টে যোগ দিতে চাও—"

আমি বলে উঠেছিলাম, "না আমি কোনদিন গভর্ণমেণ্টে চাকরী করব না।"

"তুমি বোধহয় আমার প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় আশ্চর্য হ'য়েছিলে।

কিন্তু কোনওদিন তুমি আমাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতিগুলিকে নিষ্পেষিত করতে চাও নি, তাই তোমার বিস্ময় না-প্রকাশ ক'রে কেবল বলেছিলে, "তোমরা যখন বড় হবে তখন সরকারী কাজকে স্বগায় মনে করবার প্রয়োজন থাকবে না। সরকারের বাইরে এমন অনেক কিছু করণীয় থাকবে যাতে জীবনে পূর্ণতার আস্বাদ পাবে।"

আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, "তোমার মত আমিও লেখক হব।"

"আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ভাল লেখক হবে তুমি।"

"কি ক'রে জানলে?"

"তা না হ'য়ে লেখক হ'য়ে লাভ কি?"

"তোমার চেয়ে বড় কিছু হব ভাবতে গেলে ভয় ক'রে আমার, বাবা।"

তুমি হেসে উঠেছিলে।

"সত্যি বলছি। অনেক সময় অনেক কিছু হবার কথা ভাবি। যাই ভাবি দেখি বিরাট তুমি সামনে দাঁড়িয়ে।"

"একদিন দেখবে আজকের বিরাট ছোট্ট হ'য়ে গেছে।"

"কেন হবে?"

"আর একটা বিরাট মাথা তুলে দাঁড়াবে বলে!"

"না, বাবা, তোমার চেয়ে বড় হ'য়ে আমার ভাল লাগবে না। আমি অনেক বড় হব, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়।"

"বেশ তো। আমার চেয়ে একচুল কম। খুশি?"

মিশনারী স্কুলে পড়তে একটুও ভাল লাগত না, আমার অথবা মিতুর। স্কুলে যেতেই ইচ্ছে করত না আমার, তা তুমি বিলক্ষণ জান। রোজ সকালে মার

সঙ্গে এক রীতিমত গেরিলাযুদ্ধ। কি ক'রে কোন অছিলায় দেরী করে দিয়ে বাস 'মিস্' করা যায় তার অক্লান্ত চেষ্টা। ভোর না হ'তে মা ডাকতে শুরু করত আর জেগে গেলেও আমার ঘুম ভাঙ্গতো না কিছুতেই। মিতু বাথরুমে চলে যাবার পরও আমি জেগে জেগে মরার মত ঘুমুচ্ছি। মাকে এসে অগত্যা বিছানা থেকে টেনে তুলতে হ'ত, পাইখানা আমার আর হ'তেই চায় না। স্নানের ঘরে যতটুকু পারি দেরী ক'রে নি। তারপর খাওয়া! গলা দিয়ে কিছুতেই খাদ্য ঢুকতে চাইত না। কখনও কখনও বেপরোয়া হ'য়ে মা ডাকত তোমাকে। তুমি এসে বসতে খাবার টেবিলে। তখন গলা আমার খুলতে বাধ্য। তোমার কাছে প্রতিরোধ ছিল না, অনেক বড় হবার আগে, সুসান হার্ডির সঙ্গে প্রেমে পড়ার আগে। সে কথা বলবার সময় এখনও আসে নি।

স্কুলে গিয়ে স্যার আর মিসদের দেখলেই আমার স্নায়ুগুলি বিগড়ে যেত। লাল ঠোঁট দিশী মিসরা দাঁত চেপে চওড়া গলায় ইংরিজী বলত, তাদের মধ্যে না ছিল মমতা না সহানুভূতি, তারা আমাদের ভাল বাসত না, আমাদের সামনে রাগে তারা ঘর্মাক্ত হত, আমরা যেন ছিলাম তাদের এক এক পাল শত্রু! আজ বুঝতে পারি, তাদের বিদ্যেবুদ্ধি ছিল সামান্য, কোনও মতে বাঁধাধরা পথে তারা এক একটা বিষয় যেত পড়িয়ে, ইতিহাস থেকে সমাজকল্যাণ পর্যন্ত, আমরা কতটুকু বুঝলাম, আদৌ পাঠ্যবিষয় আমাদের প্রাণস্পর্শ করল কিনা এ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাত না তারা। ক্লাসে কথা বল্লে আমরা মার খেতাম, পড়া না পারলে বেশি মার, হোম ওয়ার্ক না নিয়ে গেলে আরও বেশি। আমাদের মেরে স্যার আর মিস্-রা কেমন একটা হিংস্র আনন্দ পেত, যেন নিজেদের জীবনের অনেকবেশি গ্লানি আর পরাজয় হিংস্র রাগের মধ্য দিয়ে গেল বেরিয়ে, যেন তাদের পদানত মনুষ্যত্বের খানিকটা সাময়িক বিজয় ঘটল, নিজেদের পৌরুষ দেখে খানিকটা বাহবা পেল নিজেদের কাছেই।

শাদা চামড়ার মিশনারীরা বলুক না কেন, বাবা, তাদের পরিচালিত স্কুলে যীশুর প্রভাব যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের, এতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। দিশী স্যর ও মিস্-দের সঙ্গে সাদা পাদরী শিক্ষকদের যা সম্পর্ক তার মধ্যে আর যাই থাক মানুষের সঙ্গে মানুষের সততা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা খুব একটা থাকে না। দিশী শিক্ষকদের কোনও ভূমিকা নেই স্কুল পরিচালনায়, তাঁরা কেবল সাদা পাদরীদের আদেশ মেনে চলেন মাত্র। এবং যেহেতু খৃষ্টান হ'লেই এসব স্কুলে চাকরী পাবার সম্ভাবনা আগে,

তাই যোগ্য লোকের পরিবর্তে অনেক অযোগ্য লোক এসব স্কুলে স্থান পায়, এবং এরাই ছাত্র পেটায় সব চেয়ে বেশি। অবশ্য সেণ্ট কলম্বাতে আমাদের সময় আইরীশ ব্রাদার্সরাও ভীষণ ছাত্র পেটাত, আমাদের মেরে তাদের কি যে আত্মতৃপ্তি হত তা হয়ত তারা নিজেরাই জানত না ভাল ক'রে। বাইবেলের পাতায় পাতায় যীশুর অনেক কথামৃত, কিন্তু কোথাও তিনি মাষ্টারদের বারণ ক'রে যান নি ছাত্রদের পিটিয়ে আনন্দ পেতে, অতএব আমাদের দেহগুলি ছিল ব্রাদারদের এবং দিশী মাষ্টারদের দেহচর্চার সেল, মাথায় তারা কিছু দিতে পারুক আর না পারুক আমাদের দেহসেবায় তাদের উৎসাহের শেষ ছিল না।

ক্লাস সেভেন পর্যন্ত স্কুল থেকে আমি বলবার মত কিছু পেয়েছি মনে করতে পারি নে, বাবা। আমার একমাত্র প্রকৃত শিক্ষক ছিলে তুমি। তোমার কাছে একদিনও স্কুল কিতাব পড়িনি। কিন্তু সকালে তোমার সঙ্গে একঘণ্টা হাঁটতে যাবার সময় অথবা রাত্রে তোমার ও মার সঙ্গে গল্প করার সময় মিতু আর আমি যা শিখেছি, স্কুলের 'শিক্ষা'র বিরাট অপচয় তাতে অনেকখানি কেটে গেছে, সন্দেহ নেই।

প্রথম যে শিক্ষক আমার মনে অনির্বচনীয় অনুভূতি আনলেন তাঁর নাম ব্রাদার অ্যাশ। বাংলায় বলতে হয় 'ছাই-ভাই'। আমি যখন ক্লাশ এইটে পড়ি 'ছাই-ভাই' আমাদের স্কুলে বদলি হ'য়ে এলেন দার্জিলিং থেকে, এবং আবির্ভূত হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। প্রথম দিন রোল কলের সময় সাঁইত্রিশ জনের ক্লাসে পাঁচটি বাঙ্গালী ছেলেকে খুঁজে পেয়ে ব্রাদার অ্যাশের মনে এক বিচিত্র কোমল রসের উদ্রেক হল। প্রত্যেকটি বাঙ্গালী ছেলের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদেশ দিলেন। "কীপ ষ্টানডিং।"

সব ক্লাস বসে আছে, আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে, ছাত্ররা বুঝতে পারছে না ব্রাদার অ্যাশ তামাশা করছেন না কি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে তাঁর, তারা হাসতে গিয়েও পারছে না হাসতে, একটা নকল নীরবতা তাই বিরাজ করছে ক্লাসে।

আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রাদার অ্যাশ একটা বইতে মনোনিবেশ করলেন। আমরা পাঁচজনে এ ওর সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। পুলক বসু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি? আমি চোখ দিয়ে জবাব দিলাম, যীশু জানেন!

তিন চার মিনিট চলে গেল।

এবার আমি বসলাম।

ব্রাদার অ্যাশ বিদ্যুতের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথম বাক্যে।

'এই ছেলে, কি নাম তোমার ?'

'আমাকে বলছেন, স্যর ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে। তুমি বসলে কেন ? তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি না !"

'আমার মনে হল আমাদের বসতে বলতে আপনি ভুলে গেছেন।'

'খুব চালাক জবাব! কেন মনে হল আমি ভুলে গেছি ?'

'রোল কলের সময় দাঁড়াতে বললেন। রোল কল শেষ হ'লে আমাদের কিছু না ব'লে বই পড়তে লেগে গেলেন, আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম। তাই মনে হল ভুলে গেছেন।'

ব্রাদার অ্যাশ অন্য চারজন তখনও দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদেরও তাই মনে হচ্ছিল ?'

তিনজন বলল, না। কেবল পুলক বলল, 'আমারও অনেকটা তাই মনে হচ্ছিল, স্যার।'

'তুমি ব'সে পড়ো নি কেন ?'

'সিওর হ'তে পারি নি, স্যার।'

ব্রাদার অ্যাশ আমার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। দেহের সমস্ত তেজ চোখ দুটোতে জড়ো ক'রে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমি একবার তাঁর চোখের পানে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে মেঝের ওপর রাখলাম।

ঠাস ক'রে চড় মারলেন ব্রাদার অ্যাশ আমার গালে। অতবড় চড় এর আগে কখনও খাই নি। হটাৎ মাথাটা একদম ঘুরে গেল। দাঁড়িয়েছিলাম, বসে পড়লাম।

'আমি দাঁড়াতে বললে থাকবে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না বসতে বলি, বুঝেছ বাঙ্গালী ছেলে !'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, একশ' বার বুঝেছি।

'পুরো ক্লাস তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে,' হুকুম করলেন ব্রাদার অ্যাশ।

এর পর তিনি আমাদের পাঁচ জনের পরিচয় নিতে লাগলেন। আমাদের নাম কি ? বাবার নাম কি ? কি করেন তিনি। বেঙ্গলে কোথায় আমাদের বাড়ী ? শেষ কবে বাড়ী গেছি, এই সব প্রশ্ন। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে

একজন, দীপক চক্রবর্তী, ভারত সরকারের এক সেক্রেটারীর ছেলে। শুনে ব্রাদার অ্যাশ ঠোঁট ওল্‌টালেন।

'তোমার বাবা তাহলে একজন টপ-ব্র্যাস! ভি-আই-পি। আই-সি-এস! হেভেন বর্ণ সার্ভিস! স্টীল ফ্রেম! অ্যাঁ!' তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ! দীপকের কান লাল হ'য়ে উঠল। দুজনের পিতৃদেবরা ডেপুটি সেক্রেটারী। শুনেই ব্রাদার অ্যাশ এমন ভাব দেখালেন যে তাঁদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত কৌতূহল অবান্তর। এবার এল পুলক বসুর পালা।

'তোমার বাবা আছেন?'

'আছেন।'

'কি করেন তিনি?'

'বিজনেস একজিকিউটিভ।''

'কোন কোম্পানী?'

"লয়েডস্‌ ব্যাংক।"

'লাভলি!' চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রাদার অ্যাশ। 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক কর্মচারী! বিউটিফুল!

এবার আমি।

'তুমি কে?'

'আমার নাম কেতু।'

'তোমার বাবা কি কাজ করেন?'

'লেখেন।'

'ও আই সী! তুমি একজন রাইটারএর ছেলে! কি লেখেন?'

'বই।'

'বটে! কি রকম বই?'

'ইংরিজীতে রাজনৈতিক। বাংলায় উপন্যাস।'

'তিনি কংগ্রেসী?'

'না। দলীয় রাজনীতি করেন না আমার বাবা। তিনি বলেন, আমি রাজনীতির ছাত্র।'

'তাঁর নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক মতামত নেই?'

'আছে বৈ কি।'

'তুমি জান?'

'কিছুটা। তিনি নিজেকে মার্কসিস্ট বলেন!'

'তোমার বাবা কম্যুনিষ্ট ?'

'না। বাবা বলেন, কম্যুনিষ্ট মানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মী। তিনি তা নন। তিনি কোনও রাজনৈতিক দলে নেই। মার্কস্‌বাদে তিনি অনেকখানি বিশ্বাস করেন।'

'তুমি ?'

'আমি কার্ল মার্কস পড়িনি এখনও। বড় হ'য়ে পড়ব।'

'তুমি জান কাল মার্কস ধর্মে বিশ্বাস করতেন না ? বলতেন, ধর্ম জনগণের আফিং ?'

'শুনেছি।'

'তবু তুমি মার্কস পড়বে ?'

'কেন পড়বো না ? বড় হ'য়ে আমি গীতা উপনিষদও পড়ব। আমার বাবাও পড়েছেন।'

'ব্লাডি ব্র্যাট্।'

সমস্ত ক্লাস চমকে উঠল। ব্রাদার ক্লাসে ছাত্রদের সামনে 'ব্লাডি' বলবেন, আমাদের কান গরম হ'য়ে উঠল।

মুহূর্ত পরে সমস্ত ক্লাস একসঙ্গে হেসে উঠল।

ব্রাদার অ্যাশ বললেন, 'তোমরা পাঁচজনই আমাকে নিরাশ করেছ। তোমাদের বাবাদের মধ্যে একজনও বিপ্লবী নন! দার্জিলিং-এ আমার তিনটে ছাত্র ছিল, তাদের বাবারা বিপ্লবী। আসল টেররিষ্ট। দুজন ছিলেন সূর্য সেনের দলে। সূর্য সেনের নাম শুনেছ ? শোন নি ? চিটগঙ্গ আর্মারী রেডের গল্প জান ? জান না ? তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত! আজই বাড়ী গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো! আমি আমার তিনটি ছাত্রের বাড়ী গিয়ে তাদের বাবাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। ওঁরাই তো ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন! নট ইওর মহাট্মা গান্ধী! বাট বেঙ্গলস্ স্থভাষ বোস!'

আমরা ক্লাসের ছাত্ররা তখন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক।

ব্রাদার অ্যাশ বলে চললেন, "বেঙ্গল! বেঙ্গল! ভারতবর্ষে ঐ একটা জাত আছে, যারা ইংরেজকে মানে নি, মেরেছিল। রীয়েল গ্রেট।"

তারপর আমাদের আরও অবাক ক'রে দিয়ে ব্রাদার অ্যাশ বিশুদ্ধ বাংলায় আবৃত্তি ক'রে চললেন :

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।

ব্যাঘাত আসুক নব নব—আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

আবৃত্তি শেষ ক'রে বললেন, "কার কবিতা বলতে পার ?"

পুলক বলে উঠল, "টাগোর।"

ব্রাদার অ্যাশ বললেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

কি জানি কেন আমার দুচোখ তখন জলে ভ'রে গেছে।

ব্রাদার অ্যাশের সঙ্গে বছর খানেকের মধ্যে আমার যে সম্পর্ক তৈরী হল তাকে প্রাচীন ভারতীয় মূল্যায়নে বলা যায় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। বত্রিশ বছরের এই আইরীশ ভদ্রলোক পাদ্রী হয়েছিলেন প্রধানত পারিবারিক প্রভাবে; ঠাকুর্দা ছিলেন পাদ্রী, এবং পিতাও, "অতএব ছোটবেলা থেকে ধ'রে নেওয়া হয়েছিল আমিও পাদ্রী হব।" স্কুলজীবনেই ধর্মীয় শিক্ষার আরম্ভ, স্কুল শেষ হ'তে হ'তে ক্যাথলিক চার্চের ডিভিনিটি স্কুলে ভর্তি, এবং পাদ্রী জীবনের প্রস্তুতি। "ধর্ম নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই," বলতেন ব্রাদার অ্যাশ, "শুধু এটুকু ছাড়া যে কেউ ধর্ম মানে না, কোনও চার্চই না। পৃথিবীর কোথাও, আসলে দেখা যায় ধর্মের সঙ্গে রাজশক্তির গলায় গলায় মিতালী, ধর্ম সমাজকে নতুন ক'রে গড়বার বদলে পুরাতন ক'রে রাখবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।' আইরীশ ব্রাদার্স মিশন থেকে গিয়ে ব্রাদার অ্যাশ ভারতবর্ষে আমার আগে পড়িয়েছিলেন লাতিন আমেরিকার একুওডোরে, আফ্রিকার নাইজিরিয়ায়।" "ওখানে কি শিখেছি, জানো? শিখেছি, খৃষ্টান চার্চের পুরো সহায়তা না পেলে প্রাচ্য সাম্রাজবাদ পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে বললেও পারত না। আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খৃষ্টান চার্চ, ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্ট, এখনও প্রধান।" এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, "তোমাদের দেশে নতুন সমাজ তৈরীর সবচেয়ে বড় বাধা হিন্দুধর্ম।" বুঝিয়ে বলতেন, "ধর্ম মানে তো কতগুলি নীতি উপদেশ নয়, ধর্ম মানে একটা গোটা সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দুধর্ম মানে তোমাদের হিন্দু সমাজ, তার জাতিভেদ, জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ সব কিছু নিয়ে গোটা সামাজিক শাসন। তোমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যতদিন জাত মানবে, অদৃষ্টবাদ আর জন্মান্তরবাদ মানবে ততদিন যে কোনও শাসকদল অনায়াসে তাদের কনট্রোল করতে পারবে।"

ব্রাদার অ্যাশের রক্তে ছিল টগবগে আইরীশ জাতীয়তাবাদ। এবং ইংরাজের

প্রতি রোষ ও ঘৃণা। যা তিনি একেবারে সইতে পারতেন না, তা হল ভারতবর্ষের বিস্মিত মানসে গভীর ইংরাজ প্রীতি। "তোমরা এক বিচিত্র জাতি। ইংরেজকে রাজনৈতিক শাসন থেকে সরিয়ে বুদ্ধি আর মননের শাসক বানিয়ে নিয়েছ। আমাদের মানসিক স্বাধীনতা একেবারে নেই। চিন্তায়, মননে, আইডিয়ার সন্ধানে, তোমরা এখনও ইংলণ্ডের দুয়ারে দীন প্রার্থী। ইংরেজের যে সবচেয়ে দর্পিত দাবী—তার সাম্রাজ্যবাদ এক নতুন ভারত সৃষ্টি করেছে—সে দাবী প্রতিদিন প্রমাণ ক'রে যাচ্ছ তোমরা। অবশ্যি তোমাদের একার দোষ নয় এখানে। আমরাও দোষী। ভেবে দেখ 'ইংরেজী' সাহিত্যে আয়র্লাণ্ডের প্রভাব। জর্জ বার্নার্ড শ', ইয়েটস, জয়েস: এদের বাদ দিলে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের রইল কি? অথচ একমাত্র জয়েস ছাড়া আইরীশ ভাষা পর্যন্ত অন্য কোনও আইরীশ লেখক ব্যবহার করে নি। এবং জয়েসও তাঁর 'ইউলিসিস' লিখেছেন ইংরেজীতে, যার ফলে ইংরেজ তাঁকে বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে।"

একদিন ব্রাদার অ্যাশ ক্লাসে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে কে এই স্কুলে কিনডারগার্ডেন থেকে পড়েছ?"

অনেকগুলো হাত উঠল, বোধহয় চারপাঁচ জন ছাড়া সবারই।

"তাহলে তোমরা এই বইগুলো পড়েছ, পড় নি কি? ব্রাদার অ্যাশ তিনখানা ইতিহাস ও ভূগোল বই আমাদের চোখের সামনে রাখলেন। খুব পরিচিত বই আমাদের, সাহেবদের লেখা, সাহেব কোম্পানীর ছাপা, বছরের পর বছর এ বইগুলো প'ড়ে আমাদের মত ছেলেরা মিশনারী স্কুলের নিম্নতম চৌথট পেরিয়ে ধাপে ধাপে উঁচু ক্লাসে উত্তীর্ণ হ'য়ে থাকে।

"তোমরা পড়েছ এই বইগুলো, আজ তোমাদের ছোট ভাইবোনেরা পড়ছে, কাল তাদের ছোট ভাইবোনেরা পড়বে, তাই না?"

আমরা সমবেত স্বরে বললাম, ইয়েস স্যার।

"কি লেখা হয়েছে এ বইগুলিতে মনে আছে তোমাদের?" এক একটা বইএর পাতা উল্‌টিয়ে ব্রাদার অ্যাশ পড়ে গেলেন। "ভারতবর্ষের লোকেরা এখনও ইট তৈরী করে রৌদ্রে শুকিয়ে।...চীনের মানুষরা নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ খেয়ে জীবনযাপন করে।...ইংরেজী শিক্ষা ভারতীয়দের মনের প্রাচীন অন্ধকার দূর করেছে...ভারতবর্ষের অনেক অসভ্য কুসংস্কার দূর করেছেন ইংরেজ শাসকরা...১৯৪৭ সালে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে ও অন্যান্য উপনিবেশ গুলিকে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ..আফ্রিকার

লোকেরা আদিম অসভ্য ছিল, পশ্চিমের সভ্যতা তাদের আধুনিক যুগের আলোর সন্ধান দিয়েছে।" বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে ব্রাদার অ্যাশ কয়েক মিনিট চুপ রইলেন।

তারপর বললেন, "তোমাদের বাবারা কখনও এ বইগুলি দেখতেন প'ড়ে ?"

কেউ কেউ বলল, দেখতেন। তার মধ্যে ছিলাম আমি।

ব্রাদার অ্যাশ আমাকে ধরলেন, "তোমার বাবা পড়তেন বইগুলো ?"

"প্রত্যেকটা।"

"কি বলতেন ?"

"আমাকে দেখিয়ে দিতেন বুঝিয়ে দিতেন বইগুলি কারা লেখে কি উদ্দেশ্যে কাদের জন্যে। বলতেন, খুব দুঃখের কথা এসব বই তোমাদের পড়তে হয়।"

"এর বেশি কিছু নয় ?"

"তখন ব্রাদার ও'কনর ছিলেন প্রিন্সিপাল। বাবা তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।"

"জবাব পেয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। প্রিন্সিপাল ও'কনর লিখেছিলেন, তিনি জানতেন বইগুলোতে অনেক আউট-ডেটেড তথ্য আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ছোটদের জন্যে ইংলিশ টেক্সটবুকের দারুণ অভাব, নেই বললেই হয়। তাই এসব বই না পড়িয়ে উপায় নেই।"

ব্রাদার অ্যাশ শুধু বললেন, "তোমাদের বাবারা আসলে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু। তা নইলে এত সব সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গ্রহণ করছে এ তাঁরা সহ্য করতেন না।

পুলক বলে উঠল, "আমরা এর কিছুই গ্রহণ করি না স্যার।"

ব্রাদার অ্যাশ বললেন, "তোমরা জান না এসব বই তোমাদের কী ক্ষতি করছে। জানলে একথা বলতে না। দোষ তোমাদের নয়। তোমাদের পিতাদের। তাঁরা তো ল'ড়ে স্বাধীনতা আদায় করেন নি, ইংরেজের হাত থেকে গ্রহণ করেছেন মাত্র। একটা কথা তোমাদের বলি, বড় হ'য়ে তার মানে ঠিক বুঝতে পারবে। যাঁদের শ্লোগান হল Continuity and Change তাঁরা আসলে Continuityতে বিশ্বাস করেন Change-এ নয়।"

আমরা জানতাম ব্রাদার অ্যাশ বেশিদিন স্কুলে টিকতে পারবেন না। আমার মত কয়েকটি ছেলে, যারা তাঁর শিষ্য হ'য়েছিল, আমাদের তিনি প্রায়ই বলতেন, চার্চের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হচ্ছে না, পাদ্রী জীবন থেকে

একদিন তিনি কেটে পড়বেন। "কি করতে চাইনে তা আমি বেশ ভালই জানি এখন, বুঝলে? কি করতে চাই, তা যেদিন জানব সেদিনই কেটে পড়ব চার্চ লাইফ থেকে।" প্রায়ই বলতেন, স্বদেশে ফিরে যাবেন। "বাবার মৃত্যুর দিন গুনছি। তেরাশি বছর হয়েছে, আমি চার্চ ছেড়ে দিয়েছি জানলে বড্ড কষ্ট পাবেন। কিন্তু অনেকদিন আর অপেক্ষা করতেও পারব না।"

এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে ব্রাদার অ্যাশকে আমাদের স্কুল ছাড়তে হল। সে বছর আমরা সিনিয়র কেমব্রিজের ছাত্র, অর্থাৎ স্কুলে আমাদের শেষ বছর।

ভারত সরকারের এক জবরদস্ত মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি যাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা, ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন সেণ্ট কলম্বায়, সে ছেলে পড়ত আমাদের সঙ্গে, একই সেকসনে। পড়াশোনায় মন ছিল তার, সব বিষয়ে পাশের নীচে নম্বর পেত, ব্রাদার অ্যাশ প্রায়ই তাকে পেটাতেন, কথা শোনাতেন কড়া-কড়া, কিন্তু তাতে সে একটুও আহত হয়েছে মনে হ'ত না। সিনীয়র কেম্ব্রিজের আগে স্কুল সিলেকশন টেষ্টে সে যথারীতি ফেল ক'রে বসল। স্কুলের প্রাচীন নিয়ম ক্লাসে টীচারের অনুমোদন ছাড়া কাউকে প্রমোশন দেওয়া হয় না, এক্ষেত্রে ব্রাদার অ্যাশ মন্ত্রীপুত্রকে ফেল করিয়ে দিলেন, অর্থাৎ সিনীয়র কেম্বিজ পরীক্ষার জন্তে সে মনোনয়ন পেল না।

মন্ত্রী প্রথম লোক পাঠালেন প্রিন্সিপালের কাছে, পরে ফোন করলেন, শেষে নিজেই এলেন দেখা করতে। ছেলের জন্তে বিদেশে টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, ইংলণ্ডের ক্রাইসলার মোটর কোম্পানী তাকে নেবে শিক্ষানবীশ ক'রে, পাশ তাকে করতেই হবে। মন্ত্রী মহাশয় এজন্তে উপযুক্ত গৃহশিক্ষক রেখে দেবেন, স্কুলের তিনজন মাষ্টারের সঙ্গে কথাও হ'য়ে গেছে, এখন তাঁর চাই শুধু সিলেকশন। এটুকু তাঁর জন্তে করতেই হবে, অনুরোধ জানালেন ব্রাদার ও'ডনিয়ালকে।

ও'ডানিয়াল বললেন, "এ স্কুল থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ফেল করেনি। আপনার ছেলে পাশ করবে এমন ভরসা আমাদের নেই।"

মন্ত্রী বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি সে পাশ করবেই।" একটু পরে বললেন, "কারুর কাছে কোনও অনুগ্রহ চাইবার প্রয়োজন আমার হয় না, অভ্যাসও নেই। আপনার কাছে অনুগ্রহ চাইছি। এর চেয়ে বেশি আর

বলতে পারছি না। যদি আমার কথা রাখেন, খুব মনে থাকবে আপনার অনুগ্রহ।"

ব্রাদার ও'ডানিয়েল মন্ত্রীর কথার মানে বুঝলেন। যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তাহলেও খুব মনে থাকবে।

বললেন, "ব্রাদার অ্যাশ আপনার ছেলের ক্লাস টীচার। তাঁর অনুমোদন ছাড়া ওকে আমি সিলেকশন টেষ্টে পাশ করাতে পারি না। আমাদের স্কুলের এই নিয়ম।"

"ব্রাদার অ্যাশকে আপনি বলুন, তাহলেই তিনি অনুমোদন করবেন।"

"আপনি তাঁকে চেনেন না। আমি হয়তো বলব, কিন্তু তার আগে আপনাকে বলতে হবে।"

"বেশ তো। তাঁকে ডেকে পাঠান এক্ষেত্রে।"

"তিনি ক্লাস করছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকল, স্লিপ প'ড়ে ব্রাদার অ্যাশ মুখ বিকৃতি করলেন। আমরা তখন ইংরিজী শব্দের 'পান' অভ্যাস করছিলাম, পুলক একটা 'পান' ক'রে ক্লাস শুদ্ধ সবাইকে হাসিয়ে তুলেছিল 'পান'টা হল Brothers Marry Nun, ব্রাদার অ্যাশ নিজেও হেসে পুলকের বুদ্ধির তারিফ করছিলেন, হটাং বলে উঠলেন, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও, আমি আসছি।"

পাঁচ মিনিট পরে যখন ক্লাসে ফিরে এলেন তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর, ভীষণ লাল।

ঘটনাটা জানাজানি হ'তে দেরী হল না।

ব্রাদার অ্যাশ কিছুতেই মন্ত্রীপুত্রকে সিলেকশন টেষ্টে পাশ করাতে রাজী হলেন না।

প্রিন্সিপাল অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অত বড় মন্ত্রীকে চটালে স্কুলের, এমন কি মিশনের, ক্ষতি হ'তে পরে। এদেশে মিশন চালাতে হ'লে একটু আধটু নিয়মভঙ্গ করতেই হবে। দিল্লীর মিশনের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিশপও মনে করেন ঐ মন্ত্রীকে চটান মোটেই উচিত হবে না।

ব্রাদার অ্যাশ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন, একটি মাত্র শর্তে। মন্ত্রীপুত্রকে পাশ করালে অন্য যারা ফেল করেছে প্রত্যেককে পাশ করাতে হবে। 'এই ছেলেটা সব চেয়ে নিকৃষ্ট। তাকে পাশ করালে আর কাউকে আটকান

যাবে না। অন্য ছেলেগুলির বাপেরা মন্ত্রী নয় বলে শাস্তি পাবে তা হ'তে পারে না।'

ব্রাদার ও'ডানিয়েল মহা বিপদে পড়লেন। মন্ত্রী হয়তো তিন চারজন গৃহশিক্ষক রেখে ছেলেকে পাশ করিয়ে নেবেন। অন্য ফেল-করা ছেলেদের বাবারা তা পারবে না। তাদের সবাইকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেবার মানে অন্তত কয়েকটি নিশ্চিত ফেল। সেণ্ট কলম্বা'র ইতিহাসে যা ঘটেনি ব্রাদার ও'ডানিয়েল তা কি ক'রে ঘটতে দেন?

একটিমাত্র পথ তাঁর খোলা ছিল। ব্রাদার ও'ডানিয়েলকে সে পথই নিতে হল শেষ পর্যন্ত।

তিনি ব্রাদার অ্যাশকে দিল্লী থেকে অন্যত্র কোনও স্কুলে বদলি করিয়ে নিলেন। নিজেকে করলেন, তাঁর বদলে, আমাদের ক্লাস টিচার। মন্ত্রীর ছেলে সিলেকশন পেল। ব্রাদার অ্যাশ আমাদের কাউকে কিছু না বলে, কারুর কাছ থেকে কোনওরকমের বিদায় না নিয়ে, হটাৎ একদিন চলে গেলেন।

আমরা একদিন সকালে ক্লাসে হাজির, পড়াতে এলেন প্রিন্সিপাল ও'ডানিয়েল। আমাদের মুখে বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'ব্রাদার অ্যাশ তোমাদের আর পড়াবেন না। তিনি কাল রাত্রে অন্যত্র বদলি হ'য়ে গেছেন। আজ থেকে আমি তোমাদের ক্লাস টীচর।'

পড়া শুরু করার আগে একটি ছেলের নাম উচ্চারণ ক'রে তাকে দাঁড়াতে বললেন।

উঠে দাঁড়াল সেই মন্ত্রীপুত্র।

ব্রাদার ও'ডানিয়েলের মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বললেন, 'আজ থেকে স্কুল শেষ হলে রোজ তুমি দু'ঘণ্টা ক্লাসে ডিটেন হবে। আমি তোমাকে কাজ দেব। সে কাজ শেষ ক'রে আমাকে দেখিয়ে তারপর বাড়ী যাবে।

ব্রাদার ও'ডানিয়েল রিস্ক নিতে রাজী নন। যাকে নিয়মের বাইরে সিলেকশন টেষ্টে পাশ করিয়েছেন, সে যাতে আসল পরীক্ষায় ফেল না ক'রে বসে সে দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন।

সেদিনটা, তোমার হয়ত মনে পড়বে, বাবা, আমার বড় বিষণ্ণ কেটেছিল। তোমাকে বার বার প্রশ্ন করেছিলাম, ব্রাদার অ্যাশ আমাদের কাউকে কিছু না বলে, একবার বিদায়টুকু পর্যন্ত না নিয়ে, এমন হটাৎ কেটে পড়লেন কেন? আমরা যে তাঁকে কত ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম তা তো তিনি জানতেন!

তবে কি তাঁর কাছে আমাদের ভালবাসা-শ্রদ্ধার কোনও মূল্য ছিল না! আমাকে তো তিনি 'বন্ধু' বলতেন! কাল রবিবার তাঁর সঙ্গে পুরো অপরাহ্ণ কাটিয়েছি কত গল্পে! একবারও কি তাঁর মনে হ'ল না আমরা দুঃখ পাব?

তুমি আমার প্রশ্নগুলির জবাব দাও নি। শুধু বলেছিলে, লোকটার সত্যিকারের আর্ট সেন্‌স্ আছে। যদি কোনওদিন গল্প লিখিস, কেতু, দেখতে পাবি কি সুন্দর আর্ট-সেন্‌স্ নিয়ে ব্রাদার অ্যাশ তোদের কাছ থেকে সরে পড়েছিলেন। আমরা জীবনে অনেকেই কিছু কিছু গল্প ফেঁদে বসতে পারি। সুন্দর ভাবে শেষ ক'রে উঠতে পারি খুব কম।

তোমার কথার একটা মানে আমি সেদিন ধ'রে নিয়েছিলাম, জানিনা সেটাই সত্যিকারে মানে ছিল কিনা।

তিন বছর পরে, তখন আমি সেণ্ট স্টীফেন্‌স্ কলেজের ছাত্র, আমরা গিয়েছিলাম সিমলা পাহাড়ে। তুমি হটাৎ খবর পেয়ে গেলে ওখানকার সেণ্ট কলম্বা স্কুলে ব্রাদার অ্যাশ আছেন। বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই খবরটা আমাকে দিলে, এবং বললে. 'দেখা করতে যাবে তো তুমি! আজই যাবে?'

আমি চুপ ক'রে রয়েছিলাম।

'আজ যাবে? আমরা আসব তোমার সঙ্গে?'

'আমি বললাম, 'কি হবে দেখা ক'রে?'

তুমি বুঝলে। ব্রাদার অ্যাশের প্রসঙ্গ আর উঠল না আমাদের মধ্যে।

তারপর অনেক, অনেক বছর কেটে গেল. বাবা, অনেক মানুষের অনেক বছর। একদিন, বছর খানেক আগে, নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে একটা খবর চোখে পড়ল। নর্থ আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের সঙ্গে ইংরেজদের এক খণ্ড যুদ্ধে রবার্ট জনসন অ্যাশ নামে একজন ক্যাথলিক স্কুল শিক্ষক মারা পড়েছে। এককালে মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা সে করেছিল ইকোয়েডরে, নাইজিরিয়ায়, ইণ্ডিয়ায়। ক্যাথলিক চার্চ ত্যাগ ক'রে আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে শিক্ষকতা করছিল এবং বর্তমান ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল।' Robert Ashe belonged to the extremist wing of the anti-British Catholic movement.

ক্রমশঃ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অপুর পাঁচালী

॥ চার ॥

ভাবজীবনের জন্মযুগ

বিভূতিভূষণ যে-কালের পল্লীবাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে গ্রামজীবনের সামাজিক ছবি উদ্দীপনাময় ছিল এমন অপবাদ কেউ দেবে না। যশোর জেলার ওপর দিয়ে নীলকর সাহেবদের শোষণের ঝড় বয়ে গেছে। পুরাতন সংস্কৃতির কাঠামো ভেঙে গিয়েছে অথচ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলো সেখানে পৌঁছয় নি। অঙ্গুলিমেয় কিছু জমিদার বা জোতদার এবং গোলদারী কারবারী ছাড়া সমাজের বৃহত্তর অংশ আর্থিক দিক দিয়েও দারিদ্র্যের কষাঘাতে ক্লিষ্ট। অপেক্ষাকৃত দূরদর্শী এবং বেপরোয়া যারা তারা গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহর বাজারে রুজিরোজগারের ধান্দায় যেতে শুরু করেছে। গ্রামে তখন ইংরাজী শিক্ষা না পৌঁছলেও বস্তুতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার আবাহনী সুরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আগের দিনের মতো পরস্পরের সুখ দুঃখের ভাগাভাগি ক'রে বইবার নৈতিক দায়িত্ববোধটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। সেই হিসেবে পল্লীর জীবনে শহরের বিচ্ছিন্নতা এসে পড়েছিল কিন্তু চাষআবাদ ছাড়া অন্য কোনও শিল্প ব্যবসায় কোথাও তেমন গড়ে' ওঠেনি। নীলকরদের শোষণ যন্ত্রের উচ্ছিষ্টে যারা বড়লোক হয়েছিল তারা অমিতাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার মানসিক এবং আর্থিক দুই দিক দিয়েই নিঃস্ব হয়ে ধুঁকছিল। সমাজের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি উঁচুজাতের দশাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে করুণ। পুরনো ধরণের যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বা ওই ধরণের বুদ্ধি নির্ভর বৃত্তির উপর নির্ভর ক'রে সংসার যাত্রা নির্বাহের সুযোগ ক্রমেই লুপ্ত হয়ে আসছিল অথচ কায়িক মেহনতের দিকে নামবার মতো শিক্ষা বা মনোভাব তাদের হয়নি। এই বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যারা শহরাঞ্চলে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য অনুকৃতির আশ্রয়ে শিক্ষা নিয়ে চাকরী ক'রে অবস্থা ফিরিয়েছে—তারা অবকাশ যাপন বা সামাজিক কর্ম উপলক্ষে গ্রামে ফিরলে দেখা গেল 'ভাঁই বংশ সম্ভূত ভেঁয়ে' হয়ে গেছে। তারা গ্রাম্য আত্মীয়-কুটুম্বদের করুণা করতে লাগল। ফলে বর্ণ-কৌলিন্যগর্ব সেখানেও ধাক্কা খেতে থাকল। বনগ্রাম বা তার আশপাশের গ্রামাঞ্চল পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম জনগণ থেকে

শিক্ষা বা সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভিন্ন ছিল না। ১৮৬৮-৬৯ খৃস্টাব্দে এই যশোর জেলা থেকেই 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হলেও তার প্রভাব ব্যাপকভাবে সাধারণের মনে বিশেষ আলোকপাত করেনি। ইংরেজের আইনের আর সেই সঙ্গের শাসনযন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কারচুপিতে গ্রাম বাংলার দেশচেতনা মাথা তুলতে পারে নি।

বিভূতিভূষণের প্রপিতামহ তদানীন্তন চব্বিশ পরগণার পাণিতর থেকে বারাকপুরে এসে যখন বসত করেছিলেন তখন বারাকপুরে ইছামতীর ধারে নীলকরের কুঠী ছিল। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলতে যা বোঝায় তাই! তারপর দুই-পুরুষ কেটেছে। বিভূতির পিতা মহানন্দ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করে পণ্ডিত হয়েছেন। মহানন্দ আর পাঁচজন ব্রাহ্মণের মতো সাধারণ সামাজিক জীব ছিলেন না। তখনকার অর্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যাঁরা যজন-যাজনে জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁরা অনেক সময়ে দেবদেবীর সুবিধাজনক মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে অশিক্ষিত গ্রাম্যজনের কাছে মনসা-শীতলা ইত্যাদি ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠান করিয়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন করতে পটু ছিলেন। কিন্তু মহানন্দ যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি কবি এবং দার্শনিক—এক কথায়, এমন অবৈষয়িক লোককে দিয়ে আর যা-ই হোক সাংসারিক বিত্ত বৈভব দূরের কথা অর্থসমস্যা সমাধানেরও কোন আশা থাকতে পারে না। প্রথম যৌবনে তিনি ভারতের বহুতীর্থে ভ্রমণ করেছেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান না হওয়ায়, বংশরক্ষার জন্য তাঁর স্ত্রীই জোর ক'রে মহানন্দকে দ্বিতীয়বার বিবাহে বাধ্য করেন। সে আমলে এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না—কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ত নয়ই। মহানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী মৃণালিনীর প্রথম সন্তান বিভূতিভূষণ।

রাজপুরের অমর লাহিড়ী মশাইএর মায়ের কাছে মহানন্দ বাঁড়ুয্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পর্কে যেটুকু শুনেছি (ইনি বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'র নায়িকা এবং এই পরিবারের সঙ্গে পরবর্তী কালেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল) তা হ'ল এই: এক ভিক্ষুককে মহানন্দের স্ত্রী ভিক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন, ভিক্ষা না নিয়েই সে চলে যাচ্ছে। তাঁর ডাকে ভিখারী মুখ ফিরিয়ে বলল—'না মা, তোমার হাত থেকে কিছু নিতে পারব না।'

—'কেন বাবা!' আমি যে তোমার জন্যে—'

—'বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের দান নেওয়া গুরুর নিষেধ কিনা! তাই তোমার বাড়ির কোনো কিছুই নিতে পারব না।'

এ কথায় দুঃখ পেলেও ভদ্রমহিলার মনে হল, লোকটি সাধারণ ভিখারী নয়। তিনি তখন আগ্রহভরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, কোন্ দেবতার পূজা দিলে তাঁর সন্তান হবে? ভিখারী মাথা নেড়ে জানালেন কোনোদিনই তাঁর গর্ভে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে তিনি সুগৃহিণী, সন্তানদের লালন-পালন মাতৃস্নেহ এ সবই তাঁর ভাগ্যে লিখছে। আর সেটা ঘটবে, স্বামীর বিবাহ দিলে। গর্ভে ধারণ না করলেও স্বামীর ঔরষে সন্তানের জন্ম হ'লে বন্ধ্যাত্ব দোষ আর থাকবে না। তখন ভিক্ষুক আবার আসবেন এবং এ বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।

স্বামী তখন ঠাকুর পূজো করছেন। বিচলিতা গৃহিণী সেখানে হাজির হয়ে ব্রাহ্মণের পূজায় বাধা দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন, স্ত্রীর একটি অনুরোধ রাখবেন। আসল অভিপ্রায় শুনে মহানন্দ বিস্ময়াহত হয়ে স্ত্রীকে অনুরোধ প্রত্যাহার করার জন্য অনুনয় করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় ঘটে নি।

এবং মৃণালিনী বেশিদিন বাঁচেন নি। বিভূতির শৈশবেই নুটুর জন্মের অল্পদিন পরে তিনি মারা যান।

বিমাতার স্নেহ ও শাসনেই মহানন্দের সন্তানেরা মানুষ হতে থাকেন। রাজপুরে 'বড়মা'র মৃত্যু হয়। সে কথা পরে হবে। এইটুকু বলি, বড়দা'র কাছে তাঁর জীবনের অনেক কথাই শুনেছি কিন্তু মাতৃবিয়োগ বলতে সর্বদাই 'বড়মা'র মৃত্যু বুঝে এসেছি।

সন্তান-সন্ততি আগমনে মহানন্দকেও সাংসারিক দিকে মন দিতে হ'ল। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক জগৎকেই চেনেন বা শ্রদ্ধা করেন। গ্রামের গরীব চাষী-গেরস্থ-ঘরে কথকতার সুযোগ কোথায়! তাই তাঁকেও সহর বাজারেই উপার্জনের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াতে হ'ত।

মোটামুটি এই হ'ল বিভূতিভূষণের বাল্যের আঞ্চলিক ছবি। এই পরিবেশে ঘরে-বাইরে একটা ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীনতা। এই পরিবেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতা-সংস্কারে প্রভাবিত অতিসাধারণ মানুষের সৃষ্টির উপযোগী হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণেরও সেইরকম একটি খাঁটি গ্রামীন মানুষ হওয়ার কথা। যে-মানুষ পৈতৃক দু-বিঘে জমিকে নানা কলকৌশলে দশ বিঘে বানাবার মতলবে থাকে, যার জীবনের আকাশ সমাজের দলাদলি আর তাস-দাবা-পাশায় সীমাবদ্ধ থাকে, তেমনই একজন হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা না হয়ে এমন একটি ব্যতিক্রম কেন হলেন—যা দেশকালের

গণ্ডীকে অতিক্রম করেছে—তা ভাবতে বসলে সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সেই রহস্য হয়ত ভেদ করা যাবে না—তবে তার কাছাকাছি পৌঁছনো একেবারে অসম্ভব নয়। এবং বিভূতিভূষণের জীবন-বিশ্লেষণে তাঁর দিনলিপির দলিল আমাদের অনেকদূর পর্যন্ত আলো দেখাতে পারবে।

"সেই সময়ের ভাবগুলো বেশ ধরা যায়। ঐ দিনটা স্পষ্ট মনে এলে ঐ দিনের—পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার শৈশবের এক হারানো দিনের ভাবনাটাও স্পষ্ট মনে পড়ে। দুটো এক ফটোগ্রাফারের প্লেটে তোলা ছবি একত্রে মস্তিষ্কের কোথায় যেন আছে—এতদিন কত অন্য প্লেটের তলায় পড়েছিল—আজ হঠাৎ হাতে পড়েছে।" ২৮.১.১৯২৮ ॥

বিভূতিভূষণের স্মৃতি রাজ্যে এটি একটি লক্ষণীয় দিক। বর্তমানের কথা বলতে বসে' তিনি হামেশাই অতীতে বিচরণ করেন। কলকাতায় বা ভাগলপুরে কিম্বা সারাণ্ডার গহন অরণ্যে বসে তিনি চালকী বারাকপুরের কুঠীর মাঠ, ইছামতী নদীতীরের প্রাকৃতিক শোভার কথা ভাবেন। চৌত্রিশ বছরে যখন ভাগলপুরে খেলাত ঘোষেদের জমিদারীতে দায়িত্বশীল পদে কাজ করছেন তখন আট-নয় বছর বয়সের বাল্য স্মৃতি তাঁকে উন্মনা ক'রে তোলে। ছোট্টু সিং-এর পাঠানো পেয়ারাতে কামড় দিয়ে তাঁর মনে পড়ে গেল এমনই এক শীতের দিনে নতুন বোষ্টমের আখড়ার পিছনের পথ ধরে তিনি জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বোধহয় কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে যাওয়া সেই দিনই তাঁর জীবনে প্রথম ঘটেছিল। সামান্য ঘটনা, এরমধ্যে নাটকীয় উপাদান কিছুই আবিষ্কার করা যায় না। কিন্তু স্মৃতিলোকের উপর মানুষের ত কোন শাসন বা নির্বাচনী শক্তি খাটানোর উপায় নেই—তবে স্মৃতিচারণের ধরণ অনুসরণ ক'রে সেই মানুষটির মানস প্রকৃতির একটা সাধারণ ধর্ম নির্ণয় করা চলে।

উপরে যে দিনের ডায়েরী থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার আগের দিন সরস্বতী পূজো ছিল। আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল যে, কাছারির আশপাশের বসতির দুঃস্থ লোকজনকে পূজোর দিনে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। সেই অনুযায়ী দই মিষ্টি আর গুড়ের ফরমাস দেওয়া হয়েছিল। এদিকে প্রতিমার সাজসজ্জা, পূজা আর অন্য দিকে দরিদ্র প্রজাদের সেবা—সাহায্য করার লোকের অভাব নেই, তবু ষোলআনা দায়িত্বের বোঝা ম্যানেজারবাবুর ঘাড়ে। সকাল থেকে মেঘলা ছিল আর দুপুরে শুরু হ'ল বৃষ্টি। কে বলবে যে, বসন্ত পঞ্চমী—মনে হয় যেন শ্রাবণের দিন!

নায়েব মশাই-এর বাড়ি থেকে ঠাকুরের পিঁড়িতে আল্পনা দিয়ে আনানো হ'ল। ঠাকুর সাজানো হ'ল। ফরমায়েসী দই-মিষ্টি সময় মত পৌঁছল না—সাইকেলে লোক পাঠিয়ে আনতে হ'ল। এর মধ্যে বিভূতিভূষণ কিন্তু তাঁর বাবার কথাটি ঠিকই মনে রেখেছেন। মহানন্দ প্রথম যৌবনে যে খাতায় পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরী লিখেছিলেন, আর যে রামায়ণটি তিনি নিত্য পাঠ করতেন—সেগুলি বার ক'রে নিজে হাতে চন্দন লেপন ক'রে, ঠাকুরের পাটে রেখে বিভূতিভূষণ ফুল দিয়ে সাজালেন; এই ভাবে পিতার ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাখানি সাজিয়ে তাঁর মনে বড় আনন্দ হয়েছিল, তা মুক্তচিত্তে লিখে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। 'বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াকার ধূ-ধূ মাঠের দিকে চেয়ে মনে পড়ল…' যা মনে পড়েছিল তার কতটুকুই বা দিনলিপি থেকে আমরা উদ্ধার করতে পারি! তবু সেই পরলোক বিশ্বাসী, আধ্যাত্মবাদী, জীবন পথিকটির নিঃশঙ্ক, বলিষ্ঠ পদচিহ্ন এই দিনলিপিতেই খুঁজতে হবে। সেই স্মৃতির সূত্র ধরে' তাঁর শৈশব এবং বাল্যের দিকে ফিরলে দেখব জ্যাঠামশায়ের হাত ধরে' নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়া আর সরস্বতী পূজোর আনন্দই সব ছিল না। বা তাঁর পিতা মহানন্দ নিজেকে উত্তর পুরুষদের কাছে বিরাট সার্থকনামা অভিভাবকের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মতো কিছু কীর্তিও স্থাপন করতে পারেন নি। দারিদ্র্যই বিভূতির বাল্যের অধিকাংশ ছেয়ে ছিল। নিতান্ত সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়েছিল। আর সে দারিদ্র্যের ছবি আমরা দেখেছি যে দিন তিনি বনগাঁয়ের স্কুলে ভর্তি হ'তে আসেন তার মধ্যে। অবশ্য বাংলাদেশে অমন হাজার-হাজার দরিদ্র পরিবারের মানুষ হ'তে চাওয়া কিশোরকে এই রকম অথবা এর চেয়েও অভাব অনটনের মধ্যে লেখা পড়া শিখতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে কি আর সবাই শিল্পী হয়! অতএব দারিদ্র্যই যে তাঁকে মহৎগুণের অধিকার দিয়েছে এমনি মনে করা চলে না। তাহলে? কোন পরশমণির স্পর্শ তিনি পেয়েছিলেন? দুঃখ সাগরে পাড়ি দেবার জন্যে কোন ভেলায় তিনি চড়েছিলেন! সংসারের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগরে পাড়ি দেবার জন্য বাইবেল বর্ণিত নোয়ার মত কোনো নৌকো তিনি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বিশেষ নৌকোটিকেই বিভূতিভূষণ নিজে 'ভাবজীবন' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। তৃণাঙ্কুর পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখতে পেলাম, স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র দেবব্রত তাঁর কাছে মনিটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, সে ছোট্ট এক টুকরো চকখড়ি নিয়েছিল ব'লে মনিটর তার হাত মুচড়ে স্কুলের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে—অথচ অন্যদিন ওরা বড় বড় চক পকেটে নিয়ে বাড়ি

যায় তার বেলাতে কিছু দোষ হয় না! নালিশ করার সময় ছেলেটি তার পিষ্ট, আহত হাতখানা মাস্টারমশাইকে দেখায় এবং কেঁদে ফ্যালে। মাস্টারমশাই মণিটরকে তিরস্কার ক'রে তক্ষুনি সেই অমূল্য চকখড়ির টুকরোটা দেবব্রতকে পাইয়ে দিলেন। ঘটনার শেষ ওইখানে হ'লেও বালকের চোখের জলের প্রতিক্রিয়া বিভূতিভূষণকে আশ্চর্য এক দৈব শক্তির সাহায্যে ঝিঁঝি-ডাকা বাল্যের প্রকোষ্ঠে পৌঁছে দিল। স্কুলের ছুটীর পর তিনি দেবব্রতর জন্য কেমন একটা বেদনা অনুভব করলেন। ওই দিনের দিনলিপিতে বাল্যজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। "মনে হ'ল বহুকাল আগে শৈশবে হরিঠাকুরদাদা সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েছেন—সেই দিনটিতেই আমার এই ভাব জীবনের বোধহয় আরম্ভ।"

ইছামতী নদীতীরের ঘন বনচ্ছায়াচ্ছান্ন নিরিবিলি পল্লীজীবনে যা কিছু বৈচিত্র্য তা আসে প্রকৃতির ঋতুবদলে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আর নানা সামাজিক আর লোক সন্তাপকে আশ্রয় ক'রে। সংসারানভিজ্ঞ বালকের মনে অন্যের দুঃখকে আপন ক'রে নেবার এই প্রবৃত্তিটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। হয়ত সেই বিশেষ সন্ধ্যায় নিশ্চিন্দিপুরের অপুর মতো ছোট্ট বিভূতিভূষণও হরি ঠাকুরদাদার ব্যর্থ মনোরথকে নিজের অবলম্বনশূন্য হৃদয়ে স্থান দিয়ে রিক্ততার হাত থেকে ছুটী পেয়েছিল। এমনও মনে হতে পারে যে, বালকটির যদি বাস্তববুদ্ধি একটু প্রখর হ'ত তাহলে সে নিশ্চয় বুঝতে পারত হরি ঠাকুরদাদাকে কেন ফিরে যেতে হয়েছিল। বারাকপুরের মহানন্দ বাঁড়ুয্যেকে মোটেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ভাবা চলে না। বরং তাঁদের সংসারে অন্যকেউ সাহায্য করলেই ভালো হয় এই রকম দশা বছরে বার কয়েকই আসে! কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, বাল্যের বিফলমনোরথ হরি ঠাকুরদাদা তাঁর মাকে খেতে দিতেন না, একথা বিভূতিভূষণ জানতেন। ভদ্রলোকের বৃদ্ধা মায়ের এক দেবর গোঁসাই বাড়িতে পূজো-আর্চ্চা ক'রে যা দু-চার টাকা জমাতেন তাই দিয়ে বুড়ির জন্যে ধান কিনে দিতেন। যে মানুষটা তার মায়ের দুঃখ-কষ্ট গ্রাহ্য করেন না এমনই স্বার্থ পর,—তার জন্যও এই বালকের প্রাণ কাঁদে! সব জেনে বুঝেও যে বালক অন্যের ব্যথায় দুঃখ পায় সে কি মহৎগুণের অধিকারী নয়! হরি ঠাকুরদাদার প্রকৃতি যেমন জানা, নিজেদের অভাব অনটনের কথাও তেমনি বালকের অজানা ছিল না—তৎসত্ত্বেও বালক বিভূতিভূষণ স্বার্থপর ব্যক্তির হতাশায় এমনই অভিভূত হয়ে ছিলেন যে, পরিণত বয়সে অর্থাৎ ঐ ঘটনার তিন যুগ পরেও সেকথা, ভুলতে পারেন নি, নইলে দিনলিপিতেই বা

উল্লেখ করবেন কেন! নিঝুম শান্ত সন্ধ্যা, পিদীমের টিম্‌টিমে আলোয় ঘরখানার আনাচ-কানাচ বোবা কান্নার অনুচ্চারিত অবসন্ন দীর্ঘশ্বাস ওই হরি ঠাকুরদার ফিরে যাওয়াতে যেন আরও বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

এই বিশেষ 'ভাবজীবনের' বীজটি দেখা যাচ্ছে বিভূতিভূষণের শৈশবেই অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং তার মূলে বোধকরি ভবঘুরে পণ্ডিত কথক মহানন্দর কিছু দান আছে। তিনি যদি সংসারের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতেন তাহলে হয়ত দুঃখ-দারিদ্র্যের নগ্ন রূপটি কোন দিনই বিভূতিভূষণকে প্রত্যক্ষ করতে হ'ত না। তাহলে হয়ত প্রতিদিন ছ-সাত মাইল পথ নিঃসঙ্গ ভাবে নিজের মুখোমুখী হয়ে হাঁটার সুযোগও তাঁর ভাগ্যে জুটতো না। যে-পথের দু'ধারে মাঠ আর জলা, মানুষের সাক্ষাৎ কখনো মেলে, সে পথে যাদের সাক্ষাৎ মেলে দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তায় তারাও এক-একটি দ্বীপের মত, সেই পথে রঙীন কল্পনায় সুসজ্জিত ভাবনার ডানা মেলে দেওয়া ছাড়া আর কীই বা অবলম্বন থাকতে পারে!

মহানন্দ মাঝে মাঝে বাড়ি আসেন, সংসারের জন্য অর্থ ছাড়া ছেলের জন্য কিছু বইও সংগ্রহ ক'রে আনেন। তাঁর এই গাঁয়ে-ফেরা, যেন বালকের কাছে বহির্বিশ্বের স্বপ্ন-কল্পনার একটা রাজ্য বয়ে এনে হাজির-করা। বালক বিভূতিভূষণ বাবার কাছে তাঁর ভ্রমণের গল্প শোনেন। কবে, কোথায়, কিভাবে মহানন্দর কেটেছে, তিনি কি দেখে এলেন—এই সব কাহিনী, বালকের মনে বিচিত্র বিস্ময় জাগায়। কাজেই প্রত্যক্ষ নিত্যগ্রাম জীবনে যে সামান্য চাওয়াগুলি গরীবের পাঁচটার সংসারে অপূর্ণ হয়ে যায়, সেগুলি কল্পনার মায়ারাজ্যে শত সহস্রগুণে চরিতার্থ হয়। কে চরিতার্থ করে? শৈশবের অসীম কল্পনা শক্তি—যার চাষ হচ্ছিল যশোর জেলার প্রকৃতির সোঁদা হাওয়ায় গাছপালায় আর ভারতের সনাতন আধ্যাত্মভূমিতে!

মহানন্দ বাঁড়ুয্যে আর পথের পাঁচালীর হরিহর বহুক্ষেত্রে অভিন্ন ব'লে মনে হয়। অপুর প্রতি হরিহরের অবিশ্লেষ্য অকৃত্রিম স্নেহ মহানন্দরও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতির প্রতি সেই ধরনের একটা গভীর মমতা। একবার যখন বারাকপুরে গ্রামে পরিবারের দিন চলা দায় হয়ে উঠল এবং বোধকরি স্ত্রী মৃণালিনী পণ ক'রে বসলেন যে, তিনি আর এইভাবে কচি-কাঁচাদের নিয়ে একা নির্বান্ধব অবস্থায় থাকবেন না, গরীব ব্রাহ্মণের সহধর্মিনীও যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন অনন্যোপায় স্বামীকে মারীয়া হয়েই সংসারের বোঝা কাঁধে নিতে হয়। নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করার মতো নির্মম সন্ন্যাসী মহানন্দ ছিলেন না। অতএব মহানন্দ হুগলী জেলা'র শা-গঞ্জে কেওটাতে সপরিবারে বসবাস শুরু

করলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসী কথক মহানন্দের হয়ত আশা ছিল সেখানেই গুছিয়ে পাতিয়ে সংসারটা স্বচ্ছন্দে চালানো যাবে। বড় ছেলে বিভূতির কোলে তিন বছর পরে ইন্দু হয়েছে। তার পিঠে পরপর আরও দুটি কন্যা হয়েছে মৃণালিনীর গর্ভে। কেওটাতেই ইন্দুর হ'ল হুপিংকাশী-এবং সে আর উঠল না। পাঁচ বছর বয়সে তার মৃত্যু হ'ল শাগঞ্জের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য মিলল না, পরন্তু সদ্য পুত্রশোকে কাতরা মৃণালিনীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বোধকরি মহানন্দ আবার বারাকপুর গ্রামে সপরিবারে ফিরে এলেন। বিভূতিকে শাগঞ্জের পাঠশালা ছাড়িয়ে এবার বারাকপুরে এনে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি করা হ'ল। এ যেন ভালো হ'ল। শহর-গঞ্জের জীবনে, ঠাট বজায় রাখতেই প্রাণান্ত ; বারাকপুরের অজ-গাঁয়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন চালানো সে তুলনায় অনেক সহজ। চেনাজানা সমাজে মুখোশের বালাই নেই, এ ওর হাঁড়ির খবর রাখে। মহানন্দও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বারো মাস সংসারের তেল-নুন আর কাঠখড়ের ভাবনা নিয়ে পড়ে' থাকা তাঁর মতো মানুষের পোষায়! ওইসব বিষয় কর্ম করবার জন্যে ত আর তিনি শাস্ত্র জ্ঞান অর্জন করেন নি। শুধু ত আর নিজেরই নয় তাঁকে অন্যের পরকালের চিন্তাও করতে হয়। নিজেই যদি অন্নচিন্তা চমৎকার-এ আবদ্ধ থাকেন, তাহলে ওইসব উচ্চ, আধ্যাত্মিক চিন্তা করবেন কি করে! তিনি কোনকালেই গৃহস্থের বাড়ির ষষ্ঠি-পঞ্চমী পূজো-আর্চ্চা ক'রে পৌরোহিত্যের আয়ে সংসার চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। রামায়ণ-মহাভারত কি চণ্ডী পাঠ কিম্বা ওই ধরণের বৃহত্তর আদর্শ কেন্দ্রিক পুরাণ বা শাস্ত্রগ্রন্থের কথকতায় মহানন্দর আনন্দ বেশী। শাস্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে শ্রোতা সাধারণের মনে উচ্চ ভাবের উদ্বোধনেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই আধ্যাত্ম জগতের মানুষেরা জাগতিক সুখসম্পদকে কখনোই উঁচুতে ঠাই দেন নি। অপরকে মানসিক উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়াই প্রধান আর সেইসঙ্গে তাঁর ওপর নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের অন্নসংস্থান এই দ্বিবিধ লক্ষ্য মহানন্দের কাছে অভিন্ন ছিল। তাই বারাকপুরে পরিবারকে থিতু করে' দিয়ে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্য অন্বেষণে। বোধকরি কবি কল্পনার আতিশয্যে মহানন্দ চারটি সন্তানের জনক হয়েও তখনও বড় রকমের একটা কিছু দৈবযোগের দৌলতে আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। বাইরে গরীব ব্রাহ্মণ হলেও মনের দিক দিয়ে আশ্চর্য ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। সংসারে এ ধরণের অবৈষয়িক স্বপ্নদর্শী মানুষকে নিয়ে বড় বিপদ!

মোট কথা বাস্তব ক্ষেত্রে এই জাতীয় মানুষ নিজের দুর্দশাকে যেমন গায়ে মাখেন না, তেমনই এই ধরণের মানুষের উপর নির্ভর ক'রে যাদের বাঁচতে হয় তারা বড়ই অসহায়।

বিভূতিভূষণকে শৈশবে বিভিন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় শিক্ষা নিতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় গুরু বোধহয় সকলের অলক্ষ্যে ছিল দারিদ্র্য-যাকে অনেকে পৃথিবীর পাঠশালা বলেন।

মাঝে মাঝে অবশ্য সুখের মুখ দেখা যেত। সেই দুর্লভ সুখস্মৃতি মাখা দিনের কথা বিভূতিভূষণ মনের মণিকোঠায় সযত্নে আগ্‌লে-আগ্‌লে রেখেছিলেন, হয়ত জীবনের শেষ দিনেও তা তাঁর মন থেকে মোছে নি। তাঁর বিভিন্ন বয়সের দিনলিপিতে টুক্‌রো-টাক্‌রা কথায় তার কিছু কিছু আভাষিত হয়েছে, যেমন তৃণাঙ্কুরে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: 'সেই ঝিক্‌রে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দভরা এই অপরাহ্নের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। এই ত পুজোর সময় বাবা এতদিনে বাড়ি এসেছেন, আমাদের পুজোর কাপড় কেনা হয়ে গিয়েছে এতদিনে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সেইসব আনন্দ কি জানি কেন এইসব সময়েই তা বেশি করে মনে আসে।' মহানন্দ ঘরে ফিরলেই বালক বিভূতির মনে আনন্দের জোয়ার বইত। কিন্তু তিনি যখন বিদেশে থাকতেন তখনও বালকের জীবনে আনন্দের অভাব ঘটত না। তবে সে ছিল আটপৌরে আনন্দ। 'মাকাল-ফল, পিসিমা, পুরণো কাঁবোসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘুপাখী, বাঁশবন—কতো কথা যে এক মুহূর্তে মনে এল!'　　　　[তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৪৩]

আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে আনন্দের কোনো খোরাক দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যে পায় সে-ই শুধু জানে আনন্দের মধুরচক্রটি কোথায় তার জন্য সঞ্চিত রয়েছে! অন্যের চোখে সব সময় ধরা পরে না—আসলে হয়ত অনুভূতির সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি সকলের এক তারে বাঁধা নয়—তাই এই তারতম্য। আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন, দুঃখ-বেদনার বেলাতেও তেমনি মানুষে-মানুষে এই অনুভবের পার্থক্য।

বাল্যের স্মৃতিতে বাবা অবিমিশ্র আনন্দের উৎস ছিলেন না, অনেক সময়ে বিভূতিভূষণের জিজ্ঞাসু মনের সঙ্গীও হয়েছেন। ছেলেকে নিয়ে তিনি কখনো কলকাতায়, কখনো বা কৃষ্ণনগরে কিম্বা ওইরকম জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। একবার বিভূতিকে নিয়ে তিনি আড়ংঘাটায়

গিয়েছিলেন। সেবারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রৌঢ় কালেও স্পষ্ট মনে রয়ে গিয়েছিল বিভূতিভূষণের। আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীর একখানি ছোট্ট ঘরে পিতা-পুত্রে থাকতেন। মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ ভোরবেলায় উঠে উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করতেন—বালকের নিদ্রাচ্ছন্ন প্রত্যূষে সেই মন্ত্রের ধ্বনিতে একটু একটু ক'রে জাগরণের জগতে পা ফেলে এগিয়ে আসতো। এখানে অখণ্ড অবসর। ছেলেকে একা রেখে সকালেই বাবা চলে যেতেন। ছাদে বসে বিভূতি ব্যাকরণ পড়ত। পড়া হয়ে গেলে ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ানো—একা-একা আর পিতার জন্য প্রতীক্ষা করা, এছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না বালকের। দুপুরে মোহন্ত পেতলের লোটায় করে ঝোল রেঁধে খাওয়াতেন। আড়ংঘাটার সেই স্মৃতির সঙ্গে ভিক্টর হুগোর একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে—ওই ছাদের ওপর বসেই বিভূতি লে মিজারেব্‌ল এর বাংলা অনুবাদ পড়েন। নবীন, সতেজ, আগ্রহশীল মনে সেই মানবদরদী দুঃখের কাহিনী একটা চিরস্থায়ী সত্যলোক রচনা করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আড়ংঘাটার প্রসঙ্গ চিন্তায় তিনি লিখেছেন: 'বাবার করুণ স্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো?' অবশ্যই ভুলতে পারেন নি। ডায়েরীতে দেখি যখনই ট্রেনে ক'রে শিলং কিম্বা পূর্বরেল পথের অন্য কোথাও যাতায়াত করেছেন তখনই আড়ংঘাটার কথা তাঁর মনে পড়েছে। দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ আর তার পুত্রকে তিনি দেখেছেন। কিন্তু পিতার সে স্মৃতি তাঁর কাছে করুণ। কেন না ওই অল্প বয়সেই মহানন্দর জাগতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বিভূতিভূষণের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। হয়ত সেই বয়সেই মহানন্দকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মনে পৃথিবীর অনাত্মীয়সুলভ আচরণ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মেছিল। তার ফলে এই স্বপ্নদর্শী ব্রাহ্মণকে সকলের অলক্ষ্যে তিনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। দিনলিপির একজায়গায় তিনি লিখছেন "১৩১৩ সালের পুজোর সময়ে, বাবা কলকাতায় না কোথায় ছিলেন, একটি পয়সাও পাঠাননি, আমাদের সে কী কষ্ট! মা আমাকে তক্তপোষখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় কি কথা বলেছিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে-সে সব কথা মনে আসে কেবলই।" [উৎকর্ণ, পৃঃ ২১৭] বাবা টাকা না পাঠানোর জন্য সকলেরই কষ্ট হয়েছিল। আর যেহেতু মৃণালিনীকেই সংসারের সব ঝুঁকি সামলাতে হচ্ছিল, সেহেতু তিনি স্বামী সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্য করেছিলেন। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরকম সংকটে পড়লে অন্য

মেয়েও স্বামীর মহিমা কীর্তন করত না। সে বছর পুজোর জামাকাপড় নিশ্চয়ই হয়নি। সেজন্য বিভূতিভূষণেরও বাবার ওপর খুশী থাকার কথা নয়। কিন্তু ওই যে, বাবার সম্পর্কে মা কঠিন মন্তব্য করেছেন—এটাই বালকের বুকে বড় হয়ে বাজল। এমনি দুঃখবেদনায় মথিত অন্তরের ছবি আরো আছে: "আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বহুদিন আগেকার বারাকপুরে যাপিত বাল্যদিনগুলির কথা বিশেষতঃ পুজোর সময়কার দিনগুলির কথা মনে পড়ে। বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হ'ত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতো সন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট শব্দ করতেন —আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পুজোর সময়ে জামা-কাপড় হ'ল না—(বালক বালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকা পয়সা থাকত না।" [উৎকর্ণ পৃ ২১৬-১৭]

বাবার স্মৃতির প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা তাঁর কাছে শুনেছি, একবার বারোয়ারী তলায় 'তরণীসেন বধ' কথকতা করেছিলেন, এটা তিনি দেখেচেন।

সাধারণ গরীবের ঘরে দুর্গাপূজার সময়ে সকলেরই নতুন জামাকাপড় হয়—সেটা বাড়তি কিছু নয়। প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পুজোটা উপলক্ষ্য, আসলে জামাকাপড়ের অভাবটা দু-চার মাস আগেই অনুভূত হয়ে ছিল। কোনো রকমে পুজো অবধি ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাজেই পুজোর সময়ে জামাকাপড় না-হওয়া এখানে শুধু আর পাঁচ-জনকে দেখানোর সুযোগ হারানো মাত্র নয়—তার চেয়ে বেশী কিছু। হয়ত ছেঁড়া-খোঁড়া তালিমারা সেলাইকরা জামকাপড়ও জীর্ণতার শেষ দশায় জবাব দিয়েছে। তবু নিজেদের এই দৈন্য দশার জন্য অভিযোগ করার কথা তাঁর দিনলিপিতে অনুপস্থিত। মায়ের হাতে পয়সা-কড়ি নেই-অতএব আপন মনে শুধু অক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকতে হয়। এ থেকেও বোঝা যায় যে বাবার সম্পর্কে বিভূতিভূষণ নিভৃত মনের মধ্যে সঙ্গোপনে একটা সহানুভূতি পোষণ করতেন।

আশার আকাশ যেখানে কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত, সেখানে দিবাস্বপ্নের কল্পনা কিভাবে মুক্ত করে দিতে হয় সে কৌশল বিভূতিভূষণ বাল্যেই আরম্ভ করেছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে যেন এ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। সেই কল্পনাবিহারী বালকের কোনো দোসর সঙ্গী ছিল না কোনো কালেই। প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন বালকের সাহিত্যপাঠ। বাস্তব যতোই কৃপণ হয়েছে কল্পনার জগত তাঁর কাছে ততোই বিরাট হয়ে উঠেছে। সময়

বিশেষে তা অনায়াসেই বাস্তবের চেয়ে বড় সত্যরূপে অপুর মতো বিভূতিভূষণকে বস্তুগত কামনার জ্বালা ভুলিয়ে দিয়েছে—"শৈশবে শুধু পিসিমা, হরি রায় এরাই আমার সঙ্গী ছিল না। সেই সঙ্গে সত্যভামা, ভীষ্ম, সাত্যকী, অশ্বত্থামা এইসব পৌরাণিক চরিত্রও আমার কাছে বড় জীবন্ত ছিল। আমাদের গ্রামে আশে-পাশে বনবাদাড়ে তাদেরও স্মৃতি শৈশবের সঙ্গে জড়ানো আছে যে।" [স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৯০]

ভাবলোকের উন্মেষ যে কার কবে কি ভাবে হয় তা নিরূপণ অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। নায়ক নিজেও সব সময়ে তা টের পান না। পরিণত বয়সে সেটি আবিষ্কার করেন তিনি। হরিঠাকুরদা শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াতে বালকের মনে যে সমবেদনা জেগেছিল সেই ঘটনাকেই বিভূতিভূষণ ভাব-জীবনের আরম্ভ ব'লে চিহ্নিত ক'রেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না। তবে এটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আধুনিক বিশ্বের বিরাট ঋষি লিও টলস্টয়েরও বাল্যে ভাবজীবনের উন্মেষের কাহিনী বিচিত্র। তাঁর বড় ভাই কোকো একদিন ছোটদের কাছে গলাবাজি ক'রে বলল,—"আমি এমন একটা যোগের কৌশল শিখেছি যা দিয়ে দুনিয়ার দুঃখকষ্ট সব ঘুচিয়ে দেওয়া যায়।" কোকোর আশ-পাশে ছোট-বড় ভাই বোন সব জমায়েৎ হয়েছে—তাদের বয়েস কারুরই দশের বেশি নয়। কোকো তাদের চোখে একটা মস্ত বড় বীর—সে বিস্তর পড়াশুনো করে আর আজব দুনিয়ার তাজ্জব খবর শোনায়। কাজেই কোকো যখন বলল—"এই যোগের কৌশলটা বেশ কঠিন, তোরা পারবি না। তবে এই 'পিঁপড়ে-ভাই' সমিতি একবার তৈরী করে' ফেলতে পারলে, সত্যি পৃথিবীর মানুষে আর স্বর্গের ভগবানে কোনো তফাৎ থাকবে না। তুমি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবে। দুঃখ টুঃখ কিছু থাকবে না।" তখন সবাই তাকে ছেঁকে ধরল—"খুব পারবো। তুমি বলেই ছাখো না! যতোই শক্ত হোক না, মানুষ চেষ্টা করলে না পারে এমন কিছু হয় নাকি?" পাঁচ বছরের লিও কিন্তু কোনো কথা বলল না।

তারপর কোকো প্রথমে সাধারণ অনুশাসন হিসেবে জানালো যে, প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা ভাবে এ নিয়ে চিন্তা করবে এবং আর কারুর কাছে নিজের 'পিঁপড়ে-ভাই' সমিতির চিন্তা নিয়ে কিছু বলতে পারবে না—অন্যের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলে সে আর 'পিঁপড়ে-ভাই' হতে পারবে না, দুনিয়ার দুঃখও ঘুচবে না। এই বলে, সে প্রত্যেককে পৃথকভাবে সমিতির নিয়ম কানুন লিখে দিল। লিও দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো, কাজেই তাকে প্রথমে কাগজ

দেওয়া হয় নি, সে জোর ক'রে আদায় করেছিল। লিও যে কাগজটা পেল, তাতে লেখা আছে: নদীর ধারে ওই যে বন দেখা যাচ্ছে যেখানে একটি লাঠি পোঁতা আছে, সেই লাঠির গায়ে গুপ্ত রহস্য লিপিবদ্ধ করা। আরও অনেক দূরে যে পাহাড়টা দেখতে পাও তোমরা সেই পাহাড়ের ওপরে আমি সবাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। সেই পাহাড়ের ওপর গিয়ে আসল কথাটা তোমাদের কাছে খুলে বলব। তার আগে কিন্তু কতকগুলি সর্ত আছে সেগুলি ঠিক ঠিক মেনে চলতে হবে। সেগুলো যে-যে ঠিক মতো মেনে চলবে কেবল তারাই পিঁপড়ে-ভাই হতে পারবে। শুধু তাদের কাছেই আসল কথাটা বলা হবে। এক নম্বর সর্ত, ঘরের কোণে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—এই সময়ে সাদা রঙের ভালুকের কথা চিন্তা করা চলবে না। দু নম্বর, ঘরের মেঝেতে যে আঁকা-বাঁকা ফাটলের দাগ আছে সেই দাগ ধরে' নাক বরাবর সিধে হাঁটবে, একটু নড় চড় হয় না যেন। তিন নম্বর, এক বছরের মধ্যে কোন খরগোশের মুখ দেখা বারণ—না, জ্যান্ত কিম্বা মরা কোনো খরগোশেরই মুখ দেখা চলবে না। এছাড়া আরও কিছু নিয়ম আছে তা পরে জানানো হবে। আর কোকের কাছে গোপনে জানতে হবে, পিঁপড়ে ভাই হয়ে সে কী বর চাইবে—আগাম জানানোটাও জরুরী।

সেদিন সবাই 'পিঁপড়ে-ভাই' হবার জন্য যা যা আইন সব মেনে চলেছিল বটে কিন্তু তারপর বাল্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ভুলেও গিয়েছিল। কিন্তু লিও কিছুতেই ভুলতে পারেনি। সে রোজ ঘরের কোণে নিয়ম কানুন মেনে চলে। কাউকে কিছু বলে না। তার চিন্তা কাকে ভালোবাসবো? কিন্তু অনেক ভেবে সে ঠিক করতে পারে না,—মনে হয় মাত্র একজন মানুষকেই ভালোবেসে কোনো আনন্দ নেই। অথচ 'ভালোবাসা' জিনিসটা সে ভারি পছন্দ করে। তার মনে হয় একদিন 'পিঁপড়ে-ভাই' হতে পারলে সব্বাইকে ভালোবাসবে। কোকোর কাছে মনের কথা বলতে পারে না সে, বারণ আছে। নদীর ধারে সেই যে সবুজ রং-এর লাঠিটা আছে সেটা একা-একা খুঁজে বার করল। কিন্তু কোকো ত পাহাড়ে নিয়ে গেল না! একদিন কোকো বেচারী ম'রে গেল। কি ভাবে যে লিওর মনে সবাইকে ভালোবাসার ইচ্ছেটা দানা বেঁধে কঠিন সংকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা লিও টল্‌স্টয়ের উত্তর জীবনে প্রমাণিত হয়েছে। তিনিই রাশিয়ার জমিদারদের কবল থেকে দাস-প্রজাদের মুক্ত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য আর জীবন বিশ্বপ্রেমের অকুণ্ঠ স্বাক্ষর বহন করছে। কে জানতো যে ছেলেবেলার সেই সবুজলাঠি

আর পিঁপড়ে-ভাই সমিতির তুচ্ছ খেলাই লিওর ভাবজীবনের জনক হবে! কিন্তু তা-ই ত হয়েছিল। মৃত্যুর পর নদীর ধারের সেই সবুজ লাঠির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হোক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চাকরবাকরদের 'গণ্ডী বেঁধে দেওয়া' চকখড়ির দাগে-ঘেরা জায়গা থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবন আবির্ভূত হয়েছিল। এবং এই বিচিত্র মানসিক-প্রতিক্রিয়ার খবরটা কবি কবে পেয়েছিলেন তা আমরা না-জানলেও, এটা জানি যে পরিণত-বয়সের লেখনীতেই তিনি সে সংবাদ প্রকাশ করেছেন।

তবে টল্‌স্টয় বা রবীন্দ্রনাথের সামাজিক পরিবৃতির সঙ্গে বিভূতিভূষণের বাল্য পরিবেশের কোনো মিল নেই। বিভূতিভূষণের আত্মসৃষ্টি অন্য গোত্রের। বরং ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য মেলে। বিভূতিভূষণের পল্লীজীবনে বালক মন এক অনবদ্য বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছিল। তার সঙ্গে বাবার চরিত্র, আর মহাভারতের কাহিনী আশ্চর্য ভাবে মিশে গিয়ে যে মানসিক গঠন সৃষ্টি করেছিল তা-ই তাঁকে জীবনে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে—এমন মনে করা হয়ত অসঙ্গত হবে না।

মায়ের চরিত্রের কোনো প্রভাব তার চরিত্রে পড়ে নি—পড়ে থাকলেও তা বাবার তুলনায় অনেক কম। তা বলে' মাকে যে তিনি কম ভালোবাসতেন তা নয়। পরিণত বয়সে যখনই মায়ের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে তখনই দেখি, ছেলেমেয়েদের আদরযত্ন ক'রে খাওয়ানো, কিম্বা গার্হস্থ্য প্রয়োজনের প্রতি তাঁর সতত সজাগ দৃষ্টির কথাই বিভূতিভূষণ বলেছেন। মৃণালিনীকে গরীবের ঘরণী গৃহিণীর প্রতিমূর্তি ছাড়া বেশি কিছু মনে হয় না। অল্পের মধ্যে গুছিয়ে পাতিয়ে সংসারকে শ্রীময় ক'রে তোলার প্রাণপণ চেষ্টাই তাঁর জীবনের যেন চরম সার্থকতা। পল্লীবাংলার মায়েরা যেমন হয়ে থাকেন মৃণালিনী এবং সর্বজয়া তারই নিখুঁত চিত্র। সর্বজয়ার প্রথম জীবনের মধ্যে তবু স্বপ্নের কিছু আভাষ মেলে। হরিহরের পাণ্ডিত্য একদিন ধনদৌলতে ঘরের লক্ষ্মীর কৃপা উপ্‌ছে দেবে এরকম আশা যেন সর্বজয়ার দারিদ্র্য-দুঃখ অনেকখানি লাঘব ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মৃণালিনীতে সেই আশা স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়নি। সর্বজয়ার এই আশার স্বপ্ন বোধকরি শিল্পীরই মানস সৃষ্টি! নিজের মায়ের কথা যখনই বিভূতিভূষণের মনে পড়েছে তখনই তিনি মায়ের ছোট ছোট আশা আর সাংসারিকতার কথা বলেছেন: "মায়ের হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্তি হয়ে উঠেছে।...মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এ দরিদ্র

ঘরে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এসে অল্প সাজিয়েগুজিয়ে চালিয়ে গিয়েছিল। সেই চালভাজা—সেই সব।···মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলায় শান্ত জীবনযাত্রা, সংকীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তার সজনে গাছ পোঁতা, হরিরায়ের জমি নেবার পরামর্শ,”···(১৩.১৯২৮)। মায়ের স্মৃতির সঙ্গে খড়ের ঘর, বর্ষার দিনে মনসার ভাসান দেখতে যাওয়া, দুপুরে মায়ের বসে সেলাই করা আর দাওয়ায় বসে দুলে-দুলে পড়া আর পেয়ারা খেতে খেতে পুবমুখো যাওয়া বা ওই ধরনের ছবিই জড়ানো রয়েছে। নিতান্ত ঘরোয়া ছবি। এমনি ধরণের ঘরোয়া ছবি মায়ের প্রসঙ্গে আমরা আরও অনেক পাই--হয়ত শীতের সকালে দাওয়ায় বসে রোদে পিঠ দিয়ে মায়ের হাতে তৈরী পিঠে খাওয়া, কিম্বা স্কুলের বোর্ডিং থেকে সপ্তাহান্তে বাড়ি ফিরে মায়ের সাংসারিক দুঃখ-সুখের কথা শোনার ছবি।

ব্যক্তিজীবনে মায়ের চরিত্রের প্রভাব পড়ুক বা না-পড়ুক মাকে তিনি যে ভালোবাসতেন সে-পরিচয়ের অভাব নেই। তবে মায়ের আশাকে ফলবতী করার জন্য তিনি নিজের পথ ছেড়ে একটুও সরে'-নড়ে' সামঞ্জস্য স্থাপন করেন নি। সেখানে বাবার আদর্শ এবং তা ছাড়িয়ে আরও বড় হওয়ার স্বপ্ন তাঁকে পরিচালিত করেছে। মায়ের কাছ থেকে হয়ত বা নিজের অজ্ঞাতে তিনি একটি গুণ আহরণ করেছিলেন—সেটি হল মিতব্যয়িতা। তবে এটি তাঁকে শিখতেই হ'ত, কেন না দারিদ্র্যের পাঠশালায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মিতব্যয়িতা ছাড়া চলবার উপায় কোথায়! মা বাবা বেঁচে থাকতেই বোর্ডিং এ থেকে বা অন্যলোকের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করে' যে ছেলেকে লেখাপড়ার খরচ চালাতে হয়, তাকে হিসেবী হ'তেই হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে এটা মায়ের বিশেষ প্রভাবের মধ্যে না-ও ধরা যেতে পারে। মৃণালিনীর স্বভাবে গুছিয়ে চলার গৃহিণীপনা ছিল বড়গুণ—বিভূতিভূষণের প্রকৃতিতে সেটি একদম অনুপস্থিত। তিনি এক ধরণের খেয়ালিপনায় গা ভাসিয়ে দিয়ে চলতেন—যাকে মোটেই সাংসারিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিসেবী বলা চলে না। বরং হিসাবী হওয়াটা তাঁর অন্তরে মোটেই আদর পায়নি। এই খেয়ালীপনার মূলে ছিল, দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করার স্পৃহা আর সেই সঙ্গে দারিদ্র্যের উর্ধে মনকে তুলতে গিয়ে তিনি ধনসম্পদের প্রতিও ঔদাসীন্য অর্জন করেছিলেন। এই বিচিত্র মানসিক গঠনই অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে একটি দার্শনিক সত্তার জন্ম ঘটিয়েছিল। স্বাবলম্বনের অনুষঙ্গী হিসেবে সতর্কতা বা স্বার্থ-বুদ্ধি তাঁর মধ্যে আসেনি।

কেওটা থেকে বারাকপুরে ফেরার কিছুদিন পর বনগ্রাম স্কুলে ভর্তি হলেন বিভূতিভূষণ। স্কুলে প্রবেশের কাহিনী এর আগে বলেছি। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশাই সুদক্ষ সহৃদয় শিক্ষক ছিলেন। এই গরীব ছেলেটির লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ, বিশেষ ক'রে বহির্বিশ্বের সম্পর্কে তার দুর্নিবার কৌতূহল অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এটা তিনি লক্ষ্য করলেন যে ক্লাসের পাঠ্য পুঁথিপত্রের চেয়ে দুনিয়ার খবর জানার দিকেই এই ছেলেটির ঝোঁক বেশী। শুধু তিনি কেন অনেক শিক্ষকই এই শান্ত প্রাকৃতির ছাত্রটিকে ভালোবেসে ফেললেন।

১৯০৭ এর ফেব্রুয়ারীতে বিভূতিভূষণের উপনয়ন সম্পন্ন হ'ল। বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াতের অসুবিধা আর আর্থিক অনটনের ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে টুইশানী নিতে হ'ল। বনগাঁয়ে সরকারী ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে পড়ানোর কাজটা জুটে গেল। এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর তিনি স্কুলের বোর্ডি-এ চলে আসেন এবং সেখান থেকেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একদিন গল্পে-গল্পে বড়দা বলেছিলেন, পরীক্ষায় পাশ করার পর হেডমাস্টারকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন এটা তাঁর বেশ মনে আছে। বনগাঁয়ের মন্মথ চাটুয্যে মোক্তারী চাপ্‌কান প'রে গিয়েছিলেন প্রণাম করতে।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বিভূতিভূষণের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইনিও ছিলেন ভাবরাজ্যের মানুষ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের যে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক ধারা, তার সঙ্গে বাল্মীকি বেদব্যাস-কালিদাস এবং শেক্‌স্‌পীয়ার-মিল্টন-মধুসূদনের কাব্যলোক এই মানুষটির মনলোককে বিশ্ব নাগরিক উদার দৃষ্টির অধিকারী করে তুলেছিল। প্রথম দিনে যে কিশোরটিকে তিনি স্নেহময় হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন—সে স্নেহে কোনো স্বার্থবুদ্ধির স্পর্শ ছিল না। বিভূতিভূষণের জিজ্ঞাসু মনের অনেক খোরাক জুগিয়েছেন। বাইরের জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলকে বাড়িয়ে দিয়েছেন—সাহিত্য, ইতিহাসের, গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত করেছেন। গরীব ছাত্রটির যাতে অর্থাভাবে লেখাপড়ায় ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি সজাগ ছিল। তাঁরই চেষ্টায় সরকারী ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিভূতি গৃহশিক্ষক বহাল হলেন। চারুবাবু বুঝেছিলেন যে, উঁচু ক্লাসে পড়াশুনোর চাপ বাড়ছে, বারাকপুর থেকে নিত্য যাওয়া-আসা ক'রে বিভূতির কষ্ট হয়। এই নতুন ব্যবস্থায় প্রথম দিকে বিভূতি একটু আড়ষ্টভাবে কাটাতেন। কিন্তু

প্রতিভারানী (খিনু) আর তার মায়ের আন্তরিকতা সেই আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। 'অপরাজিত'র নির্মলা এবং মায়ের চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের এই দুটি মানুষের কম সাদৃশ্য নেই।

মহানন্দের আধ্যাত্মিক মানসিক কাঠামোর সঙ্গে তরুণ বিভূতিভূষণের মনে চারুচন্দ্রের কোনো রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছিল নিশ্চয়!

স্কুলে পড়তে পড়তেই বিভূতিভূষণের পিতৃবিয়োগ ঘটে। দিনলিপিতে দেখা যায়: "বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—'খোকা কই, খোকা?' অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে তিনি আর ওঠেন নি। পিতার প্রতি তাঁর যে গভীর আকর্ষণ তাও তৃণাঙ্কুরের দিনলিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে,—মহানন্দর স্মৃতি যেন সহস্র বর্ষ আয়ুকেও অতিক্রম করে টিকে থাকবে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। জীবনে সেই তাঁর প্রথম এবং সবচেয়ে বড় শোক একথা লিখতে গিয়ে বলছেন—"সে কি অপূর্ব অনুভূতির দিনগুলো-তার কি তুলনা আছে?" (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৫৭)।

মহানন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের অন্তরে অর্থলোলুপতার প্রতি বিদ্বেষ-বীজ সংক্রমিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর দ্বারাই পুত্রের চরিত্রে ধর্মনিষ্ঠা সঞ্চারিত হল—যে-ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা বা আনুষ্ঠানিক আচরণের ঊর্ধ্বে, যে-ধর্ম বিশ্বের দরবারে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই মানবপ্রেমের উদার ধর্মই এই তরুণটির পরবর্তী জীবনকে পরিচালিত করেছে। যৌবনে পা দেবার আগেই বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা বিভূতির মনে পৃথিবীর যে-রূপটি প্রতিফলিত করেছিল ললিতে-কঠোর মিশ্রিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শিবাজীর বীরত্বময় দুঃসাধ্য সংগ্রাম-এই সবই মনোলোকে শক্তির প্রেরক উৎস ছিল। পৃথিবী যেন প্রতিশ্রুতির কাছে নিজেকে উদ্ঘাটিত করতে প্রস্তুত এই আস্থাটুকু তাঁর মনে জন্মেছিল। বাস্তবের দুঃখ কষ্টকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, এটা যেমন বুঝেছিলেন, তেমনই এও তিনি জেনেছিলেন যে, সহ্য করার শক্তি অর্জন করতে পারলে, একদিন এই দুঃখই পরাভূত হয়ে, জীবনকে জয়ের আনন্দে মণ্ডিত করবে। ব্যথা-বেদনা জীবনেরই অঙ্গ, যেমন সুখ-আনন্দ-সবটুকু মিলেই জীবন সম্পূর্ণ। ছেলেবেলা থেকে ঘরের চেয়ে বাইরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মন তাঁর দুটি বিপরীত ধারার বেণীতে ওতঃপ্রোত ভাবে বেড়ে চলেছিল—একটি হ'ল গৃহসুখের থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ, সেই গৃহ-কোণ আর পারিবারিক

পরিবেশের প্রতি তীব্র তৃষ্ণা, আর সেই পিপাসা মেটাবার ইচ্ছা থেকেই এসেছিল যে-অল্প পারিবারিক সুখ তিনি বাস্তবে পেয়েছিলেন, তাকেই নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মনে-মনে দেখার নেশা বা অভ্যাস। আর একটি ধারা হ'ল, বিরাট বিশ্বের একজন স্বনির্ভর নাগরিক হিসেবে নিজেকে চিন্তা করার চেষ্টা। এই দ্বিতীয় ধারাটিকে একটু স্থূলভাবে বলা যেতে পারে, নাকানি চোবানি খেয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সাঁতার শিখে ফেলার মতো। এই দ্বিতীয় সত্তাই তাঁকে অনাত্মীয়কে আত্মীয় ক'রে তুলতে শিখিয়েছিল। তাঁর নিজের জবানীতে এই ভাবটি আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'স্মৃতির রেখা'র এক জায়গায় তিনি বলেছেন : "আমি আজন্ম পথিক, পথে বেরিয়েছি যেদিন থেকে সত্যবাবু বাড়িতে নেই—অনেককাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ি মাণিকের গান হ'ল—পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিং-এ এলাম-কি ক্ষণে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিলাম জানি না। সেই বিদেশবাস সুরু হ'ল।" প্রথমে নিজের বাড়ির থেকে অন্য গৃহস্থের বাড়ি, আবার সেখান থেকে মা বা মাতৃকল্প নারীর সেবাযত্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্কুলের বোর্ডিং-এ অবস্থান! বিশ শতকের গোড়ায় চৌদ্দ বছর বয়সের একটি গ্রাম্য কিশোরের কাছে এটাই বিদেশবাস বই কি!

বাড়িতে বিধবা মা আর তিনটি ছোট ভাই-বোন আর নিজের শিক্ষার উচ্চাশাকে বাঁচিয়ে বজায় রেখে চলার জন্য যে-সংগ্রাম কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে শুরু হয়েছিল তাতে ক্ষত-বিক্ষত বা সাময়িকভাবে আহত হ'লেও বিভূতিভূষণ সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকায় পরহত হন নি; সে প্রমাণ তাঁর পরবর্তী জীবন।

[ক্রমশঃ

দশ

একটি সান্ধ্য অভিযান

দেখতে দেখতে বড়ো গাছগুলোর সব পাতা ঝরে যায়। ধুলোউড়ির মাঠে শূন্য ক্ষেত থেকে ধুলো ওড়া শুরু হয়। এবং কর্ণসুবর্ণ টিলার ওপর মাঝেমাঝে দেখা যায় স্বাধীনচেতা একটি ঘোড়াকে। ছেলেপুলেরা তাকে তাড়া করে ধরতে পারে না। সে অকুতোভয়ে আকাশের নিচে ঘুরে বেড়ায় এবং রাত্রিযাপন করে। তার দেহ ততদিনে রীতিমতো মেদপুষ্ট ও সতেজ।

সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার সুধাময় একদিন সবিস্ময়ে দেখে, বিদ্যুতশিখার মতো ঝিলিক দিয়ে স্বর্ণলতা ধুলো উড়িয়ে মাঠ চিরে ছোটাছুটি করছে—তার লক্ষ্য সেই পৈতৃক জঙ্গম সম্পত্তি।

সুধাময়ের হাসি পায়। ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে সে স্বর্ণর উড়ন্ত চুল দেখে ভাবে এ নারীর মধ্যে প্রচণ্ড আদিমতা আছে, এবং মনেমনে একটু উদ্বিগ্ন হয়। এ কাকে সে ভালবাসছে মনে মনে, গোপনে! প্রণয়ের বিপুল চাপা আবেগ নিয়ে তার দিন কাটে তো রাত কাটে না। তা কি বোঝে স্বর্ণ? যেন বোঝে, যেন বা বোঝে না। চটুল হালকা কথায় উচ্ছ্বসিতা স্বর্ণ কখনও হয়ে ওঠে যেন আত্মসমর্পণে তৈরী, কখনও তীব্র হুইসল দিয়ে মেল ট্রেনের মতন ষ্টেশন ছেড়ে চলে যায়। সুধাময়ের মনে হয়, এই উপমাটাই ঠিক। এ সুন্দর সবুজ বন্য ট্রেন তার মতন ছোট্ট ভদ্র ষ্টেশনের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

'চৈতক' হ্রেষাধ্বনি করে দূরের দিকে পালিয়ে যায়। তার দোদুল্যমান পুচ্ছদেশে শেষ মাঘের দিনাবসান প্রতিবিম্বিত হতে থাকে কিছু বর্ণচাঞ্চল্যে। উঁচু একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে স্বর্ণলতা।

তখন সুধাময় লাইন ছেড়ে এগিয়ে যায় তার দিকে। পিছন থেকে খুব আস্তে সে বলে, 'ধরতে পারলেন না?'

স্বর্ণ মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয় সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারকে। কিন্তু কিছু বলে না। চৈতক বাঁজা ডাঙা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সোজা কোদলা ঘাটের দিকে—যেখানে ইয়াকুব সাধুর তথাকথিত 'আশ্রম'টা চোখে পড়ছে।

কয়েকটা গাছের ফাঁকে একটা কুঁড়ে ঘর। সেখানে কোথাও হামাগুড়ি দিচ্ছে হয়তো একটা বাউরীশিশু।

সুধাময় পাশে এসে চমকায়। 'কী ব্যাপার! আপনি…' অবশ্য হাসতে হাসতে সে বলে।…'আপনি তো ভারি ছেলেমানুষ! একটা ঘোড়ার জন্যে কান্নাকাটি করে নাকি কেউ?'

স্বর্ণ ধরা গলায় বলে, 'খুব দরকার ওকে—অথচ নেমকহারামটা কিছুতেই আর হাতের নাগালে আসতে চায় না। রাখালগুলোকে প্রতিদিন এককাঠা করে চাল দিয়ে যাচ্ছি, কেউ ধরতে পারছে না। কজনকে লাথি মেরেছিল—খুব চোট লেগেছে।'

সুধাময় ওকে সান্তনা দিতে চায়।…'হ্যাঁ—মায়ামমতা তো স্বাভাবিক। কদ্দিন থেকে আছে! তবে কি—জন্তু জানোয়ারের ব্যাপার। ওরা ওই রকমই।'

স্বর্ণ ঠোঁটে কামড়ায়। তারপর বলে, 'খুব দরকার ঘোড়াটা। না—বাবার কথা ভেবে নয়, নিজের জন্য।'

সুধাময় প্রশ্ন করে, 'নিজের জন্যে? সে কি! আপনি কি ঘোড়ায় চেপে বেড়াবেন?'

'হুঁ। দু'একটা কল পাব মনে হচ্ছে।' স্বর্ণ গম্ভীর মুখে বলে—চোখ দুটো ভিজে থেকে গেছে এবং এ মেয়ের কাছে যেন ওই অশ্রুসিক্ততাটা বিশেষ ধরণের বিলাস। ওই চোখ নিয়েই সে মৃদু হাসে।…'এত সব কেলেঙ্কারি করে লোকে। অথচ কেউ কেউ তো ওষুধ নিতেও আসছে।'

'আপনি পারবেন। আমার পায়ের মচকানি ব্যথাটা এক ডোজেই কিন্তু সেরে গিয়েছিল!'…এই বলে সুধাময় জোরে হাসে।

স্বর্ণ একটু ইতস্তত করে বলে, 'মাস্টারবাবু, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?'

'নিশ্চয়। কিন্তু কোথায়?'

'আরেকবার দেখব ভাবছি। হাজার হলেও পোষা জানোয়ার তো! আসুন না!'

সুধাময় দ্রুত পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখে নেয়। তারপর বলে, 'লোকাল আসবার সময় হয়ে এল। জর্জ ব্যাটাকে কিছু বলে আসিনি—খচে যাবে নাকি!'…

স্বর্ণ নিঃসঙ্কোচে ওর একটা হাত টানে।…'জর্জকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। ভাববেন না।'

'কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে!'

'আসুক।'...

সুধাময় মনে মনে ওকে মায়াবিনী সম্বোধন করে পা বাড়ায়। আর বস্তুত তখন কী উদ্দাম চাঞ্চল্য তার রক্তে, শিরায়-শিরায় কামনাবাসনারা খুব ভদ্র বেশে সান্ধ্য ভ্রমণ শুরু করেছে! আর এই শীতশেষের ঈষদুষ্ণ সন্ধ্যায় নির্জন মাঠে তাকে বাগে পেয়ে যায়। দুর্দান্ত প্রেমভালোবাসা। স্বর্ণ তার হাত ছাড়ে না। নরম কালচে মাটি শস্যশূন্য ক্ষেতের। কেটে নেওয়া ধানগাছের গুচ্ছ পিছনে ফেলে রেখে গেছে স্মৃতিপুঞ্জের মতন অজস্র 'মুড়ো'—তার নলে আগের রাতের শিশির সারাদিনের রৌদ্রপাতেও পুরো শুকিয়ে যায় নি, পায়ের আঘাতে ছিটকে পড়ছে প্রেমজ বেদনা থেকে অশ্রুপাতের মতন ফোঁটায় ফোঁটায়। ইতস্তত শামুকের খোল, মৃত কাঁকড়া, কিছু কোমলতম ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদগুচ্ছ বুক পেতে এই প্রেমিক-প্রেমিকার অস্তিত্ব অনুভব করছে। অসমতল মাঠের উঁচু মোটা আলের ওপর কিছু ঝোপঝাড়, কদাচিৎ দু একটা গাছ, পাখির ঝাঁক ফরফর করে উড়ে যাচ্ছে, বেজি ডিঙিয়ে যাচ্ছে সাপের সুপ্রাচীন কোন খোলস, শেয়াল কিংবা খেঁকশিয়াল গ্রামীন কিংবদন্তীর মতন সবরকম সত্যাসত্যের বাইরে থেকে প্রতিভাত হচ্ছে কখনও; এবং দেখতে দেখতে তারা কর্ণসুবর্ণর একটি টিলার ওপর দিয়ে হেঁটে হাত ধরাধরি পেরিয়ে যায়, এবং যেতে হঠাৎ শোনে বাজখাঁই হাঁক চরণ চৌকিদারের—'হেই! কারা যায়?' তখন চকিতে হাত ছেড়ে আলাদা হয়।

চরণ লাঠি হাতে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। দেখে বা সব জেনেও একবার নিজেকে জাহির করার ইচ্ছে হয়েছিল তার। স্বর্ণ কিছু বলার আগে সুধাময় সাড়া দেয়—'চৌকিদার নাকি?'

চরণ নমস্কার করতে করতে ওরাডাঙা থেকে নেমে ওর কাছে পৌঁছয়। চরণের বাঁকা হাসিটি এই ধূসরতায় অস্পষ্ট। সে বলে, 'আজ্ঞে, বেড়াতে বেরিয়েছেন নাকি?'

সুধাময় বলে, 'না। এনাদের ঘোড়াটা...

স্বর্ণ ওকে থামিয়ে দেয়।...'চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

চরণ বলে, 'হুঁ—ঘোড়াটা ওই বাগে যাচ্ছে দেখলাম। তা আপনারা কি ধরতে যাচ্ছেন ডাক্তোরদিদিরা? সে একটা কঠিন কাজ। সেবারে এতগুলো পুলিশদারোগা দৌড়াদৌড়ি করেও হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ...'

স্বর্ণ ধমকে বলে, 'হেসো না।'

থতমত খেয়ে চরণ বলে, 'আজ্ঞে হাসি নি।'

ওকে রেখে দুজনে সোজা নাকবরাবর ইয়াকুব সাধুর আখড়ার দিকে হেঁটে চলে। চরণ তখন একলা হয়ে দারোগার হাসি হেসে নেয় এবং আচমকা বিকট চেঁচিয়ে গান গাইতে থাকে। তার চ্যাপ্টা পায়ের ধাক্কায় ধুলো ওড়ে মেঠো রাস্তায়। সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার বেয়ে নির্বোধ সাপের মতন সেই আঁকাবাঁকা ধুলো কতদূর ওঠার চেষ্টা করে।

একটু পরে আবার স্বর্ণ সুধাময়ের একটা হাত ধরে। ডাকে—'মাষ্টারবাবু!

'উঁ? বলুন।'

'আপনার খুব ভয় হল না তো?'

'ভয়! কেন?'

'চরণ দেখল?'·· সুধাময় জেনেও অকারণ বলে।···'আপনাদের ঘোড়াটা খুঁজতে বেরিয়েছি—তাতে কী?'

'না মশাই। আমি এমনি করে আপনার হাত ধরে ছিলুম—চরণ দেখল।'

'বেশ—দেখল, দেখল।'

'আপনার বদনাম রটলে চাকরীতে ক্ষতি হবে না?'

'হবে তো হবে।'···বলে মরীয়া সুধাময় পরক্ষণে মাথা দোলায়।···'নাঃ কিছু হবে না।'

স্বর্ণ ওর হাতটা এবার ছেড়ে দেয়।···'না বাবা! আমার এখন রুগীপত্তর দরকার। কালিটালি থেকে দূরে থাকা ভালো। কী বলেন মাষ্টারবাবু?'

কেন যেন অভিমানে আহত হয় সুধাময়। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বলে, 'লোকেদের ওটা স্বভাব। আপনি যতই দূরে থাকুন, কালির অভাব হবে না। বলুন, আপনি কি বাঁচতে পেরেছেন এত করেও? অমন নির্দোষ মানুষটায় অকারণ সাজা হয়ে গেল পর্যন্ত! বিচার, না বিচারের প্রহসন! এই শালা ইংরাজ রাজত্বের আবার বড়াই করে সবাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ!'

'আচ্ছা মাষ্টারবাবু, হেরুর সঙ্গে আমার কেলেঙ্কারীর কথা রটল এত।'··· স্বর্ণ খুব স্বাভাবিকভাবে বলে।···'আপনি কী ভাবেন?'

সুধাময়ের চোখ জ্বলে ওঠে।···'কী ভাববো?'

'আপনি কি ভাবেন, বাবা সত্যিসত্যি নির্দোষ?'

'নিশ্চয় তিনি নির্দোষ।'

'কিন্তু আমি যেন সত্যি ভালোবাসতুম হেরু বাউরীকে।...' বলে স্বর্ণ খিল খিল করে হেসে ওঠে।

'যাঃ!'

'হুঁ-উ। মাষ্টারবাবু, আমার অপমানের শোধ নিয়েছিল যে, তাকে ভালবাসব না? কী যে বলেন!'

'ভালবাসাটা কী স্বর্ণ দেবী?'···সকৌতুকে সুধাময় বলে।

'অত বুঝিনে। কিন্তু ওই ছোটলোকটাকে দেখলে মনে খুব উৎসাহ পেতুম। ও কাছে থাকলে মনে হত—আমার ভীষণ জোর বেড়ে গেছে।'

'জানেন? আগে সব সম্রাজ্ঞী বা রাণীটাণীরা নাকি বাঘ পুষতেন। সখ করে পুষতেন।'

হুঁ। ও ছিল আমার পোষা বাঘ। আজ আফশোস হয়, বাঘটা কাছে থাকলে কত কী সব করে ফেলতুম!'

'পৃথিবীর ওপর আপনার ভীষণ রাগ, তা জানি। সেটা অন্যায় নয়।'

'উঁহু—মানুষের ওপর।'

'একই কথা। কিন্তু কী আর করবেন? আপনি আমি প্রত্যেকে এত অসহায়—যেন একটা অন্ধ শক্তির সামনে কিছু করার থাকে না।'

স্বর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে—'কোথায় এসে পড়লুম? হুঁ—বাঁদিকে। ওই যে ইয়াকুবের ঘর।'

'কিন্তু ঘোড়াটা কোথায়? অন্ধকার হয়ে এল—আর দেখাই যাবে না।'

'আসুন তো!'

তখন ইয়াকুব সবে লালটিন' জেলেছে। দাওয়ায় উবুড় হয়ে পা ছুঁড়ছে হেক্কর বাচ্চাটা—ফরসা ধবধবে রঙ। অবিকল রাভীর মতন। ইয়াকুব আলোটা দোলাচ্ছে তার সামনে। মুখে অদ্ভুত সব আওয়াজ করছে। হেক্কর ছেলেও সমানে সাড়া দিচ্ছে। উঠোনে দুই মূর্তি দেখে ইয়াকুব দ্রুত ঘুরে গর্জে ওঠে—'কে র‍্যা?'

স্বর্ণ সাড়া দেয়—'আমি সন্ন্যাসীচাচা। তোমাকে দেখতে এলুম।'

অমনি লণ্ঠন রেখে ইয়াকুব শূন্যে ঝাঁপ দেয় এবং সামনে পৌঁছে দুহাত তুলে চেঁচায়—'ওরে আমার মা এসেছে রে! আমার মহামায়া মা এসেছে রে, আমার আঁধার ঘর আলো হয়েছে রে!'

তার পর ক্ষ্যাপা ইয়াকুব সাধু ঢাকের বাজনা জুড়ে দেয়।···নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং। ডর‍্র‍্র‍্র্ ঢ্যাডাং ঢ্যাডাং ড্যাং!···

সুধাময় আমোদ পায় স্বর্ণ বলে, 'আদিখ্যেতা রাখো তো বাপু! কথা শোন।'

ইয়াকুব আরও বারকতক বাজিয়ে তারপর ঠিক ঢাকীর মতনই সমের বোলটি ঝেড়ে করজোড়ে নত হয়।

'আমাদের ঘোড়াটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। এইমাত্র এদিকে এসেছে, বুঝলে! তুমি একবার কষ্ট করে ছাখো না সন্নেসী চাচা!'

ইয়াকুব বলে, 'তাই বলুন। আমি ভাবলাম…যাক্ গে। যাবে কোথায় শালা? এইসা টানের বাণ মারব যে বাপ বাপ বলে দৌড়ে আসবে। ভাববেন না, বসুন মা জগদম্বা।'

বলে সে ব্যস্তভাবে লাফ দিয়ে ঘরে ঢোকে। স্বর্ণ বলে, 'ও তোমায় মন্ত্রতন্ত্রের কাজ নয়। আমরা বসছি—তুমি একবার খুঁজে দেখ। কাছাকাছি কোথাও আছে নিশ্চয়। গঙ্গা পেরিয়ে যেতে তো পারবেনা।'

ইয়াকুব সাধু তার জাঁক দেখাতে ছাড়বে না। ঘরের ভিতর অন্ধকারে তার বিকট অংবং আওয়াজ শোনা যায়। স্বর্ণরা এগিয়ে গিয়ে হেকুর ছেলেকে দেখতে থাকে। ছেলেটা এদের দিকে তাকায় না। উপুড় হয়ে আলোটা দেখে, আর হাত পা ছোঁড়ে। রাঙা প্যাণ্ট জামা কিনে দিয়েছে ইয়াকুব। গলায় বাহুতে ঝুলিয়ে দিয়েছে সব নানা আকারের কবচ আর সুতোয় বাঁধা শেকড়-বাকড়। নাকে সিকনি ঝরছে। লালা পড়ছে প্রচুর। ছেলেটা আলোর উদ্দেশ্যে বলছে—'গ্যাঃ গ্যাঃ গ্যাঃ!

স্বর্ণ নগ্ন দাওয়ার মাটিতে বসে পড়ে। তারপর আঙুল বাজায়, ঠোঁটে অদ্ভুত শব্দ করে। তখন সে স্বর্ণকে দেখতে পায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠে। স্বর্ণ হাসতে হাসতে বলে, 'কী হল রে বাবা! পছন্দ হল না বুঝি! তোর মায়ের মতন সুন্দরী নই কি না—তাই!'

সুধাময় মনেমনে এবার বিরক্ত। গোরাংবাবুর মতন স্বর্ণও বড্ড খামখেয়ালী। নিচুজাতের লোকজন নিয়েই এদের কারবার। তার ওপর এই সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়াটোড়ার ব্যাপার—যাকে বলে একেবারে ঘোড়ারোগ!

ইয়াকুব সম্ভবত ঘোড়াটার উদ্দেশ্যে আকর্ষণী মন্ত্র উচ্চারণ করছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ স্বর্ণ চটুল হেসে চাপা গলায় বলে ওঠে, 'বুঝলেন মাস্টারবাবু! এটি আমার প্রেমিকের পুত্র!'

সুধাময় বোকার মতন হাসে।

'হুঁ গো, ছোটলোকটার আমার ওপর কী যেন টান ছিল। পায়ের নিচে বসে মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। তারপর একবার আঁরোয়া জঙ্গলের মধ্যে…' স্বর্ণ সতর্কভাবে থেমে যায়।

সুধাময় অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'কী ?'

স্বর্ণ হাসিতে ভাঙে।…'সে এক কেলেঙ্কারি। যাক্ গে। ছেলেটা কিন্তু ভারি সুন্দর—তাই না মাস্টারবাবু ?'

সুধাময় অগত্যা বলে, 'পছন্দ হলে নিয়ে চলুন। মানুষ করবেন।'

'পাগল !'…বলে স্বর্ণ ইয়াকুবের উদ্দেশ্যে মুখ ঘোরায়।…'ও সন্ন্যাসীচাচা, হল তোমার ?'

ইয়াকুব বেরিয়ে আসে।…'চুপচাপ বসে থাকুন মা ত্রিনয়নী। শালা এক্ষুনি এসে পড়বে দেখবেন। যাবে কোথায় ? এমন জোর ঝেড়েছি শালাকে…'

স্বর্ণ উঠে দাঁড়ায়।…'তোমার ওসব বুজরুকি শুনতে আমি আসিনি। উঠুন মাস্টারবাবু, আমারই বোকামি !'

'সবুর !' বলে ইয়াকুব লাফ দিয়ে উঠোনে নামে। 'ওই দেখুন, জোসনার ঢেলা নদীর পারে উঠছেন। আর দুদণ্ড সবুর মা জগদম্বা !'

সেও অবশ্য ঠিক। ঝাউবনের ওপাশে চাঁদ উঠছে। গঙ্গার জলে এবং বালিয়াড়িতে তেলরঙা আলোর ছোপ পড়েছে। এদিকটা অনেকদূর ফাঁকা। ঘোড়াটা দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে। স্বর্ণ চাঁদ দেখতে থাকে। কুঁড়েঘরটার পিছনে সামান্য দূরে জঙ্গলে একটা বটগাছ—শ্মশান। আরও কিছু গাছের জটলা নিয়ে সেদিকটা ঘন কালো হয়ে রয়েছে। প্যাঁচা এবং শেয়াল ডাকছে মাঝে মাঝে। পারাপারের ঘাটের দিক থেকে শম্ভু ঘেটেলের কাসির আওয়াজ আসছে। সেই সঙ্গে অস্পষ্ট কিছু কথাবার্তার আভাষও। হাটুরে ব্যবসায়ীরা ফিরে আসছে বেলডাঙা বাজার থেকে।

'ঘোড়া আসছে।' ইয়াকুব ফের আশ্বস্ত করে।…'একটা কথা মা। শুনলাম, ডাক্তারি করতে লেগেছেন বাবার মতন।'

অন্যমনস্ক স্বর্ণ বলে, 'হুঁ।'

'আমার পুকড়োটার সর্দিকাশি জ্বরজারি যে ছাড়ছে না রে ত্রিনয়নী !' করুণস্বরে ইয়াকুব বলে। ‥'ওষুধ কতরকম আমি তো দিলাম—কাজ হল না। নিয়ে যাব—দেখবি মা ?'

ইয়াকুব তুই সম্বোধন করছে জেনেও স্বর্ণর রাগ হয় না। ছেলেটাকে একবার দেখে নিয়ে সে বলে, 'যেও। কিন্তু ঠাণ্ডায় ফেলে রেখেছ কেন ? অসুখ তো হবেই।'

ইয়াকুব জানায়, 'হ্যাঁ'—সে ঠিক কথা, মা জননী। কিন্তু সারাক্ষণ ছেলে নিয়ে থাকলে যে না খেয়ে মরব !'…

ইয়াকুবের তন্ত্রচালনা ভূত ছাড়ানো এবং কবরেজি অংশ বাদ দিলেও নিজের সাধনভজনের ব্যাপার আছে। তারপর সবচেয়ে মুসকিল হয় আচমকা ভর উঠলে। তখন ছেলেটা জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়লেই বিপদ। তবে ইয়াকুবের অধীনে ভূতপ্রেত আছে কিছু—তারা সব সময় রক্ষা করে। সত্যি বলতে কী, এইসব সদাসতর্ক অদৃশ্য প্রহরীদের জন্যেই ছেলেটার কোন ক্ষতি হয় নি আজ অব্দি। যেমন ধরা যাক্ সেদিনের কাণ্ডটা। কখন 'শালাব্যাটা' হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছে একেবারে গঙ্গার পাড়ে। প্রায় পড়ে যায়-যায় অবস্থা। হঠাৎ কী আজব কাণ্ড দেখুন। সেই সময় বুড়ি ছাগলটা কীকারণে খুঁটো উপড়ে দৌড়ে আসছে পাড়ে—দড়িটা এসে একেবারে জড়িয়ে গেল ছেলের গায়ে। সেই টানে অনেকখানি দূরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। বেঁচে গেল প্রাণে। কেটে ছড়ে গেল অনেক জায়গায়। এখনও ঘা শুকোয়নি।

মানতে হয়, এটা সত্যি বিস্ময়কর ঘটনা।

আরেকটি ঘটনা। বর্ষার শেষদিকে অনেক রাতে ইয়াকুব বেরিয়েছে গঙ্গার দিকে। উদ্দেশ্য, একটা মড়া আবিষ্কার—তার মুণ্ডুটা ভারি দরকার। ঘরে ছেলে একা ঘুমোচ্ছে। দরজা বাইরে থেকে আটকানো আছে। কিন্তু কীভাবে মড়াখেকো শেয়াল এসে আঁচড়ে কামড়ে ছিটে বাতার দরজা ফাঁক করে ঢুকেছে। তারপর ছেলের পায়ের কাছে যেই না শুঁকতে যাওয়া, অমনি প্রহরী বিশ্বস্ত 'চাড়া' (প্রেত) চালের বাতা থেকে তিনটে মড়ার মুণ্ডু দিয়েছে ফেলে। পড়বি তো পড়, শালার পিঠের ওপর। তখন তো শালা দরজা গলিয়ে পালাতে যাচ্ছে—কিন্তু অত কি সহজ? আটকে গেছে খাঁজে। আধখানা ভিতরে, আধখানা বাইরে—ত্রাহিত্রাহি চ্যাঁচায় হারামজাদা। আর সেই আর্তনাদ শুনে দূরে নিশাচর সাধুর কান চখে ওঠে। সে দৌড়ে আখড়ায় ফিরে দেখে এই কাণ্ড……

সুধাময় সম্ভ্রমে বলে, 'শেয়ালটা মারলেন?'

'নাঃ। মায়ের জীব সব। রক্ষে পেল।'…ইয়াকুব জবাব দেয়।…'ছেলে আমার নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

স্বর্ণ বলে, 'খুব হয়েছে। আমার দেরী হয়ে গেল এদিকে।'

হঠাৎ ইয়াকুব রহস্যময় হাসে।…'মা কাত্যায়ণী, ওই দেখুন আপনার ঘোড়া। হ্যাঁ, ঠাউর করে দেখুন। আমি বুড়োমানুষ—আমারও জোসনাতে দিব্যি নজর চলছে। যোয়ান চোখে আপনারা দেখুন. মিথ্যে না সত্যি।'

হ্যাঁ, নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে স্থির ঘোড়াটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে। চতুষ্পদ

প্রাণীটি সম্ভবত কিছুক্ষণ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে অকুতোভয়ে। একটি ধ্রুপদী সঙ্গীতের মুদ্রিত স্বরলিপির মতন শ্রেণীবদ্ধ, ঋজু এবং প্রতীকচিহ্ন খচিত তার ওই অবস্থিতি। আর সবাই তাকিয়ে-তাকিয়ে মোহিতভাবে তাকে দেখতে থাকল। মনে হল এখন তার পশ্চাদ্বাধন পাপ—পবিত্রতাবিনাশী, এবং ঈশ্বরও ক্ষমা করবে না কোন মৃদুতম হস্তক্ষেপ।

আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে প্রথমে মুখ খোলে সহকারী ষ্টেশনমাষ্টার। ···'কী বদমাইসি! একে কয়েদ করতে চেয়েছিল শুওরের বাচ্চা আফতাব দারোগা!'

শান্তভাষী ভদ্র সজ্জন প্রেমিকের কণ্ঠ থেকে এহেন বুলি শুনেও কারও মনে হল না যে এই বাক্যটি এখন অশ্লীল। কারণ, কী যেন ছিল সেই সান্ধ্য পরিবেশ ও আবহাওয়ায়, সুপ্রচুর শান্তি এবং তদ্গত ভাবসমূহ। বস্তুত স্থানটি বহু জনলাঞ্ছিত কোন শহর নয়; বিশাল আকাশ এবং ব্যাপক মাটিতে প্রকৃতির স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল। প্রকৃতি সেখানে মনুষ্যহৃদয় ও মস্তিষ্ককে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। আর গঙ্গা নামে ঐতিহাসিক শুধু নয়, পৌরাণিক প্রবাহিনী তার খুব কাছেই রয়েছে। সকলপ্রকার পাপ ও অশ্লীলতা তার জলে খুবই সহজে ব্রহ্মত্বে উত্তীর্ণ হয়।

সহকারী ষ্টেশনমাষ্টারের ঘৃণা এবং অশ্লীল বাক্যটিও তাই খুব স্বাভাবিক শোনাল। এবং তান্ত্রিক সাধু মুগ্ধচোখে ঘোড়াটা দেখতে দেখতে বলে ওঠে, 'চালসেপড়া চোখ আমার রেতের বেলা মায়ের কিপায় জ্বলে—ফুলকি বেরোয় ঝিং ঝিং! তো আহা হা! দেখ, দেখ সবাই—যেন বোররাখ্! (সুন্দরী নারীর মুখমণ্ডলবিশিষ্ট পক্ষীরাজ অশ্ব—যা হজরত মোহাম্মদকে স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল) হ্যাঁ, তাই লাগে। যেন, অবিকল রূপসী স্ত্রীলোকের মুখখানি দেখতে পাই। যেন···'

স্বর্ণ প্রশান্তি ভেঙে হাসে হঠাৎ।···'ফেট্! ঘোড়াটা মদ্দা।'

'কে মদ্দা, কে মাদী!' সাধুর ধ্যান ভাঙে না।··'আহা হা! দেখ গো, দেখ।'

'তুমি দেখ।' বলে বাস্তববাদিনী স্বর্ণ পা বাড়ায়।

সুধাময় বলে, 'একটা দড়িদড়া হলে ভালো হত। নিয়ে যাবেন কীভাবে?'

'অসুন তো।'

ইয়াকুব অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। দাওয়ায় চটের ওপর

হেরুর ছেলে লণ্ঠন দেখে যথারীতি হাত পা দোলাতে ব্যস্ত হয়েছে ততক্ষণে। এইসব ফেলে রেখে ওরা দুজনে এগিয়ে যায়।

সুধাময়ের মনে হয়, অনর্থক একটা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে, এবং এর শেষরক্ষা কতদূর হবে জানা নেই।

অথচ স্বর্ণ স্বচ্ছন্দে পোড়ো ঘাসের জমির ওপর হেঁটে ঘোড়াটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঘোড়াটা, আশ্চর্য, একটুও নড়ে না। স্বর্ণ তার পিঠে হাত রাখে। গলা জড়িয়ে ধরে। ঘোড়াটা তবু স্থির। স্বর্ণ বলে, 'মাষ্টারবাবু, একটি ছিপটি হলে ভালো হত। দেখুন না, ওই ঝোপ থেকে একটা ডাল ভাঙতে পারেন নাকি।'

সুধাময় বিরক্তভাবে ঝোপ খোঁজে। একটু দূরে নিশিন্দাঝোপে অনেক চেষ্টা করে একটা ডাল ভাঙে সে। স্বর্ণ সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাষ্টারবাবু, আমি কিন্তু চাপব।'

'চাপবেন? কোথায়?' সুধাময় হাঁ হাঁ করে ওঠে।

'আপনার পিঠে নয় স্যার, এই শ্রীমানের।'

'আর আমি?'

'সেপাই সেজে সঙ্গে আসুন।'

সুধাময়ের হাসি পায়।...'কিন্তু ব্যাটা নির্ঘাৎ আপনাকে ফেলে দেবে।'

'তখন আপনার পিঠে চাপব।'... স্বর্ণ খিলখিল করে হাসে।... 'কেন? পারবেন না?'

সুধাময় মনেমনে বলে, 'সে আমার প্রচণ্ড সুসময়!' প্রকাশ্যে বলে, 'আমি সব পারি।'

স্বর্ণ অভ্যস্তভঙ্গীতে 'চেতকের পিঠে চেপে বসলেও সে নড়ে না। স্বর্ণ মৃদু ছিপটি সঞ্চালন করে গ্রাম্য স্ত্রীলোকসুলভ ঢঙে বলে, 'আ মর! ভিরমি গেলি নাকি? হেট্, হেট্!'

সুধাময় বিস্ফারিত চোখে দেখে, ঘোড়াটা ধীর ছন্দে হাঁটতে লাগল। আশ্চর্য, আশ্চর্য এবং আশ্চর্য! ম্রিয়মান জ্যোৎস্নায় এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। কচি গমের ক্ষেত ভেঙে ঘোড়া যত হাঁটে, তার মন লোভে চঞ্চল হয়। এবং দৌড়ে কাছে গিয়ে বলে ওঠে, 'এই! আমাকেও একবার চাপতে দেবেন কিন্তু।'

'ঘোড়ায় চাপা অভ্যেস আছে তো?'

'উঁহু।'

'কোমর ব্যথা করবে। জিন ছাড়া তিষ্ঠোতেও পারবেন না।'

'আপনি তো পারছেন!'

'বারে! ছেলেবেলা থেকে চাপছি না?'

'শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন যখন, তখনও কি চাপতেন! ওনাদের ঘোড়া ছিল বুঝি?'

'যাঃ!' বলে স্বর্ণ মৃদু ছিপটি হাঁকায়। ঘোড়া আরেকটু দ্রুতগামী হয়। এবং কাঁচা সড়কে গিয়ে ওঠে।

সুধাময় ক্লান্ত হয়ে ধুকুরধুকুর দৌড়য়। মাঝে মাঝে বলে, 'আস্তে, আস্তে!'

তখন চাঁদ অনেকটা উঁচুতে চলে এসেছে। জ্যোৎস্না বেশ স্পষ্ট। বৃক্ষবিরল মাঠ একপাশে, অন্যপাশে ঐতিহাসিক টিলা। হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে স্বর্ণ সকৌতুকে বলে, 'হ্যালো মাস্টারবাবু, কাম অন।'

সে ঘোড়া থেকে নামে। তার গলায় হাত রেখে নিজের পাছা ঝাড়ে একবার। তারপর বলে, 'আসুন।'

সুধাময় হঠকারী আবেগে একলাফে ঘোড়ার পিঠে ওঠামাত্র ঘোড়াটা সামনের দুঠ্যাং তুলে হ্রেষাধ্বনি করে এবং সুধাময় অমনি স্বর্ণের ওপর পড়ে যায়। পড়ার সময় সে স্বাভাবিক ভাবে স্বর্ণকে ধরে ফেলেছিল। তার ফলে স্বর্ণশুদ্ধ জড়াজড়ি সে ধুলোয় আছাড় খায়।

ঠাণ্ডা ধুলোয় দুজনে ক'মুহূর্ত ঘন জড়াজড়ি থেকে ভেবেছিল, সব চেষ্টা এবার ব্যর্থ করে চৈতক ফের পালাবে। কিন্তু পুরুষ মানুষটির মধ্যে চকিতে সুপ্ত কামনা জেগে ওঠায় সে স্ত্রীলোকটিকে স্বাভাবিকভাবে নিষ্কৃতি দিতে চায় না এখন। আকুল দুইহাতে জড়িয়ে ধরে, পিঠের নিচে ঠাণ্ডা ধুলো নিয়ে. সে ভিখিরি চোখে তাকায় স্বর্ণর মুখের দিকে। স্বর্ণ হতচকিত ও বিভ্রান্ত ছিল এবং ঘোড়ার দিকে তার মন। সেই মুহূর্তে সহকারী স্টেশন-মাস্টার তার গালে ঠোঁট ঘষে অস্ফুট বলে, 'স্বর্ণ, আমার সোনা!'

ভাঁড়ের মতন মুখভঙ্গী করে ঘোড়া মুখ ঘুরিয়ে এই দৃশ্য দেখল। সে হ্রেষায় একবার হাসলও। আর সেই মুহূর্তে দুঃখিতা স্বর্ণ বলে, 'ছিঃ! একি মাস্টারবাবু!'

দুজনে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুধাময় নির্বাক। স্বর্ণ কাপড় ঝাড়ে সশব্যস্তে। সেও কিছু বলে না আর। তারপর ঘোড়ার কাছে যায়। তখন টিলার ওপর দৌড়ে আসার শব্দ শোনে ওরা।

আর কে! চরণ চৌকিদার দাঁত ঝলকায় তার জ্যোৎস্নায়।…'পড়ে গেলেন নাকি?'

'আর বোলো না হে!' সুধাময় বলে। 'ব্যাটা বড্ড পাঁজি। অনেক খুঁজে পাওয়া গেল যদি—তো…আরে, আরে!'

স্বর্ণ ঘোড়ার পিঠে চেপে আচমকা পিছলে চলে গেল দূরের দিকে। কিছু ধুলো দৃশ্যমান হল জ্যোৎস্নায়। কিছু শব্দ শোনা যেতে থাকল খট্‌খট্ খটাখট্ খটাখট্…

স্তম্ভিত সুধাময়। এবং লজ্জিত, দুঃখিত। এবং অভিমানীও।

চরণ বলে, 'ডাক্তারবাবুর মেয়েটো ক্ষ্যাপা। এখন কী আর করবেন? চলে যান। বড়সায়েব খুঁজছেন আপনাকে। আমি বলেছি, ঘোড়া খুঁজতে গেছেন স্বন্নদির সঙ্গে। বলুন তো সঙ্গে যাই। যাব?'

সুধাময় অনুচ্চস্বরে বলে, 'না। থাক।'

চরণ হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে গাঁয়ে ফিরে গেল। সুধাময় খুব আস্তে হাঁটে। একটা গভীর অনুশোচনা এবং দুঃখ তাকে দুপাশ থেকে চেপে ধরে। সে মনে মনে বলে, 'হা ঈশ্বর! আমি ভুলে যাই যে স্বর্ণ বিধবা। আমার মনেই থাকে না যে যা হয় না, হতে পারে না, কিংবা আদৌ হবে না—তার পিছনে ছোটাছুটি করা নিষ্ফল।'

সে ষ্টেশনের দিকে হাঁটে কুরুক্ষেত্রে পরাজিত দুর্যোধনের মতন—নিরাপদ গোপন আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে।…

আর সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়াও পাপ মনে হওয়ায় সুধাময় ছটফট করে তার কোয়ার্টারে। তারপর চুপিচুপি বেরিয়ে আসে। চাঁদ তখন পশ্চিম দিগন্তে আঁরোয়া জঙ্গলের শীর্ষে ঢলেছে। ষ্টেশনে জর্জ লম্বা টেবিলে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভোরের আগে আর গাড়ি নেই। সুধাময় লম্বা পা ফেলে লাইন ডিঙিয়ে হাঁটে।

স্বর্ণর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বুকে, ভারি শরীরে, ভাঙা গলায় সে ডাকে, 'স্বর্ণ, স্বর্ণ, স্বর্ণ!'

স্বর্ণ ধুড়মুড় করে উঠে বলে, 'কে, কে?'

'আমি—আমি সুধাময়।'

'কী?'

'ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

স্বর্ণ লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দেয়। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খোলে। বলে, 'কী চাইতে এসেছেন?'

'ক্ষমা।'

'স্বর্ণ কেমন হাসে।…'ফেট্! আমি ভাবলুম বুঝি…'

সদ্য ঘুমভাঙা ঢলঢল মুখ স্বর্ণর। সুধাময় ভাবে, ক্ষমা চাওয়াটা ঠিক হল না। সে ভিতরে ঢুকে বলে, 'আপনার রাগ মানাতে এলুম।'

স্বর্ণ শান্তভাবে বলে, 'আমি রাগিনি। খুব লজ্জা পেয়েছিলুম। আসুন, চা খাব।' (ক্রমশঃ)

সুচরিতা সান্যাল

সাহিত্যের খবর

পরলোকে এজরা পাউণ্ড॥ এজরা পাউণ্ড আর নেই। একদা বহুল বিতর্কিত, কাব্য জগৎ থেকে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত, একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। একজন কবির পক্ষে এ যেমন দুঃখের, তেমনি অন্যদিকে গর্বের বিষয় আর এখানেই পাউণ্ডের স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই তিনি বোধ হয় এক অর্থে পাঠক মহলে দুর্বোধ্য হয়ে রইলেন।

এই দুর্বোধ্যতার উৎস নিঃসন্দেহে তাঁর প্রজ্ঞা। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞান ও পড়াশুনার অধিকারী ছিলেন। ল্যাটিন, গ্রীক, ইতালীয়ান প্রভৃতি ভাষা তিনি আত্মস্থ করেছিলেন অত্যন্ত গভীরভাবে। তাঁর কবিতায় এই কারণেই আবেগের চেয়ে অভিজ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট। তিনি সচেতন ভাবেই তাঁর কবিতায় বহু বিদেশী 'ফ্রেজ' ব্যবহার করেছেন, গ্রীক সাইকলজির পাত্র-পাত্রীদের অলৌকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে। তাই পাঠকের সীমিত শিক্ষার সাথে সুসংবদ্ধ সংধর্মিতা গড়ে ওঠেনি আর এ কারণেই তাঁর কাব্য আখ্যাত হয়েছে দুর্বোধ্য।

ইমেজিস্ট কাব্য আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রবক্তা। ১৯০৯ সালের ২২ এপ্রিল তিনি এতে যোগ দেন। পাউণ্ড তখন, "was very full of his troubadours." ১৯১২ সালে তিনি টি. ই. হিউমের সম্পূর্ণ কাব্য সংকলন প্রকাশ করলেন—পাঁচটি কবিতা ও তেত্রিশ পংক্তিতে। তার মুখবন্ধে লিখেছেন—"As for the future, Les Imagistes, the descendamts of the forgotten school of 1909 have that in their keeping. সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল ইমেজিস্টদের দল। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনই ইংরেজি আধুনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটাল। ইমেজিস্টদের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পাউণ্ড লিখলেন—

(১) বিষয়টি ব্যক্তিগত বা ভাবগত যাই হোক না কেন তাকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে হবে। (২) রচনাটির পবিবেশনে যে শব্দটির নিরঙ্কুশভাবে অনিবার্যতা নেই, সে শব্দ বর্জন করতে হবে। (৩) ছন্দের ক্ষেত্রে, সাঙ্গীতিক বাক্‌ধারা পরম্পরায় রচনা করতে হবে, ছন্দস্পন্দনের অনুযায়ী। (৪) বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

পাউণ্ড কয়েকটি কাব্য সংকলনেও সংরক্ষিত করলেন ইমেজিস্ট কবিদের কবিতাবলী। ১৯২০ সালে তিনি লিখলেন; এইচ. এস. মারবেলে, একটি আত্মজৈবনিক প্রতিকল্প, একটি স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা।

পাউণ্ডের ইতিহাস চেতনা তাঁর সমসাময়িকদের অতিক্রম করে চলে যায়। বিশ্ব সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি কোন সীমারেখা টানেন নি। এদিক থেকে তাঁর বোধ ছিল আন্তর্জাতিক। তাঁর কবি প্রতিভা সম্বন্ধে হয়ত আরো বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। তাঁকে বুঝতে গেলে চাই স্বতন্ত্র অভিনিবেশ।

বাংলায় তাঁর বহু রচনা অনূদিত হয়েছে। তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় হিসেবে উৎপলকুমার বসু কর্তৃক অনূদিত একটি কবিতার কয়েক পংক্তি উল্লেখ করা যাচ্ছে।

"প্রবেশ করেছে করতলে সেই গাছ,
উদ্ভিদ রস উঠেছে দু'বাহু বেয়ে,
আমার বক্ষে জায়মান সেই গাছ—
নিম্নমুখ,
শাখা প্রশাখায় আমাকে ফেঁড়েছে, বাহুর মতো।
সেই গাছ তুমি,
শৈবাল তুমি,
তুমি ভায়োলেট শীর্ষ বাতাসতীর্ণ।
তুমি এক শিশু—এতোই উচ্চ—সেই সে তো তুমি,
তবু সব কিছু মর্তভূমিতে উপহসিত॥

অধুনিক বাংলা কাব্যেও তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও যথেষ্ট অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। তাঁর মৃত্যু তাই কাব্যানুরাগীদের দুঃখিত করবে। তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

কগবরক লেখক গোষ্ঠীর প্রথম সম্মেলন॥ ত্রিপুরার মারিয়াথল পার্বত্য গ্রামে গত ৩১ অক্টোবর ত্রিপুরা কগবরক লেখক গোষ্ঠীর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন দেবেন্দ্র দেববর্মা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরেন্দ্র দেববর্মা। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার উপশিক্ষামন্ত্রী শৈলেশচন্দ্র সোম। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—"এই সম্মেলন ত্রিপুরার সামনে এক মহান সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। উদ্যোক্তারা এবং যাঁরা এই অলিখিত ভাষার লিখিত রূপ

উদ্ভাবনে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরা এক বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক ধারা সৃষ্টি করলেন বলা যেতে পারে। এই ভাষা লিখিত রূপ পেয়ে আশা করি উপজাতি জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে।"

সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীমোহন চৌধুরী বলেন—"স্বাধীন ভারতে এই সর্বপ্রথম একটি ভাষা দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এই সম্মেলন মাধ্যমে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হবে। এইদিক থেকে সম্মেলনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রভাবও সারা ভারতে পড়বে বলে আশা করি।" বর্ণমালা নিয়ে সম্মেলনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা হয়। কেউ কেউ রোমান হরফে লিখিত রূপ দেবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এই যুক্তির বিপক্ষে কুমুদ চৌধুরী বলেন—"বর্ণমালাটা অলিখিত ভাষাকে লিখিত রূপ দেবার পক্ষে প্রধান সমস্যা নয়। রোমান হরফ বিজ্ঞান সম্মত হওয়া সত্ত্বেও কগবরক ভাষার লিখিত রূপে ব্যবহার করা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিচারে যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না।" বীরচন্দ্র দেববর্মা, নগেন্দ্র জামাতিয়া, অঘোর দেববর্মা, সুরেশ দেববর্মা, যোগেন্দ্র দেববর্মাও বাংলা লিপির সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে, ত্রিপুরার উপজাতিদের সঙ্গে বাংলাভাষার যোগাযোগ প্রায় দুইশত বৎসরের। রোমান লিপি ব্যবহার করতে গেলে সে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে বাংলা লিপি ব্যবহারের প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

সম্মেলনে একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে নগেন্দ্র জামাতিয়া, বীরচন্দ্র দেববর্মা, যোগেন্দ্র দেববর্মার নাম বিশেষ উল্লেখ্য। কগবরক ভাষায় একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্তও সম্মেলনে গৃহীত হয়। সারা ভারতে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। বহুজাতিক ও বহুভাষিক ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিসত্তার সার্বিক বিকাশ না হলে যে তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে, এ সত্য যাঁদের কাছে স্বীকৃত, তাঁদের কাছে এই সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রতীয়মান হবে।

বিদ্যাপতি সমারোহ পর্ব। গত ২০-২১ নভেম্বর পাটনার রাজেন্দ্র নগরে চেতনা সমিতির উদ্যোগে দুই দিবসব্যাপী সমারোহ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিহারের রাজ্যপাল প্রখ্যাত অসমিয়া কবি শ্রীদেবকান্ত বরুয়া। তিনি তাঁর ভাষণে বিদ্যাপতিকে ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—"বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, কবীর, সুরদাস ও শঙ্করদেবের রচনা ভারতের ভাব-সংহতিকে দৃঢ়তর করেছে।"

মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাঁড়ে মৈথিলী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন। বিদ্যাপতির কবি প্রতিভা সম্বন্ধে বহু বক্তা ভাষণ দেন।

সতীনাথ ভাদুড়ি স্মরণসভা॥ গত ২২ নভেম্বর পাটনার রবীন্দ্রভবনে বাংলার বিশিষ্ট লেখক স্বর্গত সতীনাথ ভাদুড়ির স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সুপরিচিত প্রকাশন সংস্থা "ভারতী ভবন" সতীনাথ স্মারক গ্রন্থ—প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল শ্রী বরুয়া একটি উল্লেখ্য ভাষণে সতীনাথ ভাদুড়ির সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বলেন—"গত শতকের মধ্যভাগে একজন মহান বাঙালী দার্শনিক বলেছিলেন যে উত্তর গাঙ্গেয় সমতলভূমির মাটিতে এমন এক রহস্য আছে, যেখান থেকে আপনা আপনি গত চার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন চিন্তাবিদের জন্ম হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিভাধরদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, এই মাটি থেকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ি, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের জন্ম দিয়েছে। ডুমকায় বসেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন।"

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ মান্নান তাঁর ভাষণে সতীনাথ ভাদুড়ির সাহিত্যিক কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বলেন—"ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সতীনাথের 'জাগরী' উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান এবং কিছুটা প্রভাবিতও হন। পরে তাঁর ছাত্ররাও সতীনাথের উপর গবেষণা করতে এগিয়ে আসেন।" অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং স্মারকগ্রন্থটির সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়ও সভায় ভাষণ দেন। তিনি পূর্ণিয়ায় সতীনাথ ভাদুড়ির নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। হিন্দী লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণু বলেন যে, পরাধীনতার সময়ে ভাগলপুর জেলে বসে যখন সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' রচনা করেন, তখন তার পাণ্ডুলিপি পড়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। শ্রীমতী বাণী রায়, রঙ্গীন হালদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন।

কলকাতায় রুমানিয়ার কবি॥ রুমানিয়ার বিশিষ্ট কবি ও লেখকসঙ্ঘের অন্যতম সদস্য মাটেই কালিনেস্কু এবং লুসিয়ান রাইকু সম্প্রতি কলকাতা এসেছিলেন। গত ২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় 'সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলনে'র উদ্যোগে ১০, হিন্দুস্থান রোডে এক ঘরোয়া সভায় বাংলার বিশিষ্ট কবি লেখকদের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সতীকান্ত গুহ। তিনি অতিথি কবিদের সঙ্গে উপস্থিত কবি লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

রুমানিয়ান ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা অনুষ্ঠানটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীমতী লীলা রায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী কবিতা সিংহ, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এইসব আলোচনা থেকে জানা যায়, রুমানিয়ান সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হল কবিতা। কবিতার বইয়ের সাধারণতঃ প্রথম মুদ্রণ হয় ১০ হাজার কপি।

উপস্থিত সকলের অনুরোধে মূল রুমানিয়ান ভাষায় কবিতা পাঠ করেন মাটেই কালিনেস্কু। বাঙালী কবিদের মধ্যে স্বরচিত কবিতা পড়েন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীকান্ত গুহ, কবিতা সিংহ, আশিস সান্যাল ও শুভ মুখোপাধ্যায়।

সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার॥ এবার সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কারে সম্মানীত হয়েছেন বাংলার বিশিষ্ট কবি গোলাম কুদ্দুস। তাঁর এই সম্মানে সাহিত্য রসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন বলে আশা করি। এক সময়ে তাঁর 'ইলা মিত্র' কাব্যগ্রন্থ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই কবিতাটি সম্বন্ধে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—"ইলা মিত্রকে তখনও আমি দেখিনি। আলাপ হল তাঁর স্বামী রমেন মিত্রের সঙ্গে। রমেনবাবুর বিমর্ষ চেহারা এবং স্ত্রীর দুরবস্থায় কাতর মূর্তি আমাকে চঞ্চল করে তুললো। অনেককে বললাম, এর উপর লিখতে। এই সময় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হল, নোয়াখালির ধর্ষিতা মেয়েদের যেন আর সমাজে নেওয়া না হয়। যন্ত্রণায় মন আরো অস্থির হল। ঠিক এই সময়ে 'শ্রী' সিনেমা হলে বিশ্ব যুব উৎসবের একটি তথ্যচিত্র দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে বর্ণিত স্টেডিয়ামে সারা পৃথিবীর সকল দেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে দেখলাম। তখনই স্থির করলাম, এমন কিছু লিখতে হবে, যা অত্যাচারীকে কাঁপিয়ে দেয়। আর স্থির করলাম, ইলা মিত্র হবে তার প্রতীক। এইভাবেই একদিন রচিত হল কবিতাটি। এই কবিতাতেই তিনি লিখেছিলেন—

> "ইলা মিত্র রাজসাহী জেলে,
> স্বামী তার শান্ত ঋজু, দৃঢ়,
> ফেরারী এখনো পাকিস্থানে।"

গোলাম কুদ্দুসের অপর কৃতিত্ব 'রিপোর্টাজ' রচনা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর

এই 'রিপোর্টাজ'গুলি চিরকাল লিখিত থাকবে। তিনি সাহিত্য রচনায় এখনও সক্রিয়। তাই তাঁর কাছে আমাদের আশা অনেক।

প্রবীণা লেখিকাদের সম্বর্ধনা। গত ২৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় রবীন্দ্রসদনে ইউনির্ভাসিটি উইমেনস এসোসিয়েশন ও সাহিত্যিকার যুগ্ম উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ছ'জন প্রবীণা সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জানান হয়। যে ছ'জন সাহিত্যিকাকে সম্বর্ধনা জানান হয়, তাঁরা হলেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী ও গিরিবালা দেবী। এঁদের সম্বর্ধনা জানিয়ে উদ্যোক্তারা একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন বলা যেতে পারে।

এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তিনি তাঁর ভাষণে মহিলা সাহিত্যিকদের কয়েকটি মৌল সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণ অভিযোগ যে, তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সমাজে মেয়েদের যে স্থান তাতেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সমস্ত সমাজটাই যেন তাঁদের গুরুজন। অদৃশ্য দড়িতে তাঁদের হাত-পা বাঁধা। অথচ সৃষ্টির জন্য চাই মুক্ত পরিবেশ। তিনি প্রসঙ্গতঃ শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহিলা সাহিত্যিকদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক পাঠ করেন ডঃ রমা চৌধুরী। এরপর ছ'জন লেখিকাকে দু'টি মনোজ্ঞভাষণে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় পড়লেন পুণ্যলতা চক্রবর্তীর উপর রচনাটি। গৌরী আইয়ুব পরিচয় করিয়ে দিলেন শান্তা দেবীকে, কল্যাণী দত্ত পড়লেন শৈলবালা ঘোষ-জায়ার উপর রচনাটি। সন্ধ্যা ভাদুড়ি গিরিবালা দেবীকে পরিচয় করাতে গিয়ে স্মরণ করলেন তাঁর আশ্চর্য গল্পের কথা। ডঃ তপতী রায় এবং মহাশ্বেতা দেবী যথাক্রমে পরিচয় করিয়ে দিলেন সীতাদেবী ও জ্যোতির্ময়ী দেবীকে। প্রতিটি রচনাই স্মরণ করার মত। সম্বর্ধনার উত্তরে পুণ্যলতা চক্রবর্তী বলেন—"বয়সে আমি প্রবীণা হলেও লেখিকা হিসেবে আমার স্থান সকলের উপরে নয়।" তাঁর এই বিনয়াবত উচ্চারণ সকলকে মুগ্ধ করে। শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর সমকালীন যুগের কথা উল্লেখ করে বলেন—"তাঁদের যুগ ছিল স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী। আজ তা কেটে গেছে।" তিনি নতুন যুগের লেখিকাদের এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানান। সীতা দেবী বলেন—"আমাদের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনই ছিল না। তবু তখন পুরুষদের পাশে অনেক স্ত্রী-সাহিত্যিককে দেখা যেত। অথচ একালে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও লেখিকার সংখ্যা কম।" শান্তা দেবীর বক্তব্য পাঠ করেন তাঁর কন্যা।

অনুষ্ঠানে আশাপূর্ণা দেবী, রাধারাণী দেবী ও গীতা মুখোপাধ্যায়ও ভাষণ দেন। কবিতা পাঠ করেন ডঃ উমা রায়।

চট্টজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ-বিচিত্রা, শ্রীকান্ত ৩য়, ৪র্থ (খণ্ড) / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আরোগ্য নিকেতন / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
জাগরী, সতীনাথ-বিচিত্রা, দিগ্‌ভ্রান্ত / সতীনাথ ভাদুড়ী
কথা-চরিত মানস / বিমল মিত্র
ন্যায়দণ্ড, লৌহকপাট (৩য় খণ্ড) / জরাসন্ধ
মন্দাক্রান্তা / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বলাকার মন, আবার আমি আসব /
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বরযাত্রী, রূপ হ'ল অভিশাপ / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পুতুল নাচের ইতিকথা / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জেনানা ফাটক / রাণী চন্দ
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে / সুরেশচন্দ্র সাহা
কালজাক / যজ্ঞেশ্বর রায়
মানব কল্যাণে রসায়ন / দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
নাগচম্পা / নারায়ণ সান্যাল
রুদ্ধ দ্বারের / গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সমুদ্রের চূড়া / গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রাশিয়ার ডায়েরী / প্রবোধকুমার সান্যাল
ঘাসের আকাশ / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দিগন্তের রং / গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রকাশ ভবন /

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Regd. C 208 Rs. 2·00 Dec., 1972 Agrahayan 137[illegible] B.S.

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা//

কালি ও কলম-এর নিয়মাবলী

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

সাধারণ সংখ্যার দাম '৭৫ পয়সা।

গ্রাহকদের ছ'মাসের জন্য ৪'৫০ ও এক বছরের জন্য ৯'০০ দিতে হয়। মনি অর্ডারে অগ্রিম মূল্য পাঠালে সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। ডাকের গোলযোগে কোন সংখ্যা নিরুদ্দিষ্ট হলে আমরা দায়ী নই। রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠাতে হ'লে পৃথক খরচ দিতে হয়।

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

রচনার নকল রেখে পাঠানো নিয়ম। সঙ্গে ডাক টিকিট থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না। রচনা পাঠাবার ছ'মাসের মধ্যে যদি প্রকাশিত না হয় তখন সংবাদ নেবেন। তাহার পূর্বে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত জানান সম্ভব নয়। পত্রের উত্তর পেতে হ'লে সঙ্গে ডাক টিকিট থাকা দরকার।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

কমপক্ষে পাঁচখানি পত্রিকা নিতে হবে।

পাঁচ টাকা আমাদের কাছে জমা থাকবে।

কাগজ ভি. পি. ডাকে পাঠানো হবে।

কোন সংখ্যা ফেরত এলে জমা টাকা থেকে ডাকব্যয় বাদ যাবে এবং একাধিকবার ফেরত এলে এজেন্সী বাতিল হয়ে যাবে।

অন্ততঃ দশখানি নিলে ডাকব্যয় বহন করা হবে।

সিজার্স
সব সময়
তৃপ্তি দেয়
পূজোয়
অথবা যেকোন দিন
তৃপ্তিতে
সিজার্স
তুলনাহীন
W.D. & H.O. WILLS
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
SCISSORS
S 5289-1

চতুর্থ বর্ষ : পৌষ : ১৩৭৭

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক

সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : শুভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

॥ চতুর্থ বর্ষ ॥
॥ পঞ্চম সংখ্যা ॥
॥ পৌষ, ১৩৭৭ ॥

আমাদের কথা

কবিরা যতো উপেক্ষাই করুন, বাংলা প্রবচনেই প্রকাশ পৌষমাস বাংলা দেশে এক আনন্দের কাল। ক্রান্তীয় অঞ্চলে শীতের সময় আরামপ্রদ নিঃসন্দেহে; কিন্তু, বাংলাদেশে এই পৌষমাসটি ধন-ধান্য-মিষ্ট-ভরা। শীতের আমেজ, খাদ্যের প্রাচুর্য ও সুলভতা, প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতা এ-সময়ে মানুষকে এক অপার আনন্দলোকে পৌছে দেয়। স্বল্পকালের হলেও তা অনন্তের আস্বাদ যোগায়। অবশ্য, শীতের প্রকোপে দুঃস্থ নরনারীর কষ্টভোগ কিছুটা বর্ধিত হলেও, মোটামুটি সকলেই এ-সময়ে কিছুটা শারীরিক ও মানসিক বিলাসের মধ্যে কাল কাটায়। তাই, এ-সময়ে বাংলাদেশে, বিশেষ, কলকাতা শহরে, আনন্দের হাট বসে। এইটেই বিগত দীর্ঘকাল নিয়ম হয়ে এসেছে যেন।

কিন্তু, এবারের পৌষ মাস বাংলাদেশে তেমন উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারেনি। কেন পারেনি, তার কারণ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। কলকাতা শহর তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক নারকীয় হত্যালীলা চলছে বেশ কিছুদিন যাবৎ যা প্রতিটি মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত করে তুলেছে। চতুর্দিকের অশান্তি, উদ্বেলতা, অনিশ্চয়তা মানুষের সমস্ত শান্তি ও স্বস্তিকে বিঘ্নিত করেছে। মানুষ আজ উদ্‌ভ্রান্ত, নিরাপত্তার অভাবে দিশেহারা।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ডামাডোলে বাংলাদেশের জনজীবন দীর্ঘদিন থেকেই এক চরম দুঃখ ও অব্যবস্থার মধ্যে নিমজ্জমান। রাজনৈতিক অস্থিরতা সে দুঃখ ও অশান্তির মাত্রাকে শতগুণে বর্ধিত করেছে। কিন্তু, সব ছাপিয়ে, আজকের বাতাসে যে দাঙ্গা, মারামারি ও হত্যার পুতিগন্ধ তার বোধ করি তুলনা মেলা ভার। কোন বিধাতার অমোঘ বিধানে এহেন পরিস্থিতি, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু, এ-পরিবেশ যে আর এক মুহূর্তও সহনীয় নয়, তা স্পষ্ট করে বলতে আমাদের এতোটুকু দ্বিধা নেই। কবে এর হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ—তা কে বলবে! বাংলাদেশ কি এই পারস্পরিক অবিশ্বাসে, এই ভয়ংকর অস্থিরতায়, এই পাশব হত্যালীলায় দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থাকবে? না কি প্রলয়ের পর মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্রস্নানের দিন দূরাগত নয়?

এই অস্থিরতার মধ্যে সাহিত্যের স্থান কোথায়? আমাদের বিশ্বাস সাহিত্য,—একমাত্র সাহিত্যই—বাঙ্গালীকে এই ভয়াবহ পরিবেশ অতিক্রম করার প্রেরণা দিতে পারে, পথ দেখাতে পারে পরিত্রাণের। সৎ সাহিত্য —যা তাৎক্ষণিক বিলাস অথবা কণ্ডুয়নের সামগ্রী নয়, যা কালজয়ী, যা যুগে যুগে বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের হাতে আলোকবর্তিকা তুলে দিয়েছে,—সমস্ত হতাশা, বিভ্রান্তি, অস্থিরতার উপশম ঘটিয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক মানবিক-বোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, নির্দেশ দিতে পারে কী শ্রেয় আর প্রেয়, কোনটা সৎ, চিৎ এবং আনন্দ।

'কালি ও কলম' আশা করে, সৎ সাহিত্যিকেরা—প্রকৃত মানবপ্রেমীরা—জীবনের জয়গান কণ্ঠে নিয়ে আজকের এই অশুভ পরিবেশে মাঙ্গলিকের বার্তা ছড়িয়ে দেবেন এই হতভাগ্য রাজ্যের সর্বত্র, এ-রাজ্যের সকল অধিবাসীর কর্ণপটে, যাতে হতাশার স্থানে আসে আশা, অস্থিরতার পরিবর্তে স্থৈর্য, বিভ্রান্তির রাজ্যে সুস্থতা ও ন্যায়বোধ, হত্যার পরিবর্তে জীবন।

অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'কালি ও কলম' প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিসংখ্যারূপে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আমাদের ধারণা ছিল না যে আজকের এই অস্বাভাবিক পরিবেশে, যখন সাহিত্যপত্র ও সাহিত্য-প্রকাশনের প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে, সে-সময় কোনো পত্রিকার চাহিদা এতো বিপুল হতে পারে। অসংখ্য সাহিত্যানুরাগী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-অনুরাগীকে তাই আমাদের, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই, নিরাশ করতে হয়েছে। তাঁদের কাছে আমরা লজ্জিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই ভেবে আনন্দিত যে বাংলাদেশ মরেনি, তার প্রাণ-ধর্ম এখনও নিঃশেষ নয়, এবং জীবনের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুরাগ এখনও অটল। কারণ, সাহিত্য জীবনেরই আরেক প্রকাশ; আর সেই জীবনেরই প্রকৃত শিল্পী ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র সমালোচনার পথিকৃৎ : সুখরঞ্জন রায়

—বার্ণিক রায়

১

সুখরঞ্জন রায় (১৮৮৯-১৯৬৪) রচিত 'আকাশ প্রদীপ' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৬৭) ভূমিকায় ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন সমর্থন আবশ্যক হয়নি বটে, তবে তাঁর প্রথম বিশিষ্ট সমর্থক ও সমালোচকেরা সকলেই তরুণ ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিলে থাকেন দুজন তরুণ অধ্যাপক—অজিত কুমার চক্রবর্তী ও সুখরঞ্জন রায়···। এই দুজনেই রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনার পথ খুলে দেন ও সে সমালোচনাকে বৈদগ্ধ্যের পথে পরিচালিত করেন।···অজিত কুমার ও সুখরঞ্জন দুজনে রবীন্দ্র সাহিত্যপত্রের দুটি পৃষ্ঠা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং দুজনে মিলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্মের মোটামুটি সমগ্র পরিচয় দিয়েছিলেন। অজিতকুমারের আলোচনার বিষয় ছিল কবিতা ও নাটক, সুখরঞ্জনের আলোচনার বিষয় ছিল তখন উপন্যাস ও গল্প।··"

সুখরঞ্জন রায়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্প সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি মন্তব্য হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা কোথাও নেই। আর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে পুস্তকালোচনা ছাড়া কোনো বইয়ের রসগ্রাহী আলোচনা ছিল না বললেই চলে। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্পের ওপর সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা সুখরঞ্জন রায়ই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় করেছিলেন। "কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সুখরঞ্জনের বয়স তখন বাইশ তেইশ, সেই বছরেই ইংরেজি সাহিত্যে তিনি এম্. এ. পাশ করেন। সুতরাং এই আলোচনার মধ্যে তরুণ যুবার মানসিকতার সঙ্গে তাঁর অধীত বিদ্যার মিশ্রণ যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে কবিজনোচিত দৃষ্টি-ভঙ্গি। লেখক কিভাবে চিন্তা করেছেন, কোন্ চিন্তা ও ভাবের বীজ থেকে কাহিনী চরিত্র ঘটনা পল্লবিত হয়েছে, সুখরঞ্জনের কৃতিত্ব তিনি সেই উৎসে পৌঁছে তার রহস্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

"কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি ১৩১৮ সালের আশ্বিন থেকে ১৩১৯ সালের আষাঢ় পর্যন্ত 'প্রতিভা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' এই চারটি উপন্যাসের বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। 'করুণা' সম্বন্ধে হয়তো সুখরঞ্জন তখন অবহিত ছিলেন না, তাই তার আলোচনা এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'গোরা' উপন্যাস ১৯১৬ সালেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সুখরঞ্জন এই মহাকাব্যোচিত উপন্যাসটির আলোচনা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে করেন নি। অথচ পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবন্ধে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে তিনি যথার্থ মন্তব্য করেছেন। এই বিরোধের একমাত্র কারণ তখনকার রবীন্দ্র-বিরোধী আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার উঠেছিল, বিভিন্ন পত্রিকায় তার নজির আছে। রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত মূল্য দিয়েছিলেন বলে সুখরঞ্জনকে নিন্দিত ও ভর্ৎসিত হতে হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩১৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বলেছিলেন : "...শ্রীসুখরঞ্জন রায়ের 'কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি নামক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিরাট বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। কবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা অনুমান করা অসাধ্য। সমালোচনার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় 'হাতের চেয়ে আম বড়' হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধের ভাষাটিও কঙ্করবৎ কঠিন, চর্বনের চেষ্টা করিলেও দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।... বাঙলা ভাষারূপ লাওয়ারিস ময়দাকে পদদলিত করা আজকাল এই শ্রেণীর নবীন লেখকদের উৎকৃষ্ট ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে।"

শুধু রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠির কাছ থেকেই এই ভর্ৎসনা পাননি, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রপন্থী সমালোচকদের ঈর্ষার আগুনেও তাঁকে দগ্ধ হতে হয়েছিল। যে কারণে অভিমানে বিরক্তিতে পরে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, আত্মনির্বাসনে বাস করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ সুখরঞ্জনই পারতেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির যথার্থ ব্যাপক তুলনামূলক ও ধারাবাহিক আলোচনা করতে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি তা করেন নি। তথাপি যেটুকু করেছেন তাতেই তাঁর কৃতিত্ব কিছুতেই মুছে যাবার নয়। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি আমাদের অবহেলার জন্য, সুখরঞ্জনের প্রচার যন্ত্রের অভাবের জন্য এবং ঐ সব প্রবন্ধ পুস্তকাকারের গ্রথিত না হবার জন্যে পাঠকের কাছে তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে পারেনি। সুখরঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত, কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্বে রচিত একটি প্রবন্ধে সুখরঞ্জন স্পষ্টতঃ তাঁর এই কৃতিত্বের

কথা সচেতনভাবে স্বীকার করেছেন। "কয়েক বৎসর কলিকাতায় থেকে এটুকু বুঝলুম, অন্ততঃ সাহিত্যের যারা সামান্যতম ধারও ধারে তাদের কাছে কবি রবীন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু কথা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তখনও তাঁর ন্যায্য সম্মানটি পাননি। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভা'য় তখন "কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" নাম দিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। কবি সম্বন্ধে, অন্ততঃ তাঁর কথাসাহিত্য সম্বন্ধে, এত বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে কেউ করেছেন বলে জানিনা।...'প্রতিভা'য় প্রথম প্রবন্ধ ছাপা হবার কয়েকদিন পর চারুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়। চারুবাবু উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলেন—রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং আপনাকে 'প্রবাসীর সমালোচন বিভাগে ডেকে আনতে বললেন। সেই প্রবন্ধের সারাংশ 'প্রবাসী'র 'কষ্টি পাথ'রে বের হয়েছিল। তারপরেই 'জ্যোতিঃ-পিপাসু' এই ছদ্মনামে 'প্রবাসী'তে পুস্তক সমালোচনা শুরু করি।..." রবীন্দ্র স্মরণে। কথাসাহিত্য, ১৩৭২, বৈশাখ। সুখের কথা সুখরঞ্জনের এই কথায় তাঁর পরবর্তী সমালোচকেরা কর্ণপাত করেন নি।

দুই

রবীন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যের হেতু স্মৃতি অনেকটা অবস্থার ফেরেই হারিয়ে বসে ছিলেন, তাই ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হরপ্রসাদ মিত্রের লেখা 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ চমৎকৃত হয়েছিলেন। অনেকের ধারণা 'গল্পগুচ্ছ' সম্বন্ধে ওটাই প্রথম রচনা। এর পরে অনেকে প্রচার করেছেন যে ১৯৩১ সালে সপ্ততিতম রবীন্দ্র জন্মতিথি উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদ থেকে প্রকাশিত কবি পরিচিত স্মারক গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' নামে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ। কিন্তু এগুলি না জানার জন্যে। এরও বহু আগে ১৩২৩ (১৯১৬) সালের বৈশাখ মাসে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আলোকপন্থা ও কথাসাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধে সুখরঞ্জন ছোটগল্পের আলোচনা শুরু করেন। এরও পূর্বে ১৩২২ (১৯১৫) সালের ফাল্গুন মাসে 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর পর ১৩২৩ সালের মাঘ মাসে 'প্রতিভা' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রীয় কথা-সাহিত্যে কল্পপন্থা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার ১৩২৪, চৈত্র ও ১৩২৫, বৈশাখ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রীয় কথা-

সাহিত্যে আলোকপন্থা', ১৩২৮, শ্রাবণ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রপূর্ব বঙ্গসাহিত্যে বস্তুপন্থা, ১৩২৮, ভাদ্র-সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও বস্তুপন্থা,' ১৩২৮, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বস্তুপন্থা', প্রবাসী'র ১৩২৭, পৌষ-সংখ্যায় 'আলোকপন্থায় পো ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ভারতী'র ১৩২৯ কার্তিক-সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে শ্রেয়ঃ পন্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সুতরাং ১৩২২ সালে 'ছোটগল্প' এবং ১৩২৩ সালে 'আলোকপন্থা ও কথাসাহিত্যের ধারা' এই দুটি প্রবন্ধ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আলোচনার প্রস্তুতি করেন, শেষ করেন ১৩২৯ সালে। কাজেই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনেরো ষোল বছর আগেই সুখরঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে গেছেন। এর আগে এমনভাবে বিস্তৃত আলোচনা কেউ করেছেন কিনা জানিনা। তবে ১৮৯১-৯২ সাল থেকেই পত্র পত্রিকায় মন্তব্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিচার চলে আসছিল। শশাঙ্ক মোহন সেন ১৩১২ সালে 'বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে গিয়ে ছোটগল্পের ওপর মন্তব্য করেছেন, পরবর্তী আলোচনায় তা বিশেষ উপযোগী : "এই ক্ষেত্রেও (ছোট গল্পে) রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি উপন্যাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্ব দর্শনে বিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে ও মানব চরিত্রের অধ্যয়নের ফলে তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এ সমস্ত গল্পে বঙ্গ ভাষার শক্তি ও গতি বুঝিতে পারা যায়।" গল্পের বাস্তবতা সম্বন্ধে ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে বিপিনচন্দ্র পালের 'বঙ্গদর্শনে' মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : "রবীন্দ্রনাথ শতরঞ্চ গালিচা মণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদ কক্ষে বসিয়া মানসচক্ষে কর্দম মর্দিত পিচ্ছিল পথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কণ বপু, সুমার্জিত রুচি, স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া সুদূর দরিদ্র পল্লীর শুষ্কদেহ রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।"

এ সমস্ত আলোচনা সুখরঞ্জন রায় প্রত্যক্ষভাবে জেনেছিলেন এ অনুমান করিনা। কিন্তু রবীন্দ্রালোচনার প্রতিবেশে তাঁর মনের মধ্যে যে ভাবাবেগ স্পন্দিত হয়েছে তার সাহায্যেই এই আলোচনায় তিনি ব্রতী হয়েছেন। এবং আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আলোচনায় তিনি ছোটগল্পের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিকও আলোচনা করেছেন। ছোটগল্পের এই বিস্তৃত পরিপূর্ণ তুলনামূলক সামগ্রিক তাত্ত্বিক আলোচনা বাংলা দেশে

একেবারে বিরল। সেই দিক থেকে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অত্যধিক। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা দেশে ছোটগল্পের তাত্ত্বিক আলোচনা করেন ১৮৯১ সালে 'বর্ষা যাপন' কবিতাটির মধ্য দিয়ে, এর পরে 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ছোটগল্প সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা। কিন্তু এই সব আলোচনা কোনোটাই পূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরেই সুখরঞ্জনের আলোচনার নাম করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে ছোটগল্প সম্বন্ধে সুখরঞ্জনের সংজ্ঞা উদ্ধার করা যেতে পারে : 'অবাস্তব ও অসম্ভব উপায়ে নীতি প্রচার ও শিক্ষাদান চেষ্টাই প্রাচীন গল্পের লক্ষণ, গৃহ সংসারের বস্তুচিত্র এবং মন ও হৃদয়লোকের কল্পচিত্রের সাহায্যে পাঠকগণকে আনন্দদানই হইয়াছে আধুনিক ছোটগল্পের লক্ষণ।"

ছোটগল্প সম্বন্ধে বর্তমানে যে সব গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা সুখরঞ্জনের আলোচনাকে অতিক্রম করতে পারে নি। তথাপি কোনো আলোচকই সুখরঞ্জনের নাম করেন নি। হয়তো তাঁদের আলোচনার মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়েই।

তিন

রবীন্দ্রকাব্যের ও নাটকের আলোচনা সুখরঞ্জন রায় করেছেন অনেক পরে, ১৩৪০ সাল থেকে। 'মহামানব রবীন্দ্রনাথ', 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুইরূপ', 'নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ', 'পৃথিবীর পূর্ণতম মানব রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ১৩৪০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'বিচিত্রা' ও 'দেশে' প্রকাশিত হয়। 'মহাসমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ : সেদিনের চোখে', প্রবন্ধগুলি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ১৩৭১ সালে 'হোমশিখা' ও 'অমৃতে' এবং Rabindranath—A Perfection Incarnate প্রবন্ধটি ১৩৭৬ সালে 'Bengali Leterature'—এ প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলির মধ্যে সুখরঞ্জনের মৌলিকত্ব তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্বন্ধে আলোচনার তুলনায় কম। ১৯১১ (১৩১৮) সালে অজিত চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচনার যে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন, সুখরঞ্জন তাকেই গ্রহণ করেছেন, অজিত চক্রবর্তীর মতো তিনিও বলেন : "কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজিত করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা।' অজিত চক্রবর্তীর আলোচনার ধারা পরবর্তীকালে কাজি আবদুল ওদুদ

(১৩৩৪), বিশ্বপতি চৌধুরী (১৩৩৭), প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতির আলোচনায় অনুসৃত হয়েছে। সুখরঞ্জন রায় রবীন্দ্রকাব্যের ভাষাগত উপাদানের দিকটা বিশ্লেষণ করেন নি, স্তরবিন্যাস্ করেন নি, তিনি অজিতকুমারের মতোই রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য ও ধারাটিকে বিভিন্ন রচনার মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈচিত্র্যে বিস্ময়াভূত হয়েছেন ; কয়েকস্থানে বিশ্বসাহিত্যের তুলনায় রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যও দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সুখরঞ্জনের কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের আলোচনার মধ্যে এই কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়—(১) ব্যক্তিগত জীবনে নারী প্রেম সৌন্দর্য কিভাবে সৌন্দর্যলক্ষ্মী মানসসুন্দরী হয়ে জীবন দেবতার স্তর পেরিয়ে বিশ্বদেবতায় উন্নীত হয়েছে, (২) মানব ধারা কিভাবে বিশ্বজীবনবোধে পরিণতি লাভ করেছে, (৩) শ্রেয়বোধ ও প্রেয়বোধ কিভাবে রবীন্দ্রভাবনায় যুগপৎ সক্রিয় থেকেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যের আলোচনা করেন নি, কিন্তু পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত। এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ঋষিত্ব ও কবিত্ব এক সঙ্গে দেখা দিয়েছ, যা পৃথিবীর অন্য কোনো কবির মধ্যে দেখা যায় নি, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-মঙ্গলের 'নমস্কার' কবিতায় এ ঘোষণা প্রথম সুখরঞ্জন রায়ই করেছিলেন।

তবু একথা আমরা বলবো, উপন্যাস ও ছোটগল্পের আলোচনায়ই সুখরঞ্জন ভগীরথের মতো কাজ করেছিলেন। উপন্যাসের আলোচনায় তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক তেমন আলোচনা করেননি, যে আলোচনা তাঁর পরে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে করেছেন। কিন্তু ছোটগল্পের আলোচনায় তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক ও উৎস সন্ধান এতো সুনিপুণভাবে সুখরঞ্জনের পরেও বাংলা সাহিত্যে তেমন কেউ করেননি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি-সাহিত্যে উপন্যাসের আলোচনার রীতি গ্রহণ করে বঙ্গসাহিত্যের ওপর তার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের ইতিহাসের আলোচনা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃত-সাহিত্যকেন্দ্রিক। কিন্তু সুখরঞ্জন রায় সেখানে তুলনামূলকভাবে বিশ্ব সাহিত্যের উপন্যাসের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। আর একটি বিষয়ও মনে রাখতে হবে, সুখরঞ্জন রায় কবি বলেই তাঁর আলোচনায় কবিজনোচিত সংশ্লেষণিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়েছে তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে, যা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে নেই। কিন্তু দুজনেই চরিত্ররীতির আলোচনায় একই পথে এগিয়েছেন।

চার

সুখরঞ্জনের রচনার প্রধান গুণ হচ্ছে তাঁর রচনায় কবিত্বগুণের সঙ্গে বিশ্লেষণধর্মিতা একত্র মিশেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনার পরিণতি, চরিত্র সংঘাত, লেখকের জীবনদর্শন প্রভৃতি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের বিশেষ চরিত্র পরবর্তী উপন্যাসে কেমন ভাবে রূপান্তরিত ও পরিণত হয়েছে, তার ইতিহাসগত দিকটাও তুলে ধরেছেন। এই রীতি পরবর্তীকালে প্রমথনাথ বিশীর আলোচনায় দেখতে পাই। শুধু উপন্যাস নয়, নাটক ও গল্প থেকেও বিশেষ চরিত্র কেমন ভাবে নূতন রূপ নিয়েছে সুখরঞ্জন তারও আলোচনা করেছেন, এই সঙ্গে বঙ্কিমের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যে জটিল এবং আধুনিক মনের বিশেষ উপযোগী তার কথাও বলেছেন। অন্যদিকে তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে উপন্যাস বা ছোট গল্পের আলোচনায় সাহিত্যের বিশেষ মনোভঙ্গিগুলি বিশ্লেষণ করে তার আলোকে গল্প বা উপন্যাসের বিচার করা। ফলে কোথাও কোনো ঝাপ্‌সা দৃষ্টি বা কথা নেই। সুখরঞ্জন রায় নিজে কবি ছিলেন, কবিদের একটা বিশেষ গুণই হচ্ছে সমালোচ্য বস্তুর মর্মমূলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন, 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছেদের বেদনায় সমস্ত চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মন আধ্যাত্মিক মিলনে উৎসুক। তাই সমগ্র চরিত্রই মিলনে বাঁধা পড়েছে। রমেশের বিচ্ছেদের মধ্যেও কোথায় এক সান্ত্বনা লুকিয়ে আছে, সেটা মুক্তির। সুখরঞ্জন রায় বলেছেন : " 'নৌকাডুবি'র যুগ রবীন্দ্রনাথের হিন্দু সমাজ সমর্থনেরই যুগ, দেশের প্রাণের মাঝে তখন তিনি আনন্দনিকেতন খোঁজেন, স্বদেশের তুচ্ছতাকেও তখন তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন। সেই সময়কার প্রবন্ধাবলীর রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের উপন্যাস 'নৌকাডুবি'তেও বর্তমান।" 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র রচনাশৈলীর পার্থক্য সম্বন্ধে বলেছেন : " 'চোখের বালি' আগাগোড়া metaphysical, ইহার ঘটনাবলী হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিলেও ইহার সমস্ত ব্যাপারকেই আমরা গ্রন্থকারের মনের ভিতর দিয়াই দেখি, ইহাতে যেন গ্রন্থকার নিজেকেই ভাঙিয়া চুরিয়া আনিয়া বাহিরে আঁকিয়াছেন। 'নৌকাডুবি'তে এই স্বাঙ্কন (self painting) নাই তাহা নহে, তবে ইহাতে প্রত্যক্ষ বহির্জগতের ছবিও বিস্তর আছে।" 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের নাম করণের ত্রুটি দেখিয়ে গ্রন্থের শেষে রমেশের পরিবর্তে নলিনাক্ষের আধিপত্য সম্বন্ধে সুখরঞ্জন রায় বলেছেন :

"প্রথমতঃ রমেশ ও হেমনলিনীর বিদায়ের বুকভরা আঘাত দিয়া নিরুপায় পাঠকের নিকট তিনি বিদায় লইতে চাহেন নাই ; দ্বিতীয়তঃ নলিনাক্ষকে দিয়া গ্রন্থ শেষ করাতে সমস্ত জগৎ ব্যাপারের যে 'সর্বশেষের গান' অবসানের সেই আধ্যাত্মিক সুরটি দিয়াই গ্রন্থের একটি কল্যাণময় পরিসমাপ্তি তিনি করিতে পারিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ কবি, সুতরাং তাঁর রচনায় বিশ্লেষক কল্পনা সক্রিয়, এই বিশ্লেষক কল্পনা জটিল রচনার অনুকূল, আর রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই নর-নারীর জীবনের বিশেষ বিস্ময়কর পরিস্থিতি কল্পনায় অনুভব করতে পেরেছেন, তাকেই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। এ সম্বন্ধে সুখরঞ্জন রায় বলেছেন, "'নৌকাডুবি'র আর একটি প্রধান বিশেষত্ব যাহা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে না পড়িয়া যায় না—ইহার অভিনব অবস্থা পরিকল্পনা (situation), পরস্ত্রী এবং পর-স্বামীর একত্র বাস এবং পর-স্বামীকে পরস্ত্রীর আপন স্বামী মনে করা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নবোন্মেষিণী কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" কিন্তু সর্বোপরি সুখরঞ্জন রায় তখনকার কালের ধারা অনুযায়ী চরিত্র বিশ্লেষণই যে নাটক উপন্যাসের মূল উপজীব্য সেই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনায় নেমেছেন, টেকনিকের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নি। এবং এ যুগের সমাজ-বাস্তবতার ধারাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

সুখরঞ্জন রায় ভারতী গোষ্ঠীর লেখক। ডঃ সুকুমার সেন ভারতী গোষ্ঠীর লেখকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছ'টি গুণ দেখতে পেয়েছেন, ছ'টি গুণের একটি গুণ হলো বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের গভীর সংযোগ। এই সংযোগ শুধু সাহিত্য রচনাতে নয়, সমালোচনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। সুখরঞ্জন রায় ভারতী গোষ্ঠীর কবি বলেই তাঁর রচনার মধ্যে তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলিও বিশেষ ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাস বস্তুটিই পাশ্চাত্ত্যের, এর আলোচনাও পাশ্চাত্ত্য রীতিতেই হওয়া দরকার। সেই রীতিই সুখরঞ্জন রায় গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বিদেশী সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিশদ বিশ্লেষণে নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছেন বেশী, মাঝে মাঝে স্কট, জর্জ এলিয়েট প্রভৃতির নাম এসেছে। কিন্তু ছোট গল্পের আলোচনায় সুখরঞ্জন রায় তাঁর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-অধ্যয়নের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন। 'আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় স্থাপন করা' এই মতে বিশ্বাসী হয়ে সুখরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য পর্যালোচনা করেছেন। ছোট গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলে নিয়েছেন :

"ছোট গল্পটা পাশ্চাত্ত্যের সৃষ্টি। এমন লোক আছেন যাঁরা এই কথা শুনিয়াই নাক সিটকাইতে আরম্ভ করিবেন এবং স্বদেশী সাহিত্যের চতুঃসীমানা হইতে এই বিদেশী রচনাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়া গঙ্গা জলের ছিটা সহযোগে কড়া পুরুতী পাহারায় নিযুক্ত হইবেন। বাংলা দেশে ছোট গল্পের বয়স পঁচিশের উপর গিয়াছে। এ বিদেশী 'কলম' হইলেও বাংলা দেশে তার শিকড় বসিয়া গিয়াছে; এখন তার ফুলে ফলে ফলিয়া উঠিবার দিন আসিয়াছে। এখন exotic বলিয়া গাল পাড়িলেও সে নড়িবার নামটি পর্যন্ত করিবে না।" এবং উপন্যাসের আলোচনায় তিনি যেমন চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাসের আলোচনা করেছেন, ছোট গল্প কোনো চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে না, ক্রম পরিণতি দেখায় না, মুহূর্তের ইম্‌প্রেশনই তার মুখ্য উপজীব্য। সুতরাং বিভিন্ন ইম্‌প্রেশন মিলে কি মনোভাব সৃষ্টি করেছে, সেটাকে জোটবদ্ধ করাই এখানকার রীতি। তাই ছোট গল্পের আলোচনায় গল্পগুলিকে সামাজিক, নৈসর্গিক, আলোকপন্থা, বস্তুপন্থা প্রভৃতি শ্রেণীভাগে বিভক্ত করে তিনি আলোচনা করেছেন।

কবিতা ও নাটকের আলোচনায় কাব্যের বিশ্লেষণের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়, অনুভূতি ও বক্তব্য কিভাবে সমগ্র রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তার আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা সাংশ্লেষনিক মনোভাবের।

সুখরঞ্জনের আলোচনার সঙ্গে একমাত্র সাদৃশ্য চোখে পড়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার। এই দুজনের ধারাই পরবর্তীকালে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের আলোচনায় দেখতে পাই। তবে নীহাররঞ্জন তাঁর আলোচনায় সামাজিক পটভূমিকা যুক্ত করেছেন। ছোটগল্পের আলোচনার সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনারীতির হুবহু মিল রয়েছে। ডঃ শিশিরকুমার দাশ সুখরঞ্জনের মন্তব্য বাংলা ছোটগল্প যে পাশ্চাত্ত্য থেকে এসেছে তা অস্বীকার করতে চাইছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্টিশীল লেখকের দাবি নিয়ে পূর্বসূরীর নাম না-ও উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু ডঃ শিশির দাশ তো বহু পত্র পত্রিকা ঘেঁটেছেন, সেখানে তিনি তাঁর বইয়ে সুখরঞ্জনের নাম কেন উল্লেখ করলেন না তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, বাংলা সাহিত্যে একদিকে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় অন্যদিকে তেমনি ছোটগল্পের আলোচনায়ও সুখরঞ্জনের নামকে এড়িয়ে গেলে সে আলোচনা হবে অসম্পূর্ণ এবং অজ্ঞতা দুষ্ট।

পাঁচ

মার্কসীয় দৃষ্টিতে উপন্যাসের সঙ্গে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া মনোভাবের যোগ ঘন নিবিড়। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া মনোভাব উদার মনোভাবের পরিচায়ক, সে সব কিছুই গ্রহণ করে, কোনো কিছুকেই বর্জন করে না। মুক্ত কল্পনাই তার চরিত্র ও ঘটনাকে বহুধা বিস্তৃতি দান করে। বস্তুর সঙ্গে মনের উদারতা মিলেই উপন্যাসের বিস্তৃতি, যাতে বুদ্ধি বা দার্শনিকতার একমুখীন সংকীর্ণতা নেই। স্বভাবতই উপন্যাসের সমালোচকও জীবনের বহুমুখীনতা এবং উদারতাকে স্বীকার করে নিয়ে তার বিচারে প্রবৃত্ত হবেন।

কিন্তু তাহলেও পৃথিবীতে দেখা যায় উপন্যাসকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার রূপগঠনে সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অধিকাংশ সমালোচক চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের বিচারে নিযুক্ত হয়েছেন। এটা একপেশে হলেও তাঁদের পক্ষে যুক্তি হলো, চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ধরা পড়ে এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের হৃদয়ের স্বরূপ ধরা পড়ে বেশি করে। কারণ চরিত্র যদি সার্থক হয় তাহলে তার অভিজ্ঞতার মধ্যে অবস্থা বা ঘটনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রসঙ্গ এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কাজেই কোনো চরিত্রের মূলীভূত সত্যকে জানতে অন্য চরিত্রের প্রাসঙ্গিক জ্ঞান আমাদের জানা দরকার। তাই চরিত্রের মূল শক্তি ও বাইরে অন্য চরিত্রের প্রসঙ্গ—দুটোকে ভালোভাবে জানাই হলো চরিত্রের বিশ্লেষণ। এদের মতে রিয়্যালিটি হচ্ছে বিশেষ একটা প্রসঙ্গের প্যাটার্ন, এই প্যাটার্ন সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, বুদ্‌বুদ্ তুলে এগিয়ে যায় অনবরত বিশ্বের দিকে। সুতরাং চরিত্রের মধ্যে সমাজ জড়িয়ে থাকে, ভালো কোনো চরিত্র নির্মাণের মানেই হলো সমাজের পরিপূর্ণ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা। বাংলা দেশে অন্ততঃ শরৎচন্দ্র এই সত্য স্বীকার করেছেন যে চরিত্র সৃষ্টিই উপন্যাসের মূল কথা। কারণ তিনি চরিত্রকে ঘটনার মধ্যে স্থাপিত করতেন। তবে ১৮৮০ সাল থেকে পরীক্ষামূলক উপন্যাসে রিয়্যালিটির যে নূতন রূপ দেখা দিয়েছে তাতে চরিত্রের চেয়ে আখ্যান ভাগ, স্টাইলের বহুবিধ প্রকাশ, চিত্রকল্প ও সংকেতের ব্যবহার, চেতনাপ্রবাহ প্রভৃতি এসেছে, আলোচনাও সেই মতে হয়, তবে রবীন্দ্রনাথে পাশ্চাত্ত্যের প্রথাগত উপন্যাসের চরিত্ররীতি গৃহীত।

সুখরঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্পের প্রথম ও সার্থক সমালোচক। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতে

উপন্যাসের আলোচনা হয়েছে। সেগুলি রসাস্বাদনের দিক থেকে কতখানি সার্থক তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে সমাজ বাস্তবতার ধারাকে লক্ষ্য করবার প্রবণতা তাঁদের আলোচনায় ধরা পড়ে। ১৯০৪ সালে ব্র্যাডলির বিখ্যাত গ্রন্থ 'শেক্‌সপিয়রিয়ান ট্রাজেডি' প্রকাশিত হয়। নাটকের আলোচনায় এ্যারিষ্টটলকে কেন্দ্র করে প্লটের আধিপত্য দেখানোই রীতি ছিল, ইনিই চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের আলোচনার ধারার সূত্রপাত করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার অন্তরালে হেগেলের ব্যক্তিকতা লুকিয়েছিল। বাংলা দেশে শেক্‌সপিয়রের সাহিত্যের পঠন পাঠনই বেশি সক্রিয়। বাঙালি ছাত্রেরা শেক্‌সপিয়রকে কেন্দ্র করে এই চরিত্রপ্রধান আলোচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন অবশ্যই। আমি এই মত দৃঢ় ভাবে পোষণ করি যে, ব্র্যাডলির পরেই সুখরঞ্জন রায় উপন্যাসের আলোচনায় এই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নেমেছিলেন। চরিত্র বিশ্লেষণের আগে লেখকের প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে তিনি সজাগ, এবং রসাস্বাদনে উৎসাহী, পরবর্তী উপন্যাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় সার্থক, কিন্তু মূল্য নিরূপণে তাঁর উৎসাহ ততটা তীব্র নয়। কিন্তু এগুলি থাকা সত্বেও উপন্যাসের আলোচনায় চরিত্রই তাঁর লক্ষ্য। সেগুলিই ক্রমান্বয়ে একের পর এক বিশ্লেষণ করেছেন। তবে ছোটগল্পের আলোচনায় বিষয়গত ও ভাবগত শ্রেণীভাগ করেছেন। সুখরঞ্জনের এই আলোচনার ধারা পরবর্তীকালে একমাত্র ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দেখতে পাই। উপন্যাসের আলোচনায় বিভিন্ন দিকের প্রতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সজাগ দৃষ্টি ও উন্মুখতা থাকা সত্বেও চরিত্রবিশ্লেষণই তাঁর আলোচনার মানদণ্ড রূপে গণ্য করেছিলেন, এবং ছোটগল্পের আলোচনায়ও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের শ্রেণীভাগ করেছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে কোনো আলোচনা তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে নি। সি. এস্‌. লুইসের মতো এঁরা দুজনেই উপন্যাসের আলোচনায় একথা বলতে পারেন :

It is better to study the changes in which the being of the Human Heart largely consists than to amuse ourselves which fictions about its immutability.

A Preface to Paradise Lost.

একদা স্বপ্ন

গজরাজ

ছবি আঁকা সহজ। আকাশ, নদী কিংবা পাহাড়; কিংবা একটি নারীর সুশ্রী সুন্দর মুখ; নিউর‍্যাল আর্ট; কিংবা পিকাসোর মতো ধোঁয়াটে অস্পষ্ট কয়েকটি রেখা, যে-ছবির বক্তব্য শিল্পীকে ঠিক করতে হয় না, শিল্প রসিকেরাই উদ্ভাবন করে। কিন্তু সম্পাদকের ফরমাশ মতো ছবি আঁকা সহজ নয়। অন্তত বাসুদেব তাই মনে করে।

একটি দ্বিমাসিক পত্রিকার সম্পাদক জনার্দন ত্রিপাঠী সেই অসম্ভব বায়না ধরেছেন। পত্রিকাটি ঋতুতে ঋতুতে প্রকাশিত হয়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত—সব কটি সংখ্যা পার কোরে দিয়েছে বাসুদেব। পত্রিকাটির ওপরের প্রচ্ছদপট আঁকতে হয় তাকে। মোটামুটি চলেও আসছিল। গত শীত সংখ্যার প্রচ্ছদও ত্রিপাঠী মহাশয় বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছেন। একটি গাছের পত্রহীন শীর্ণ শাখা-প্রশাখা। কিন্তু বছরের শেষ এই বসন্ত ঋতুতে অসম্ভব বায়না। একটা চমৎকার ছবি চাই।

জনার্দন ত্রিপাঠী পাঠকদের সাইকোলজি বোঝেন। বছরের প্রথম এবং শেষ সংখ্যাটি ভালো করতেই হবে। কারণ প্রথম এবং শেষ সংখ্যার ওপরেই গ্রাহকদের কাছে আগামী বছরের চাঁদা প্রত্যাশা করা যেতে পারে। তাই বাসন্তী সংখ্যা কাগজের ভেতরের লেখা থেকে ওপরে প্রচ্ছদপট পর্যন্ত নিখুঁত হওয়া চাই।

সব কথা খোলাখুলি লিখে জানিয়েছিলেন ত্রিপাঠী মহাশয়। তাতে কাজ হোয়েছিল। বাসুদেব অন্যবারের মতো একটি ছবিই পাঠায়নি। খান তিন-চারেক বাছা বাছা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে-কোন একটা বেছে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তিন-চারদিনের মধ্যেই ছবিগুলো ফেরৎ এলো। সেই সঙ্গে ত্রিপাঠী মহাশয়ের হুমকি—আঃ, কি সব রাবিশ পাঠিয়েছেন! এসব ছাইভস্ম নিয়ে কি করবো? বললাম একটা ভালো ছবি পাঠাতে! খুব শীগ্‌গীর একটা ভালো ছবি পাঠিয়ে দেবেন।

আবার ক্যান্‌ভাস্ তুলি রং আর এক কৌটো নস্যি নিয়ে বসলো বাসুদেব। দুশ্চিন্তায় ভাবতে ভাবতে পাঁচ মিনিট অন্তর নস্যি টানলো। বার কয়েক বেদম হাঁচলো। অবশেষে হাঁচির টানে আবার ছবি আঁকলো।

ওই এক অভ্যেস বাসুদেবের। বিড়ি-সিগারেট-পান—ওসব কিচ্ছু না। স্কুলে পড়ার সময়ই কখন্ এক ফাঁকে গুরুমশাইকে ফাঁকি দিয়ে নস্যি টেনেছিল। সেই জের এখনো চলে আসছে। এখন সেই নস্যি ছবি আঁকায় বেশ কাজে লাগে। যখনই বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, তখনই এক নাগাড়ে নস্যি টানে বাসুদেব।

সেই তিনখানা ছবি পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এবার নির্ঘাৎ ওরই একখানা বাসন্তী সংখ্যার জন্য মনোনীত হবে। কিন্তু সম্পাদকদের মতিগতি 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'। ফল বিপরীত হলো।

সেদিন বাসুদেব ক্যান্‌ভাস্-তুলি-রং আর নস্যির কৌটো নিয়ে সবেমাত্র বসেছে খুব আধুনিক শিল্পসম্মত একটা ছবি আঁকতে। নস্যি টেনে বার কয়েক হাঁচি দিয়ে অত্যন্ত ভাবালু দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে ছিল। তার কুটিরের সামনে কিছুদূরে একটা কাঁঠাল-চাঁপার গাছ। ফুল এসেছে শাখা-প্রশাখায়। দুটো কোকিল বেশ ক-দিন থেকেই ওই গাছে এসে নিয়মিত বসছে। বাসুদেব চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

হঠাৎ এক মাঝ-বয়সী হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক এসে হাজির হোলেন। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। বিরাট ভুঁড়ি। সারা মুখে অসন্তোষের ছায়া। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বাসুদেবকেই জিজ্ঞেস করলেন—বাসুদেব আছে ?

—আজ্ঞে আমিই বাসুদেব। বাসুদেব ত্রস্তব্যস্ত হোয়ে ক্যান্‌ভ্যাস্-রং-তুলি ফেলে উঠে দাঁড়ালো। থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলো—আপনি—আপনি—

আর বলতে হলো না। ভদ্রলোক ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন—আমি ? আমার নাম জনার্দন ত্রিপাঠী। আপনার কেন এমন দুর্মতি হলো, আমি তাই জানতে এসেছি।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেলো বাসুদেবের। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে এই প্রথম দেখা। এতোদিন চিঠি পত্রেই আলাপ চলছিল। পেটের দায়ে ত্রিপাঠী মহাশয়ের পত্রিকায় প্রচ্ছদ আঁকার কাজ নিতে হোয়েছিল।

জনার্দন ত্রিপাঠী তাঁর হাতের লেদার-ব্যাগ খুলে একমুঠো কাগজ বার করলেন। তারপর বাসুদেবকে দেখিয়ে বললেন—এসব ছাইপাঁশ নিয়ে কি করবো ? মুদির দোকানে পাঠিয়ে দিন, দু পয়সা হবে। কিংবা যাদের শখের

কাগজ, তাদের পাঠান। আমার এণ্টারটেন্‌মেণ্ট-ম্যাগাজিন। আমার কাগজের পপুলারিটির সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে।

বাসুদেব ভালো কোরে চেয়ে দেখলো, ত্রিপাঠী মহাশয়ের হাতে তারই সেই তিনখানা ছবি। কি নির্মমভাবে তিনি সেগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে ধরেছেন। ব্যথায় বুক টনটন কোরে উঠলো বাসুদেবের। বললো—ওগুলো আমি উপযুক্ত মনে কোরেই পাঠিয়েছিলাম।

—আপনার 'মনে করা'-র নিকুচি করেছে। গর্জন কোরে উঠলেন ত্রিপাঠী মহাশয়। বললেন—উপযুক্ত? এক ঝাড় ফুলের গাছ এঁকে দিলেই হলো? এই বসন্তকালের ভরা নদীতে পালতোলা দুটো নৌকো পেলেন কোথায়? আর এই যে এই ছবিটা—এই এক পাল গরু নিয়ে আমি কি করবো? উঃ, আমার মাথাটা খারাপ কোরে দেবেন আপনারা।

জনার্দন ত্রিপাঠী ছবি তিনখানা রং আর তুলির ওপরেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

—আমার ভালো ছবি চাই। মনে রাখবেন, এটাই এ-বছরের লাস্ট্‌ ইস্যু। খদ্দেরগুলো ধ'রে রাখতে হবে তো। আমি চললাম এখন।

বাসুদেব ব্যস্ত হোয়ে উঠলো—না-না, একটু বসুন। একটু চা—

—আমার কি চা খাওয়ার ফুরসৎ আছে? এই ফিরতি ট্রেনেই আমাকে ফিরতে হবে। আবার এক হতভাগা লেখকের কাছে যাওয়া দরকার। রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকিয়ে জনার্দন ত্রিপাঠী ঝড়ের মতো চ'লে গেলেন।

কিন্তু জনার্দন ত্রিপাঠী পাগল হন নি, পাগল কোরে গেছেন বাসুদেবকে। ত্রিপাঠী মহাশয় তিনখানা ছবিই রঙের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনখানা ছবিই রং লেগে নষ্ট হোয়ে গেছে। তারপর সম্পাদক মহাশয়ের ফরমাশ মতো একখানা ছবি আঁকার চেষ্টা করছে ক-দিন থেকে। কিছুই হচ্ছে না।

নিজেকে এতো বিপন্ন আর কখনো বোধ করেনি বাসুদেব। আগে দরকার হোলে বার কয়েক নস্যি টেনে হাঁচি দিয়ে দিব্যি ছবি এঁকেছে। এখন নস্যিতে কাজ হয় না। প্রথম দু-দিন এক নাগাড়ে নস্যি টেনে টেনে ফল হয় নি, এখন ভাবতে ভাবতে নস্যির কথা ভুলেই গেছে, নস্যি নিতে মনে থাকে না। বাসুদেবের পাগল হোয়ে যাওয়ার উপক্রম।

সেদিন বিপদ হোয়েছে। কাঁঠাল-চাঁপার গাছ ফুলে ফুলে সাদা। দুটো কোকিলের একটা কোথায় নিরুদ্দেশ, অপরটি সাদা ফুলের আড়ালে গা ঢাকা

দিয়ে ক্লান্ত চীৎকারে সকালের শান্ত স্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো কোরে ফেলছে।

ক্যান্‌ভাস্-রং-তুলি নিয়ে সকালেই ছবি আঁকতে বসেছে বাসুদেব। কিন্তু বিরহী পাখিটার ডাকে সে বারবার অন্যমনস্ক হোয়ে পড়ছে। সম্পাদকের রূঢ় তাগিদের কথা সব সময় মনে থাকে না। পাশে নস্যির কৌটো অবহেলায় উপুড় হোয়ে প'ড়ে আছে।

হঠাৎ বিস্মিত হলো বাসুদেব। একটি মেয়ে এক-পা এক-পা কোরে কাঁঠাল-চাঁপা গাছটির দিকে এগোচ্ছে। ফুলের আড়ালের পাখিটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। চোখে-মুখে একটা সকৌতুক দুষ্টুমি। মেয়েটি অনন্যা, কিন্তু তাকে আগে কোথাও দেখে নি সে।

তারপর এক অবাক কাণ্ড হলো। বাসুদেবের কুটিরের ঠিক ওপরেই যেন একটি কোকিল সাড়া দিল। অবাক হোয়ে ফিরে তাকালো মেয়েটি। কুটিরের দাওয়ায় বাসুদেবকে দেখতে পেয়ে সে বিস্মিত হলো। তারপর হঠাৎ নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই লজ্জা পেয়ে ছুটে পালালো।

বাসুদেব লক্ষ্য করলো, মেয়েটি ওপাশের ছোট একতলা বাড়ীটায় গিয়ে উঠলো। এখানে আসা অবধি বাসুদেব ও-বাড়ীটায় লোকজন কাউকে দেখে নি। বাসুদেব মনে মনে ভাবলো, ওরা তাহোলে নতুন এসেছে।

তারপর সকালের মতো বাসুদেব রং-তুলি-ক্যান্‌ভাস্ সব তুলে রাখলো।

দুপুরের দিকে ওপাশের একতলা বাড়ীটা থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। বললেন—সুরুচির কাছে খবর পেয়ে আলাপ করতে এলাম।

বাসুদেব ভদ্রলোককে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসালো। নড়বড়ে চৌকিটার ওপর জুত কোরে বসলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—মশাইয়ের কি করা হয়?

বাসুদেব কুণ্ঠিত হোয়ে জবাব দিল—আজ্ঞে, ছবি আঁকি।

—বেশ বেশ। ছবি থেকে দু-চার পয়সা আসে তো?

—খুব যৎসামান্য।

—আমারও একটা বাতিক আছে মশাই, মন্দির দেখে বেড়ানো। রুই-কাৎলা খেয়ে খেয়ে অরুচি যাদের, চুনো পুঁটি কুচো চিংড়ির জন্যে তারা হা-পিত্যেস হোয়ে মরে। গয়া-কাশি-বৃন্দাবনে অরুচি ধরে গেছে মশাই, এখন চুনো পুঁটি খুঁজতে বেরিয়েছি।

কালো পচা পচা দাঁত বের কোরে খিক্ খিক্ কোরে হাসলেন ভদ্রলোক।

তারপর বললেন—আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, এখানে একটা বহুদিনের কালীমন্দির আছে। খুব জাগ্রত। তাই গতকাল সন্ধ্যের সময় এসে পৌঁচেছি এখন ক-দিন থাকবো এখানে। এ কদিন প্রায়ই আসব মশাইয়ের কাছে, গুণী লোকের কাছে দু-দণ্ড বসেও আরাম।

তারপর বাসুদেবের আঁকা ছবি দেখলেন তিনি। অনেকগুলো ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু বাসুদেব এ-যাবৎ কোন মন্দিরের ছবি আঁকেনি শুনে ভদ্রলোক হতাশ হোলেন।

সন্ধ্যের সময় তিনি আবার এলেন। অনেক জায়গার অনেক মন্দিরের গল্প করলেন। তারপর বাসুদেবকে নিমন্ত্রণ করলেন পরদিন তাঁদের সঙ্গে কালী-মন্দির দেখতে যাওয়ার জন্য। কথা হলো, ভদ্রলোকের বাসাতেই সকালে এক সঙ্গে চা খেয়ে তাঁরা বেরুবেন।

ভদ্রলোকের নাম জগদীশ রায়। নিঃসন্তান। বছর পাঁচেক পূর্বে তাঁর একমাত্র ছেলে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপরই তাঁর সংসারে বৈরাগ্য। সেই তখন থেকে তিনি বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই মন্দির দেখে বেড়ান। সঙ্গে থাকে স্ত্রী কমলমণি এবং সতেরো বছরের ভাগ্নি সুরুচি। এসব কথা আরো পরে জানতে পেরেছিল বাসুদেব।

কালীমন্দির দেখতে যাওয়ার দিন সকালে যথাসময়ে জগদীশবাবুর চায়ের আসরে যোগদান করেছিল বাসুদেব। কমলমণি মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাদের পরিবেষণ করছিল। সুরুচি অবাক হয়ে দেখছিল বাসুবেকে। চা খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—আপনি ছবি আঁকেন? সত্যি?

জগদীশবাবু একগাল হেসে বললেন—তুই ভারি ছেলেমানুষ রুচি। এর আবার সত্যি মিথ্যে কি আছে? আমি তো কাল নিজের চোখে দেখে এলুম।

সুরুচি হঠাৎ এক অবাক প্রশ্ন করলো বাসুদেবকে—আমাকে এঁকে দিতে পারবেন আপনি? এই যেমন আমি—ঠিক তেমনি কোরে।

জগদীশবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাসুদেবের মুখের দিকে তাকালেন। বাসুদেব মৃদু হেসে বললো—তা হয়তো চেষ্টা করলে করতে পারি।

—পারবেন? ঠিক এই আমাকে এঁকে দিতে পারবেন? যেমন ক্যামেরার ছবি ওঠে? বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হোয়ে গেলো সুরুচির।

জগদীশবাবুও বিস্মিত হোলেন।

সুরুচি বললো, তাহলে আমার একটা ছবি এঁকে দিন। এখুনি আঁকুন।

—না-না, এখন না—এখন না। প্রতিবাদ কোরে উঠলেন জগদীশবাবু। বললেন—বরং আপনি আপনার সব সরঞ্জাম নিয়ে নিন। সেরকম হোলে মন্দিরের ওখানেই আঁকবেন।

তারপর দুটো রিকশা কোরে ওঁরা যাত্রা শুরু করলেন। একটা রিকশায় কমলমণি ও সুরুচি, অন্যটায় জগদীশবাবু ও বাসুদেব। মাইল তিনেক রাস্তা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা সেখানে গিয়ে পৌছুলেন। ছোট মন্দির, সামনে একটা বড় পুকুর। ঘাটের কাছে গোটা কয়েক অশ্বত্থ ও নিম গাছ। ঠিক যেন একটা ছোটখাটো আশ্রম।

মন্দিরে দেখবার মতো কোনো বিষয়-বস্তু খুঁজে পেল না বাসুদেব। কিন্তু জগদীশবাবু ও কমলমণি খুঁটিয়ে খুটিয়ে এক ঘণ্টা ধোরে কি যেন দেখতে লাগলেন। দেখে সাধ মেটে না তাঁদের।

বরং বাসুদেবের সেখানকার নির্জন পরিবেশটাই ভালো লাগছিল। ঘন সন্নিবিষ্ট অশ্বত্থ এবং নিম গাছের নিবিড় শান্ত ছায়া, সামনে পুকুরের কালো গভীর জলে বড় বড় ঢেউ। বাসুদেব একা একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো। আরো একটু পরে সুরুচি এলো। বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো—ওঁরা এখনো দেখছেন?

সুরুচি মুখ টিপে হেসে বললো—ওঁদের এখুনি হবে না-কি? এখনো অনেক দেরী।

—অতো কোরে কি দেখেন ওঁরা?

—আমি ওসব ছাই বুঝি নে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই, বেড়াতে ভালো লাগে, তাই। ওঁরা কিন্তু আবার আসবেন এখানে। একদিনে সাধ মেটে না ওঁদের।

—আশ্চর্য! বাসুদেব স্বগতোক্তি করলো।

সুরুচি বললো—ছেলেটা মারা যাওয়ার পরই ওঁরা ওই রকম হোয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ওঁরা ফিরলেন। কমলমণি বললো—ছোট্ট মন্দির, কিন্তু অপূর্ব।

সুরুচি বললো—তুমি সব মন্দির দেখেই তো ওই কথা বলো মামি। সবই অপূর্ব।

জগদীশবাবু ধমক দিয়ে বললেন—তুই অতো সব কি বুঝবি রুচি? মন্দির কখনো খারাপ হয়?

কমলমণি বললো—তাছাড়া বড় বড় মন্দির দেখেছি, কিন্তু ছোট মন্দির-গুলো আরো ভালো লাগে।

বাসুদেব বললো—ওটা খুব স্বাভাবিক। বড় মন্দিরে অনেক কারুকার্য থাকে, কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে চোখে পড়ে না। ছোট মন্দির ছবির মতো; সবটাই একসঙ্গে দেখা যায়। যেমন বিরাট ল্যাণ্ড্স্কেপ্, ছবিতে দেখতে আরো ভালো লাগে।

কমলমণি বললো—তাছাড়া জায়গাটা ভারি পবিত্র ব'লে মনে হচ্ছে।

বাসুদেব বললো—আমারও ভালো লেগেছে জায়গাটা। শহরের এতো কাছে এতো ভালো জায়গা আছে, আমার জানা ছিল না। এখন থেকে আমি প্রায়ই আসব এখানে।

—চলুন তাহোলে ফেরা যাক্। রোদ বাড়ছে। প্রস্তাব করলেন জগদীশবাবু।

সুরুচির যেন হঠাৎ খেয়াল হলো—আমার ছবি? আমার ছবি আঁকবেন যে বাসুদেবদা।

—না-না, এখন আর ওসব না! তুই পাগল হোয়েছিস? এ-কি ক্যামেরা যে ক্লিক্ কোরে তুলে নিল? হাতে ছবি আঁকতে অনেক সময় লাগে।

—বেশ তো, তোমরা যাও। আমি আর বাসুদেবদা পরে যাব।

—এর পরে কতো রোদ হবে ভেবে দেখেছিস? আমরা তো আবার আসছি।

বাসুদেব বললো—সেই ভালো হবে। আর একদিন এসে এঁকে দেব।

—হ্যাঁ, আবার আমরা পূর্ণিমাতে আসবো। জগদীশবাবু সান্ত্বনা দিলেন—কাল বাদ পরশু। চাঁদের আলোতে ভারি অদ্ভুত লাগবে জায়গাটা।

—কিন্তু রাত্রে তো ছবি আঁকা হবে না! বাসুদেব অসুবিধের কথা বললো।

জগদীশবাবু আর দেরি করতে রাজী হোলেন না। বললেন—দিনেও আসব না-হয় একদিন।

সুরুচি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমলমণির পাশে গিয়ে বসলো। বাসুদেব উঠে বসলো জগদীশবাবুর পাশে।

কমলমণি ও সুরুচির রিকশাটা বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। বাসুদেব ও জগদীশবাবু দু-জনেই স্তব্ধ। নির্বাক। হঠাৎ জগদীশবাবু বললেন—আমাদের পাগলামী দেখে আপনি খুব অবাক হচ্ছেন, না? কিন্তু সত্যি বলছি, মন্দির-

টন্দির দেখার নেশা আমার নেই। ওসব দেখে আনন্দও পাইনে আমি। তবু দেখে বেড়াচ্ছি। ভারি আশ্চর্য!

বাসুদেব অবাক হোয়ে গেলো জগদীশবাবুর কথা শুনে।

জগদীশবাবু বললেন—আমাদের সন্তান এসেছিল অনেক দেরিতে। কিন্তু দেরিতে এলেও আমরা সুখী হোয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন মোটর দুর্ঘটনায় আট বছরের ছেলেটি মারা গেলো। আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, মায়ের কাছে একমাত্র পুত্র হারানোর ব্যথা কতোখানি। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংযত করলেন জগদীশবাবু। তারপর বললেন—এরপর আমার স্ত্রী বোধ হয় পাগল হোয়ে যেতো কিন্তু আমি ওর চিন্তাকে আর অন্তর্মুখী হোতে দিই নি, বাইরে টেনেছি। আমি তাকে দেশে দেশে নিয়ে বেড়াচ্ছি তার মন থেকে খোকনের সেই ছবিটুকু মুছে দিতে। কিন্তু আমার এই ষড়যন্ত্র ও ঘুণাক্ষরেও জানে না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে জগদীশবাবু বললেন—পুরনো বাড়ীটা আমি ছেড়ে দিয়েছি ছোট বলে। কিন্তু তা নয়। ওই বাড়ীর সঙ্গে খোকনের প্রতিটি স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, তাই। নতুন বাড়ী কোরে সেখানে উঠে গেছি। কিন্তু তবু এখনো, অতো বড় খোলামেলা নতুন বাড়ী, কতো মন্দির, কতো দেশ, কতো বিস্ময়কর পরিবেশ, সব হেরে গেলো মশাই, কোনো কিছুই ওর মনের সেই এক টুকরো ছবিখানি মুছে দিতে পারলো না। যখনই ও একটু নিরিবিলি অবকাশ পায়, তখনই খোকনের কথা ভাবে।

রিকশা যখন শহরে ঢুকলো, তখন শেষ মন্তব্য করলেন জগদীশবাবু—আমিও কিন্তু ছাড়ছি নে মশাই। হাজার হাজার ছবির ভিড়ে একদিন ওর মন থেকে সেই ছোট্ট এক টুকরো ছবি হারিয়ে যাবেই।

পূর্ণিমায় আবার সদলবলে কালীমন্দির দেখতে যাওয়া হলো। সত্যিই অপূর্ব পরিবেশ। কমলমণি আর জগদীশবাবু পুকুরের বাঁধানো ঘাটের একটা সিঁড়িতে বসলেন। সুরুচি এবং বাসুদেব পুকুরের পাড়ে পাড়ে অনেক দূর চ'লে গেলো। দূর থেকে অদ্ভুত লাগছিল—সব কিছু মিলে মনে হচ্ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ছবি।

সুরুচি বললো—কাল কিন্তু আমার একটা ছবি এঁকে দিতেই হবে।

বাসুদেব বললো—তাহোলে কাল আবার আসতে হয় এখানে।

—আসব। আপনি আর আমি—আর কেউ না।

বাসুদেব সুরুচির মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

সুরুচি বললো—আমরা যখন অন্য কোথাও যাব, আপনি থাকবেন না, তখন আপনার আঁকা ছবিটা দেখে ভারি ভালো লাগবে। আপনার কথা মনে পড়বে।

বাসুদেবের বুক এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় টনটন কোরে উঠলো!

কিন্তু পরদিন যা ঘটলো, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বাসুদেব। মন্দির দেখে ফিরে অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছিল, উঠলো অনেক বেলায়। এবং আরো একটু পরে এলেন জগদীশবাবু। বললেন—আমি আর পারছি নে মশাই, বুঝি হেরে গেলাম শেষ পর্যন্ত। হয়তো খোকনের কথা মনে পড়েছে, তাই আজ আমার স্ত্রী বাড়ী যাওয়ার জন্যে হঠাৎ ভীষণ বায়না ধরলো। কিন্তু অতো তাড়াতাড়ি মালপত্র সামলাই কি কোরে? অগত্যা ওকে আর সুরুচিকে পাঠিয়ে দিলাম। আমি এখানকার সংসার গুছিয়ে-টুছিয়ে পরের ট্রেনে যাব। ওই এক মুশকিল! বাড়ী ফেরার ঝোঁক উঠলে আর সামলানো যায় না। একদণ্ডও না।

পরের ট্রেনেই জগদীশবাবু চলে গিয়েছিলেন। তারপর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল বাসুদেবের। ক্যান্‌ভাস্-রং-তুলি নিয়ে বসতে পারলো না দুদিন। সুরুচি বলেছিল একটা ছবি এঁকে দিতে, তা-ও দেওয়া হয় নি। ছবিটা থাকলে বাসুদেবকে প্রায়ই মনে পড়তো তার।

বাসুদেব একদিন একাই কালীমন্দির দেখতে গেলো। কিন্তু আশ্চর্য, এতোটুকু ভালো লাগলো না। যে পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হোয়েছিল বাসুদেব, তাই অত্যন্ত ফাঁকা ব'লে মনে হলো। প্রতি মুহূর্তে বুকের ভেতর কিসের একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিল সে।

এমন সময় আবার জনার্দন ত্রিপাঠীর তাগাদা এলো। সাত দিনের মধ্যে ছবি চাই।

বাসুদেব রং-তুলি-ক্যান্‌ভাস্ আর নস্যির কৌটো নিয়ে আবার বসলো। কিন্তু কি আঁকবে সে? হঠাৎ দুটো ছবি তার মনে পড়লো। কমলমণির বুকের ভেতর হাজার হাজার অস্পষ্ট ম্লান ছবির পাশে এক টুকরো উজ্জ্বল ছবি—একটি আট বছরের ছেলের কচি সুন্দর মুখ। আর একটি ছবি—কাঁঠাল-চাঁপার গাছ ফুলে ফুলে সাদা, সেই সাদা ফুলের আড়ালে একটি বিরহী কোকিল, আর কাঁঠাল-চাঁপার গাছের নীচে সন্তর্পণে যেতে যেতে একটি মেয়ের গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকানোর আশ্চর্য ভঙ্গী, চারপাশের পটভূমিকায় ছড়ানো বসন্তের লাল আবির।

প্রথম ছবিটা আঁকা যায় না, ওটা মহাশিল্পীর নিজস্ব সম্পদ। দ্বিতীয় ছবিটি ক্যানভাসের গায়ে তরতর কোরে এঁকে ফেললো বাসুদেব। বুকের যন্ত্রণা ক্যান্‌ভাসের গায়ে রঙে রেখায় ছড়িয়ে পড়লো।

এমন সার্থক ছবি কোনোদিন আঁকতে পারে নি বাসুদেব।

আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ

সুরেশ চক্রবর্তী

পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বাপর স্মৃতিচারণ করতে বসে 'তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল'।

ব্যক্তি অতুলপ্রসাদ! কবি ও সুরকার অতুলপ্রসাদ, মানব-দরদী অতুল-প্রসাদ!

এই মহান মানুষটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনে এক পরম লগ্ন। এই শুভ লগ্নটির আবির্ভাবের পূর্বতন কাহিনীর বিবৃতি কিছুটা আত্মকথনের অপেক্ষা রাখে।

কৈশোরের চাপল্য ও যৌবনের প্রথম পদধ্বনির সন্ধিক্ষণে জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে উচ্ছলিত দৃশ্যগুলি অভিনীত হয়েছে, তার স্মৃতি মনে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাগ্রে একটি আপাততুচ্ছ ঘটনার কথাই মনে পড়ে, যা আমার সাহিত্য জীবন-ধারার গতিপথের প্রথম উৎস। সুতরাং নবীন সাহিত্য-ব্রতীর মনের রহস্য-ব্যঞ্জনার ইতিবৃত্তটুকু পুনরাবৃত্তি না করলে অতুলপ্রসাদ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে না। বাংলা সাহিত্যে আকৃষ্ট আমার মানস-চিন্তা নানা খাতে প্রবাহিত। হাতে লেখা একখানি মাসিক পত্রের প্রকাশ, তারই ফল-শ্রুতি। কিন্তু উচ্চাভিলাষের অঙ্কুরটি অন্তরে ক্রম বর্ধমান হ'য়ে আমাকে সর্বদা এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণে বিভোর করে রাখত।

সেটা ১৯২০ খৃষ্টাব্দ।

বাংলার বাইরে বাঙালীর অবহেলিত মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ যেন দুর্নিবার হয়ে উঠ্‌ছে। বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও বাঙালী ছেলেরা একত্রে বেড়াবার সময় আপনাদের মধ্যে হিন্দিতে কথাবার্তা বা রহস্যালাপ করত; এমন কি বাড়িতেও পরিজনদের মধ্যে হিন্দিতে বাক্য-বিনিময় চল্‌তো'। এ রূপের পরিবর্তন দেখা গেল। প্রায় প্রতি বড় সহরেই বাংলা স্কুল ও বাংলা পাঠাগারের দ্রুত প্রসার ঘটতে লাগল। প্রবাস থেকে জন কয়েক বাংলা সাহিত্য-সেবীর অভ্যুত্থানে একটা আশার আলোকে যেন কুয়াশা কাটতে সুরু করল।

ধর্মপীঠ ও জ্ঞানপীঠ দু'য়েরই সমন্বয় এই কাশী। আবহমানকাল থেকেই কাশী বাঙালীর বড় প্রিয়।

একালটায় স্বাস্থ্যান্বেষী বঙ্গবাসীরা দূর দেশ বলতে মধুপুর, শিমুলতলার পরেই কাশীর কথাই ভাবতেন। তীর্থভ্রমণাভিলাষী পর্যটকদের কথা স্বতন্ত্র।

বহু কীর্তিমান বঙ্গদেশীয়দের আগমন যখন-তখন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক অথবা কি না! সুদূর মানস-সরোবর তীরবর্তী বলাকার মত তাঁরা বহন করে আনতেন, বাংলা-সংস্কৃতির আবহাওয়া, বাংলাদেশের সাহিত্যের নতুন দিগন্তের বার্তা। তারা স্বল্পকালীন অবসর বিনোদনের স্থান-হিসাবে নির্বাচন করতেন বাঙালী-অধ্যুষিত এই উত্তরবাহিনী গঙ্গা তীরবর্তী বারাণসীকে।

এ সুযোগ কিন্তু প্রবাসের অন্যত্র দুর্লভ।

বাঙালীরা নানা কর্মোপলক্ষে দূর-দূরান্ত প্রদেশে কর্মমুখর জীবনযাপন করতেন ঠিকই কিন্তু বাংলার সজল স্নিগ্ধ বাতাসের রোমাঞ্চকর স্পর্শ থেকে তাঁরা যে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হ'বে না। এই মাপ কাঠিতে উত্তর ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে কাশী ব্যতিক্রম।

এমনই দিনে একটি সাহিত্য-পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল এখানে! পরিমণ্ডল শব্দটার ওজন বেশি, মজলিস শব্দটা বেশ ঘরোয়া। বিশেষ যেখানে সুরসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যমণি। এ আসরটি বসত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহে। মণিবাবু তখন লেখনি পরিত্যাগ করে, বণিকের মানদণ্ড হাতে তুলে নিলেও, তাঁর গৃহের মজলিসটি ছিল—সাহিত্য-রসের মধুচক্র। কবি কিরণ চাঁদ দরবেশ, রবীন্দ্রভক্ত সাহিত্যানুরাগী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাসের অধ্যাপক বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য, উদীয়মান তরুণ লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখ মধুকরের আনা-গোনা চলত এই মধুচক্রে। বহিরাগত ভ্রমরের গুঞ্জন ও আসরকে সচকিত করে তুলত কখন-সখন।

রচনার মুখপাতে যে উচ্চাভিলাষের অঙ্কুরটির আভাস দিয়েছিলাম, সেটি হাতে লেখা মাসিক পত্রটির পরিবর্তিত মুদ্রনাঙ্কিত রূপ।

উচ্চাভিলাষের কথাটির অন্য অর্থ আমার কাছে অবান্তর। মনের সঙ্গোপনে রক্ষিত এই অনুচ্চারিত আকাঙ্খার খবরটি রাখতেন যে একজন তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের তখন মাসিক পত্রিকার স্বর্ণযুগ। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, ভারতী, নারায়ণ,সবুজপত্র এক সারে।

যেন সাহিত্যের দেব দেউল।

এই সব মাসিক পত্রিকার সমগোত্রীয় একখানা মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনায় এবং সহধর্মী কেদারনাথের সহমর্মিতায় উদ্দীপিত হয়ে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কথাটা বলি! তিনি সাগ্রহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। মনিবাবুর ব্যবসা তখন তুঙ্গে, একটি মুদ্রণালয়ের মালিকও তিনি। কার্যত তাঁর সমর্থনের মূল্য আছে।

কি জানি কি ছিল বিধাতার মনে।

জনচিত্তজয়ী বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিজন সহ বায়ুপরিবর্তনের জন্ত কাশী এলেন ঠিক সেই সময়। আলাপ পরিচয় ক্রমশঃ হৃদ্যতায় পরিণত হল। আমাদের মজলিসে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত। তাঁর বাড়িতেও দ্বিতীয় বৈঠকের সমারোহ। সাহিত্য আলোচনা যত না হোক, বৈঠকী গল্পের আমেজে সে অভাব পূর্ণ করতেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের মন মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে, একদা আমাদের পরিকল্পিত মাসিক-পত্র প্রকাশের কথা উত্থাপন করে অসীম সাহসে তাঁকে একখানি উপন্তাস দেবার অনুরোধ জানালাম। সময়টি বুঝি অনুকূল ছিল। স্বীকারোক্তি আদায় হল।

উৎসাহের আতিশয্যে আমাদের কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ আয়োজন জোয়ার-উচ্ছ্বসিত নদীর মত লক্ষ্যাভিমুখী।

পত্রিকার নামকরণ করলেন কেদারনাথ। 'প্রবাসজ্যোতি'।

সহরবহুল এই প্রদেশে এ জাতীয় প্রচেষ্টার অগ্রদূত এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী'। অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় প্রবাসভূমি ত্যাগ করে অচিরেই স্থানান্তরিত করলেন তাঁদের দপ্তর কলকাতায়। 'প্রবাসী' নামটি রইল, সুসঙ্গতি রইল না।

কলকাতার প্রচার-বর্ধিষ্ণু মাসিক পত্রিকাদিতে 'প্রবাস জ্যোতি'র বিজ্ঞাপনে সাড়ম্বরে "শরৎচন্দ্রের উপন্তাস" প্রকাশিত হবে কথা ক'টি বেশ বড় বড় অক্ষরে ঘোষিত হল।

চল্‌তি খ্যাতিমান লেখক লেখিকাদের লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখার কাজটির ভারও নিলেন কেদারনাথ।

ভবিষ্যৎ পত্রিকার রূপরেখা অঙ্কিত করে অনুষ্ঠানপত্র লেখা ও ছাপা শেষ।

গ্রাহক হবার অঙ্গীকার পত্র, রসিদ বই, বড় বড় নানা ধর্মে রঞ্জিত পোষ্টার যা মণিবাবুর মস্তিষ্ক প্রসূত। এক সময়ে থিয়েটারের সংস্রবে ছিলেন ত! সব আয়ুধ প্রস্তুত।

সর্বঅস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে উত্তর ভারতের বাঙ্গালী-প্রধান শহরগুলিতে 'প্রবাস জ্যোতি'র প্রচার ও গ্রাহক সংগ্রহের অভিযানে প্রথমেই সংযুক্ত-প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লখ্‌নৌ অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম।

সর্বাগ্রে এ শহর মনোনয়নের প্রধান কারণ—শরৎচন্দ্রের নির্দেশ ও উপদেশ।

আমাদের এ প্রচেষ্টার সূত্রপাতেই তিনি আমায় বলেছিলেন—'তোমরা একবার লখ্‌নৌর এ. পি. সেনের সঙ্গে দেখা করবে। ব্যারিষ্টার! নামজাদা মানুষ। তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ নেবে।' কথাটা ভুলিনি।

(২)

কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে যাত্রা সুরু হল।

বিদেশ-ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

লখ্‌নৌ শহরে মকবুলগঞ্জ পল্লীতে এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয় নিলাম। নাম দুর্গাপ্রসন্ন। কাশীতেই বাড়ী, সম্প্রতি এখানে কমিশারিয়েট অফিসের একজন করণিক।

লখ্‌নৌর পৌরাণিক নাম লক্ষ্মনাবতী। ইংরাজ আমলে এর আদরের ডাক নাম 'সিটি অফ্‌ গার্ডেনস্‌।'

শহরটি বেষ্টন করে পুষ্পপাদপ শোভিত অসংখ্য উদ্যান। এই রম্য নয়ন মুগ্ধকর উপবন সমাকীর্ণ নগরী নবাগত মুসাফিরকে একবার বিমনা না করেই পারে না। আছে বড় বড় ইমারৎ ও প্রাসাদ। নবাবদের কীর্তি। গোমতী তীরে অবস্থিত ছত্রমঞ্জিল হর্ম্যটি এক বিস্ময়! কৈসারবাগের উদ্যানটির আকর্ষণ দুর্নিবার। কল্পনা করতে ভাল লাগে, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র বেগমরা কৈসরবাগ উদ্যানের আনাচে কানাচে এখনো বুঝি বা লোকচক্ষুর অন্তরালে নৃত্যপরা। সকালে সন্ধ্যায় ইমামবাড়া থেকে নামাজের ভাবগম্ভীর আওয়াজ শহরটিকে সচকিত করে তোলে।

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান'। তবু নিরঙ্কুশ ইংরেজ রাজত্বেও লখনৌর মুসলমানরা তাদের নবাবী আমলের মেজাজটা একেবারে মুছে ফেলতে পারে নি। পারেনি বলেই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণে এটা প্রকট হয়ে পড়ে। আমিনাবাদের ঘন ঘন পথ অঞ্চলে একটি তাম্রখণ্ড-প্রয়াসী

দণ্ডায়মান হুঁকাবরদারের হস্তধৃত আলবলার সটকায় সুখটান না দিয়ে পথিকেরা পথ চলতে অনভ্যস্ত। বটের বাজী, কবুতর বাজী বা পতঙ্গ বাজী (ঘুড়ি ওড়ানো) এসব নবাবী নেশার ছাঁটকাট করেও কিছুটা বিদ্যমান। বেশেবাসে, কায়দা কানুনে, চলনে বলনে নিজেদের যুগটাকে ধরে রাখতে আপ্রাণ সচেষ্ট।

এ হেন লখ্নৌ শহরে পদার্পণ করে আমার প্রথম চিন্তা ব্যারিষ্টার এ. পি. সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

সেন সাহেব! সামান্য টাঙাওয়ালা থেকে উচ্চকোটীর লখ্নৌ অধিবাসীর কাছে তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত শুধু 'সেন সাহেব!

এ. পি. সেন যে অতুলপ্রসাদ সেন এবং তিনি যে একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ —এ পরিচয় আমার অজানা। বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা স্বল্প। অনেক বিষয়েই ত' অনধিকার।

বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র এসব সদাপ্রচলিত নামের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা। এঁদের সাহিত্য সম্ভার আমাকে সারস্বত সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় যেসব কবি ও সাহিত্যিক লেখনী চালনা করে যশস্বী হয়েছেন—তাঁদের নামধাম আমার জিহ্বাগ্রে। কিন্তু অতুলপ্রসাদ!

সাহিত্য কাননে বড় বড় বনস্পতির আবডালে যে পুষ্পতরুটিতে কবিতা ও গানের অজস্র ফুল একান্তে প্রস্ফুটিত হয়ে সৌন্দর্য ঢেলে দিচ্ছে সে দৃষ্টিসুখ কয়টি নয়নের!

অতুলপ্রসাদের 'শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' বা 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠগো জগতজনপূজ্যা'—এসব স্বদেশী গান বহুকণ্ঠে গীত হলেও রচয়িতার নামটি জনসাধারণের কাছে অশ্রুতই বলা যায়। মুষ্টিমেয় অভিজাতশ্রেণীর রসবেত্তা সাহিত্যিক ও কবির মধ্যেই অতুলপ্রসাদের কবিকৃতি সীমাবদ্ধ। দু'এক খানি মাসিকপত্রিকায় কোনকালে দু'একটি কবিতা ও গান প্রকাশিত হলেও তা নগন্য।

এযুগে রেকর্ড ও রেডিও অতুলপ্রসাদের নাম ও গান ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এ নামটি অপরিস্ফুট।

একদা কালক্রমে যেন নন্দন কাননের উদ্যান-পালক সযত্নে পুষ্পতরুটিকে বাংলা দেশ থেকে আহরণ করে দ্বিতীয় নন্দন কানন এই লখ্নৌ শহরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অবশ্য এসব ত' আমার পরবর্তী ভাবনা।

আমার তৎকালীন ধারণায় অতুলপ্রসাদের স্বরূপ, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। সাহেবী ধরণ-ধারণ মান্যগণ্য, ধনী ব্যক্তি বিশেষ।

এখন সমস্যা! কে আমায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে? কোন্ সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা? আমিই-বা কিভাবে আমার বক্তব্য তাঁর কাছে উপস্থিত করব? নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেতেও উৎসাহ পাচ্ছি না।

যেটা তখন সমস্যা বলে মনে হ'য়েছিল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, উত্তরকালে অপরিচিত মহা-মহা দিকপাল সাহিত্যরথীদের সঙ্গে কি অনায়াস ভঙ্গীতেই না দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। কথাবার্তায় অস্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র থাকত না।

এমন কি কাশীতে নিজের গণ্ডীর মধ্যে অনেকটা স্বচ্ছন্দবিহারী। ধনী মানী গুণীজনের সঙ্গে সহজ ভঙ্গিমায় আলাপচারী।

গণ্ডীর বাইরে সর্বপ্রথম আমার এই পদচারণা আমাকে বিহ্বল ও দিশেহারা করে তুলল।

সমস্যা ও সমাধান দুটি বিপরীতধর্মী শব্দ হলেও একে অন্যের পরিপূরক।

কাশীর পরিচিত একজনের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ।

'তুমি এখানে?'

প্রশ্নের উত্তরে লখ্‌নৌ আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হ'ল। পরিচিত ব্যক্তিটি উল্লসিত হবার মত লোক নন। তাঁর পরিচয় তিনি পুলিশের একজন ইনফর্মার বা গুপ্তচর। নাম কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সে যুগে কাশী একটি বিখ্যাত বিপ্লবকেন্দ্র। বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব এখানেই।

কাশীর একশ্রেণীর অশিক্ষিত, সত্রভোজী, নেশাবাজ, অকালপক্ক যুবকরা যেমন বহুবিধ কুকার্যের নায়ক, অপরদিকে শিক্ষিত, তেজস্বী, বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতাকামী তরুণদলের সংহতিতে শাসকদল সন্ত্রস্ত।

এই বিপ্লবী দলের কার্যকলাপের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবার ও তাঁদের দমন করবার জন্য যে দুজন প্রতাপশালী পুলিশ অধিকর্তা কাশীতে একচ্ছত্র রাজত্ব চালাচ্ছিলেন—তাঁদের একজনের নাম জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। এঁরই অধীনে কাজ করতেন এই কালীকৃষ্ণ অপভ্রংশে কালীকেষ্ট।

শচীন্দ্র সান্যাল, রাজেন লাহিড়ী, মন্মথ গুপ্ত, শচীন বক্সী—এঁরা ত' চিহ্নিত। অচিহ্নিত যুবকদের উপরও শ্যেনদৃষ্টি ছিল পুলিশের।

কালীকেষ্টকে দেখতাম—সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার অভিসন্ধিতে সমান অবিচলিত ধৈর্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে উদ্দিষ্ট বাড়ীর সামনে দেয়ালে গা ঘেঁষে। মুখে চুরুট, হাতে একখানা বই।

নাম যদিও কালীকৃষ্ণ—গায়ের রঙটা বেশ ফর্সা। সুপুরুষ বলা যেত যদি তাঁর একটি চোখ টেড়া না হত। চশমার আড়ালে সেই বাঁকা চোখের তীর্যক দৃষ্টি লক্ষ্য ভেদ করবার সুবিধাটুকু বিধাতার দান।

স্বভাবটি মিনমিনে। পুলিশের চর জানা সত্ত্বেও লোকের কাছে ভীতিপ্রদ ছিলেন না। গুজগুজ করে অনেক যুবককে নাকি পূর্বাহ্নে তাঁদের সাবধান হবার ইঙ্গিত দিতেন।

গোয়েন্দা কর্মের বাইরে—সাহিত্য-হাটের ছোটবড় অনেক খবর তাঁর নখদর্পণে।

তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবকৃষ্ণবাবু মণিবাবুর অফিসের একজন কর্মচারী। ঐ সূত্রে ওখানে গতায়াত মাঝে মাঝে। আমি কালীকেষ্ট নামের সঙ্গে একটা 'দা' যোগ করে ডাকতাম কালীকেষ্ঠদা।

হঠাৎ এসময়ে এ শহরে তাঁকে দেখে বিস্মিত হইনি। পেশাগত কারণে লখ্‌নৌ আসা তাঁর এমন কি অস্বাভাবিক!

আমি এ, পি, সেনের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক জেনে আমায় আশ্বাস দিলেন—'তোমায় মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।'

এ, পি, সেনের সঙ্গে এঁর মাধ্যমে পরিচিত হ'তে আমি একটু ইতঃস্তত করছিলাম। কিন্তু মুখে উৎসাহ দেখিয়ে বললাম—'বেশ ভাল হয় তা হ'লে। কবে নিয়ে যাবেন বলুন?'

'কাল সকালে। এই ত' ব্যাংকস্‌ রোডে তাঁর বাঙ্‌লো।'

একটা নির্দিষ্ট স্থানে আমায় অপেক্ষা করতে বলে তিনি বিদায় নিলেন।

কৈসারবাগ প্রবেশপথের অদূরবর্তী রাস্তাটি ব্যাংকস্‌ রোড। এরই দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে একটি বাঙ্‌লো ধরণের পাকাবাড়ী। রাস্তার ওপরের ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সঙ্গী কালিদা। বাঙ্‌লোর চারপাশটা বেশ ফাঁকা। অল্প-স্বল্প গাছ-গাছড়ার সন্নিবেশ।

সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখছি। ঝাড়ন হাতে একজন বেয়ারা সামনে এসে হাজির। সেনসাহেবের দর্শনপ্রার্থী জেনে সে হিন্দী, উর্দু মেশানো ভাষায় যা বললে, তার সার কথাটুকু: 'সায়েব এখন গোসলখানায়। অন্ততঃ আধঘণ্টা দেরী হবে। তারপর দপ্তরখানায় এসে বসলে তখন দেখা হবে।'

গুটি কয়েক সিঁড়ি উপেক্ষা করে বারান্দায় উঠলাম বেয়ারাকে অনুসরণ করে। বারান্দার পশ্চিমদিকের ঘরখানার সামনে একখানা লম্বা বেঞ্চি। ইসারায় উপবেশন করবার স্থানটি দেখিয়ে সে অন্তর্হিত হল।

পাশাপাশি দুজনে নিঃশব্দে বসে রইলাম বেঞ্চির ওপর।

আষাঢ় মাস হলে হবে কি! সংযুক্ত প্রদেশের আকাশে মেঘদূতের প্রবেশ নিষেধ। তবে আনাগোনায় আপত্তি নেই। খণ্ড মেঘের আড়াল থেকে ঝলমল আলো এসে পড়েছে গাছগুলির মাথায়।

একটু অন্যমনস্ক ভাব দু'পক্ষেরই। অতর্কিতে কানে এল মধুর কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। গুঞ্জন ক্রমশঃ রূপায়িত হয়ে উঠল ধ্বনিতে। ঝরঝর জল-তরঙ্গের সঙ্গে কানে ভেসে এল একটি গানের কলি—

'হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?'

যেখানটায় বসে আছি, তার সংলগ্ন ঘরটিই নিশ্চয় স্নানাগার। গায়ক স্নানপর্ব উদ্‌যাপন করছেন স্বতঃনিঃসৃত সঙ্গীত-উপচারে।

গানের কথায় ও সুরের মাধুর্যে মোহাবিষ্টের মতন কতক্ষণ মগ্ন ছিলাম, জানিনা।

তন্ময়তা দূর হল কার আহ্বানে। তাকিয়ে দেখি পশ্চিমদিকের ঘরখানার দ্বার উন্মুক্ত। এদেশীয় একটি ভদ্র চেহারা আমাদের উপবেশন-কক্ষে দুখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে অনুরোধ জানিয়ে 'সায়েব আসছেন' এ সংবাদটুকু ঘোষণা করে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমরা চেয়ারে বসে কক্ষটির চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আলমারীতে চামড়া-বাঁধানো স্বর্ণাক্ষরে নামলেখা বইগুলি সাজানো। সামনে একটি প্রশস্ত টেবিল, তার একধারে সুবিন্যস্ত কিছু নথি-পত্র।

একটি মন্থর পদধ্বনির শব্দে সজাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের দ্বার দিয়ে আবির্ভূত হলেন একজন দীর্ঘকায়, নাতিস্থূল, পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে সজ্জিত স্বভাব-গম্ভীর প্রৌঢ় মানুষ। আমরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম এবং দাঁড়িয়েই রইলাম। তিনিও তাঁর কেশবিরল মস্তকটি সামান্য নত করে হাত দু'খানি জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে যেন আমাদের স্বাগত জানালেন। সুবিন্যস্ত গোঁফের ফাঁকে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে—'এই যে বসুন, বসুন।'

কালীদার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে—'কি ব্যাপার, হঠাৎ এসময়ে?'

অনুমান করতে পারলাম, পরিচয়টা একেবারে শূন্যগর্ভ নয়।

এবার আমার পালা। 'ইনি ?' উত্তরে কালীদা বললেন—'আপনার সঙ্গে দেখা করতেই ত' ইনি লখ্‌নৌ এসেছেন।'

'তাই নাকি—তা—'

এই শান্ত অথচ রাশভারী লোকটির সান্নিধ্যে কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করলেও, মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে উঠলাম—'কাশী থেকে একখানি মাসিক-পত্র বের করতে যাচ্ছি, আপনার সাহস ও পরামর্শ পাব এই আশায় লখ্‌নৌ এসেছি।'

শরৎচন্দ্রের নির্দেশেই যে তাঁর কাছে এসেছি—এ কথাটারও উল্লেখ ছিল।

[এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক কৌতুক-কথার অবতারণা করছি। যদিও বহু বৎসর পরের কথা। সেদিন অতুলপ্রসাদের অনুজের আসনটি আমার দখলে। এই ধীর, স্বল্পবাক্ মানুষটি আড্ডা-মজলিসে কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারেন—বারবার তা দেখেছি, উপভোগ করেছি। কোন এক ছুটির দিনে অতুলদার ড্রইংরুমের আসরটি জমজমাট। প্রিয়জনরা অনেকেই উপস্থিত। আলোচ্য বিষয় গুরুগম্ভীর ছিল না। হাল্কা মেজাজের গালগল্প। মজলিশী গল্প কে কত রসিয়ে বলতে পারে—এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নাম উচ্চারিত হতেই, বৈঠকের রসভঙ্গ করে বললাম—'অতুলদা' হয়ত আপনার মনে পড়বে না, আপনার সঙ্গে লখ্‌নৌ এসে প্রথম সাক্ষাৎ করি শরৎদারই উপদেশে। তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ত' বহুদিনের। শরৎদার গল্প ত' অনেক। আপনার জানা কিছু বলুন না।'

অতুলদা তাঁর স্বভাবসুন্দর হাসিটি ফুটিয়ে বললেন—'এমন কিছু আমার জানা নেই, তবে তাঁর রহস্যপ্রিয়তার একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটা এখানেরই।

বেলা তখন প্রায় ন'টা। মক্কেল বিদায় দিয়ে কোর্টে যাবার তোড়জোড় করছি, বেয়ারা এসে খবর দিলে—কে একজন মৌলবী সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, বাইরে অপেক্ষা করছেন। বেরিয়ে এসে দেখি—একজন মুসলমান ভদ্রলোক। পরনে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় উঁচু তুর্কী টুপি। দাড়ি ত, ছিলই।

'কি অতুলবাবু, চিনতে পারেন ?'

ইতঃস্ততঃ করছি।

অকস্মাৎ মাথার ফেজটি খুলে ফেলে তিনি হাসতে লাগলেন।

'শরৎবাবু, আপনি ?'

'চিনতে পেরেছেন তা' হলে।'

দু'জনেই হাসতে লাগলাম।

স্মরণীয়—তখন শরৎচন্দ্রের দাড়ি ছিল, মাথার তুর্কী টুপিটাই এক্ষেত্রে বিশ্বাস-ঘাতক।]

'প্রবাস-জ্যোতি'র অনুষ্ঠান-পত্র তাঁর হাতে দিতেই তিনি পুস্তিকাটির পাতা উলটে উলটে—চোখ বুলোতে লাগলেন। একটু আগ্রহ ও ঔৎসুক্য যেন প্রতিফলিত হল তাঁর চোখেমুখে।

'বাঃ! এ ত' খুব ভাল কথা।' বলুন, কি করতে হবে ?'

'লখ্‌নৌ থেকে পত্রিকার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করতে চাই। এ বিষয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় ? আমি ত' এ শহরে নবাগত—কারও সঙ্গেই ত' জানাশোনা নেই। আপনার সুপরামর্শই আমার ভরসা।'

এই রকমই কিছু বলে থাকব।

মুখে কোন উত্তর না দিয়ে তিনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে লেখবার প্যাড বের করে খস্‌খস্‌ করে দু'খানা চিঠি শেষ করে, খামে ভরে, তার উপর নাম ও ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিলেন। বললেন—এঁদের সঙ্গে দেখা করুন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

খাম খুলে চিঠি দু'খানি পড়লাম। বয়ান একই। চিঠির নীচে নাম স্বাক্ষর—অতুলপ্রসাদ সেন।

সংক্ষিপ্ত এ. পি. সেনের পুরাদস্তুর নামটির সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়।

আমার ঈপ্সিত কার্যে, আনুকূল্যকরার সুপারিশপত্র দু'খানি হাতে নিয়ে নমস্কার জানিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রারম্ভিক পদক্ষেপ যে শুভপ্রদ—এতে মনটা আনন্দ-উচ্ছল।

কালীদার কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

বন্ধু দুর্গাপ্রসন্ন আমার কথানুযায়ী স্থানীয় একজন কামলা দিয়ে 'প্রবাস-জ্যোতি'র চিত্র-বিচিত্র পোষ্টারগুলি শহরের বাঙালী প্রধান মহল্লার দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছে। লক্ষ্য করেছিলাম সেগুলি বাঙালী অধিবাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পত্র দু'খানি যাঁদের নামে আজ বহু বর্ষ পরে তাঁদের নাম দু'টি মনে রাখতে

না পারলেও একজনের নাম আবছা-আবছা স্মরণ হয়। তিনি হরি নফর বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় নামটি আমার স্মৃতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দু'জনেই কর্মে একনিষ্ঠ, আদর্শবাদী যুবক। তাঁদের কাছে প্রদত্ত সুপারিশ পত্র দু'খানি যেন প্রত্যাদেশপত্র। তাঁরা আমায় সঙ্গে নিয়ে তত্রতৎ প্রতিটি বাঙালী পরিবারের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 'ও, সেন সাহেব পাঠিয়েছেন।' আর কথা কি। তাঁরাও অতুলবাবু সম্বোধন করেন না। তাঁদের কাছেও তিনি সেন সাহেব। এই নামটির প্রতি এঁদের কত অবিচলিত শ্রদ্ধা। আবার শ্রদ্ধার পরিবর্তিত রূপ প্রীতি ও ভালবাসা।

সময়টা ১৯২১।২২। লখ্‌নৌ-এ বাঙালীর সংখ্যা তুচ্ছ করার নয়। ব্যবসায়ী বাঙালী, ব্যবহারজীবী বাঙালী, চিকিৎসক বাঙালী, শিক্ষাব্রতী বাঙালী, চাকুরী জীবী বাঙালী—দিনদিনই বাঙালীর বাড়-বাড়ন্ত। মডেল-হাউস মহল্লাটি ত' কাশীর বাঙালীটোলা। তাছাড়া নগরের এপ্রান্ত ওপ্রান্ত—সেখানেও বাঙালী মুখের উঁকিঝুঁকি।

গোমতীর অপর পারে নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ-চত্বরেও সদ্য আগত উচ্চ-শিক্ষিত অধ্যাপক বাঙালীদের ক্ষীণ পদধ্বনি।

ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েসন, বেঙ্গলী ক্লাব প্রভৃতি বাঙালীর নিজস্ব প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষরও বর্তমান।

কিন্তু বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের কোন বিদ্যায়তন' ? হয়ত আমার চক্ষুকে প্রতারিত করেছে।

আশাতীত গ্রাহক সংগ্রহ হ'ল 'প্রবাসজ্যোতি'র। কার্য ত' সিদ্ধ। সুতরাং সিদ্ধিদাতার সমীপে প্রণিপাত না করে যাওয়া ত' অকৃতজ্ঞতা।

সময়টা জানাই ছিল। যথা সময়ে সেন সাহেবের চেম্বারে এসে, সব বৃত্তান্ত জানালাম।

তিনি খুব খুশি। বললেন, 'আমাকেও গ্রাহক করে কাগজ পাঠাবেন।'

চকিতে একটা কথা মনে পড়ল। শরৎচন্দ্র ত' একথাও বলে দিয়েছিলেন—'ওঁর কাছ থেকে লেখা-টেখা চেয়ে নেবে।'

'কি লেখেন ইনি!' ভাবলাম, 'লেখা চেয়ে এঁকে একটু আপ্যায়িত করে রাখা ভাল। এঁর জন্যই ত' এত গ্রাহক সংগ্রহ হল।'

ভদ্রলোককে তুষ্ট করবার মনোভাব আর কি! আমার মনোজগত তখন ত' ছোট পরিধি মাত্র।

'আপনাকে লেখা দিতে হবে।'—একটু আবদারের সুর ফুটে থাক্‌বে আমার কণ্ঠে। পূর্বের আড়ষ্ট ভাবটা অনেক শিথিল। সান্নিধ্যটুকুও ভাল লাগছিল।

তিনি সলজ্জে বললেন—'আমি ত' বড় একটা লিখিনা। তবে গান-টান কিছু লেখা আছে খাতায়। যদি আপনাদের ভাল লাগে এর থেকে বেছে নিতে পারেন।'

ড্রয়ার থেকে ধূলো ঝেড়ে একখানা 'এক্সসারসাইজ' বুক আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। খাতাখানি বেশ পুরোনো। পাতাগুলিও খুলে খুলে পড়তে চাইছে। অক্ষরগুলির উজ্জ্বল কালিও কিছু ম্লান। সদ্যোলিখিত যে নয় এটা সুস্পষ্ট।

আমি একটির পর একটি গান পড়ে যেতে লাগলাম। সেন-সাহেব তখন নিজের নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত।

একখানি সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে পর পর দুটি গান নকল করে খাতাখানি তাঁকে ফেরৎ দিলাম। বললাম—'দুটি গান নিলাম।'

হাতের প্রতিলিপি-করা কাগজখানি চেয়ে নিয়ে তার উপর নিমেষ মাত্র দৃষ্টিপাত করে সেখানি তিনি আমাকে প্রত্যার্পণ করলেন।

নির্বাচন তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে, প্রশংসিত চোখ দুটিই তার সাক্ষ্য।

গান দু'খানি এই :—

(১) আ মরি বাংলা ভাষা······

(২) হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে···

প্রথম গানটি নির্বাচনের মূলে আমার নির্জ্ঞান মনের প্রেরণা।

দ্বিতীয় গানটির কথা ও সুর পূর্বশ্রুত। যেদিন প্রথম অতুলপ্রসাদের বাস-ভবনের অলিন্দে অপেক্ষারত, আমার কর্ণে স্নানাগার থেকে উত্থিত সেই অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনা বুঝিবা এই গানটি আহরণের মূলাধার।

হৃষ্ট চিত্তে বিদায় নিলাম—অতুলপ্রসাদ বা লোককান্ত এ. পি. সেনের কাছ থেকে।

লখ্‌নৌ থেকে উত্তর ভারতের কয়েকটি শহর পরিভ্রমণ করে, 'প্রবাস-জ্যোতির' প্রচার ও গ্রাহক-সংগ্রহ অভিযানে সমাপ্তি-রেখা টেনে ফিরে এলাম কাশীতে।

সহকর্মীরা, বিশেষ করে দাদামশাই কেদারনাথ আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন—যিনি এই সাহিত্যযজ্ঞের পুরোধা। উৎফুল্ল হলেন মণিবাবুও—যজ্ঞেশ্বর ত' তিনিই।

প্রবাসজ্যোতি!

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য পত্রের প্রথম বৈজয়ন্তী আকাশপৃষ্ঠে উড্ডীয়মান, সেই দোদুল্যমান পতাকার শীর্ষে প্রবাসী-বাঙালীর যে ধ্যানমন্ত্রটি উৎকীর্ণ, সেটি অতুল-প্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা।'

সময়টা বঙ্গাব্দ আশ্বিন ১৩২৭। ক্রমশঃ

ত্রিকোণ

(গল্প)

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥

টয় ট্রেন। ঝিক্ ঝিক্ করে সাপের মত এঁকে বেঁকে কুয়াশা ভেদ করে, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে পাড়ি দিচ্ছে স্বপ্নরাজ্যের দিকে। ভা-রী মজা লাগছিল।

অবাক হয়ে সে রহস্যলোকের দিকে চেয়েছিলুম জানালা দিয়ে। দু' একবার চোখ ফেরাতেই চোখ পড়ছে সামনে-বসা ভদ্রলোকের দিকে। গায়ে গলাবন্ধ পুরনো গরম কোট, খোচা খোচা একগাল দাঁড়ি, কোটরাগত চোখ দু'টি থেকে কৌতুহল-ভরা মিট্ মিট্ দৃষ্টি।

কথা বলার জন্য ভদ্রলোক যেন উস্‌খুস্ করছেন। যতবার চোখে চোখ পড়েছে আমি এড়িয়ে গেছি।

এবার চোখ পড়তেই অধৈর্য হয়ে ভদ্রলোক বললেন :

: আমি আপনার কোন ক্ষতি করেছি ?

: না, না। কেন অমন কথা বলছেন ?

: তবে বারে বারে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন ?

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলুম।

: দার্জিলিঙ গিয়ে কোথায় উঠবেন ?

: ঠিক করিনি—

: বেড়াতে যাচ্ছেন, না চাকরী নিয়ে ?

চাকরী নিয়ে···

: তাহলে ত আরো বিপদ·······

: বিপদ কেন ?

: সিজনে যারা দুচারদিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছে তারা কোথাও জায়গা পাচ্ছে না। আপনি যাচ্ছেন চাকরী নিয়ে পার্মানেণ্ট থাকবার জন্য। কোথায় জায়গা পাবেন ?

আবার নির্বাক হয়ে রইলুম।

: আপনার যদি আপত্তি না থাকে খুব সুবিধা ভাড়ায় একটি ঘর ঠিক করে

দিতে পারি। আমি তো দার্জিলিংয়ের স্থায়িবাসিন্দা। কোথায় ঘর খালি আছে সে আমার নখদর্পনে। রাজী ?

রাজী। কিন্তু আপনাকে কি দিতে হবে ?

ঃ মাঝে মাঝে এক কাপ গরম চা বা কফি। আর কিচ্ছু না। নকুল ভৌমিক অনেক শর্মাকে এ রকম ঘর ঠিক করে দিয়েছে। এ তার ফালতু কাজ। ফালতু কাজও বলতে পারেন ; সমাজ-সেবাও বলতে পারেন······

—বলেই হো-হো করে সে কী দিলখোলা উচ্ছ্বসিত হাসি !

নকুল ভৌমিকের সঙ্গে স্টেশনের নীচে একতলা ছাই-রঙের বাড়ীটার সামনে যখন হাজির হলুম তখন দুপুর প্রায় বারোটা বাজে। অক্টোবরের উজ্জ্বল সূর্যালোকিত দিন। মালপত্র নামিয়ে নিয়ে ভুটিয়া কুলী চলে গেল। নকুল ভৌমিকও চাবি আনতে টুক্ করে চলে গেল নীচের একটি বাড়ীর দিকে।

জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা করবার জন্য বাড়ীটাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে চাইলুম। মনে হলো কিছুটা দূরেই যেন আকাশ ছোঁওয়া রাজেন্দ্রাণী মূর্তি নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার দিকে চেয়ে হাসছে। অভিভূত হয়ে গেলুম সে অপরিসীম সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে। নকুল ভৌমিককে মনে মনে ধন্যবাদ দিলুম এমন একটি বাড়ীতে এনে ফেলবার জন্য।···

ঃ আরে, এত কী দেখছেন ওদিকে চেয়ে চেয়ে ? নিজের ঘরে বসেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঞ্চনা দেবীকে, আরো কতো রূপে দেখবেন রোজ রোজ। এখন চলুন মালগুলো রেখে খাবার ব্যবস্থা করা যাক ···

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কপাটের ওপর একটা লেখা দেখে চমকে উঠলুম—রাম নাম সাঁচ হায়। একটু থমকে দাঁড়ালুম।

ঃ কী হল ? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে ?

ঃ ও কিছু নয়, চলুন···

নকুল ভৌমিকের ব্যবস্থা নিখুঁত। স্টেশনের রেস্টুরেন্টের সঙ্গে বেশ একটা সুবিধামত রেটে সে আমার সারা মাসের খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললো। বললো, আপনি যখন একলা মানুষ কী দরকার ঝাঞ্চা-ঝাঞ্চী নিয়ে রান্নাবান্নার ছজ্জোত করে। এ ছাড়া ওদের রান্না আপনি খেতেও পারবেন না। সব তরকারীতে এমনি ঠেসে রসুন দিয়ে দেবে। তার চাইতে নির্ঝঞ্ঝাট এখানে খান, তারপর আপিসের কাজটা সেরেই ইচ্ছেমত চষে বেড়ান দার্জিলিঙ—বার্চহিল, জলাপাহাড়, লেবং, ঘুম, টাইগার হিল, আরো দূরে যেতে চাইলে গ্যাংটক, ছন্দকপু···। দেখবেন। কী মজা লাগাব মশাই। মজা···মজা

…হাঃ হাঃ…হাঃ—বলেই ভদ্রলোকের আবার সেই দিলখোলা উচ্ছ্বসিত হাসি।

বিকেলের দিকে ম্যালের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালুম। একলা ঘুরলেও একলা মনে হলনা নিজেকে। সমস্ত ভারতবর্ষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অক্টোবরের দার্জিলিঙ্-এর ম্যালে। রঙ্ বেরঙের পোষাকের মধ্যে আগন্তুক নর নারীর স্বাস্থ্য যেন উপচে পড়ছে।

সন্ধ্যায় স্টেশনে খাওয়া দাওয়া সেরেই বাড়ী এলুম। দেখি, নকুল ভৌমিক বাল্‌ব, বালতি, মগ, গেলাস, কুঁজো প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর সামনে। এক গাল হেসে বললো:

: শুধু ঘুরে বেড়ালে হবে না। ছোট্ট সংসারের কথাও চিন্তা করতে হবে। বিশেষ করে বাড়ীতে যখন গৃহিনী নেই। গৃহিনী গৃহমুচ্যতে…কী বলেন, হেঃ…হেঃ…হেঃ। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল নকুল ভৌমিক।

: আমি তো আপনাকে কোন টাকা পয়সা দিই নি। আপনি এতো জিনিষ কিনে এনেছেন…

: দেবেন, দেবেন। একটা পয়সাও ছাড়বো না মশাই। নকুল ভৌমিকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স অঢেল নয়। এখন দরজা খুলুন। আগে বাল্‌ব লাগিয়ে দিই…

পাশাপাশি দু'খানা শোবার ঘর। প্রথম ঘর থেকে মাঝের একটি দরজা দিয়ে দ্বিতীয় শোবার ঘর যেতে হয়। দ্বিতীয় ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বেরুলেই ডানদিকে বাথরুম। প্রথম ঘর থেকেও একটি দরজা আছে বাথরুমের দিকে। বাথরুমটিও বেশ বড়। পেছনে ছোটখাট একটি রান্নাঘর। নকুল ভৌমিক সব ঘরে বালব লাগিয়ে দিলো। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে ঘরগুলি ভালই দেখাচ্ছে। মোটামুটি প্রয়োজনীয় আসবাবও আছে প্রত্যেকটি ঘরে। নকুল ভৌমিক বললো:

: আপনি প্রথম ঘরটায় থাকুন। সামনে একফালি বারান্দাও আছে। নির্জন ঘরে ভালো না লাগলে বারান্দায় বসে ইচ্ছে হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন, ইচ্ছে হয় মানুষ দেখুন, দেখবেন সামনের সরু রাস্তাটা দিয়ে সারাদিন কত ধরনের মানুষের আনাগোনা। আমি তো কাছেই আছি। কোন চিন্তা নেই মশাই…

আবোল তাবোল দার্জিলিঙ্-এর বহু গল্প করে রাত্র প্রায় আটটার সময় নকুল ভৌমিক বিদায় নিলো।

দরজা বন্ধ করে এ্যাটাচি থেকে স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইখানি

নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে লাগলুম। কিছুকাল থেকে মৃত্যুরহস্য জানবার প্রবল নেশা পেয়ে বসেছে। দেশী বিদেশী বহু বই পড়েছি। এই বইখানি নতুন কিনেছি কলকাতা ত্যাগের পূর্বে···

পড়তে পড়তে ক্লান্ত দেহে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরও পাইনি।···

হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ি দেখলুম রাত্রি দুটো। সমস্ত দার্জিলিঙ্ শহর নিঝুম, ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। আর সে নিঃসীম নৈশব্দ ভেদ করে চমৎকার একটি বাঁশীর সুর ভেসে আসছে পাশের ঘর থেকে। সে সুর আনন্দ ও বেদনায় মেশানো। আনন্দের সুরকে ছাপিয়ে উঠেছে বেদনার গভীরতা!

সঙ্গে চুড়ির টুংটাং শব্দ, সাড়ীর খস্ খস্ আওয়াজ। আর ঘুঙুরের রিম্ ঝিম্ রব। বাঁশীর সুরের তালে তালে কেউ যেন নাচছে খুব আস্তে আস্তে···

এ কী স্বপ্ন, না সত্য? সব গুলিয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতে জোরে চিমটি কাটলুম। বেশ যন্ত্রণা করে উঠলো।

ঘরের আলোটাও তো জ্বলছে। দু'ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ। মনে পড়ছে বিছানায় শোবার আগে নিজের হাতে বন্ধ করেছিলুম। তবে?

বেজে চলেছে বাঁশী। সুরের মীড়ে মীড়ে বেদনার মূর্ছনা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুরের রিম্ ঝিম্ শব্দের সঙ্গে নৃত্যের মৃদু তাল···

কিছু করা দরকার। এভাবে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবো। মরীয়া হয়ে মাঝের দরজা খুলে পাশের ঘরে গিয়ে সুইচ টিপলুম। আলোতে ভরে গেল সমস্ত ঘর। কোথাও কিছু নেই, ঘর খালি!

আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে এলুম আবার এ ঘরে। ঘুমাবার চেষ্টা না করে পড়তে শুরু করলুম—'মরণের পারে'। জীবনের ওপারের মৃত্যুলোকের রহস্য! পাশের ঘর থেকে আর কোন শব্দই আসছে না। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম। একটু আগে যা শুনেছি তা ভুল। আমার অচেতন মনের কোনো স্বপ্ন-কামনা!

পড়তে পড়তে অনুভব করলুম, সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে আসছে, দেহ ভারহীন হয়ে উড়ে চলেছে কোন অজানা লোকের দিকে।

এ আধা চেতনার জগতে কতক্ষণ কিভাবে ছিলুম জানি না। সম্বিত ফিরে পেলুম দরজা ধাক্কার শব্দে। চোখ মেলে দেখলুম, অনেক বেলা হয়েছে। পূবের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘর ভরে গেছে।

দরজা খুলতেই দেখি, একখানি ট্রের ওপর টি-পট, কাপ, খাবার সাজিয়ে সহাস্থে দাঁড়িয়ে আছে নকুল ভৌমিক।

ঃ উঃ, কী ঘুমটাই না ঘুমিয়েছেন মশাই এতো বেলা অবধি! বলেছিলুম, সারা দার্জিলিঙ্-এ আপনি এমন বাড়ী পাবেন না যেখানে ইচ্ছামতো এত নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেন। এখন তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে চা খেয়ে একটু গরম হয়ে নিন ··

ঃ আপনি কেন চা আনতে গেলেন? আমি তো এখনি স্টেশনে গিয়ে চা খেয়ে আসতে পারতুম···

ঃ আমাকে বলে কোন লাভ নেই মশাই। নতুন অতিথির জন্য এ আমার গৃহিণীর ব্যবস্থা··

নকুল ভৌমিকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। লোকটি নাছোড়বান্দা। গত রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হতেই ওর এই গায়ে-পড়া উপকার প্রবৃত্তির হেতুটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারলুম। আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হলো, লোকটি হয়ত সত্যি সৎ, পরোপকারী। আমার আধুনিক শিক্ষিত মন সংস্কারান্ধ বলেই ওর সদিচ্ছায় সন্দেহ করছি···

যথা সময় অপিসের কাজে যোগ দিলুম। সহকর্মীরা যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেন। যারা মেসে বাস করেন তারা আমাকে একলা বাড়ীতে না থেকে তাদের সঙ্গে বাস করতে বললেন। আমার রোখ চেপে গেছে। সে বাড়ীর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে। তাদের অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলুম···

আপিস ছুটির পর পেট ভরে টিফিন খেয়ে জলা পাহাড় ঘুরে এলুম। যত দেখছি ততই যেন দার্জিলিঙ্-এর প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। পাহাড়ী রাস্তার ধারে একখানি বেঞ্চিতে বসে অস্তসূর্যের সোনার আলোকে প্রতিবিম্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘার যে অপূর্ব রূপসজ্জা দেখলুম তা আমাকে নিয়ে গেল আর এক রহস্যলোকে। ভুলে গেলুম বাড়ীর কথা, কলকাতার আকর্ষণীয় সাহিত্যিক আড্ডার কথা, আর এক বিগত রাত্রির অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা···

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে স্টেশনে ফিরে মাংস নিয়ে ভাল করে ভাত খেলুম। ম্যানেজারের অনুরোধে দু' পেগ হুইস্কিও টেনে নিলুম। দার্জিলিঙ্-এর শীতে শরীর তাগদ রাখবার অব্যর্থ মহৌষধ।

বাড়ীতে এসে দু'ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে শুরু করলুম —'মরণের পারে'। খানিকক্ষণ পরে নকুল ভৌমিক এলো। আর এক দফা

দার্জিলিঙ্‌-জীবন এবং এ বাড়ীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে বিদায় নিলো। রাত্র এগারটা অবধি পড়ে দু'ঘরের লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম।

রাত্র কতক্ষণ জানিনা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনুভব করলুম পাশের ঘরে কারা যেন ধস্তাধস্তি করছে। জোরে জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ শব্দ, চুড়ি আর ঘুঙুরের টুংটাং ঝম্‌ ঝম্‌ আওয়াজ, কে যেন কাকে ছুড়ে দিচ্ছে পিছনের বাথরুমের দরজার দিকে। স্পষ্ট শুনতে পেলুম, বাথরুমের দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ, বাথরুমে ধস্তাধস্তি, হাঁপাচ্ছে কেউ বাথরুমে, দীর্ঘ-নিশ্বাস এসে বিদ্ধ করছে আমার সর্বাঙ্গ, বাথরুমের ভেতর থেকে কে যেন জোরে জোরে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে আমার ঘর থেকে বাথরুমে যাবার দরজাটার ওপর, কার ধাক্কায় কে যেন সশব্দে পড়ে গেল বাথরুমে, গোঁ গোঁ শব্দ। সে শব্দও থেমে গেল একটু পরে। বুঝতে পারছি, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কে যেন বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিচ্ছে···

আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি! কি করবো, কি করা উচিত এখন? দুটো পথ খোলা আছে : সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়া এই গভীর রাত্রে দার্জিলিঙ্‌-এর নির্জন পথে কিংবা বাথরুমের দরজা খুলে দাঁড়ানো সে অদৃশ্য সত্তার সামনে!

শেষের পথটিই বেছে নিলুম। আমার জীবনের এমন কী মূল্য আছে? এ জীবন দিয়েও যদি নির্যাতিত একটি মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারি ক্ষতি কী? খুব সম্ভব আমার নিয়তিই নকুল ভৌমিকের রূপ ধরে এ সৎকাজ করবার জন্য আমাকে এনে ফেলেছে এখানে···

মনটিকে শক্ত করে বাথরুমের দরজা খুলে এগিয়ে গেলাম। মনে মনে যত বীরত্বই করি না কেন বাথরুমে পা দিতেই·গায়ের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে উঠলো। একী বাথরুম না আমার মৃত্যুকূপ? টলতে টলতে বাথরুমের সুইচটি টিপে দিলুম। ঘর একদম খালি। কেউ কোথাও নেই। মেঝে রক্তের চিহ্ন দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করলুম। কিছু নেই···

ঘরে ফিরে পাশের ঘরে গিয়ে আলো জাললুম। মানুষ বাস করার চিহ্নমাত্র নেই এই ঘরে। এ কী স্বপ্ন! এ কী মায়া! আমি কী পাগল হয়ে যাবো? নিজের অজ্ঞাতে আবৃত্তি করতে লাগলুম :

তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?

তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ববেনা ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবেনা রাঙাবরণ ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবেনা ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ?

অসীম ক্লান্তিতে চেয়ারে বসে মাথা গুঁজে রইলুম। কতক্ষণ এভাবে ছিলুম জানিনা। যখন মাথা তুললুম দেখি, প্রভাত সূর্যের অরুণালোকে কাঞ্চনজঙ্ঘা হেসে উঠেছে সলজ্জ নববধূর মতো!

* * * *

সেদিন আপিসে সারাদিন আনমনা হয়ে রইলুম। গত রাত্রের যে বীভৎস অভিজ্ঞতা চেতনার জগতে আলোড়ন তুলেছে কে সে বিদেহী পুরুষ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে যে একটি নারীর গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করছে? কী করেছিল মেয়েটি যার জন্য পুরুষটি এতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে? মেয়েটি কী শেষ পর্যন্ত ওই জিঘাংসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, না তার জীবনের মর্মান্তিক অবসান ঘটেছে বাথরুমরূপী অন্ধকার মৃত্যুকূপে? এমনি কতো জিজ্ঞাসা উদ্‌ভ্রান্ত করলো মনকে···

আমার বয়সী দু' একজন মেসবাসী সহকর্মী ছুটির পর তাদের মেসে যেতে সাদর আমন্ত্রণ জানালো। আর একদিন যাব বলে তাড়াতাড়ি নেমে এলুম রাস্তায়। ছাই রঙের বাড়ীটি আমাকে টানছে দুর্ণিবার আকর্ষণে!

রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ মনে পড়লো পরশুরাম রোকার কথা। আমার কলেজ-জীবনের অন্তরঙ্গ নেপালী বন্ধু। বহুকাল আগে ওর চিঠিতে জেনেছিলুম, দার্জিলিঙ্ সরকারী স্কুলে সে শিক্ষকের কাজ করে, আর হস্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট্ হিসেবে হস্টেল সংলগ্ন কোয়াটার্সে সপরিবারে বাস করছে।

পথচারী দু' একজনকে জিজ্ঞেস করতেই স্কুল এবং হস্টেলের হদিশ মিলল। হস্টেলের কাছে আসতেই বুঝতে পারলুম,জায়গাটি আমার ছাই-রঙের বাড়ীটির অতি-নিকটে, কিছুটা নীচে। পরশুরাম রোকা বাড়ীতেই ছিলো। আমাকে দেখে আনন্দে কলকণ্ঠ হয়ে উঠলো। বুকে জড়িয়ে ধরে তার নেপালী স্ত্রীর কাছে হাজির করলো। পরিচয় করিয়ে দিলো। বাংলায় কথা বলে আমাকে অভ্যর্থনা করলো তার স্ত্রী ভানুমতী। খুব সম্ভব রোকা ওকে শিখিয়েছে। রোকা বাংলায় কথা বলতে, বাঙালীর মত চলতে, খেতে ভালোবাসে। কলকাতায়

পড়বার সময় বহুবার আমাদের বাড়ীতে এসেছে, খেয়েছে, দু'একরাত থেকেছেও।

মিঃ রোকা ও ভানুমতী কেউ আমাকে সে রাত্রে আমার ছাই রঙ-এর বাড়ীতে ফিরে যেতে দিতে চাইলো না। রোকা বললো, কাঞ্চাকে নিয়ে আমি এখনই তোর জিনিষপত্র নিয়ে আসছি। যতদিন কোথাও থাকবার সুবিধা করতে না পারিস ততদিন এখানেই থাকবি। দুই রাত ওই বাড়ীতে একলা থেকেও যে তুই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছিস সে তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি! কত ভাড়াটিয়া সে বাড়ীতে এলো আর গেল, কেউ থাকতে পারেনি…

: কেন, বাড়ীটি তো চমৎকার…

চমৎকার না ছাই। গত কয়েক বৎসর পর্যন্ত কোন ভাড়াটিয়া সে বাড়ীতে টেকেনি। রাত্রে ঘুমুতে পারতো না। কেউ কেউ তো অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে গেছে। দেখিস্‌নি দরজার কপাটের ওপর সর্বত্র লেখা আছে—'রাম নাম সাচ হ্যায়…

: দেখেছি, কেন লিখেছে ?

: সে এক মিষ্ট্রি। সব বলবো তোকে আজ রাত্রে খাবার পরে। এখন চল, জিনিষগুলো নিয়ে আসি··

: কিন্তু বাড়ীওয়ালাকে না বলে, বাড়ীভাড়া না চুকিয়ে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না ভাই…

: বাড়ীওয়ালা আবার কে ? ওই নকুল ভৌমিক ? সে তো দালাল। আমি ওকে চিনি। ওর সঙ্গে আমি সব বন্দোবস্ত করবো। তোর কোন চিন্তা নেই…

খাওয়ার পরে মিঃ রোকার ড্রইং রুমে ভানুমতীকে নিয়ে আমরা দুই পুরনো বন্ধু বেশ মৌজ করে বসলুম। রোকা ছাই-রঙ-এর বাড়ীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করলো এভাবে :

রণবাহাদুর এবং তুলসীবাহাদুর—দুই বন্ধু বাস করতো দার্জিলিঙ্‌ সহরের অদূরে একটি বস্তীতে। ছোট বেলা থেকেই বন্ধুত্ব, দুজনে অভিন্ন-হৃদয়। কেউ কাউকে কোন জিনিষ না দিয়ে খায় না, বেড়াতে যাওয়া, 'ঢেউ শিরে' উৎসবে যাওয়া সব একসঙ্গে। বস্তী থেকে সব্‌জী সংগ্রহ করে দুইজনেই বিক্রী করতো দার্জিলিঙ্‌-এর বাজারে। এ ব্যবসা করতে গিয়ে ওদের পরিচয় হলো কলকাতার একজন বড়ো সব্‌জি-কণ্ট্রাকটারের সঙ্গে। তাঁর অনুরোধে তাঁকে সব্‌জি সরবরাহ করে দুজনের আয় ফেঁপে উঠলো। দুই বন্ধুতে তখন পরামর্শ

করে দার্জিলিঙে একটি বাড়ী ভাড়া করে থাকবে ঠিক করলো। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর ভাড়া করলো অবশেষে তারা ওই ছাই রঙ-এর বাড়ীটি, যে বাড়ীতে তুই দুই রাত কাটিয়ে এসেছিস ··

ঃ তারপর···

ঃ দুজনে হোটেলে খায়, পালা করে বস্তী থেকে সব্‌জি সংগ্রহ করে আনে। যেদিন বেশী আয় হয় দুজনেই মহানন্দে হিন্দী সিনেমা দেখে, বিলেতি মদ খায়, আবার মাঝে মাঝে পশুপতিনাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করে

বেশ চলছিল দুই বন্ধুর আনন্দময় জীবন। তবে বেশীদিন চললো না। দুই-বন্ধুর অভিন্ন হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিল একটি নারী···

ঃ কী রকম ?

ঃ রণবাহাদুর একদিন বললো, তুলসী, আমাদের তো বেশ টাকা পয়সা হয়েছে, এখন আর হোটেলে খেয়ে কষ্ট করতে ভালো লাগেনা। কী বলিস ?

ঃ ঠিক বলেছিস, আমারও ভাই ভালো লাগছে না···

ঃ তবে তুই একটি বিয়ে কর। বৌ এসে রান্না করবে, আর আমরা দুজনে বেশ ভালো করে খাবো···

ঃ না ভাই, আমি বিয়ে করতে পারবো না, আমার ভয় করে। তার চাইতে তুই বিয়ে কর। আমি খুবই খুশী হবো···

ঃ বলছিস্ ? শেষে আপশোষ করবি না তো ?

ঃ কী যে বলিস ? তুই আমাকে এত পর ভাবিস রণবাহাদুর ?

রণবাহুরের প্রকৃতিটি উদ্দাম, আর তুলসী ধীর, শান্ত। রণবাহাদুর হিন্দী সিনেমার নায়কের মত নাচে, শীস দেয়, সময় অসময় হিন্দী প্রেমের গান গেয়ে পাড়া মাতিয়ে তোলে, আর তুলসী অবসর সময় বাঁশী বাজায়। চমৎকার বাঁশী বাজায় তুলসী, বাঁশীর স্বরে স্বরে অন্তরের না-বলা-বাণীকে যেন ভাষা দেয়···

তুলসী একদিন সবিস্ময়ে দেখলো, ওদের বস্তীর ত্রিকম ছেত্রীর মেয়ে মনমায়াকে নিয়ে এসেছে রণবাহাদুর ছাই-রঙের বাড়ীটিতে। ওদের মধ্যে যে ইতোমধ্যে ভাব হয়ে গেছে তার কোন খবরই পায়নি তুলসী।

রণবাহাদুর বললো ঃ

ঃ মনমায়াকে নিয়ে এলুম তুলসী। কিছুদিন এখানে থাক। মনের মিল হয় কিনা দেখি। তারপর বিয়ে করব। তুই কী বলিস ?

: বেশ তো, বেশ তো···

: তাহলে আমরা ভেতরের ঘরটায় থাকি, তুই বাইরের ঘরটায় থাক। কী বলিস তুলসী···

: তোদের অসুবিধা হবে। তার চাইতে অন্য কোথাও গিয়ে থাকি আমি···

ঘাড়ে প্রচণ্ড একটা গাট্টা মেরে রণবাহুর তুলসীকে জড়িয়ে ধরলো। তুই আর আমি কী আলাদা যে মনমায়াকে এনেছি বলে আর কোথাও চলে যাবি ? এমন কথা বললে তোকে আস্ত রাখবো না।···

মনমায়াকে আনবার পর রণবাহাদুর আরো যেন উদ্দাম হয়ে উঠলো। দুপুরে তার জন্য কিনে আনছে এক রাশ স্নো-পাউডার-ক্রীম-সেণ্ট্-সাড়ী, সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে সিনেমায়, তুলসীকেও জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি খাবার কিনে আনছে, আর ঘুরছে মনমায়ার পায়ে পায়ে··

তুলসীর অবস্থা ঠিক উলটো। মনমায়া আসার পর সে যেন আরও ধীর গম্ভীর হয়ে গেছে। অবকাশ সময় বাইরের ঘরটায় বসে বসে সে বাঁশী বাজায়। বাঁশীর সুরে মনমায়া আনমনা হয়ে ওঠে। কাজ করতে ভুলে যায়। চুপ করে বসে থাকে রান্না বা শোবার ঘরে। রণবাহাদুরের হৈ হুল্লোড়ে সে আচমকা জেগে ওঠে জগতের বাস্তবতায়। মনমায়ার এ ভাবান্তর রণবাহাদুরের চোখ এড়ায় না। তার চোখ দুটো হিংসায় কুটিল হয়ে ওঠে···

একদিন রণবাহাদুর ও তুলসী মাল সরবরাহের একটি বড়ো রকমের কণ্ট্রাক্ট্ পেল সেই কণ্ট্রাক্টার থেকে। তাড়াতাড়ি মাল সরবরাহ করতে হবে। সেবার মাল সংগ্রহের পালা রণবাহাদুরের। বস্তীতে গিয়ে অন্তত দুই তিন দিন থাকা দরকার, না হলে তাড়াতাড়ি এত মাল সংগ্রহ সম্ভব হবে না। রণবাহাদুর পরম অনিচ্ছায় বন্ধু তুলসীর ওপর মনমায়াকে দেখবার ভার দিয়ে বস্তীর দিকে চলে গেল।

মনমায়া হাতে স্বর্গ পেল। তুলসীকে আজ একান্তে পাবে সে। সযত্নে অনেক উপচারে রান্না করে রাত্রে সে তুলসীকে খাওয়ালো। খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। খাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে ঘটা করে সাজলো। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিলো। তারপর তুলসীকে ডাকলো নিজের ঘরে।

তুলসী যেতে রাজী হয়না। সে জোর করে তুলসীর হাত ধরে টেনে নিলো নিজের ঘরে। বললো :

: তুলসী, তুমি বাঁশী বাজাও, আমি নাচবো···

বাঁশীর সুরে তুলসী ঢেলে দিলে তার অবরুদ্ধ অন্তরের আনন্দ ও বেদনার

অনুভূতি। তুলসীও রক্তমাংসের মানুষ, তারও আছে কামনায় এবং বেদনায় ভরা সুকুমার একটি অন্তর। এতদিন সংযমের কঠিন বাঁধ দিয়ে সে বাধা দিয়েছিল সে অন্তরের অনুভূতিকে। আজ মুখর হয়ে উঠেছে সেই অনুভূতি বাঁশীর সুরে সুরে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে ঘুঙুর পায়ে মনমায়ার নাচ ধীরে—অতি ধীরে। মনমায়ার মনে সৃষ্টি হয়েছে শিল্পীর সাহচর্যে অপরূপ একটি ভাবলোক —বন্যপ্রকৃতি রণবাহাদুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাস করেও যে জগতের সন্ধান সে পায়না···

: তুলসী···তুলসী ··দরজা খোল···

—বাইরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। ধাক্কার পর ধাক্কা···

রণবাহাদুরের দুই তিন দিন পরে ফিরবার কথা। সে রাত্রেই সে ফিরে আসতে পারে মনমায়া বা তুলসী কেউ ভাবতেও পারেনি। মনমায়া ভয়ে কুঁকড়ে উঠলো। রণবাহাদুরের প্রকৃতি সে জানে···

তুলসী এসে দরজা খুলে দিলো। ঘরে ঢুকেই রণবাহাদুর দরজা বন্ধ করলো। তারপর তুলসীকে টেনে নিলে ওর শোবার ঘরে। সে ঘরে গিয়েই দরজা বন্ধ করে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তুলসীর ওপর। তুলসীর শরীরেও শক্তি কম নয়। দুজনের শুরু হলো প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। প্রচুর মদ খেয়ে এসেছে রণবাহাদুর। গায়ে ওর অসুরের শক্তি। এক সময় কায়দা করে তুলসীকে নীচে ফেলে গলা টিপে ধরলো। কিছুক্ষণ গোঁ গোঁ শব্দ, তারপর সব শেষ···

এরপর মনমায়ার পালা। রণবাহাদুর মনমায়াকে ছুঁড়ে দিলো পিছনের বারান্দার দিকে। সেখান থেকে আবার ছুঁড়লো বাথরুমের দরজার ওপর। দরজাটা বন্ধ ছিলো। রণবাহাদুর দরজাটা খুলেই জাপটে ধরলো মনমায়াকে। অন্ধকারে ফসকে গিয়ে মনমায়া ধাক্কা দিতে লাগলো সামনের ঘরে যাবার দরজাটার ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে। রণবাহাদুর কাছে আসতেই সে ছিটকে গেল আর এক দিকে। এভাবে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে রণবাহাদুর মনমায়াকে ধরে ফেলল। মাটিতে ফেলে শক্ত হাতে তার গলা টিপে ধরলো। খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ শব্দ, তারপর আর কোন সাড়া নেই···

রণবাহাদুর তখন উন্মত্ত হয়ে গেছে। বাইরে এসে বাথরুমের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সে ছুটে পালাল বাইরের দিকে। পরের দিন বুকে তীক্ষ্ণ ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় রণবাহাদুরকে পাওয়া গেল পাগলাঝোরার কাছে। তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে বহুক্ষণ আগে ··

রোকা বললো, এই হলো ছাই রঙের বাড়ীর বাঁশীর সুর ঘুঙুর পায়ে

নাচের শব্দ, ধস্তাধস্তি, গোঙানী, বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আসল রহস্য। রণবাহাদুর, মনমায়া এবং তুলসীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর অশান্ত আত্মা এখনও গভীর রাত্রে সজীব হয়ে ওঠে ওই অভিশপ্ত বাড়ীটাতে। তোর আগে আরও অনেক ভাড়াটিয়া এসেছে ও বাড়ীতে। সকলেরই একই অভিজ্ঞতা। শেষ এসেছিল সপরিবারে এক বিহারী ভদ্রলোক—ভূত তাড়াবার জন্য যিনি কপাটের ওপর লিখে রেখেছেন—'রাম নাম সাচ হ্যায়'। একবার এক ভদ্রলোক তো এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় পাগল হয়ে গেলেন। হাসপাতালে সময়মতো চিকিৎসায় তিনি অবশ্য বেঁচে গেছেন। তবে দুর্বল স্নায়ুর আর এক ভদ্রলোক ও বাড়ীর ভৌতিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় পাগল হয়ে গেছেন। ভাগ্যিস, তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। না হলে তোরও কি হতো কে জানে? ইদানীং ও বাড়ীর তো কোন ভাড়াই হচ্ছিল না। নকুল ভৌমিক তাই সুকৌশলে যোগাড় করেছে তোকে। তুই যদি ও বাড়ীতে পার্মানেন্ট্ থেকে যেতে পারতিস তাহলে বাড়ীওয়ালা থেকে সে বেশ ভালো একটা ফি পেতো···

মিঃ রোকার শেষ কথাগুলো আমার কানে গেল না।

আমার মন তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে রণবাহাদুর মনমায়া আর তুলসীকে ঘিরে—প্রেমার্ত হৃদয়ের উন্মাদ নৃত্য, প্রতিহিংসায় ভয়ঙ্কর, আত্মাহননে করুণ, বিচিত্র নারীচিত্তের দ্বিধা, শিল্পী মনের বাসনা ও বেদনায় মেশানো সে অজ্ঞেয় রহস্যলোকে—যার ক্ষণসান্নিধ্যে এসে আমার সমগ্রসত্তায়ও জেগেছিল এক প্রবল আলোড়ন।

দস্তয়েফ্‌স্কি

যজ্ঞেশ্বর রায়

বাইশ

মারিআর সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির প্রেম প্রেমের লুকোচুরি খেলা ছিলনা, ছিলনা ক্ষণকালের সঙ্গ-সুখের আনন্দ। তিনি তাঁকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রথম প্রেম দিয়ে পরিপূর্ণ আবেগে ভালবেসেছিলেন। তাঁর মধ্যেকার যা-কিছু সুন্দর, উদার ও মহৎ, যত অনিরুদ্ধ আবেগ ও বাসনা সব উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন সে ভালবাসার সঙ্গে—একখানা তাসে বেপরোয়া জুয়াড়ী যেমন তার সর্বস্ব পণ করে বসে। আর তার ফলে জেগে থাকলে চোখের জলে সব আবছা দেখছেন, ঘুমোলে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা।

মারিআর চিঠি এলেও তাঁর শান্তি ছিল না। তাঁর চিঠির জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন কিন্তু চিঠি এলে তক্ষুনি খুলে পড়তে পারেন না আজকাল। কী থাকবে তাতে তিনি জেনে গেছেন, অর্থাৎ তিনি যা আশা করছেন তা থাকবে না অধিকন্তু সন্দেহ সংশয় আর তজ্জনিত ক্ষোভ তিরস্কার থাকবে।

কাজাক্ষফ গারডেনসের যে নির্জন ছায়ার বেঞ্চিতে বসে শেষ বারের মতন মারিআকে বুকে ধরেছিলেন তিনি, সেখানে এসে একলা বসে থাকেন এখন, আর সেই মধুর-স্মৃতির কণ্ঠের মধ্যে ডুবে যান, ভ্রাঙ্গেল এসে পাশে বসলে তাঁর সঙ্গে মারিয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন। কথা বলেন আর চোখের জল ফেলেন। এই বিরহ-কাতর মানুষটির যন্ত্রণা অবশেষে তাঁর ছোট্ট বন্ধু মহলটিকেও বিব্রত করে তুলল। তারা তাঁকে শান্ত অন্যমনস্ক করতে আনন্দ দিতে টেনে হেঁচড়ে নাচের আসরে নিয়ে যেতে থাকল। না-ছোড়বান্দা বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু'চার বার নাইট ক্লাবে নাচের ফ্লোরে যেতে হল তাঁকে। কিন্তু অনিচ্ছার সে কর্মেরও ফল ফলল গুরুতর। মন তাতে করে প্রফুল্ল অন্যমনস্ক ত হলইনা অধিকন্তু মারিআর কাছ থেকে মিলল বিদ্রূপ আর তিরস্কার। তাঁর নাইট ক্লাবে যাওয়া নিয়ে কারা রঙ ফলিয়ে চিঠি লিখেছিল মারিআকে। আর মারিআ, একেত মনসা তাতে আবার ধূপের ধুয়ো, রেগেমেগে তাকে নানা কটূক্তিতে জেরবার করতে থাকলেন।

'না, এ মিথ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। বেশী দূর একে এগুতে দিলে, বেশীদিন চলতে থাকলে ভাবপ্রবণ মানুষটি হয়ত আত্মহত্যা করে বসবে। অদর্শনের ফলেই এই ভুল বোঝাবুঝি, দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্যেই এই ঈর্ষা আর হিংসা। অতএব ওদের অবিলম্বে একজায়গায় হওয়া দরকার, মুখোমুখি বসা, কথাবার্তা বলা দরকার।' বন্ধুরা সকলে মিলে পরামর্শ করল।

ঠিক হল সেমিপালাতিনস্ক আর কুজনেস্কের মাঝামাঝি একজায়গায় গিয়ে দস্তয়েফ্স্কি মারিআর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু যাবেন বললেই হুট করে যেতে পারেননা তিনি। একজন সামান্য সৈনিকের পক্ষে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলের এলাকার বাইরে দূরে যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ তার ওপরে তিনি আবার নজর-বন্দী। সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সবসময় সতর্ক হয়ে আছে তাঁর ওপরে। বন্ধুরা তখন একটা ফন্দি আঁটল। ভ্রাঙ্গেলের এক ডাক্তার বাবুর থেকে একটা সারটিফিকেট আদায় করল তারা। ডাক্তার লিখে ছিলেন, দস্তয়েফ্স্কি অসুস্থ। তাঁকে দিন কয়েক বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। নড়া-চড়া পর্যন্ত চলবে না। ব্যস, সেই মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটি যথাস্থানে দাখিল করে নিঃশব্দে কেটে পড়লেন দস্তয়েফ্স্কি।

তার আগেই দিন তারিখ জানিয়ে মারিআকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তিনি, তুমি জামিএভে এস আমি ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছি। এক দুরন্ত দুর্নিবার আগ্রহ নিয়ে দু'শ মাইল ছুটে গেলেন দস্তয়েফ্স্কি। কিন্তু এত কাঠ খড় পুড়িয়ে এত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর সেই প্রেমাভিসার একেবারেই বিফলে গেল। গিয়ে দেখেন মারিআ আসেনি। এসেছে তার একখানা চিঠি; অতিশয় সংক্ষিপ্ত তার ভাষণ, "বিশেষ কারণে কুজনেস্ক ছেড়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ক্ষমা কর।"

পত্র পেয়ে ধূলো পায়েই ফিরে এলেন তিনি। ফিরে এসে পথের ধকলে আর হতাশায় এবার সত্যি শয্যা নিলেন তিনি; ক'দিন আর বিছানা থেকেই উঠতে পারলেন না। কেন মারিআ এলনা, কী বিশেষ কারণে সে আটকে গেল?…নাকি…তবেকি…সে কি… তাকে কি…সন্দেহ যন্ত্রণা অবিশ্বাস দুর্বল স্নায়ুর মানুষটিকে কুরে কুরে খেতে থাকল। কয়েক দিন বিছানায় পড়ে থেকে উঠে বসলেন বটে, কাজেও বেরোলেন; কিন্তু অস্থির যন্ত্রণায় দিন যাপন তাঁর মর্মান্তিক হয়ে উঠল। তিনি জামিএভে গিয়েছিলেন জুলাই মাসের প্রথম দিকে সেই থেকে একটা চিঠিও আর লেখেননি মারিআ। কী হল তার,…সেকী

তবে আর···না দস্তয়েফ্স্কি ভাবতে পারলেন না মরিআ তাঁকে ভুলে গেছে, মারিআ তাঁকে উপেক্ষা করছে, মারিআ আর কাউকে ভালবাসছে। কিন্তু ভাবতে পারা যায়না বলেই ত আর ভাবনা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ভাবনা অক্টোপাসের মতন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, তাঁকে হাড়ে মাসে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। এহেন নিদারুণ অবস্থায় অবশেষে চিঠি এল মারিআর, সেটা ১৮৫৫-র চৌদ্দ আগস্ট কি কাছাকাছি একটা দিন। দীর্ঘ চিঠি। খুঁটে খুঁটে সব লিখেছেন মারিআ।

—জামিএভ যাওয়ার নিমন্ত্রণ পাওয়ার আগেই রোগে পড়েছিল ইসায়েফ। ক্রমশ সে রোগ বাঁকা পথ নিচ্ছিল। জুলাইয়ের শেষে এসে জানা গেল এ রোগ থেকে ইসায়েফের আর নিস্তার নেই। সত্যি নিস্তার পেলনা কিংবা মরে জীবন-যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেল মানুষটা। "·· ···আমাদের ভাসিয়ে গেল বলব না, ও বেঁচে থাকতেই আমরা ভাসছিলাম।···মরার সময় মানুষটি আমাকে ও ছেলেকে অনেক আশীর্বাদ করল। ওর চোখ বেয়ে জল পডছিল তখন। করুণ সে দৃশ্য ধারাল নখের আঁচড় কাটছিল আমার বুকে।" স্বামীর মৃত্যুর কথা লিখতে বসে নিজের বর্তমান অসহায় অবস্থার কথাও বাদ দিতে পারেনি মারিআ, লিখেছে, "কপর্দকহীন এই অবস্থায় কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না।···"

পত্র পেয়ে দস্তয়েফ্স্কি এত দিনে সুস্থ হলেন, স্বস্তি পেলেন। ইসায়েফের জন্যে তাঁর দুঃখ হল বটে, দীর্ঘশ্বাসও পড়ল একটা; কিন্তু মারিআর পত্র পেয়ে তিনি যে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন সে আনন্দ মলিন হল না। যে নিষ্ঠুর চিন্তাটা তাঁকে একটা নিদারুণ জোঁকের মতন কামড়ে ধরে প্রাণপণে রক্ত খাচ্ছিল সেটা খসে পড়ল এখন। হালকা হলেন দস্তয়েফ্স্কি। তক্ষুণি মারিআকে পঁচিশ রুবল পাঠিয়ে দিলেন। ওই ক'টা রুবলই মাত্র ছিল তাঁর কাছে; কিন্তু এই বিপদে ওই ক'টা টাকায় তাঁর কীহবে! অথচ ভ্রাঙ্গেল তখন বারনাফলে। ঈশ্বরের নামে দোহাই গেয়ে তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন, "সদ্য বিধবার প্রতি দয়ালু হও তুমি, এ বিপদে তাকে সাহায্য কর।"

সত্যি বিপদ, বড় বিপদে পড়েছেন মারিআ। কাছে পিঠে না আছে কোন আত্মীয় স্বজন, না কোন বন্ধু-বান্ধব। একলা বিদেশে নিঃসম্বল তিনি তার ওপরে একটি কচি ছেলের বোঝা। এমন অসহায় অবস্থায় মারিআ ওখানে থাকবে কী করে? দস্তয়েফ্স্কি অস্থির হয়ে উঠবেন, স্বাভাবিক। ইসায়েফের মৃত্যুর পরে দস্তয়েফ্স্কির সঙ্গে মারিআর সম্পর্কের পরিবেশটাও

বদলে গেল অনেকখানি। এখন আর তাঁদের প্রণয় লুকিয়ে রাখার ব্যাপার নয়। দস্তয়েফ্‌স্কি বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন মারিআর কাছে ; আর দ্বিধা কেন, আর অপেক্ষা কিসের জন্যে ? দস্তয়েফ্‌স্কি যে মারিয়াকে সাহায্য করবার জন্যে, তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার জন্যেই এ প্রস্তাব পাঠালেন তা নয়। একটা অচরিতার্থ ভালবাসার দুর্নিবার কষ্টে তিনি ভুগছেন ঠিকই, এ কষ্ট পার হয়ে এসে পরিতৃপ্তির স্বর্গে তিনি পৌছতে চান অবশ্যি ; কিন্তু তার চেয়েও বড় দরকার আজ তাঁর পারিবারিক জীবনের শান্তি।

"বিবাহিত জীবনের চেয়ে সুখের আর কিছু নেই পৃথিবীতে।" জেল থেকে বেরিয়েই তিনি লিখেছিলেন দাদাকে। জেলে যাওয়ার আগে হতাশায় বিপর্যস্ত তিনি বার বার বারবণিতার কাছে ছুটে গিয়েছেন ; কিন্তু জেনেছেন ওরা ক্ষণকালের জ্বালা জুড়োতে জানে, সব সময়ের শান্তি দিতে পারে না কখনো। সেই অনুক্ষণের শান্তির জন্যে চাই স্ত্রী, চাই পরিবার-জীবন। আজ তাঁর কেবলই মনে হয়, তাঁর বাবা-মার দাম্পত্য-জীবন ছিল বড় নির্মল বড় সুখের। সেই সুবিমল সুখী পরিবেশে তাঁর কৈশোর কেটেছে, তাঁর এত কালের জীবনে সেই কৈশোর কালের মতন এমন হৃদয়-জুড়োনো স্মৃতি আর নেই। বিয়ে করে তিনি সেই সুখের জীবনে ফিরে যেতে চান। এতদিনের মর্মান্তিক দুঃখ দুর্দশা ভোগের শেষে আজ সেই বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিই তাঁর আদর্শ হয়ে উঠবে, তাঁকে আকুল করে টানবে, স্বাভাবিক। তা ছাড়া মাকে হারানোর পরে, সেই সতর বছর বয়স থেকে পৃথিবীর কোন কোথাও তাঁর ক্ষুদ্রতম এমন একটা কোণ নেই, যাকে তিনি নিজের বলতে পারেন, 'আমার' বলে আঁকড়ে থাকতে পারেন। বিয়ে করলে নেই কোণটি পাবেন তিনি, সেই গৃহকোণ : দাম্পত্য-জীবনের সেই মাটির-স্বর্গই কেবল হাতছানি দিচ্ছিল তাঁকে। সেই টানেই তিনি মারিআকে টানতে চাইছেন নিজের কাছে। নারী-বুকের উত্তাপে লালিত পারিবাবিক জীবনের আরাম আজ তাঁর জীবনের ঐকান্তিক প্রার্থনা। মারিআর সঙ্গে বিয়ে মানে এক অকৃত্রিম ভালবাসার উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান। মারিআকে বিয়ে করা মানে সমস্ত সমস্যার সমাধান। তাঁর ভাবাবেগ, তাঁর যৌনতাড়না পাড়ের নিগড়ে নির্দিষ্ট গতি নদীর মতন সংগত গতিতে বয়ে যাবে, তা আর তাঁর সাহিত্য-চিন্তার বাধা হবেনা কখনো। সংযত জীবনের ব্যয়ও হবে সংযত, আর্থিক ক্লেশ কমে আসবে।

অথচ মারিআর চিন্তার সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির চিন্তার কোন মিল ছিল না।

তাঁর চিন্তা হচ্ছিল ভিন্ন খাতে।" তিনি দস্তয়েফ্‌স্কির দ্রুত ও নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের আকুল প্রার্থনার জবাবে জানালেন, আমি বড় হতাশায় ভুগছি। বুঝতে পারছিনা আমি কি করব।"

দস্তয়েফস্কি বুঝতে পারেন মারিআর এই দ্বিধার জন্যে তাঁর নিজের আর্থিক দৈন্যই দায়ী। শুধু কী অর্থের দৈন্য, তাঁর যে সামাজিক মর্যাদাও নেই। সরকার তাঁর 'ভদ্রলোকের মর্যাদা' কেড়ে নিয়েছেন। তাঁকে সৈন্য বিভাগে একজন সামান্য পদাতিক করে রেখেছেন। সর্বোপরি তিনি নজরবন্দী। সরকার এখনও তাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। মস্কোআ বা পেতেরসবুর্গে চিঠি লিখলে সেগুলি গুপ্তচর বিভাগের দপ্তরে যায়। তাঁরা খুলে পড়েন তবে যথাস্থানে যেতে দেন। এ মর্মান্তিক অবস্থায় হয়ত তাঁকে আরও বছর চার থাকতে হবে তার পরেও যে তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। অনিশ্চিত কুয়াশায় অস্পষ্ট সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, লেখক হিসেবেও যে তিনি দারুণ কিছু হবেন এমন প্রমাণই বা কী তিনি রাখতে পেরেছেন মারিআর সামনে। দশ বছর আগে তিনি 'বেদ নিয়ে লিয়ুদি (অভাজন) লিখে নাম করেছিলেন। এত দিনে সে নাম হয়ত পাঠকের মন থেকে মুছে গেছে। তিনি যদি এখন ভাল কিছু লিখতে পারেনও সরকার তা প্রকাশ করতে দেবে, এমন নিশ্চয়তাও নেই। পেতেরসবুর্গ যাওয়ার রাস্তা তাঁর বন্ধ। আয় বলতে দাদার দয়ার দান ছাড়া কিছু নেই। এমন অসহায় নিঃসম্বলকে কী কেউ বিয়ে করতে চাইবে? দস্তয়েফ্‌স্কি স্বীকার করেন মারিআর ভয় স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে জার সম্রাট প্রথম নিকোলাস মারা গেছেন। ১৮৫৫-র মার্চে দ্বিতীয় আলেকজানদার সিংহাসন আরোহণ করেছেন। দস্তয়েফ্‌স্কি শুনেছেন, মানুষটি প্রথম নিকোলাসের মতন কট্টর নন, প্রজাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে তিনি রাজী। তা ছাড়া রাজনৈতিক আবহাওয়াটাও নাকি বেশ অনুকূল। দস্তয়েফ্‌স্কি চিঠির পর চিঠি লিখতে শুরু করেছেন তাঁর মস্কোয়া ও পেতেরসবুর্গের বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে—দোহাই তোমাদের, তোমরা একটু চেষ্টা কর। এই মিলিটারী চাকরীতেই আমার যাতে পদোন্নতি হয়। আমার বই যাতে ছাপতে অনুমতি দেয় সরকার তার জন্যে তোমরা একটু উঠে পড়ে লাগো।"

যেমন চিঠি লেখেন রাজধানীতে তেমনি লেখেন মারিআকে, "শোন মারিআ,

ভাগ্যকে জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছি আমি। তুমি পাশে এসে দাঁড়াও, তুমি উৎসাহ দাও। দেখো কিছুই অজেয় থাকবে না আমার।”

এই সব মিনতি ও প্রার্থনা এবং দুর্দম সংকল্পের চিঠি পড়ে মাঝে মাঝে মন যে টলে ওঠে না মারিআর, তিনি যে বিয়ের সম্মতি দিতে চান না তা নয়। কিন্তু সম্মতি দিতে মন তৈরি হয়ে উঠতে উঠতেই আবার অবিশ্বাস এসে অবশ করে তাঁকে। প্রেম ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ক্রমাগত দুলতে থাকেন তিনি।

মন স্থির করা কঠিন হয়ে ওঠে তাঁর। মারিআকে যদি একমাত্র দস্তয়েফ্‌স্কির দয়ার দানের ওপরেই ভরসা করতে হত, তাঁর যদি নির্ভর করার আর কেউ কিংবা আর কিছু না থাকত ত ভিন্ন কথা ছিল। কিছু তা নয়। তাঁর বাবা আসত্রাখান থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন মাঝে মাঝে, সরকারি চাকুরের বিধবা হিসেবেও কিছু পেনশন পাচ্ছেন তিনি। অতএব সম্মতি দেওয়ার আগে সব দিক ভেবে দেখবার অবসর ছিল বইকি তাঁর। তার ওপরে মহিলার রয়েছে অসুখ। নিত্য-রোগী তিনি। পরবর্তীকালে যে-রোগ তাঁর যক্ষায় দাঁড়িয়েছিল বর্তমানে তারই সূচনায় ভুগছিলেন তিনি। আর সেই লাগাতার সর্দি কাশি অল্প অল্প গা-গরম তাঁর স্নায়ুগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ফলে প্রশান্ত চিত্তে কিছু ভাবতে পারতেন না তিনি। যা ভাবতেন তার ওপরে ভরসা রাখতে পারতেন না, ক্রমাগত মত বদলাতেন। অভাব অসুখ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাঁর মেজাজটাকে খিটখিটে করে দিয়েছিল। সর্বোপরি একটা সন্দেহ ও ঈর্ষায় ভুগছিলেন তিনি। পাঁচশ' মাইল দূরে বসে দস্তয়েফ্‌স্কির নিষ্ঠার ওপরে যেন তিনি আর নির্ভর রাখতে পারছিলেন না। মারিআর সঙ্গে তিনি প্রেম করছেন আর বাড়ীওলীর মেয়ের সঙ্গে শুচ্ছেন, এ সন্দেহ কেবলই বিঁধছিল তাঁকে। তাই তিনি দস্তয়েফ্‌স্কিকে একটু যাচাই করে নিতে চাইলেন। বলা ভাল, জ্বালাতন করতে চাইলেন, লিখলেন, ‘তুমি আমার একজন ঐকান্তিক শুভানুধ্যায়ী, আমাকে নিঃস্বার্থ জবাব দাও, আমার বর্তমান অসহায় অবস্থা দেখে যদি কোন সচ্ছল দয়ালু প্রৌঢ় আমাকে বিয়ে করতে চায়, মত দেব কী?

সেই চিঠি পড়ে দস্তয়েফ্‌স্কির বজ্রাহত মানুষের অবস্থা। বিমূঢ় তিনি দু' হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন। ব্যর্থ প্রণয়ের তপ্ত অশ্রু দু'চোখ বেয়ে অঝোরে ঝরতে থাকল। কেঁদে কেঁদে মনটা যখন হালকা হল, আবার পড়লেন তিনি চিঠিটা। আবার। আবার। শেষে চোখের সামনে ধরে রাখলেন।

ইতিমধ্যে তিনিও একটা গুজব শুনেছিলেন (আমল দেননি) কুজনেৎস্কের

কতিপয় প্রবীন মারিআর জন্যে একটি সৎ ও সচ্ছল পাত্র খুঁজছেন। অসহায় বিধবার জন্যে তাদের দয়া উথলে উঠেছে। তিনি দাঁতে দাঁত ঘষলেন। কিন্তু চোখের জলে ক্রোধ ভেসে যায়, তাঁর কেবল মারিআর মুখখানা মনে পড়ে। অব্যবস্থিতচিত্ত অবলা কোন দিনই কোন কিছুতে মনস্থির করতে পারেনি, আজ ত আরও পারবেনা। আজ সে নিঃসম্বল পরিত্যক্ত অসহায় বিধবা। এখন অনায়াসে সে যে-কোন পুরুষের স্ত্রী হতে রাজী হবে। নিজে এগিয়ে গিয়ে কারো হাতে হাত না রাখুক কেউ যদি কাউকে এনে সামনে হাজির করে দেয়, ভরসা পেলে অনায়াসে সে তার পানি পীড়ন করতে পারে।

দস্তয়েফ্স্কি চিঠিখানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। পত্রের শেষে মারিআ লিখেছে, "আমি তোমাকে ভালবাসি। জেনো, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা খুবই আন্তরিক।" নিঃসন্দেহে আন্তরিক, দস্তয়েফ্স্কি স্বীকার করেন, তাঁর প্রতি মারিআর ভালবাসাকে তিনি কোনদিনই অবিশ্বাস করেননি। আজও করলেন না। তার ভালবাসা আন্তরিক বলেই না সে এরকম একটা চিঠি লিখতে পেরেছে তাঁকে। পাঁচ শ মাইল দূরে বসে সে যা খুশী করতে পারে, যে-কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে, কিংবা কারো প্রণয়িণী হয়ে থাকতে পারে, বাধা দিতে প্রতিবন্ধক হতে কেউ পাঁচশ' মাইল দূর থেকে ছুটে আসছেনা। তবে কেন সে চিঠি লিখল? না, ভালবাসে বলেই, সে ভালবাসা আন্তরিক বলেই। তবু দস্তয়েফ্স্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, হতাশ হয়ে ভাবেন, এ আন্তরিক ভালবাসা আসলে করুণা, আসলে দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নয়।

দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদে দুর্বল মানুষটির স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই অবসন্ন স্নায়ুতে এবার বিপুল আঘাত লাগল। মারিআকে তিনি বুঝি আর পাবেন না। তাঁর মারিআ বুঝি জন্মের মতন পর হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভাবনায় বিভ্রান্ত দস্তয়েফস্কি সারারাত বিভীষিকা দেখলেন। অনিদ্রার রাত্রি শেষে উঠে বসে চিঠি লেখেন "তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও মারিআ ত আমি মরব। আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।"

ইতিমধ্যে ভ্রাঙ্গেল এখান থেকে বদলী হয়ে চলে গেছেন পেতেরসবুর্গ। তিনি তাঁকে মারিআর চিঠির কথা জানিয়ে লিখলেন,..."সন্দেহ নেই, ভালবাসা এক অসীম আনন্দ; কিন্তু এর যন্ত্রণা এমনই নির্মম যে, সে কথা চিন্তা করে কেউ কোন দিন যেন-না কাউকে ভালবাসে। সত্যি বলছি, কেউ যেন আমাকে হতাশার সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, আমি অকূলে ভাসছি।

কী করছি, কী বলছি, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছেনা। আমি যে কী করে বেঁচে আছি, সেটাই এক বিস্ময়।······আমি একমনে কিছু ভাবতে পারিছিনা। কিছুই লিখতে পারছি না আমি। যে বইগুলি শুরু করেছিলাম সব ক'টাই অসমাপ্ত পড়ে আছে। যে-ঘটনা যে-পরিস্থিতি আমার জীবনে ঘটতে এত দেরি হয়েছে, সেই ঘটনা, সেই পরিস্থিতি অবশেষে আমার জীবনে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসল। আমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলল সে। আমাকে একেবারে অকূল পাথারে ডুবিয়ে দিলে।"

১৮৫৬-এর জানুআরিতে বন্ধু মাইকফকে লিখেছিলেন, "আমি খুব সুখী ছিলাম, সুখের আতিশয্যে কিছু লিখতে পারছিলাম না। তারপরে অকস্মাৎ দুঃখ এসে ছোঁ মেরে সে সবটুকু সুখ কেড়ে নিল আমার। শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তৈরি হয়ে উঠেছিল সব ধসে পড়ল। আমি সর্বস্বান্ত হলাম। শত শত মাইলের বিচ্ছেদ এখন আমাদের মধ্যে। আমি এক লাইন লিখতে পারছিনা।"

কেননা, দারিদ্র্যে ও রাজরোষে তাঁর পায়ের তলার মাটি তপ্ত হয়েছিল, ভালবাসার পাখা পেয়ে তক্ষুনি তিনি তপ্ত মাটি থেকে পা গুটিয়ে নিয়েছেন প্রাণের নিদারুন আবেগে ও বাসনায় প্রেমের নীলাঞ্জন আকাশে পাখা মে- দিয়েছিলেন এবং নিমেষে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন বাস্তব। অর্থাৎ তাঁর যে এখন বিয়ে করার অবস্থা নয়, তাঁর নিজেরই যে এখন আশ্রয় ও আহার অনিশ্চিত, সর্বোপরি ঋণে ঋণে তিনি যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাঁর পক্ষে যে এখন ঘর বাঁধা সংসার পাতা আদৌই সম্ভব নয় একথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। কিংবা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু যিনি তাঁর সংসারে আসবেন তাঁর ত এ কথা ভুলে থাকলে চলবে না, কিংবা গ্রাহ্য না করেও তাঁর উপায় নেই, কেননা দায়ত তাঁরই ; আসলে বোঝা যে বইতে হবে তাঁকেই। মারিআর দ্বিধা ছিল সেইখানে, তাই দস্তয়েফ্‌স্কিকে ভালবেসেও সচ্ছল অন্য পুরুষের ঘরনী হওয়ার কথা ভাবছিলেন তিনি।

মারিআর এই দ্বিধাগ্রস্থ ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, "বেদ নিয়ে লিয়ুদি" (অভাজন) উপন্যাস লিখে আমি আমার দুর্ভাগ্যেরই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম। কথাটা তিনি মিথ্যে লেখেন নি, তাঁর অভাজন উপন্যাসের নায়িকা ভারাংকা থেকে অব্যবস্থিত চিত্ত মারিআর এতটুকু পার্থক্য ছিল না। ভারাংকা জমিদার বীকভকে বিয়ে করে দারিদ্র্য এড়াতে চেয়েছিল, চেয়েছিস তার প্রেমমুগ্ধ প্রিয়চিকীর্ষু গরীব মাকার

আলেক্সয়েভিচকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ভারাংকা ছিল কুমারী অন্যপক্ষে মারিআ শিশু কোলে বিধবা। কুমারী ভারাংকাই যখন গরীব মাকারের প্রেমে সাড়া দিতে পারল না, তখন সবৎসা বিধবা মারিআর পক্ষে নিঃস্ব এক সাধারণ সৈনিকের প্রেমে পড়ে ঘর বাঁধা শক্ত বই কি।

তাই বুঝি ওখানকার একটা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার চব্বিশ বছরের যুবা ভারগুণফের প্রেমে পড়তে চান, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চান মারিআ। খবরটা সেমিপাখাতনস্কের কানে কানে ঘুরতে ঘুরতে যখন দস্তয়েফ্‌স্কির কানে উঠল, তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠতে চেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়লেন।

ভ্রাঙ্গেলকে লিখলেন, "আমি যদি আমার প্রিয়াকে হারাই, আমি পাগল হয়ে যাব, কিংবা ইরতিশের জলে ডুবে মরব।"

কিন্তু পাগল হলেন না তিনি, ইরতিশের জলেও মরলেন না। কুজনেৎস্কের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তেই বরং বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠলেন তখন। মারিআকে পেতে হলে চাই সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জেতার সেটাই সবচেয়ে শক্ত হাতিয়ার। তিনি মসকোআ আর পেতেরসবুর্গের আত্মীয় বন্ধুদের পত্র লিখে লিখে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলতে থাকলেন। তোমরা এমন কিছু কর যাতে সামরিক বিভাগ থেকে আমি বদলী হতে পারি। মাসমাইনের কেরানী হতে পারি কোন সরকারী দফতরের।"

দস্তয়েভ্‌স্কি একটা কেরানীর চাকরী পেলেও বর্তে যান এখন। চতুর্দশ শ্রেণীর কেরানী হতে পারলেও তিনি খুশী আজ। যে জাতের কেরানীকে নায়ক করে তিনি 'পুঅর ফোক' আর 'ডাবল' লিখেছেন—সেই অসহায় পরম করুণার মানুষই আজ তাঁর কাছে ঐকান্তিক লোভের জীবন।

অবশ্য তাঁর সব বড় উপকার হবে, বর্তমান সমস্যার সর্বোত্তম সমাধানও বটে, যদি তাঁকে লেখা ছাপানোর ছাড়পত্র দেন সরকার। সেই উপকারটুকু করার জন্যেও তিনি বন্ধুদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠান। অবশ্য তিনি ভাল করেই জানেন, তাঁর যে প্রতিভা আছে, তিনি যে লিখে জীবন ধারণের উপযুক্ত উপার্জন করতে পারবেন, এ বিশ্বাস তাঁর বন্ধু কিংবা আত্মীয় স্বজন কারো নেই। তিনি কেরানীর চাকরীর জন্যেই প্রার্থনা করে যাচ্ছেন কেবল।

আর মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন। যেন তেন প্রকারেন এই রাজরোষ আর বন্দীদশা থেকে মুক্তি চাই। তিনি আর রাজদ্রোহী নন, তিনি যে তার ১৮৩৯-এর লব্ধ ইতিমধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, জারতন্ত্রই যে উৎকৃষ্ট

তন্ত্র তা প্রমাণ করতে তিনি কিছু দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন সেমিপাথাতনস্কে পা দিয়েই, এখন আরও দুটি কবিতা লিখলেন। সব কবিতা থেকে বেছে দুটি কবিতা বের করলেন 'শান্তির সিদ্ধান্ত বিষয়ক' আর 'সেই ভয়ংকর যুদ্ধের শেষ।' কবিতা দুটির কাব্যমূল্য কিছুই ছিলনা। তিনি তা চানওনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল কবিতার মধ্যে দিয়ে রাজানুগত্য প্রকাশ করা, তা তিনি যে কবিতাগুলিতে ভাল করে ফোটাতে পেরেছেন তারই দুটি পাঠিয়ে দিলেন পেতেরসবুর্গে, জেনারেল হাসফোর্ডকে। মিলিটারী এনজিনিয়ারিং আকাদামীতে হাসফোর্ড ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে ভদ্রলোক সরকারের কাছে দস্তয়েফ্‌স্কির জন্যে দরবার করবেন, শুধু কবিতাগুলি পেতেরসবুর্গের কোন পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতিই চাইবেন না, দস্তয়েফ্‌স্কির প্রতি জারের করুণাও প্রার্থনা করবেন। আশ্বাস দিয়ে, ধৈর্য ধরতে চিঠি লিখেছেন তিনি।

যতক্ষণ অব্দি না প্রার্থনা মঞ্জুর হচ্ছে আশ্বাসের কোন দাম নেই তবু হাসফোর্ডের আশ্বাস দস্তয়েফস্কির মনে আশার সঞ্চার করল। ভ্রাঙ্গেলের আশ্বাস ত তিনি আগেই পেয়েছেন, বারবারই পাচ্ছেন অতএব মাঝে মাঝে মন তাঁর সম্ভাবনায় উজ্জল হয়ে উঠবে বই কি, সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ কল্পনায় এঁকে তিনি মারিআকে চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁর সেই আবেগ উত্তপ্ত চিঠির উত্তরে মারিআ লেখেন নিরাবেগ ঠাণ্ডা কতকগুলি লাইন। সব চেয়ে আহত হন দস্তয়েফ্‌স্কি মারিআর ভাই সম্বোধনে। মারিয়া আজকাল চিঠিতে তাঁকে ভাই বলে ডাকতে শুরু করেছে।

এই শব্দটি যে কী হৃদয়বিদারক ভ্রাঙ্গেলকে সেকথা জানিয়ে তিনি চিঠি লেখেন,"···তবু আমি এখনও একেবারে হতাশ হইনি। যে ছেলেটির ওপরে মারিআ নির্ভর করতে চাইছে, সেই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারটির বেতন বছরে মাত্র তিন শ' রুবল। এর বেশী সে কোন দিন রোজগার করতে পারবে বলেও আমি বিশ্বাস করিনে কেননা তার বিদ্যার দৌড়, শুনেছি খুবই সমান্য, এবং যে কোন দিন কজনেৎস্ক ছেড়ে বাইরে যাবে তেমন সাহস কি উচ্চাশাও তার নেই। তুমি কী মনে কর মাত্র তিন শ' রুবলের ভরসায় মারিআ চিরকালের জন্যে সাইবেরিয়ায় পড়ে থাকবে কেবল একটা জোয়ান যৌবনের সঙ্গ পেতে? অনভিজ্ঞ ও বোকা মারিআ নয় নিশ্চয়। তবু যদি তাই সে থাকতে চায়, আমি বাধা দেবনা। মারিআর সুখই আমার সুখ। সে ক্ষেত্রে ভারগুনভের জন্যে আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা করব সে যাতে আরও কিছু দূর লেখাপড়া

করতে পারে। যাতে কোন ভাল চাকরি একটা পায়। আমার চেষ্টা মানে সে তোমারই চেষ্টা, পড়াশোনা ও একটা ভাল চাকরির জন্যে তোমাকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে ভাই। মারিআ যদি সুখে না থাকে, আর্থিক কষ্টে ভোগে আমি কোনদিন শান্তি পাবনা বন্ধু।

কিন্তু এসব পরের কথা। আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি গিয়ে তার সামনে দাঁড়াব। দাদাকে টাকা পাঠাতে লিখেছি। লিখেছে শিগগিরই টাকা পাঠাবে। টাকা পেলেই একটা সুযোগ বের করে কুজনেৎস্ক ছুটব। দাদার কষ্টার্জিত টাকা আমি মায়া হরিণীর পেছনে ছুটে নষ্ট করছি, এ কথা যেন বল না তাকে। তুমিও মুখ ফিরিয়ে নিওনা ভাই। আমাকে বিচার করতে বসো না।...এখন আমি আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে পারছি না। মারিআ আমার সম্পূর্ণ মন জুড়ে আছে। আমি অবিলম্বে তাকে দেখতে চাই, তার স্বর শুনতে চাই। আমি এক অসুখী উন্মাদ। আমি জানি এ ধরণের ভাববাসা আসলে একটা সাংঘাতিক অসুখ।" —ক্রমশ

॥ এ কোন ভারতবর্ষ ? ॥

আশিস সান্যাল

উদভ্রান্ত নীলিম হাওয়া।
যতদূর উদ্ভাসিত নীলিম প্রান্তরে
ভাঙনের প্রতিধ্বনি।
যেদিকে তাকাই—
বিপুল ঝঞ্ঝার বেগে বনরাজিনীল
ভয়ানক আন্দোলিত।
সর্বত্র ভীষণ
সমুদ্র মেঘের শব্দ···
শব্দ শব্দ
চতুর্দিকে ভাঙনের শব্দিত বিষাণ
নিনাদিত পর্বতে প্রান্তরে।

এ কোন ভারতবর্ষ ?
অগ্নিগর্ভ স্বদেশ আমার ?
এ কোন্ কাঙ্ক্ষিত-দিন ঝড়ের প্রহারে
দিকে দিকে কল্লোলিত ?
কোথায় উন্মুখ আমি ?
নতুন ফুলের
দুর্লভ সাধনা চেয়ে কোথায় এলাম ?

ফিরে যাবো ?
কোনদিকে ফিরে যাবো আজ ?
যতদূর চাই
কম্পমান পটভূমি—
সর্বত্র ভয়াল দৃশ্য।
কালের রাখাল
যেন বা অন্তিম দৃশ্যে স্থির দ্বিধাহীন।

তাহলে সংশয় থাক।
গর্জে ওঠো নিমগ্ন হৃদয়—
কঠিন প্রস্তর ভাঙো।
ব্যর্থতার নিবিড় কুয়াসা
চূর্ণ করে চৈতন্যের অমোঘ আঘাতে
গড়ো আজ প্রত্যাশার স্থির পটভূমি

মাঘ সংখ্যা থেকে অরণ্যজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখক ও সাংবাদিক
গৌরচন্দ্র চক্রবর্তীর অরণ্যের পটভূমিতে লেখা 'মধুবন'
ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে

॥ যদিবা রাত্রি, ভ্রান্তি যদিবা ॥

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিবা রাত্রি ক্রমেই ঘন হয়ে আসে
সময় চকমকি ঠোকে; মিটি মিটি জ্বলে দ্বীপ
অন্ধকারে জোনাকি প্রদীপ ;
ঠেলে দেয় আলপথে ভ্রান্তি যদিবা
মাঝ রাতে আলেয়ার আলো তারে
হাতছানি দিয়ে ডাকে,
নিয়ে যায় বহুদূর—খাল বিল নদী নালা
আরো দূর পদ্মদীঘি
পেরিয়ে অনেক গল্পকথা মাটির স্বাদে ভরপুর :
জোয়ান চাষীর ভ্রান্ত ভয়—
অশরীরি মৎস্যগন্ধা নারী,
আঁশটে দেহের গন্ধে তার হয়েছিল
কে নাকি কবে বিরাগী ?
অলৌকিক সে নারীর নামে
রক্তে তবু তার শিহরণ,
সাত বাঁক, সাত নদী
পেরিয়ে স্বর্ণ চর ভাঙাগড়া ইতিকথা
লৌকিক কাহিনী কত—
ঘরফেরা স্বজন মাঝি মাল্লার
অভিজ্ঞতায় সে অবাক বিস্ময় মানে ;
তারপর একদিন ঘুর-পথে ফিরে আসে
এক বুক জল ভেঙে
এক হাঁটু কাদা মাটি
মাড়িয়ে আ-চষা ভুমি, রোয়া ধান ক্ষেত
ভয় ভ্রান্তি ভুলে গড়া
চিরন্তন কালের জীবন পথে।

॥ সব স্তব্ধ

সুধীর করণ

সঞ্চিত বিক্ষোভ নিয়ে
বঙ্কিমান অরণ্যের বাহু
চতুর্দিকে ছড়ায় নিজেকে।
সব পুড়ে ভস্ম হয় ঃ
লতাগুল্ম বনস্পতি
কান্তিমান হরিণ শাবক,
হিংস্রক শার্দুল চিতা
বৃক্ষশাখে টিয়া হরিয়াল
পুড়তে পুড়তে কুৎসিত অঙ্গার ;
মৃত শ্মশানের দাগ—
অরণ্যের বিকল্পে চিহ্নিত।

আপাততঃ কিছু নেই।
কেউ বোণে শূন্যতায় বীজ ;
কেউ হাহাকার করে—
অরণ্যের নিহত শয্যায় ;
কেউ কেউ অপেক্ষায়—
ভস্ম থেকে জন্ম নেবে
আর এক শ্যামল বনানী।

আপাততঃ কিছু নেই—
সব স্তব্ধ। ঘাস ফুল
ঝর্ণা-বায়ু-হৃৎস্পন্দন শেষ।
মৃত শ্মশানের দাগ—
অরণ্যের বিকল্পে চিহ্নিত।

॥ চোখ মেলো রূপবতী ॥

সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

চোখ মেলো রূপবতী
　　বলেছিলে তীর্থে যাবে তুমি ?
　　　　চেয়ে দেখ

বনভূমি
কুয়াশা ছড়ান মাঠ
　　বনস্পতির বুকে হাওয়া।
　　　　চেয়ে দেখ
সারি সারি
আলোর মালার মত ম্লান মুখ
　　বঞ্চনায় আহত পাষাণ।
জলোচ্ছ্বাসের শব্দ
শোক তবু কুঠার শানায় ?
　　তৃষ্ণার মতন আঁখি
　　　　চেয়ে দেখ
লোকজন ক্রোধ দুঃখ
　　এ তোমার সেই জন্মভূমি।
　　　　চোখ মেলো রূপবতী
　　　　　　বলেছিলে তীর্থে যাবে তুমি ?

প্রাকৃতিক

সুভাষ ঘোষাল

সত্যি আর ভালো লাগে না—মল্লিক খুব ক্লান্ত গলায় বললো। অন্যদিন হলে সোমা উত্তর দিতো—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। ভালো না লাগার কি আছে। তোমাকে এখন অনেক কিছু করতে হবে। এইতো সবে শুরু।

এবং মল্লিক নিজেও এই ধরণের কোন কিছু শুনবে আশা করেছিলো। কিন্তু আজ মল্লিককে প্রায় চমকে দিয়ে সোমা বলে উঠলো—যা বলেছো। আমাদের বেঁচে থাকাই কেমন অর্থহীন হয়ে গেছে। এভাবে বেশীদিন চলে না।

সোমার গলা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। খুব অপরিচিত লাগলো মল্লিকের। চেনা মানুষ হঠাৎ অচেনার মতো কথা বললে অস্বস্তি হয়। মল্লিক ঠিক কি বলবে বুঝে উঠতে পারলো না। ওরা রেলিং ঘেঁষে ধীরে ধীরে হাঁটছিলো।

সূর্যের হাট পুরোপুরি ভাঙে নি। সন্ধ্যে নামতে এখনও কিছু দেরী। তবে অফিস ভেঙেছে। বাসগুলো ফিরছে—যেন যুদ্ধক্ষেত্র। আর আরোহীদের ভগ্নদূত বলা যায়। একটু দূরে একদল ছেলে দল বেঁধে ফিরছে। তাদের একজনের হাতে বল। মল্লিক লক্ষ্য করলো ওদের। ও এখান থেকেই শূন্য দুটো বার যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো। এখন আর তাদের রক্ষার জন্য কোন গোল-কীপার নেই। একদিন আন্দুলে থাকতে—মল্লিকও প্রাণপণে গোল রক্ষা করেছে। ওর জার্সিটা ছিলো টুকটুকে সবুজ। ঠিক ঘাসের রঙের মতো। তাই ওটা পরলেই ওর কেমন উত্তেজনা হতো। মনে হতো ও কি না করতে পারে। পৃথিবীতে কিছুই ওর অসাধ্য নয়। এখন এইসব মনে পড়ায় মল্লিক মজা পেলো।

আর একটু এগিয়েই দুটো ইট, কিছু পোড়া কাঠ, তরকারির খোসা দেখতে পেলো মল্লিক। বুঝতে পারলো কিছু আগেও এখানে কেউ না কেউ সংসার পেতেছিলো। তারপর নিজের হাতে সব ভেঙে দিয়ে কোথাও চলে গেছে।

ওর হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়লো। কোন দিকে যাবে—সোমা খুব আস্তে বললো।

ওদিকটা বড়ো ভীড়। বাঁয়েই চলো।—খুব নিস্পৃহ গলা মল্লিকের। আবার দুজনে আনমনে হাঁটছিলো। মল্লিকের বাবা পরমেশ বাবু থানার বড়ো দারোগা ছিলেন। উজ্জ্বল ছ'ফুট চেহারার মানুষটা যখন ফুল ইউনিফর্ম পরে হেঁটে যেতেন সবাই তাকিয়ে দেখতো। সারাজীবন উপার্জন করেছেন প্রচুর। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা সঞ্চয়ের দিকটা একেবারেই ভাবে না। তাদের কাছে আয়-ব্যয়ের কোন সীমারেখা নেই। তিনি ছিলেন সেই দলের। যা পেয়েছেন দুহাতে খরচ করেছেন। শেষে একদিন সকালে সবাই জেগে উঠে তাঁকে আর দেখতে পেলো না। তাঁর মতো মানুষের কি কারণে গৃহত্যাগ মল্লিক ভাবলেই দিশেহারা হয়ে যায়। তবে আজ যেন দুটো ভাঙা ইট, কাঠের টুকরো আর তরকারীর খোসা একসঙ্গে দেখার পর সে অনেক কিছু বুঝতে পারছিলো। আর বুঝতে পেরে বাবার ওপর তার এতো দিনের রাগ, অভিমান সব কেমন শিথিল হয়ে এলো। একটা দার্শনিক নির্লিপ্তি অনুভব করছিলো সে।

একটু বসবে ?—সোমার প্রশ্ন।

—আরো একটু হাঁটা যাক না।

—আমরা কিন্তু অনেকদিন বাদে এখানে এলাম।

—হ্যাঁ, অনেকদিন ব্রীজটার কাছেও যাওয়া হয় নি।

—আজতো যেতে পারি ?

—না আজ থাক। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।

বৃষ্টির কথা ভাবতে মল্লিকের একটুও ভালো লাগলো না। ও ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলো। দমকা হাওয়ায় সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। হঠাৎ বললো—এক মিনিট দাঁড়াও। আর মাত্র দুটো কাঠি আছে। মালির ঘর থেকে ধরিয়ে আনছি।

ওই খোলা মাঠে দমকা হাওয়ায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সোমার নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হলো। ও হঠাৎ মনে প্রাণে চাইলো বৃষ্টি হোক। আজ অন্তত বৃষ্টির দরকার আছে। ওর চোখের সামনে একটা অস্পষ্ট বাস-ষ্টপ আর দুটো মানুষ ধরা দিলো। সেদিনও প্রচণ্ড বৃষ্টি। এদিকে কখন যে বাস আসবে ঈশ্বরই জানেন। চুপচাপ একজন অপরিচিতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে একটুও ভালো লাগছিলো না মেয়েটির। সে একটু ইতস্তত করে স্বগতোক্তি করলো,

এ বৃষ্টি সহজে ধরবে বলে মনে হয় না। বাস-টাসই বা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

একটু ব্যবধান রেখে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিলো সে সমর্থনের ভঙ্গীতে বললো—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলে মেয়েটির মনে হলো ছেলেটি খুব একটা সপ্রতিভ হতে পারছে না। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে সে তাই নিজেই প্রস্তাব করলো—আপনি যদি নর্থের দিকে যান তবে এক সঙ্গে যেতে পারি।

ছেলেটি শেষ পর্যন্ত জড়তা কাটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেছিলো। তারপর কখন যে নামার সময় দুজনেই দুজনের ঠিকানা টুকে রেখেছে, কবে যে আবার দেখা হয়েছে সে সব খুব একটা স্পষ্ট মনে পড়ছিলো না। বোধ হয় ঘটনাগুলো খুব স্বাভাবিক বলেই তাকে মনে রাখার দায়িত্ব অনেক কমে গেছে।

তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি।—মল্লিক ফিরে এলো।

কী কথা ?—সোমা যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন।

—আজ সকালে দিদির চিঠি পেয়েছি।

—ভালো আছেন ? টুলটুল ভালো আছে ?

—ওরা সবাই ভালো আছে। তার জন্য নয়। দিদি যেতে লিখেছে। "তোর সুজয়দা তোর জন্য এখানে চেষ্টা করছে। তুই কয়েক দিনের মধ্যে একবার এখানে এলে খুব ভালো হয়।"—এইসব লিখেছে।

—তুমি আমাকে এই খবরটা এতো পরে জানালে ! এটাতো ভীষণ ভালো খবর।

মল্লিক যেন আহত হয়ে বললো—তুমি এটাকে ভালো খবর বলছো। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমাকে এখন পেটের চিন্তায় দুর্গাপুর চলে যেতে হবে। যে শহরকে এতো ভালোবাসি, যেখানে এতো বড়ো হলাম তাকে ছেড়ে যাবার কথা আমি যে ভাবতে পারছি না। তাছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন তোমার সঙ্গে এখন দুদিন অন্তর দেখা হচ্ছে। আর তখন, তখন তো দুমাস অন্তরও দেখা হবে না। এখনও এটাকে ভালো খবর বলবে ?

সোমা হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। তারপর খুব জোরের সঙ্গে বললো—আমাদের এইসব ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই তোমার যাওয়া খুব প্রয়োজন। তুমি কি ভুলে গেছো কারো নিজের ব্যর্থতা তার কাছে বড়ো হয়ে উঠলে সে আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না ?

সোমার এইসব কথা শুনে মল্লিক আরো অসহায় বোধ করছিলো। ও

আশা করেছিলো সোমা তাকে অন্তত বুঝতে পারবে। তাকে বারণ করবে দুর্গাপুর যেতে। অন্যদিনের মতো সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু না—কোনটাই নয়। সোমা যেন আজ অচেনা যাদুকরের মতো অসম্ভব প্রত্যয়ে কথা বলছে। মল্লিক একবার ভাবলো চীৎকার করে উঠবে। সোমার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে বলবে—তুমি ওভাবে কথা বলছো কেন। তোমাকে যে একটুও চিনতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে। বুঝতে পারলো ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—বৃষ্টি না হয়ে যায় না। বেশ মেঘ করেছে।

সোমা সায় দিলো—তখন ব্রীজের দিকে না গিয়ে ভালোই করেছি। চলো তাড়াতাড়ি পা চালাই।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো।

সোমা—চলো দৌড়ই।

মল্লিক—চটির ফিতেটা খুলে যাবে মনে হচ্ছে।

সোমা—হাতে করো। এক ছুটে ওই মন্দিরটার চাতালে গিয়ে উঠবো।

সোমা যেন খুব খুশী। যেন দারুণ মজা পেয়েছে। দুজনে ছুটতে ছুটতে মন্দিরের ছাউনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। সোমাই প্রথম কথা বললো—বাব্বাঃ এটুকু দৌড়তেই এই অবস্থা। হাঁফাচ্ছো দেখি।

আমিতো আর তোমার মতো স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হই নি কোনদিন।—মল্লিক দম নিয়ে বললো।

থাক হয়েছে। তুমিও তো এক সময় গোলে খেলতে শুনেছি।—

সোমা প্রতিবাদ করলো।

মল্লিক কোন উত্তর না দিয়ে চারপাশটা ভালো করে দেখছিলো। এককোণে এক সাধুগোছের মানুষ দূরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। আর কয়েকজন প্রৌঢ়া বিধবা গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। একজনের সঙ্গে আবার একটি ছোট ছেলে। ভীষণ দুরন্ত। তাকে কিছুতেই কাছে বসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সে যে ওঁদের আলোচনায় যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মল্লিক ওর দিকে তাকিয়ে বললো—অনেকটা টুলটুলের মতো দেখতে না?

সোমা—ওমা তাই তো। কী সুন্দর। এই যে শোনো। তোমার নাম কি?

তোমার নাম কি?—আধো আধো গলায় ছেলেটা পাল্টা প্রশ্ন করলো।

—আগে তোমার নাম বলো।

—বুলু।

—আমারও নাম বুলু।

—তোমারও নাম বুলু! তবে আমার সঙ্গে খেলো।

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে তো খেলবোই।—সোমা ওর সঙ্গে জাঁকিয়ে বসলো।

মল্লিক একটু সরে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছিলো। ভাবছিলো সোমা কেমন সহজেই মিশে যেতে পারে। সব মেয়ের এই ক্ষমতা এই নিবিড় হবার ক্ষমতা, থাকে না—মনে পড়ায় ও একটু গর্ব অনুভব করলো। আর যখনই ওর এই ধরণের কোন আনন্দ হয় যার চরিত্র খুব পরিচিত, খুব শুভ, মল্লিক, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন তার মনে হয়—আমি সবাইকে কাছে টেনে নিতে পারি। আমার এই আনন্দের অংশ দিতে পারি।—ও এখন তাই তাগিদ অনুভব করলো দূরে বসা নির্জন সাধুমানুষটির কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর, তাঁর সঙ্গে কথা বলার। তিনি তখনও শূন্যের দিকে তাকিয়ে। না কি আকাশের দিকে, মেঘের দিকে, বৃষ্টির দিকে? মল্লিক ঠিক ধরতে পারলো না। ইতস্তত করলো—কে জানে এখন কথা বলা ঠিক হবে কি না। শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে গিয়ে বসলো। কিছু সময় নিলো কী ভাবে বলবে ভেবে নিতে। একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো। যেন অলিখিত কিছু পাঠ করতে চাইলো। তার সেই লক্ষ্য করার মধ্য দিয়ে সে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলো ছেলেবেলার এক সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মল্লিকের মনে পড়ে ছেলেবেলায় সে খুব দুরন্ত ছিলো। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন সাধুগোছের মানুষ দেখলেই সে কেমন শান্ত আর দুর্বল হয়ে পড়তো। তার কেমন গভীর বিশ্বাস হতো এই সেই মানুষ যে তার জীবনের আদ্যন্ত জেনে ফেলেছে। আর ঠিক তখনই তার মৃত্যুর কথা মনে পড়তো। স্থির, নির্লিপ্ত সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে ভাবতো তার কিছুই করার নেই। তার মনে হতো মানুষ এমন একটা নদীর পাড়ে বসে আছে যেখানে গভীর রাত। যেখানে কিছু আগেই সবশেষের প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে।

মল্লিক আচ্ছন্ন অবস্থা সামলে নিলো। একটু ধরা গলায় বললো—আপনি এখানে থাকেন?—তিনি প্রথমে ঘাড় কাত করলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন—একদিন এখানে ছিলাম না। সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এখানে আসবো। এলাম। শেষে তো আসতেই হলো। এখন ভাবতেই পারি না যেখানে ছিলাম সেখানে আর কোনদিন ফিরে যাবো। কি মজা ভাবুন তো!

মল্লিক ভাবছিলো। ভাবছিলো তার মনে যে প্রশ্ন চিরকালীন তা স্পষ্ট করবে কি না। এই দ্বিধা খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠলো—আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে একটা কথা। আপনি কি শান্তি পেয়েছেন? হয়তো খুব ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি যেন্ তাঁর দৃষ্টি আরো বিস্তৃত করলেন।—শান্তির কথা তো বলতে পারবো না। শুধু জানি যেতে হয়। ছেড়ে যেতে হয়। হোথায় ছিলাম হেথায় এলাম—এইটুকুই বুঝি।

মল্লিকের আবার বাবাকে মনে পড়লো। সে নিজের মনে উচ্চারণ করলো—বাবা হেথায় নেই, হোথায় আছে। কোথায় আছে? বাবার বয়স কতো হলো? বাবা হয়তো এমনি করেই কোন বারান্দায় নির্জন হয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিকে মেলে ধরেছেন মেঘ, বৃষ্টি, আকাশের দিকে।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে ভাঙা-ভাঙা মেঘ। একটু যেন ঠাণ্ডা পড়েছে। গাছগুলো ভিজে একশা। হাওয়ার বেগ অল্প।—মেলাটা ঘুরে গেলে হতো। তোমার ট্রেণের তো এখনও দেরী আছে।—একজন প্রস্তাব করলো। অন্যজন সমর্থন করলো—হ্যাঁ। যাবো যাবে। করে তো আর যাওয়া হয় না।

দূরে মেলার মাথায় আলোর ত্রিভুজ কাঁপছে। তার দিকে মাথা রেখে একটা পথ পড়ে আছে। যেতে যেতে মল্লিক সেই আবহমানকে দুচোখ ভরে দেখলো। আর সোমা দেখলো মল্লিককে।

রঙ্গমঞ্চের পঞ্চ-কন্যা

(তিনকড়ি)

দেবনারায়ণ গুপ্ত

(কার্তিক সংখ্যার পর)

যে তিনকড়ি এক কথায় থিয়েটারের চাকুরীতে জবাব দিয়ে এলো, সেই তিনকড়ি থিয়েটার ছাড়তে চায়নি বলে, এর কিছুদিন আগে তাকে তার মায়ের হাতে কি কম লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে ? থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে শুনে, তার মা হয়ত আজ খুবই খুশী হবেন। কিন্তু তিনকড়ি ?—সে কি থিয়েটার ছেড়েছে খুশী মনে ?—না আজকের এই চাকুরী ছাড়ার মধ্যে আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মা যে কারণে সেদিন থিয়েটারের চাকরী ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জেদ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল আত্মগ্লানি আর উপজীবিনীর ঘৃণ্য জীবন যাপনের প্রশ্ন। তাই আজকে চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়ার মধ্যে যেমন আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, অপর দিকে তেমনি সেদিন ছিল আত্মহননের প্রশ্ন।

ঘটনাটি ঘটেছিল বীণা থিয়েটারে থাকাকালীন। রাজকৃষ্ণ রায়ের "মীরাবাঈ" নাটকে মীরার ভক্তিরসসিঞ্চিত ভূমিকাটি অভিনয়ে ও গানে মূর্ত করে তুলেছিল তিনকড়ি। আর তার সঙ্গে সেদিন তার দেহ লাবণ্য দর্শকদের সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। তিনকড়ি অভিনয়ের পর একদিন বাড়ী এসে দেখে দু'টি সুদর্শন ও সুবেশধারী যুবাপুরুষ তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো তিনকড়ি। মা সস্নেহে মেয়েকে ডেকে পাশে বসালেন। মায়ের পাশটিতে জড়সড় হয়ে বসলো তিনকড়ি। মা যুবক দু'টির সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন—'এইটি আমার মেয়ে।'

—হাঁ হাঁ, আমরা বীণা থিয়েটারে দেখেছি ওঁর অভিনয়।

অপর একজন বলে ওঠে—বড় ভাল অভিনয় করেছেন। যেমন একটি তেমনি গান। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর অভিনয়ে আমরা মুগ্ধ। আর সেই জন্যেই তো এসেছি। আপনি যা চেয়েছেন, তা দিতে আমরা রাজী আছি। তবে আপনার মেয়েকে কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে সব ব্যাপারটা তিনকড়ির কাছে পরিষ্কার হয়ে এলো। কি উদ্দেশ্যে ওঁরা এসেছেন বুঝতে পারলো তিনকড়ি। মাও মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় মেয়ের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাবু দু'টির উদ্দেশ্যে বলেন—আমার মেয়ের থিয়েটারের বড় সখ। এই কিছুদিন হোল থিয়েটারে ঢুকে যাহোক একটু আধটু নামও করেছে। কিছু মাইনেও পাচ্ছে। তাই চট করে থিয়েটার ছাড়াতে মন চাইছে না। তা আপনারা তো আসা-যাওয়া করুন। থিয়েটার ছাড়াতে আর কতক্ষণ।

বাবুদের মধ্যে একজন বলে বসলেন,—না, তা হবে না। থিয়েটার আপনাকে ছাড়াতেই হবে। আপনার মেয়ে যদি বেশীর ভাগ সময় থিয়েটার নিয়েই মেতে থাকে, তাহলে আমরা আসি কখন? আপনি দুশো টাকা চেয়েছেন, আমরা তা দিতে রাজী হয়েছি। আপনার মেয়ে থিয়েটারে যা পায়, যদি চানতো সে টাকাটাও আমরা ধরে দিতে রাজী আছি। আমাদের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহলে ছ'মাসের টাকা আগাম দিতেও রাজী আছি। তবে আপনার মেয়েকে থিয়েটারের কাজে ইস্তফা দিতে-ই হবে।

বাবুটির কথার উত্তরে তিনকড়ির মা বলেন—তা কালতো আপনারা আসছেন, সে যাহোক করা যাবে।

তিনকড়ির মায়ের কথার উত্তরে অপর একজন বলে ওঠে—যা হোক বল্লে চলবে না। মোট কথা থিয়েটার আপনার মেয়েকে ছাড়তেই হবে। যদি আপনি পাকা কথা দেন, তাহলে আমরা কাল টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে আসি।

উত্তরে তিনকড়ির মা বলেন—তা বেশতো আসবেন।

বাবু দু'টি উঠে দাঁড়ালেন।—ঘর থেকে বেরুবার আগে জানিয়ে গেলেন, কাল সন্ধ্যায় তাঁরা টাকাকড়ি নিয়ে আসবেন। এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনকড়ি যেন থিয়েটারে না যায়। উত্তরে তিনকড়ির মা জানালেন—সে কি কথা! আপনারা আসবেন, আর ও থিয়েটারে যাবে? তাও কি হয়?

এইভাবে পাকা কথা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাবু দু'টি চলে গেলেন।

এই ঘটনাটি তিনকড়ি তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন—

"ভদ্রলোক দুটি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি যেন দম ফেলিয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা এমন কড়া আতর মাখিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহারা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরটা তখন সেই আতরের গন্ধে ভরভর করিতে

লাগিল। তাঁহারা চলিয়া যাইবামাত্র আমি মাকে বলিলাম, 'মা আমি থিয়েটার কিছুতেই ছাড়ব না, তা তুমি আমায় যাই বল আর যাই কর।'

মা আমার কথার উত্তরে বেশ মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া বলিলেন, 'ছি, এমন বেয়াড়াপনা কি করতে আছে! এত বড় একটা দাঁও কি হাতছাড়া করা যায়? ওরা হল মস্ত বড়লোক, ওদের আশ্রয়ে থাকলে তোর আর কি ভাবনা থাকবে? গহনায় সমস্ত গা একেবারে মুড়ে যাবে। থিয়েটার করে কি এমন চতুষ্পদ প্রাপ্ত হবে বল।'

আমার কিন্তু এককথা, আমি থিয়েটার ছাড়বো না।

মা আমাকে অনেক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে না চাওয়ায় শেষে তিনি আমাকে যা তা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, আমি কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে সম্মত হইলাম না। পরদিন প্রভাত হইতে বাড়ীর আর সবাই মিলিয়া একে একে আসিয়া আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, থিয়েটার করিয়া কোনই লাভ নাই, থিয়েটার করিয়া কাহারও দুঃখ ঘুচিতে পারে না ইত্যাদি। আমি কাহারও কথার কোন জবাব দিলাম না, রাত্রি হইতেই একেবারে গুম্ খাইয়া গিয়াছিলাম। মা আমায় শেষে একথা বলিতেও ভুলেন নাই যে যদি আমি তাঁহার কথার অবাধ্য হই তাহা হইলে তিনি আর আমায় আস্ত রাখিবেন না। মা যদিও আমায় সেদিন দুইশতবার থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। রাত্রে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, সেই ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার পরই আসিয়াছিলেন এবং আমি থিয়েটারে চলিয়া গিয়াছি শুনিয়া মাকে দুই চারিটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হইল আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মার নিষেধ সত্ত্বেও থিয়েটারে চলিয়া যাওয়ায় মা রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়াছিলেন। আমি বাড়ী ফিরিবামাত্র তিনি একখানা বাখারী দিয়া আমাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে আমার জ্বর আসিয়া গেল। আমি তিনদিন জ্বরে বেহুশ হইয়া ছিলাম। জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আবার আমি নিয়মিত থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু উপরিলিখিত ঘটনার পর বহুদিন পর্যন্ত মা আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম, মা তাঁহার সমবয়স্কাদিগকে বলিতেছেন, 'অমন বেয়াড়া মেয়ের মুখ দেখতে আছে? এখন

ভাল কথা শুনল না এরপর শেষে পস্তাতে হবে। আমি তো ওকে আর কোন কথা বলব না, ওর যা ভাল বিবেচনা হয় করুক। আমার কি ?

তথাপি ইহার পরেও মা আমাকে থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার জন্য বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান তখন আমায় কি সদ্‌বুদ্ধি দিয়াছিলেন জানি না, আমি শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে রাজি হই নাই। মাতার অবাধ্য হইবার জন্য প্রহার তো যথেষ্টই খাইয়াছি, এখন কি, একবার মা আমায় দুই তিন দিন কিছু খাইতে পর্যন্ত দেন নাই, কিন্তু তবু আমি থিয়েটার পরিত্যাগ করি নাই। নটনাথের নিতান্ত কৃপায় আমি যে কত কত গুরুতর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছি, তাহা কেবল অন্তর্যামী জানেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।"

যাই হোক বীণা থিয়েটারের পর, এমারেল্ড থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে ক্ষুন্ন হয়ে চাকুরীতে জবাব দিয়ে এসে, বেশী দিন বসে থাকতে হয়নি তিনকড়িকে। সিটি থিয়েটারের কর্তা নীলমাধব চক্রবর্তী তিনকড়িকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যান সিটি থিয়েটারে। সেটা ১২৯৮ সাল। সিটি থিয়েটারে তিনকড়ির মাসিক মাইনে ধার্য হয়েছিল ৪০ টাকা। অর্থাৎ এমারেল্ড থিয়েটারে, যে মাইনে পেত তিনকড়ি, সেই মাইনেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল থিয়েটারে। এখানে এসে তিনকড়ি সরলা নাটকে গদাধরের মা, বিল্বমঙ্গলে বণিক পত্নী, চৈতন্যলীলায় ভক্তি, তরুবালায় দাসিনী ও সধবার একাদশীতে কাঞ্চনের ভূমিকায় সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে।

যে চারজন মহিলা প্রথম বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের অন্যতমা শ্রীমতী জগত্তারিনী তখন এই সিটি থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য করতেন। বিবাহ বিভ্রাট নাটকে জগত্তারিনী ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। জগত্তারিনীর এই অভিনয় তিনকড়ির মনঃপূত হোত না। মনে হোত ষ্টার থিয়েটারে যিনি এই ভূমিকাটি অভিনয় করতেন তাঁর কাছে জগত্তারিনী যেন কিছু নয়। ষ্টার থিয়েটারে থাকাকালীন এই ভূমিকাটি আয়ত্ত করে রেখেছিল তিনকড়ি। একদিন নীলমাধববাবুকে বলে বসলো, ঐ ঝিয়ের পার্টটা ঠিক হচ্ছে না ; ওটা আমাকে একদিন করতে দিন। তিনকড়ির কথা শুনে নীলমাধববাবুর মনে হল, একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব করে বসেছে সে। তাই তিনকড়ির কথার উত্তরে বলেন—ঐ কঠিন ভূমিকা অভিনয় করতে জগত্তারিনী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, ও পার্ট কি তুমি করতে পারবে ? তিনকড়ি বলে—বেশতো, পারি কি না পারি একদিন

পরীক্ষা করেই দেখুন না। তিনকড়ির সাহস দেখে সত্যিই একদিন নীলমাধববাবু গোপনে তিনকড়ির মুখ থেকে পার্টটা শুনলেন। তার বলার ভঙ্গিমা এবং সেই সঙ্গে নিখুঁৎ অঙ্গ ভঙ্গি তাঁকে বিস্মিত করে তুললো। একদিন 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকে 'ঝি'য়ের পার্টের অভিনয় করার সুযোগ দিলেন তিনকড়িকে। দর্শকদের কাছে অজস্র প্রশংসা কুড়োল তিনকড়ি। আর সেদিন থেকে 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে ঝিয়ের ভূমিকাটিতে সে নিয়মিত অভিনয় করতে লাগল।

পূজো উপলক্ষ্যে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে অভিনয়ের বায়না পেয়েছে সিটি থিয়েটার। গিরিশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে। আর পাঁচজন বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে অভিনয় দেখছেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয়ের শেষে গিরিশচন্দ্রকে সকলে সাজঘরে নিয়ে গেল। গিরিশচন্দ্রের মত দর্শক পেয়ে সিটি থিয়েটার আজ ধন্য। অভিনেতা অভিনেত্রীরা পায়ের ধূলো নিল গিরিশচন্দ্রের। সেই সঙ্গে তিনকড়িও এসে প্রণাম করল গিরিশচন্দ্রকে। তিনকড়ি এর আগে গিরিশচন্দ্রকে আর কখনও দেখেনি ; এই প্রথম দেখল গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন তিনকড়িকে। তারপর নীলমাধববাবুর দিকে চেয়ে বললেন—'ওর ওপর নজর রেখো নীলমাধব। ওর গলার স্বরটি ভারী মিষ্টি, চেহারাটিও অভিনেত্রীরই উপযুক্ত। ওকে যদি ঠিক মতন শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পার, তাহলে আমি বলছি কালে ও একজন নিশ্চয়ই বড় অভিনেত্রী হবে।

গিরিশচন্দ্রের ঐ ভবিষ্যৎ বাণী নিষ্ফল হয়নি। সত্যিই তিনকড়ি উত্তর কালে একজন বড় অভিনেত্রী হয়েছিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক তখন নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। আর গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক। "ম্যাকবেথ" নাটকের মহলা চলছে। একদিন তিনি লোক পাঠালেন তিনকড়ির কাছে। গিরিশচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত আহ্বানে তিনকড়ি অভিভূত হয়ে পড়লো। কোন দিন সে কল্পনাও করেনি যে, গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার মত অভিজাত বড় থিয়েটারে কাজ করার জন্যে তাকে ডেকে পাঠাবেন। যথা সময়ে থিয়েটারের গাড়ী এল তিনকড়িকে নিয়ে যেতে। নানা রকম দ্বিধা আর সঙ্কোচ নিয়ে গাড়ীতে উঠলো তিনকড়ি। প্রমদাসুন্দরী তখন মিনার্ভা থিয়েটারের সবচেয়ে বড় অভিনেত্রী। গিরিশবাবু তখনও থিয়েটারে এসে পৌছোন নি। তিনকড়ি মহলার জায়গায় মেয়েদের কাছে গিয়ে সসঙ্কোচে বসল। অপরিচিতা মেয়েটির

দিকে নজর পড়লো প্রমদাসুন্দরীর। পাশের অপর একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন—'ও মেয়েটি কে? আজ থেকে নতুন এল বুঝি?' প্রমদাসুন্দরীর কথার উত্তরে পাশের মেয়েটি জানায়—কি জানি, দেখেতো সেই রকমই মনে হচ্ছে।' ইতিমধ্যে—থিয়েটারের জনৈক কর্মচারী আসে ও তিনকড়িকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে—'এসো, গিরিশবাবু এসেছেন, তোমায় ডাকছেন।'

গিরিশচন্দ্র বসে আছেন তাঁর ঘরে। থিয়েটারের কর্মচারীটির সঙ্গে তিনকড়ি এসে প্রবেশ করে ও গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করে। গিরিশচন্দ্র অভিনয় সম্পর্কে তাকে নানা রকম উপদেশ দেন—যা আজ পর্যন্ত কোন নাট্য-শিক্ষকের কাছেই সে পায়নি। মনে মনে ভাবে—এতদিন পরে সত্যিকারের গুরু পেয়েছে সে। গিরিশচন্দ্র কর্মচারীটিকে নির্দেশ দেন। তিনকড়ির সঙ্গে একবছরের একটা চুক্তিপত্র করে নেওয়ার জন্যে। মাইনে ধার্য হয় তিরিশ টাকা।

নিয়মিত থিয়েটারের গাড়ী আসে তিনকড়ির কাছে। মহলায় আসে। ম্যাকবেথ নাটকে তার কোন ভূমিকা নেই। সে শুধু শিল্পীদের মহলা শোনে আর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে গিরিশচন্দ্রের নাট্য শিক্ষাদানের কি অদ্ভুত ক্ষমতা। মনে মনে ভাবে তিনকড়ি আরও কিছু দিন আগে যদি সে গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসতে পারতো, তাহলে কত কি না শিখতে পারতো সে।

অপরিসীম পরিশ্রম করে চলেছেন গিরিশচন্দ্র ম্যাকবেথ নাটককে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্যে। প্রমদাকে লেডিম্যাকবেথের ভূমিকাটি শিক্ষাদানের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু প্রমদার চলা-বলা কিছুই মনঃপূত হচ্ছেনা গিরিশচন্দ্রের। শেষে একদিন ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে ফেলেন গিরিশচন্দ্র। বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রমদার প্রতি। তারপর তিনকড়িকে বলেন, লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় মহলা দেবার জন্যে। তিনকড়ি কল্পনাও করেনি যে নাম-ভূমিকায় মহলা দেবার জন্য তাকে গিরিশচন্দ্র আদেশ করবেন। তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের কাছে একটি দিন সময় চেয়ে নেয় পার্টটিকে ভাল করে পড়ে নেবার জন্যে। তার পরের দিন থেকে সে মহলা দিতে থাকে লেডি-ম্যাকবেথের ভূমিকায়। গিরিচন্দ্র খুশী হন তার সংলাপ বলা ও সেইসঙ্গে তার অভিব্যক্তি দেখে। গিরিশচন্দ্র যেমনটি শিক্ষা দেন, তিনকড়ি হুবহু তা আয়ত্ত করে।

১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী বাং ১২৯৯, ১৬ই মাঘ, মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যাকবেথ মঞ্চস্থ হল। গিরিশচন্দ্র-ম্যাকবেথ আর লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায়

তিনকড়ি। দর্শকেরা বার বার করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলো তিনকড়িকে আর অভিনয়ের শেষে নটগুরু গিরিশচন্দ্র আশীর্বাদ করলেন—"তোমার অভিনয় দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে বই লেখা আমার সার্থক হয়েছে। বাঙ্গালী দেখুক, যে বাংলা রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রী আছে। এত সুন্দর, এত নিখুঁৎ যে তুমি অভিনয় করতে পারবে, একথা আমি একবারও ধারণা করতে পারিনি। 'আমি তোমাকে আর কি আশীর্বাদ করব? তবে এই আশীর্বাদ করি যে তুমি যথার্থ অভিনেত্রী হও। এমন অভিনয় কর যে যতদিন থিয়েটার থাকবে, ততদিন বাঙ্গালী যেন তোমার কথা আর ভুলতে না পারে।'

সত্যিই বাংলার নাট্যামোদীরা ভুলতে পারেনি—তিনকড়িকে। বাংলার নাট্যশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে তিনকড়ি বিশিষ্টভাবে জড়িয়ে আছেন। 'ম্যাকবেথের পর মিনার্ভার "মুকুল মুঞ্জরা"। এই নাটকে তারার ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার আর একটি সাক্ষর রাখলেন। গিরিশচন্দ্র সানন্দে ঘোষণা করলেন—'তিনকড়িই এখন বঙ্গ রঙ্গ-মঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। এরপর 'আবুহোসেন'-এ 'দাই' আর 'জনা' নাটকে জনার ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যামোদী সুধীজনের অজস্র প্রশংসা কুড়োলেন। পর পর নানা রসের ও নানা স্বাদের নাটকে অভিনয় করে তিনকড়ি সেদিন নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠাভিনেত্রীর আসনে অভিষিক্ত হলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর অভিনেত্রী সুলভ চেহারার জৌলুষে অনেকেই আকৃষ্ট হলেন। জনার পরের নাটক 'করমেতিবাই'। এ নাটকেরও নাম ভূমিকায় তিনকড়ি। তখন তার যথেষ্ট নামডাক হয়েছে। কাজেই, 'করমেতির' প্রথম অভিনয় রজনাতে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

অভিনয় আরম্ভের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অথচ পটত্তোলন হচ্ছে না। বাইরে দর্শকদের হৈ চৈ। কি ব্যাপার? কিছু অঘটন ঘট্‌লো নাকি? গিরিশচন্দ্র ছুটে এলেন সাজ ঘরে। শুনলেন তিনকড়ি বিধবার বেশে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে চাচ্ছে না। করমেতি বিধবা। অথচ বিধবা সাজবে না? শিল্পীর খেয়াল খুসী ও মর্জ্জির ওপর নির্ভর করে, থিয়েটার চলবে নাকি? গিরিশচন্দ্র রাগে ফেটে পড়লেন। বল্লেন—যাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে নেওয়া যায়, অমনি সে মনে করে আমি কি হলাম! এ জাতের স্বভাবই এই। যাক্—কাউকে দরকার নেই। নাপিত ডাক। আমিই আজ করমেতি সাজবো। ইতিমধ্যে নগেন্দ্রবাবু রোগ ও রোগীর খবর নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। গিরিশচন্দ্রকে জানালেন—তিনকড়ির বাবু বক্সে টিকিট কিনে বসে আছেন। তাই তিনকড়ি থান পরে ষ্টেজে বেরুতে রাজী হচ্ছে না। যাই

হোক, আমি বাবুটিকে বিনীতভাবে সব কথা বলায়, বাবুটি চলে গেছেন। বাবুটির চলে যাওয়ার সংবাদে শুধু তিনকড়ি নয়, সকলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ঘণ্টা পড়লো। ড্রপ উঠ্‌লো। সুরু হোল—অভিনয়। থান পরে অভিনয় করার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি, তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই থান পরেই অপূর্ব কেরামতি দেখালো তিনকড়ি করমেতিবাই-এর ভূমিকায়। করমেতিবাই-এর প্রথম অভিনয় রজনীর ঘটনা নিছক ছেলে-মানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘটনার পর সে গিরিশচন্দ্রের কাছে ত্রুটি-স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। মানুষ হিসেবে তিনকড়ি সত্যিই ভাল ছিল। গিরিশচন্দ্র যখন যে থিয়েটারে গিয়েছেন, তিনকড়িকেও সেই থিয়েটারে নিয়ে গেছেন। গিরিশচন্দ্র তিনকড়ির প্রসঙ্গে বলেছেন—'শুধু সুঅভিনেত্রী বলেই আমি তিনকড়িকে স্নেহ করি না, তার মধ্যে অনেক গুণ আছে—যা দিয়ে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মিনার্ভা থিয়েটারের পর, সেকালের প্রায় প্রতিটি রঙ্গমঞ্চেই কাজ করেছে তিনকড়ি। বিভিন্ন রসের ও বিভিন্ন স্বাদের বহু নাটকে সে আত্মপ্রকাশ করেছে—বিভিন্ন রূপে।" পাণ্ডব গৌরব নাটকে তার গাওয়া সুভদ্রার ভূমিকায়—

'ধিয়া তাধিয়া নরমালী। ঘোরাননা রক্তদশনা করালী।" এই গানটি সে যুগে দর্শকদের কাছে এমনিই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তখন অনেকের মুখেই এই গানটি শোনা যেত। "বিল্বমঙ্গল" নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অনেকেই অভিনয় করেছেন। কিন্তু তিনকড়ির মত অমন সুন্দর অভিনয় আর কেউই করতে পারেননি। "ভ্রান্তি" নাটকে অন্নদার চরিত্রটি খুবই জটিল। এই জটিল ভূমিকায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে তিনকড়ি নাট্যামোদীসুধীজনের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ছত্রপতি শিবাজী নাটকে জিজাবাঈ-এর ভূমিকায় তিনি যখন বলতেন—'যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমার মায়ের মুণ্ড ছেদন করতেও দ্বিধা করো না" তখন দর্শকেরা তাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌তো।

অভিনেত্রী হিসাবে তিনকড়ি যখন একক এবং অদ্বিতীয় সেই সময় উত্তর কলকাতার নাম করা এক বড়লোকের নজর পড়লো তার ওপর। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও বড়লোকটির হৃদ্যতা ছিল। রাজেন চাটুজ্জে নামে গিরিশচন্দ্রের অপর এক বন্ধুরও ঐ বড়লোক বাবুটির আড্ডায় যাওয়া আসা ছিল। বাবুটির বাগান বাড়ী ছিল সিঁথিতে। প্রায়ই সেখানে মাইফেল

বসতো। রাজেন চাটুজ্যে, গিরিশচন্দ্র তো যেতেনই, মধ্যে মধ্যে তিনকড়িরও ডাক পড়তো মাইফেলের আসরে। বাবুটি তিনকড়িকে একান্তভাবে কাছে পেতে চান। প্রস্তাব করেছেন থিয়েটার ছেড়ে তিনকড়ি তাঁর অধীনে থাকুক। সোনাদানা, হীরে জহরৎ আর সেই সঙ্গে টাকা পয়সা গাড়ী বাড়া সবই দেবেন তিনি। কোন অভাবই রাখবেন না তিনকড়ির। বাবুটির প্রস্তাবের উত্তরে তিনকড়ি জানিয়েছিল—ভেবে চিন্তে জানাবে।

ভাবাচিন্তা মানে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করা। তিনকড়ির কাছে সব শুনে গিরিশচন্দ্র থিয়েটার না ছাড়ার জন্যে পরামর্শ দিলেন। বাবুটির প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়—তা দু'দিন বাদেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল তিনকড়ি। ধুরন্ধর বাবুটির বুঝতে দেরী হোল না, যে গিরিশচন্দ্র থাকতে তিনকড়িকে কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মনে মনে ঠিক করলেন গিরিশচন্দ্রকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে।

কিছুদিন পরে বেশ খোলা মন নিয়েই বাবুটি আবার মাইফেলের নেমন্তন্ন করে পাঠালেন—গিরিশচন্দ্র, রাজেনবাবু আর তিনকড়িকে। আর সেই সঙ্গে একথাও জানালেন যে এবার আর সারারাত ধরে মাইফেল হবে না। ওতে শরীর খারাপ হয়। রাত বারোটায় শেষ করা হবে এবারের আসর। আর গিরিশচন্দ্রকে চুপি চুপি বলে রাখলেন বড় মানুষটি—দেখুন রাত বারোটা পর্যন্ত মাইফেল অন্যদের জন্য। আপনার জন্যে নয়। বেশ কথা। বাবুর নির্দেশ মত নির্দ্ধারিত দিনে গিরিশচন্দ্র, তিনকড়ি প্রভৃতি সন্ধ্যায় এসে আসর বসালেন সিঁথির বাগান বাড়াতে। রাজেনবাবু সন্ধ্যার একটু পরেই সেখানে এসে ঢুকলেন। মাইফেলের আসরের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে গাছতলায় ও কে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে? গোলাপ সিং না? ও কেন এসেছে এখানে? রাজেনবাবু গোলাপ সিংকে বেশ ভাল ভাবেই জানেন। এক সময় কিছুকাল সে কাজও করেছে রাজেনবাবুর অধীনে। আজ শহরের সে নাম করা সেরা গুণ্ডা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন রাজেনবাবু। অনুমান মিথ্যে নয়—গোলাপ সিংই বটে। লম্বা সেলাম ঠুকলো গোলাপ সিং রাজেনবাবুকে দেখে। কি কারণে সে এখানে এসেছে জানতে চাইলেন—রাজেনবাবুকে প্রথমে বলতেই চায় না আসল কথাটা তারপর চুপি চুপি যে কথা জানালো—তাতে তো রাজেনবাবু রীতিমত চিন্তিত ও ভীত হয়ে উঠলেন। বাবুটির নির্দেশে গোলাপ সিং গিরিশচন্দ্রকে আজ রাতেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার সব

ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে। গিরিশচন্দ্রকে খুন করার পর তাঁর দেহটা মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। গর্ত খোঁড়া আছে। আর সেই সঙ্গে ঘাসের চাব্‌ড়া সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করে তার ওপর ঘাসের চাব্‌ড়া বসিয়ে দেওয়া হবে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে লাস পুঁতে রাখা হয়েছে। রাজেনবাবু ভাবতে লাগলেন, কি করে গিরিশচন্দ্রকে রক্ষা করা যায়, কি করে তিনকড়িকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় ঐ বাবুটির কবল থেকে। বাগান বাড়ীর অভিসন্ধি ভালভাবেই জানা ছিল রাজেনবাবুর। গিরিশচন্দ্র যেখানে যেতেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর চাকর ফকিরও যেত সেখানে। তিনি প্রথমে ফকিরকে ডেকে চুপিচুপি বলে দিলেন, একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী ডেকে এনে সিঁথির মোড়ে সে যেন অপেক্ষা করে। ফকির কালবিলম্ব না করে রাজেনবাবুর নির্দেশমত চলে গেল। আর সুকৌশলে গিরিশচন্দ্র ও তিনকড়িকে সকলের অজ্ঞাতসারে রাজেনবাবু পাচার করে দিলেন, বাগান বাড়ীর বাইরে। গিরিশচন্দ্র বেঁচে গেলেন সে যাত্রায়। তিনকড়ি চলে গেল বাবুটির নাগালের বাইরে। বাবুটির সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল!

সে যুগে রঙ্গজগতের মানুষদের কাছে গিরিশচন্দ্র ও তিনকড়িকে নিয়ে প্রণয়ঘটিত যে সব কাহিনীর গুঞ্জরণ শোনা যেত, তার মধ্যে উপরোক্ত কাহিনীটি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ।

শেষ জীবনে তিনকড়ি বেশ কয়েকবছর ডায়েবিটিস্ রোগে ভুগেছিলেন। একসময়ে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্যে কাশীতে যান। দীর্ঘদিন পরে ফিরে এলে, থিয়েটারের মালিকেরা একে একে সকলেই তাঁকে মঞ্চে ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাত্রিজাগরণ করা ডাক্তারের নিষেধ থাকায় তিনি সকলকেই ফিরিয়ে দেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র বলে পাঠান—"কৈশোর হইতেই তোমার থিয়েটার করা অভ্যাস। আমার মতে সে অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিয়া নীরবে বাড়ীতে বসিয়া থাকা উচিত হয়। তোমার থিয়েটারে যোগদান করাই উচিত। তবে পরিশ্রম অধিক না নয়, সেটুকুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গিরিশচন্দ্রের নির্দেশমত তিনকড়ি ১৩২৪ সালে থেস্‌পিয়ান থিয়েটারে যোগদান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাতে একটা কার্বাঙ্কল্ হয়।

কার্বাঙ্কল্ অপারেশন করার পর পাঁচ ছয় দিন বেশ ভালই থাকেন। কিন্তু সহসা অবস্থার অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বে তিনকড়ি একটি উইল করেন। ঐ উইলের সর্তানুসারে, তাঁর দুইখানি বাড়ী বড়বাজার হাসপাতালকে, ও একখানি বাড়ী তাঁর বাবুর পুত্রকে দান করা হয়। আর তাঁর অলঙ্কার এবং আসবাবপত্র বিক্রয়ের টাকায় তাঁর বাড়ীর ভাড়াটেদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। এবং বাকী টাকা তাঁর শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে খরচ করা হয়।

উত্তরাধিকার

(ধারাহিক উপন্যাস)

জরাসন্ধ

॥ ১৭ ॥

রূপা নামটা নীহারের জানা শম্ভুর মুখে-শুনেছে কদিন' আগে। ঘরের সামনে এসে এক নজরে দেখেই বুঝল মেয়েটাও তার চেনা। আরেকবার এসেছিল, আজকের মতই মায়ের সঙ্গে। মা বলেছিল তার, চাটগাঁর গেঁয়ো ভাষায় যেখানে হোক একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে দাও, দিদিমণি। এখানে আর এক দণ্ডও রাখতে ভরসা পাচ্ছিনা।

ভরসা না পাবার যথেষ্ট কারণ আছে। মেয়েটার চোখ মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল নীহার। বয়স পনর ষোল, অর্থাৎ চলতি ভাষায় 'সেয়ানা' হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা শুধু বয়সে, দেহের গড়নে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গের পুষ্টিতে। কলোনীর অন্য মেয়েগুলো এই বয়সে পৌঁছবার আগেই যেমন সব দিক দিয়ে সেয়ানা হয়ে ওঠে, এ তা পারেনি। বড় বড় চোখ দুটো সরল, মুখখানাও বয়সের অনুপাতে কাঁচা। এদিকে দেখতে শুনতে মন্দ নয়। মা কোথায় ঝিয়ের কাজ করে, ঐ মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ নেই, সাধ্যমত ভাল খেতে পরতে দেয়। কাজেই স্বাস্থ্যটিও ভাল। এ মেয়ে নিয়ে সত্যিই ভাবনা হবার কথা। চারিদিকের খানাখন্দ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্যে যে-সব হাতিয়ার এই বয়সী মেয়েদের দরকার, বিশেষ করে যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে, এ মেয়ের তূণে তার অভাব আছে। তারই ফল ফলতে দেখা গেল।

এর আগে দু-একটা ছোটো খাটো ঘটনা ঘটে গেছে। একবার কলোনীর দুটি লায়েক ছোকরা রূপার মায়ের অগোচরে ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। দুপুরের দিকে বেরিয়ে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত কোথায় ছিল তারা, কী করেছিল. সেটা প্রকাশ পায়নি। তবে এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে কলোনীর ঘরে ঘরে। তাই এ নিয়ে মার খানিকটা চেঁচামেচি এবং মেয়েকে দু-চারটা চড় চাপড়—তার বেশী আর কোনো হৈচৈ হয়নি।

এর পরের বারে সে যাদের হাতে পড়ল তারা পুরুষ নয়, মেয়ে, এবং ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াল। রূপার মার মতে সেটাই নাকি স্বাভাবিক। "মেয়েমানুষ ছাড়া মেয়েমানুষের এতবড় সর্বনাশ আর কে করবে. দিদিমনি?"

দুটি মেয়ে, বেশ চালাক চতুর, রূপার চেয়ে বয়সে কিছু বড়; কিছুদিন থেকে ফর্সা জামাকাপড় পরে কোলকাতায় যাতায়াত করছিল। কয়েকদিন অন্তর অন্তর ফেরে। দু-এক বেলা থেকে আবার বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকেরা বলে, ওরা পার্টির কাজ করে। 'কাজটা' কী তা নিয়ে কিছুটা কানাঘুসা চললেও প্রকাশ্যে কেউ প্রশ্ন তোলেনা। অনেকের ঘরেই ঐ বয়সী মেয়ে আছে, ঐ রকম একটা কিছু কাজ তাদেরও দরকার। দেশ গাঁয়ে থাকলে মেয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মার মনে তার বিয়ের কথাটাই বড় হয়ে উঠত। এখানে ও ভাবনাটাকে সবাই এক পাশে সরিয়ে রেখে দিয়েছে। এদের সমাজ বলতে এই কলোনী। বাইরের লোকদের সঙ্গে বিরোধ হয় তো নেই, অনেকদিন কাছাকাছি বসবাস, আলাপ পরিচয় এবং কাজে কর্মে পারস্পরিক নির্ভরতার ভিতর দিয়ে একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। সেটা বৈবাহিক সম্ভাবনার স্তর পর্যন্ত পৌছায়নি। কলোনীর মেয়ে তাদের ঘরে বৌ হয়ে আসবে' একথা যেমন গ্রামবাসীদের চিন্তার অতীত, তেমনি কলোনী-বাসীদেরও কল্পনার বাইরে। মেয়ে যদি আনতে হয় কলোনীরই কোনো ঘর থেকে, যদি দিতে হয়, কলোনীরই কোনো ঘরে। কিন্তু 'ঘর' কোথায়? এক একটা পরিবার যে-জায়গাটুকু দখল করে আছে, সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বুড়ো বাপ-মা খুড়ী জেঠীরই মাথা গোঁজা চলেনা। তার মধ্যে আবার একটা বৌ এসে থাকবে কোথায়, তার চেয়েও বড় কথা-খাবে কী? এরা যেখানে ছিল সেখানে বৌকে খাওয়াবার দায়িত্ব ছিল গোটা সংসারের, বরের একার নয়। কিছু করেনা, এমন ছেলেও বিয়ে করত, বাবা-কাকারা বিয়ে দিয়ে দিত। এখানে এসে নতুন অবস্থার ফেরে যার যার দায় তার তার নিজের। কেউ চাপিয়ে দেয়নি। আপনা থেকেই এসে পড়েছে। ছেলেরা জানে বিয়ে করতে হলে বৌকে খেতে দেবার মত সামর্থ্য চাই, তাকে নিয়ে বাস করবার মত ঘর চাই। মেয়েরাও সেটা বোঝে। তাই বিয়ের চিন্তা তাদের তরফেও নেই। কিন্তু বয়সের ধর্ম যাবে কোথায়? তার গতি আটকাবে কে?

প্রকাশ্য ও সহজ পথ যেখানে রুদ্ধ, স্বাভাবিক কারণেই সেখানে গোপন ও জটিল পথ দেখা দেয়। সে যাক।

মেয়েদুটি রূপাকে একদিন বলল, এই, কোলকাতা যাবি?

"না, ভাই, মা মারবে।" আগের ঘটনা তার মনে আছে, তারাও জানে। তাই ভরসা দিল, "দূর হাবি, মারবে কেন? যাবি তো আমাদের সাথে। আমরা নিয়ে যাবো।"

রূপা ভাবতে লাগল। ওরা তো কলোনীরই মেয়ে, জানা শুনো। ওদের সঙ্গে যেতে আর দোষ কী? তবু মাকে জিজ্ঞাসা না করে সাহস করল না।

এবার নতুন টোপ ফেলল মেয়েদুটো। উদ্দেশ্য কী তারাই জানে। দল ভারী করার জন্যেই হোক, কিংবা নিরীহ বোকাশোকা ধরনের বলে রূপার উপর তাদের একটা স্নেহ ছিল বলেই হোক। বলল, যাসতো তোরও চাকরি হবে আমাদের মত। ভালোমন্দ খেতে পাবি। টাকা পাবি। তার থেকে তোর মাকেও দিতে পারবি। আমরা দিচ্ছিনা?

রূপা প্রলুব্ধ হল। তাকিয়ে দেখল ওদের ফরসা জামা কাপড়ের দিকে, চকচকে চোখমুখের দিকে, কদিন আগেও যা ছিল শুকনো, রুক্ষ। মাথা নেড়ে বলল, যাবে। বন্ধুরা পরামর্শ দিল, এখনই কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। চাকরি পাবার পর জানালেই হবে। বেশ তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে মাকে।

তাক লাগাবার ব্যাপারটায় রূপা বেশ মজা পেল। বিকেলের দিকে মা যখন কাজে বেরিয়ে গেছে মেয়ে দুটোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। কেউ টের পেল না।

পরে জানা গেছে পার্টির কাজ-টাজ কিছু নয়। গোড়াতে হয়তো সেই রকম একটা কিছুর নাম করেই কেউ ঐ দুটি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। কিংবা এও হতে পারে, পার্টির মেয়ে ভলান্টিয়ার হয়েই তারা শুরু করেছিল, যেমন আরো কিছু মেয়ে রয়েছে ঐ কাজে। তারপর কখন কিভাবে কোথা দিয়ে ছিটকে গিয়ে জুটেছিল এক বিশেষ পাড়ার রেস্তোরাঁয়, বিশেষ ধরণের নৈশ খদ্দেরের খাদ্য পরিবেশনের ভার নিয়ে কদিনের মধ্যে নিজেরাও তাদের 'খাদ্য' হয়ে উঠেছিল, সে ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ নয়। উদ্বাস্তু মেয়ে হলেও প্রথম প্রথম মনটা যে ওদের বিদ্রোহ করে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু তাকে মাথা তুলতে দেয়নি। পেটে বিদ্যা না থাক, বাস্তব-বুদ্ধি আছে। তাই দিয়ে নিজেদের বুঝিয়েছিল, বিয়ে থা যখন হবে না, বাপ-মা-ভাইয়েরাও বরাবর খেতে দেবে না—দেবেই বা কোত্থেকে তখন একটা কিছু করে পেটটা তো চালাতে হবে। কী করে, তা নিয়ে অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। দিন গেলে দুটো করে টাকা হাতে আসছে এবং তার জন্যে বাড়ির লোকেরাও হাত পেতে বসে আছে, জানতে চাইছে না কোত্থেকে এল, রোজগারের রাস্তাটা কী। হয়তো আন্দাজ করছে; সন্দেহ করছে অন্য পাঁচজন। তা করুক। প্রকাশ্যে তো কেউ কিছু বলতে পারছে না। "বলুক দেখি?"—এমনি একটা বেপরোয়া

ভাব নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যেত আসত মেয়ে দুটি। জানত, যারা বলবে তারাও কেউ ধোয়া তুলসি পাতা নয়। পাপ ঢোকেনি কোথায়? কিন্তু যতক্ষণ চাপা আছে, ততক্ষণ কোনো পাপই পাপ নয়, কোনো অন্যায়ই অন্যায় নয়।

ওদের ভয় ছিল শুধু এক জায়গায়—শম্ভুদা, গোড়ার দিকে হলে হয়তো এসব পথে বা বাড়াতে সাহস করত না। তখন শম্ভুচরণের সমর্থন নেই, কিংবা সে পছন্দ করে না, এমন কিছুই করা চলত না কলোনীতে। অল্প-সল্প যা হত, তাকে লুকিয়ে, তার অগোচরে। সব ছেলে-মেয়ের উপর তার প্রভাব ছিল একচ্ছত্র। তাতে ভাঙন ধরল যখন বাইরে থেকে ঐ 'বাবুরা' আসতে আরম্ভ করলেন। অনেক আশার কথা শোনালেন তাঁরা, মিটিং করলেন, বক্তৃতা দিলেন, কলোনীর হাজার রকম দুঃখ দুর্গতি, অভাব-অভিযোগ দূর করবার আশ্বাস দিলেন। ভরসা দিলেন,—তোমাদের আমরা কাজ দেবো, পার্টির কাজ, দেশের কাজ, তার থেকে তোমাদের খাওরা-পরার ভাবনাও মিটে যাবে।

শম্ভু যে কেন ঐ বাবুদের আসা-যাওয়া পছন্দ করল না, মেয়ে দুটি এবং তার মত আরো অনেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। তার সেই এক কথা— আর বাইরের লোক নয়। এমনি ধারা অনেকে আমাদের ঠকিয়েছে! সব মতলববাজ। নিজেদের কাজ গোছাতে আসে, সেটুকু হয়ে গেলেই সরে পড়ে। এবার যা কিছু করবার আমরা নিজেরাই করবো। জমিদারের সঙ্গে লড়তে হয় লড়বো, দরকার হলে বোঝাপড়া করবো। আমরা দশজনে যা ভালো বুঝবো, তাই হবে। যাদের চিনি না, জানিনা, তাদের পরামর্শ বা সাহায্যের দরকার নেই।

আগে আগে শম্ভুচরণের সব কথা একবাক্যে মেনে নিত কলোনীর ছেলে-বুড়ো। ভিতরে ভিতরে পছন্দ হোক না হোক বাইরে কেউ প্রতিবাদ করতো না' বিরুদ্ধেও যেত না। এবারে আর তা হলনা। দুটো দল হয়ে গেল। তারপর থেকেই চলছে গণ্ডগোল। ঝগড়া, বিরোধ, কথা কাটাকাটি। হাতাহাতিও হয়ে গেছে কয়েকবার। শান্তি বলে আর কিছু নেই কলোনীর জীবনে।

"মরুক গে", নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে মেয়ে দুটি, "আমরা তো বেঁচে গেছি।"

রূপাকে নিয়ে ওরা তুললো সেই রেস্তোরাঁয় নিজেরা যেখানে কাজ করে। তার পিছনে যে ছোট্ট ঘরটাতে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেইখানে বসিয়ে মালিককে গিয়ে জানাল, আরেকজনকে চাকরি দিতে হবে। মালিক সরাসরি 'না' বলে দিল। আর লোকের দরকার নেই তার। মেয়েরা তাকে চেনে। বলল, একবার দেখুন না। দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল লোকটা। 'রিফিউজী গার্ল' বলে যে জাতটার সঙ্গে সে পরিচিত, অনেক দিন ধরে দেখছে, এ তাব থেকে একেবারে আলাদা। ওর হাতে যারা এসে পড়ে, প্রায়ই না খেয়ে খেয়ে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যেখানে তারা যে মেয়ে, অর্থাৎ দেহগুলো নারী দেহ, সেটা সহজে ঠাহর হয় না। খাইয়ে দাইয়ে 'খদ্দেরের' চোখে পড়বার মত করে তুলতে সময় লাগে, পয়সাও কম লাগে না। তবে 'তৈরী' হয়ে গেলে সে পয়সা উঠে আসতে দেরি হয় না। তারপর মোটা লাভ।

এ মেয়েটা একেবারে 'তৈরী' হয়েই এসেছে। এর পিছনে টাকা ঢালতে হবে না। জামা কাপড়ে আর চেহারায় একটু চেকনাই দিয়ে আসতে যা সামান্য খরচ।

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে রূপার পা থেকে মাথা এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত বারবার তাকিয়ে দেখল মালিক। মনে মনে বলল, একেবারে টাটকা মাল, বাসী নয়, ঘাঁটাঘাঁটি হয়নি। "দেখি, একবার তাকাও তো আমার দিকে"—কাছে গিয়ে মোটা, ভাঙা, কর্কশ গলাটাকে যতটা সম্ভব মোলায়েম করার চেষ্টা করল। তাহলেও বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল রূপার। চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। খুশী হল মালিক। তার এবড়ো খেবড়ো মাংসল মুখে, ঘোলাটে চোখ দুটোতে লোভ চকচক করে উঠল। ভালো ব্যবসা হবে একে দিয়ে।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই মেয়ে দুটোর মধ্যে যে বড় বলে উঠল, তাহলে আজ থেকেই দোকানে বেরোবে তো?

"যাক না আজকের দিনটা। এত তাড়াতাড়ি কিসের?"—বলে বেরিয়ে গেল মালিক। আসলে এ মেয়েকে রেষ্টুরেণ্টে পাঠাবার ইচ্ছা নয়। টেবিলে টেবিলে চপ কাটলেট পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে আরো কোনো লাভজনক কাজে একে লাগাতে হবে। তারই কথা ঘুরছিল মাথার মধ্যে।

সঙ্গিনীরা তখনই কাজে বেরিয়ে গেল। ওকে বলল, তুই থাক। ভয় কী? আমরা এখানেই আছি, একটু পরেই আসছি।

চাপা অন্ধকার মত ছোট্ট ঘরটার মধ্যে একা বসে বসে রূপার বুকের

ভিতরটা হু হু করতে লাগল। মার কথা মনে পড়ছিল আর ভাবছিল কেন এলাম, কোথায় এলাম। দরকার নেই আমার চাকরির। ওরা এলেই বলবো, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

কিন্তু ওদের যে আর দেখা নেই। না আসুক ও একাই চলে যাবে। তার পরেই মনে পড়ল, পথ ঘাট সে কিছুই চেনে না। যাবার উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি বুড়ীমত মেয়েছেলে এসে বলল, এসো আমার সঙ্গে।

"কোথায় ?" জানতে চাইল রূপা।

"তোমার কাজ ঠিক হয়ে গ্যাছে।

"ওরা—ওরা তো এল না।"

"ওরা কারা ?"

রূপা তার সঙ্গী মেয়ে দুটির নাম বলল। বুড়ী তাদের চেনেনা। কিন্তু এমন ধারা গাঁ থেকে সদ্য ভুলিয়ে আনা কিংবা হঠাৎ ছিটকে এসে পড়া মেয়েগুলোকে সে চেনে। তাই একগাল হেসে বলল ও, ওরা ? ওদের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। চল।

রূপা ভরসা পেল। বেরিয়ে গেল বুড়ীর সঙ্গে। (ক্রমশঃ)

সাহিত্যের অন্তরালে শরৎচন্দ্র

ছবি মুখোপাধ্যায়

॥ ১৪ ॥

আকরামের সঙ্গে সেদিন দেশবন্ধুর কথা নিয়ে আরও অনেক কথাই বলেছিলেন শরৎচন্দ্র। বিশেষ করে হিন্দু মুসলমান রাজনৈতিক সমস্যা ও তার সঙ্গে চরকা আন্দোলনের কথাও হয়েছিল তাঁর। তিনি বলেছিলেন, জানো হে আকরাম একদিন দেশবন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে, আচ্ছা শরৎবাবু আপনি চরকা বিশ্বাস করেন তো ?

বলেছিলাম, আপনি যে রকম বিশ্বাসের কথা বলছেন—তা করি না।

—তার মানে ?

—তার মানে অনেক দিন ধরে অনেক চরকা কেটেছি বলেই একথা বলছি।

এর উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন, কিন্তু এই বিশাল দরিদ্র দেশে তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে যদি পাঁচ ছয় কোটি লোকও চরকা কাটে, তাহলে কত কোটি টাকার আয় বাড়ে তা বোঝেন তো ?

—হ্যাঁ তা বুঝি। তবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি—অবশ্য যদি আমার অপরাধ না নেন, তবেই বলবো সে কথা।

—বলুন না।

—আচ্ছা ধরুন, যে বাড়ী একশ দিনে তৈরী করতে একশ লোক লাগে—সেখানে যদি দশলক্ষ লোক তা করতে হাত লাগায়, তাহলে সেটা কি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শেষ করা যায় ?

তাতে দেশবন্ধু বলেছিলেন, আপনার ও কথার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ ও দুটো এক জিনিস নয়। তবে এটা বুঝতে পারছি যে, আপনি সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প অবতারণা করছেন। তবুও আমি বলবো যে, এতে আমি বিশ্বাসী। আমার ভারী ইচ্ছে করে যে আমি চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোনো রকম হাতের কাজেই আমার পটুতা নেই।

সে কথা শুনে হেসেই বলেছিলাম সেদিন, ভগবান আপনাকে রক্ষা

করেছেন। আমার কথা শুনে দেশবন্ধু সেদিন মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছুই আর বলতে পারেন নি।

এই চরকা নিয়ে আর এর আন্দোলনে, এরপর থেকে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও নিজের ওই অন্য মত প্রকাশে কোনো সময়ই পশ্চাৎপদ্ হন নি। বরং তারপর এক রংপুর অধিবেশনে তিনি অভিভাষণ দিয়েছিলেন ওরই বিরুদ্ধে। সেদিন ওই নিয়ে যে কত জল গড়িয়েছিল তা বলতে গেলে এক ইতিহাস রচনা করতে হয়। সে থাক, তবে সেদিন কংগ্রেসের মধ্যে তাঁকে দোষারোপ করা হয়েছিল এই বলে যে, তিনি নাকি মহাত্মাজীর টিকিতে চরকা বাঁধার আবমাননাকর উক্তি করেছিলেন।

আসল কথা তিনি বলেছিলেন সেদিন, বাংলাদেশের লোক মনেপ্রাণে সকলে চরকা গ্রহণ করেনি বা গ্রহণ করতে চায় না। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিও উদ্ধৃত করে তাঁর নিজের মতকে সেদিন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি হোলো : The programme of the Charka is utterly childish that makes one despair to see the whole country deluded by it.

এরপর হিন্দু মুসলমান ইউনিটির কথা নিয়ে আকরামকে বলেছিলেন সেদিন তিনি, জানো আকরাম দেশবন্ধু যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে—আচ্ছা শরৎবাবু আপনি তো হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের একতাবদ্ধ হওয়ায় গভীর বিশ্বাসী তাই না ?

তাতে বলেছিলাম, না।

আমার সে কথা শুনে দেশবন্ধু বলেছিলেন, আপনার ওকথা মোটেই আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার কথাতে আমার আসল গোপন ইচ্ছেটা আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল তখন। তিনি বলেছিলেন তখন, আপনার মুসলমান প্রীতি লুকিয়ে রাখতে আপনি যে পারেননি—সে আমিও জানি, আপনিও জানেন। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছিলেন যে, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের। আর এর প্রয়োজন এই জন্যে যে, এরা দিনের পর দিন সংখ্যায় লাখে লাখে বাড়ছে।

তাঁর শেষের ওই কথায় হেসে বলেছিলাম আমি—আপনার একথা শুনলে ওরা কিন্তু অন্য মানে করবে।

তাতে তিনি কোনো কথা না বলে—পরেই বলেছিলেন, গোঁড়া হিন্দু সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে নিচু জাতের হিন্দুরা দিনে দিনে মুসলমান

ও খৃষ্টান ধর্মে যে রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু তবুও পৈতেধারী সনাতনীদের আজও চোখ খুললো না। বলতে বলতে সেদিন তিনি কাশ্মীর নৃপতি মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের কথায় এসে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, জানেন শরৎবাবু আজ যে কাশ্মীর দেখছেন—সেখানে কি চোদ্দ আনা লোক মুসলমান প্রধান, এই সেদিনও সবাই হিন্দু ছিল। আফগানী সর্দার জব্বরখানের রক্ত মাখা অসির সামনে দাঁড়িয়ে সেখানকার প্রায় সমস্ত হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। সে হোলো উনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা। কিন্তু তার কিছুদিন পর যখন মহারাজা প্রতাপ সিং ওই সব ধর্মান্তরিত মুসলমান বংশধরদের আবার শুদ্ধি করিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন হিন্দু ধর্মে, তখন সনাতনী কাশ্মীর পণ্ডিতরা তাতে বাধা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। বলতে বলতে সেদিন দেশবন্ধুর চোখ দুটো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠেছিল। একবার তিনি বাঙলাদেশের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এই যে নমঃশূদ্র চণ্ডাল ছোটো জাতদের আঘাতের পর আঘাত করে আমাদের সমাজ থেকে ছেড়ে চলে যাবার জন্য বাধ্য করা হয়ে চলেছে আজও, তার কি কোনো প্রতিবিধান নেই শরৎবাবু?

সেদিন তাঁর কথায় আমি চুপ করে ছিলাম শুধু। তারপরেই তিনি আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, আমাকে আপনারা রাজনীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে দিন ভাই, আমি বরং নিপীড়িত নির্যাতিতদের মধ্যে থেকে কাজ করিগে এখন।

দেশবন্ধুর ওই কথাগুলো শুনে তারপর আকরাম বলেছিলেন শরৎচন্দ্রকে, দাদা, সত্যি সত্যিই উনি দেশের নিপীড়িত মানুষের অন্তরের ব্যথার কথা অন্তরে অন্তরে বুঝেছিলেন বলেই তো দেশবন্ধু হয়েছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে আকরাম এও বলেছিলেন, ভেদাভেদের ওই যে যন্ত্রণা কত দুঃখপ্রদ—কত দুঃসহ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। কথাগুলো বলতে গিয়ে আকরামের তখন চোখ দুটো জলে টল্‌টল্ করে উঠেছিল যেন।

শরৎচন্দ্রও তখন বুঝতে পেরেছিলেন বেশ যে, আকরামও সত্যি সত্যিই ওই ব্যথার ব্যথী। অতএব এরপর অন্য কথায় এসে পড়লেন তিনি। বললেন আকরামকে, জানো হে দেশবন্ধু বলতেন—Compromise করতে যে শিখলে না, সে বোধহয় এ জীবনে কিছুই শিখলে না।

—বোধহয় তাই।

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই বলি যে, তুমি নিশ্চয়ই জানো—বাংলা দেশের মুসল-

মানেরাও 'জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট' এখন চাইতে শুরু করেছেন। তা না হলে গলদ যে কোথায় তা তারা ভালো করেই জানেন। অতএব Compromise না করলে উভয় সম্প্রদায়ের দুর্ভোগ যে বাড়বে তাতে সন্দেহ একটুও নেই। একটা কথা মোটেই ভুললে চলবে না যে, বেশীর ভাগ এদেশের ধনী মুসলমানরা তাদের নায়েব—গোমস্তা—উকিল—ডাক্তার হিসেবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি যে, প্রত্যেক হিন্দুই মনে প্রাণে ন্যাশানালিষ্ট। ধর্ম বিশ্বাসেও তারা কারও থেকে ছোটো নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষদ বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। হয়ত তাদের মধ্যে গোঁড়ামীর বা কুসংস্কারের কিছু অন্যায় যে আছে তা সত্যি, কিন্তু সবটাই তা নয়।

এর পরের বছরেই ইংরেজ সরকার নতুন শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আইন পাশ করালেন এদেশে। সেদিন শরৎচন্দ্র ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছিলেন, বাংলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হোলো সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাদের ছোটো করা হোলো চিরদিনের মত। তিনি আরও বলেছিলেন, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছে বলে তাঁদের বলতে চাই—অন্যায় অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। আর এতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কারুরই মঙ্গল হবে না।

এর কিছুকাল পর তখনকার গ্রাম বাংলার উদীয়মান কবি সেখ্ জসিমুদ্দীন সাহেব তাঁর কাছে এসেছিলেন একবার। এসে বলেছিলেন, দাদা, আমাদের দেশের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মালিন্যের উদ্ভব হয়েছে তা দূর করার জন্যে একটা প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

সে কথা শুনে শরৎচন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার দিকে। তারপর বলেছিলেন, কেন হে, খুবই কি অসহ্য লাগছে তোমাদের?

তাতে বলেছিলেন শেখ সাহেব, লাগছে বলেই তো এসেছি আপনার কাছে। তারপর শেখ সাহেব বেশ আবেগের সঙ্গেই বলেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎজাতি, একই দেশে. একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মত বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। আরও বলেছিলেন, সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারুর মঙ্গল নেই।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করছো ?

—উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখলে দেখবেন, বাইরের বিভেদ যতই বড় দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

উত্তরে বলেছিলেন শরৎচন্দ্র, এ কথা আমিও জামি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে থাকবে ভাই। এরপর একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন তিনি, কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করে ফেলবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই তো নিরাপদ।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন তিনি, শেখ সাহেবের মুখেও কথা ছিল না। শেষে বললেন তিনি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দে বরদাস্ত করো না আর প্রতিশোধ যা নাও, তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগত ভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমার ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায়, তখন দেখবে, তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ সবচেয়ে বেশি।

এ শোনার পর শেখের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, বলেছিলেন তিনি, এমনি Non-cooperationই কি তবে চলবে ?

—না, চিরদিন চলবে না। কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা, তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

শেখ বলেছিলেন তখন, বেশ, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

—হ্যাঁ, তাই করো। তাহলেই দেখবে তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে।

বলা বাহুল্য, এরপর থেকে বাংলার কথা সাহিত্যে তরুণ লেখকদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মিলনের এক সুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ধীরে ধীরে।

বিহার-অরণ্যে বিভূতিভূষণ

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

বিভূতিভূষণ যখন 'আরণ্যক' উপন্যাস লিখেছিলেন তখন তিনি মাত্র ভাগলপুরের সামান্ত বনজঙ্গলই দেখেছিলেন, সারাণ্ডার বিখ্যাত অরণ্য-সমুদ্র দেখেন নি। এ নিয়ে তাঁর আপশোষ ছিল প্রচুর। বলতেন, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, অরণ্যের রূপ এত সুন্দর? এই সীমাহীন গভীর অরণ্য দেখে মনে হয় বুদ্ধের আর খৃাইষ্টের বাণী যেন অরণ্যের প্রতিটি সবুজ পাতা বুকে করে ধরে মৌন হয়ে আছে। আমাদের যদি সে কান থাকতো, শুনতে পেতাম।

কথাটা নিতান্ত সত্য। সে অরণ্যের প্রতিটি বিশাল তরু যেন এক একটি কবিতা। কিন্তু সেই অরণ্যে যখন ঝড় ওঠে, যখন অরণ্যবহ্নি দিগ্বিদিক্ গ্রাস করে ছুটে আসে, তখন সে আরেক রূপ। ভয়ঙ্কর। সর্বগ্রাসী সে রূপ দেখে বিভূতিবাবুর কি মনে হয়েছে, সে কথা আমার জানবার সৌভাগ্য হয় নি।

হরদয়াল সিংহ তখন কোল্হান ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার। যোগেন্দ্রনাথ সিন্হার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। বিভূতিবাবুকে বামিয়াবুরুর গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতেই হবে।

চাইবাসা থেকে বামিয়াবুরু ত্রিশমাইলের পথ। কিছুদূর গিয়েই আকাশচুম্বী বিখ্যাত সারাণ্ডার শালবন। অরণ্য ভ্রমণের কথায় বিভূতিবাবু সর্বদাই যেন তৈরী হয়ে থাকতেন। রওনা হয়ে পড়লেন। বোধহয় সস্ত্রীক।

পথে কোথাও লাল মোরমের বেশ উঁচু উঁচু ঢিবি। একের পর চলে গেছে বহুদূর। কোথাও ছোট জঙ্গলে ভরা ছোট পাহাড়ের ঢালে গরুমোষ চরছে। কোথাও চুঁয়া (পাহাড়ী বনের বাটি চুঁইয়ে জলের ক্ষীণ ধারা) থেকে আদিবাসী গ্রামের মেয়েরা কলসী ভরে জল নিয়ে চলেছে। কেউ চাপা সুরে, কেউ খোলা গলায় বনলক্ষ্মীর সৌন্দর্য বর্ণনা করে গান ধরেছে। কোথাও বা আম তেঁতুল ইত্যাদি ফলের গাছের ভিড় জানান দিচ্ছে, ওখানে গ্রাম। দু-একটা তেমনি পাতার ছাউনির অংশ উঁকি দিচ্ছে। কোথাও ওই হোথায় টুংরির ওপর নিরম্বু নিঃসঙ্গ একটিমাত্র পাতার ঘর। যেন অসীম সমুদ্রের মাঝে একটি মাত্র ডিঙ্গি—আর কোথাও কোন কিছু নেই।

বিভূতিবাবু শিশুর মত অবাক বিস্ময়ে সব দেখছেন এবং মনের ভাব নানা

কথায় প্রকাশ করছেন। একবার বলে উঠলেন, উঃ, কী সুন্দর জায়গা। এখানেই একটা বাড়ী করব।

দুচার মাইল গিয়ে আবার বললেন না-না, আগেরটা বাজে। বাড়ী করতে হয় এইখানে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তও স্থায়ী হতে পেল না। কারণ, আরো কিছুদূর গিয়ে তাঁর মত সম্পূর্ণ বদলে গেল।

বললেন, দাঁড়ান মিঃ সিং। এইখানে। বাড়ী কোরতে হলে, এই হোল আমার শেষ স্থান নির্বাচন। আমাকে এখানে একটা ছোটমোট প্লট করে দিতে পারবেন? মানে, এই আমার ফাইনাল শিলেক্‌শান।

হরদয়াল সিংহ বললেন, যেখানে চাইবেন সেখানেই আমরা আপনার জন্যে প্লট ঠিক করে দেব। কিন্তু আপনার মতের স্থির হোক তো আগে।

মত কি আর স্থির হয়?

এর পরেও আরো চার পাঁচটি জায়গা তাঁর ফাইনাল সিলেক্‌শান বলে ঘোষণা করতে করতে বিভূতিবাবু শিশুরমত প্রতিপদে নব নব বিস্ময়ের মালা গেঁথে গেঁথে এগিয়ে চললেন। আর মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, ব্যাস্‌। আগেকার সব চুনাও রদ্‌। আমার বাড়ী এই এইখানেই হবে।

সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠেন।

জঙ্গলের ষোল মাইলের পথের শেষে সেত্‌বা গ্রাম।

গ্রামের বাইরে নির্জন এলাকায় গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা ফরেস্ট রেস্ট হাউস। বিভূতিবাবু বললেন, ফরেস্ট অফিসারের চাকরী গ্রহণ করা মানে দেখছি আত্মহত্যা করা। আরে মশাই. আপনারা এসব জায়গায় এমন একলা থাকেন কি কোরে? এখানে তো মনে হয় দিনের বেলাতেই বাঘ আর বুনোহাতী ঘুরে বেড়ায়।

কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেন নি তিনি। কিন্তু তখন তাঁর সামনে কে বলবে যে এই কিছুক্ষণ আগেই এমনিতর স্থান নির্বাচন করছিলেন তিনি মনের মত একটি চোট্ট বাসার জন্যে?

তর্ক আরম্ভ হয়ে গেল।

ওটা ওয়েড লেণ্ডিয়া, না চাঁপা?

বিভূতিবাবু হার মানবেন না। চাঁপা। চাঁপা চিনিনে মশাই? বাংলা দেশের মানুষ, আমায় চাঁপা চেনাবেন?

হরদয়াল সিংও না-ছোড়। চোখে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলছেন, আপনার বাংলা দেশে বাড়ী বলে কি আমরা সিলভিকালচার ভুলে যাব? জানেন, দেরাদুনে মেডেল পেয়েছি সিল্‌ভিকালচারের ওপর? আপনি বললেই মেনে নেব?

বিভূতিবাবুকে অত সহজে ঠকানো গেল না।

বললেন, সিং সাহেব, সাহিত্যিকরা আর সব বিষয়ে বোকা হয়, মানি। কিন্তু আমি তার ব্যবস্থা করেই জঙ্গলে এগিয়েছি। বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব আর তাদের নাড়ি-নক্ষত্র চিনবনা, তেমন বোকা সাহিত্যিক বিভূতি বাঁড়ুজ্যে নয়। যোগেন বাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে কম করে চল্লিশখানা গ্রন্থ আপনাদের বন বাদাড় সম্বন্ধে পড়ে ফেলেছি। স্টাডি করেছি। এ-তো এক অসীম বিজ্ঞান মশায়। তাই সিলভিকালচারে মেডেল পেলেও ফ্লোরিকালচারে আমাকে ঠকাতে পারবেন না। মাইকোরিয়া চম্পকা সে হোল আলাদা জিনিষ। এ হোল প্লুমেরিয়া। আমরা একে চাঁপা-ই বলব।

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

যোগেনবাবু, হরদয়ালবাবু, বিভূতিবাবুর বনজঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে আন্তরিক তারিফ না করে পারলেন না। গাছপালা, লতাগুল্ম, পাহাড় ঝরনা—সব কিছু সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান অর্জন করে তিনি অরণ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন! তাই, তাকে শুধুই ভ্রমণ বললে ভুল বলা হবে। তিনি বলতেন, যাকে ভালবাসি, তাকে অন্ধের মত ভালবাসতে গিয়ে নিজের ভালবাসা ও প্রেমাস্পদকে ছোট করতে যাব, অতবড় মূর্খ আমি নই। আমি আসি অরণ্যের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ পাতাতে। অন্তরের যোগ স্থাপন করতে। আমি অরণ্যকে অধ্যয়ন করতে চাই। সৃষ্টির মস্ত বিস্ময় যেমন মানুষ, তেমনি এই অরণ্য। দূর থেকে অরণ্য দেখে দু কলম লিখে দেওয়ায় লোক ঠকানো যায় বটে, অরণ্যের সত্য উপলব্ধিও হয় না, প্রকাশও হয় না। অরণ্য অত ছোট, অত তুচ্ছ নয়।

তাই বোধ হয় তিনি অরণ্যবাসীদের সম্বন্ধে কোন বড় লেখা বা উপন্যাস লেখেন নি। চাইবাসায় এক সাহিত্য সভায় একবার বলেছিলেন, যাদের জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পারিনি, তাদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে পাপের বোঝা বাড়াব না। অথচ বনে জঙ্গলে গিয়েই তিনি মানুষ খুঁজতেন। আদিবাসীদের ঘরে যেতেন। ওদের সংসার সমাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগলে বলতেন, জিজ্ঞাসা

করুন তো, এমন কেন করে? ঐ ধর্মীয় আচারের অর্থ ওরা বোঝে কি-না। অন্য ধর্ম সম্বন্ধে এদের জ্ঞান আছে কি-না?

এদের ভাষা না জানায় বড়ই আপশোষ করতেন। বলতেন দেবেন তো মশাই এদের পুঁথিপত্তর। দেখি, যদি পারি কিছু।

এইখানেই বিভূতিবাবুর মত সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ লেখকের সঙ্গে অন্যদের প্রভেদ। দুদিন বনে-জঙ্গলে আমোদ-আহ্লাদ করতে এসে অনেকেই তথা-কথিত প্রতিভার ভাঁড়ার হাতড়ে মোটা মোটা গ্রন্থ লিখে যশ ও অর্থলালসায় অধীর হয়ে ওঠেন। এটা যে কতবড় বেইমানি সে কথা তাঁরাও বোঝেন। সবাই বোঝে।

তাই, বিভূতিবাবুর মত মানুষ সে পথে পা বাড়ান নি।

বিভূতিবাবু বললেন, এমন দৃশ্য জীবনে চোখে দেখব আশা করিনি। যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা বললেন, তাইতো আপনার আরণ্যক পড়বার পর ইচ্ছে হোত আপনাকে নিয়ে সারাণ্ডার জঙ্গল দেখাই।

বন পাহাড়ের অসীম এই দুনিয়া। অরণ্য প্লাবন।

পাহাড়ের পর পাহাড়। মাঝে মাঝে অতল খাই। মাটির তলদেশ পর্যন্ত চোখ যায় না।

রেস্ট-হাউসে যখন পৌছন গেল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

চা খেয়ে সবাই বেড়াতে যাবেন। ফিরতে দেরি হতে পারে। তাই বিভূতিবাবুর স্ত্রী বাংলোতে রয়ে গেলেন।

ঢালান থেকে নেমে সুদীর্ঘ পাহাড়ী নালাটার পাশে-পাশে বনবিভাগের যে পথ চলে গেছে, সেই পথ ধরে সবাই এগিয়ে চললেন।

গভীর অরণ্যের ভেতর বনবিভাগ নিজেদের রাস্তা তৈরী করে। নইলে তো কোনদিন বনজঙ্গলের auctionই হবে না। ঠিকাদারের লরী বা ছোটছোট গরুর গাড়ী মাল বহন করবে কি কোরে?

পথ চলতে চলতে দুদিকের দৃশ্য দেখছেন আর বিভূতিবাবু একবার এঁকে একবার ওঁকে ডেকে বলছেন, আঃ, এদিকে দেখুন না মশাই।

তারপর জংলী হাতী আর বাঘের গল্প আরম্ভ হল।

হরদয়াল সিং বললেন, বুনো হাতীর আর বাঘের এই জঙ্গলেই আড্ডা। বাঘ, বিশেষ করে শীতকালে, রাস্তায় রাস্তায় এদিকে ঘুরে বেড়ায়।

বিভূতিবাবু চমকে উঠে বললেন, বাঘ এদিকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কেন? বাঘ-তো জঙ্গলে জঙ্গলে থাকবে। এদিকের বাঘদের এমন বাবুগিরি

কেন যোগেনবাবু? নাকি এদিকের বাঘের পায়ে চাকা বাঁধা আছে যে জঙ্গলে না ঘুরে পথেপথে ঘোরে?

উত্তর দিলেন হয়দয়াল সিং। বললেন, শীতকালে বাঘের গায়ে এদিকের বড় বড় চোরকাঁটা ঢুকে গেলে, বেচারারা বড় নাস্তানাবুদ হয়। তাই যতটা পারে ওরা বন জঙ্গল এড়িয়ে পথে পথেই ঘোরে।

সকলেই চুপচাপ পথ চলতে লাগলেন। কেননা সন্ধে বেশ হয়ে এসেছে। তারওপর বাঘেরও রাস্তায় বেড়াবার শখ ও প্রয়োজনের কথা শুনে সকলেই যেন আমরা কপট দুশ্চিন্তায় পথ চলি।

কিছুদূর গিয়ে একটা ন্যাড়া পুল পার হতে হল।

হরদয়াল সিং বললেন, বাঘ এই পুলটাও পার হয়। বলেই টর্চ জেলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখালেন সকলকে, সত্যিই কয়েকটা বড় বড় বাঘের পাঞ্জার ছাপ ঐ পুলের পথে দেখা গেল। মাটির খুব কাছে চোখ নামিয়ে বিভূতিবাবু বাঘের পাঞ্জার ছাপ পরীক্ষা করেই একেবারে রাইট্ এবাউট্ টার্ণ।

কয়েক পা গেষ্ট্ হাউসের দিকে চলতে চলতে বললেন, ফিরে আসুন মশাই। আর দরকার নেই।

হরদয়াল সিং বিভূতিবাবুর কথায় কোন সাড়া না দিয়ে বন্যজন্তুদের চরিত্র ব্যাখ্যা বেশ জোরে জোরে আরম্ভ করেছিলেন। বললেন, সাধারণতঃ বাঘ আর বুনো হাতী মানুষকে আক্রমণ করে না। কিছু বলেও না। কেবল বাঘ যখন নরভোজী অর্থাৎ maneater হয়ে যায়, এবং নরহাতী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হলে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়, তখনই ভয়ের কথা।

বিভূতিবাবু মন দিয়ে সব শুনে বললেন, তো মশাই আমাদের মত মুখ্যু মানুষদের জন্যে আরো একটু উব্গারই করলেন আপনারা। দয়া করে এ জঙ্গলের সব বাঘ আর হাতীদের গলায় টিকিট ঝুলিয়ে দেন, কোন বাঘ হাতী সাধু, অরে কোনগুলোই বা শয়তান।

আবার সকলেই হেসে উঠলেন।

বনপথ ও পাশের জঙ্গল গভীর আঁধারে ঢেকে গেছে। রেস্ট হাউসের পথে ফিরে চলেছেন সবাই। সকলের হাতেই টর্চের আলো। কিছুদূর গিয়ে বিভূতিবাবু থমকে দাঁড়ালেন। চারিদিক বেশ ভাল করে টর্চের আলোয় বার কয়েক দেখে নিয়ে বললেন, ভেবে দেখুন, ঠিক এই সময় বারাকপুরে দাওয়ায় বিশুদা বসে হুঁকো টানছেন, জগু জেলে গোপালনগর হাটে মাছ বেচে ঘরে ফিরে আসছে, আর আমি কিনা গম্ভীর অরণ্যে এমন এক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে

আছি, যেখান দিয়ে সদ্য সদ্য বাঘ পার হয়ে গেছে, আরো পার হবার আশঙ্কাও আছে। একটু ভেবে দেখুন দিকি কি অবস্থা।

এবার যে ঘুরপথে ফিরে চলেছেন সবাই, তার একস্থানে উঁচু উঁচু শালগাছের পাশে কাঠুরিয়ারা তাদের অস্থায়ী পাতার ছাউনি বসিয়ে পোর্টেবল্ সংসার পেতে বসেছে। যে দিকে যখন কাঠ কাঠবার কাজ বাড়ে, এই কাঠুরিয়ার দল তখন সেইদিকেই ঝাড়ি জঙ্গলের বেড়া দিয়ে পাতার ছাউনির অস্থায়ী ডেরা ডালে। এখানে ওখানে অনেকগুলো গর্ত-উনুনে আগুন জ্বলছে। ভাত চড়েছে হাঁড়িতে হাঁড়িতে। তারই অদূরে একটা পরিষ্কার স্থান দেখে কাঠের আগুনের ধুনি জ্বালা। আগুন ঘিরে মেয়ে-পুরুষের দল বসে।

বিভূতিবাবু বললেন, চলুন না, ঐখানে ওদের সঙ্গে গিয়ে একটু বসা যাক।

যুবতীরা আগুনের পাশে বসে খেজুর পাতার চাটাই বুনে চলেছে আর গান গাইছে। তারই অল্পদূরে বাঁশী বাজাচ্ছে বসে কোন কোন সুরেলা যুবক।

ওরা ছোট খাটো একটা অস্থায়ী গ্রাম বসিয়ে ফেলেছে যেন। পথ চলতে এমন সংসার ওরা নিত্যি গড়ে। নিত্যি ভাঙে। পেছনে ফিরে চাইবার ফুরসৎ নেই ওদের। জীবনের ডাক ওদের এমনি করেই অবিরত কর্মের মাঝে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলে। মাসের পর মাস এমনি কাটে। আবার কর্মশেষে ওরা নিজ-নিজ গ্রামে ফিরে যায়। স্ত্রী-পুরুষ সবাই। দশ গাঁয়ের মানুষ কাজকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে অস্থায়ী সংসার এমনি করে পেতে পেতে এগিয়ে চলে। আলাপ হয় পরিচয় হয় কত ভিন্‌গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে। করাত-কুড়ুল চালাবার মাঝে মাঝে ওরা আপন আপন গাঁয়ের কথা, অভাব অভিযোগের কথা অন্যগাঁয়ের সহকর্মীদের শোনায়।

মেয়েরা গান গাইছিল। 'মাঘে পরবের' গান। এসো প্রিয়, মাঘে পরব যে বয়ে যায়। এসো আমরা এক সাথে নাচি। এসো আমরা শীত উপভোগ করি, আগুন জ্বেলে, নেচে আর মাঝে মাঝে কানে-কানে কথা বলে। এসো।"

পুরুষরা বাঁশী বাজাচ্ছে। মেয়েরা মাঝে মাঝে গান থামিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। বাঁশী থেকে ফুঁ তুলে নিয়ে ওরাও মেয়েদের হাসির শরিক হচ্ছে মাঝে মাঝে।

বিভূতিবাবু বসে বসে শুনছেন আর ওদের গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, কি সহজ জীবন! সত্যের বাস্তবতার কত নিকটজন এরা। এই শীতে কারো গায়ে ভাল আবরণ নেই। কিন্তু দুঃখকে এরা বাঁশীর ফুঁ-য়ে আর গানের সুরে কত দূরেই না ঠেকিয়ে রেখেছে। এরা

জানে জীবনকে দুঃখের হাতে বাজী ধরে দিয়েও আনন্দকে জয় করে নিতে। মানুষ হিসাবে এরাই না সার্থক। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে কি এর চেয়েও বেশী দুঃখ জয়ের আহ্বান ছিল? জানি না।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

বিভূতিবাবু তখন ঘাটশীলায়।

চাইবাসা থেকে সিন্‌হা সাহেব (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা) বিভূতিবাবুকে লিখলেন, "আমি ঘাটশীলা হয়ে বহরাগোড়া ইত্যাদি বনাঞ্চলে টুরে যাচ্ছি। আপনিও চলুন না কয়েকদিনের জন্যে আমার সঙ্গে। সেদিকের দৃশ্যাবলী খুবই মনোরম। আশা করি আপনার খুবই ভাল লাগবে।"

বনাঞ্চলে ভ্রমণের ব্যাপারে বিভূতিবাবুর জন্যে এইটুকু প্রলোভন দেখানোই যথেষ্ট ছিল। তিনি যোগেনবাবুকে লিখলেন, "নিশ্চয়ই আমি যাবো। ঝাড়গ্রামও বোধহয় বহরাগোড়া থেকে বেশী দূর হবে না। সম্ভব হলে দুজনে ঝাড়গ্রামটাও পাক দিয়ে আসবো।"

ঝাড়গ্রামের আকর্ষণ ছিল তাঁর শ্বশুরালয়। স্ত্রী তখন সেখানেই। তাঁর শ্বশুর আবগারী বিভাগের অফিসার ছিলেন।

ঘাটশীলা থেকে পুব-দক্ষিণ কোণে বহরাগোড়া। চাকুলিয়া হয়ে আটত্রিশ মাইল।

যোগেনবাবু যখন বিভূতিবাবুকে সঙ্গে নেবার জন্যে ঘাটশীলা পৌছলেন, বিভূতিবাবু যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদিকটা কি রকম? যোগেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, মন্দ না।

হাফসার্টের ভেতর মাথা গলিয়ে বিভূতিবাবু একটু যেন আশাভঙ্গের সুরে বললেন, সে কি মশাই? এখন ওসব বললে চলবে না। আগে তো চিঠিতে এমন বর্ণনা দিয়ে আমাকে নাচিয়ে তুললেন, এখন শুধু 'মন্দ না' বললে তো শুনব না।

যোগেনবাবু বললেন, আগে চলুন তো। দেখবেন।

এখানে বামিয়াবুরু নেই।

সে সকল সুউচ্চ বিশ্ববিখ্যাত শালবন নেই, যে বনে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে ভয় পায়। বহরাগোড়া তাই বামিয়াবুরু নয়।

শিশু শাল বন।

সমস্ত অঞ্চলজুড়ে afforestation এর কল্যাণে কচি কচি শিশু শাল কেবল

মাথা তুলে উঠেছে। তাও মানুষের কোমর পর্যন্তও ছাপিয়ে উঠতে পারে নি! ভবিষ্যতের মহীরুহের সব প্রতিশ্রুতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় বহন করে শিশুশালবন বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সূর্যের অকরুণ আলোর সঙ্গে হেলে দুলে খেলায় মত্ত। শত শত শিশুশাল একবার বাতাসের ইসারায় বাঁয়ে হেলে মাটিতে যেন মাথা নোয়ায়। একবার দক্ষিণে। কখনো বা প্রণিপাতের ভঙ্গিমায় একেবারে সম্মুখ দিকে নুয়ে পড়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। চোখে না দেখলে মালুম করা কঠিন।

বহরাগোড়া পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

চারিদিকে যেন দামী কাশ্মীরী কার্পেট। তার ওপর কোন সুনিপণার হাতে সযত্নে গেঁথে তোলা ফুলের রকমারি বাহার।

চা-পানের পর বেড়াতে বেরোন।

একটা উঁচু টিলার ওপর গিয়ে বিশ্রামের জন্য বসা হোল। রকমারি ছোট অথচ দৃঢ় পাথরের টিলা। বিভূতিবাবু একটা অপেক্ষাকৃত চওড়া পাথর দেখে তার ওপর বসলেন। নির্বাক। কারো সঙ্গে কোন কথা নয়। কিছুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে মৃদু মৃদু টানতে লাগলেন।

এইভাবে বহুক্ষণ কাটাবার পর শুধু বললেন, beauty of space!

অন্ধকার হয়ে আসে চারিধার।

দূরে, বহুদূরে ছিট্ ফুট্ বাতি। গ্রাম।

আর সবকিছু যেন একটা ছোট্ট কালো তাঁবুতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

তবুও বিভূতিবাবু নড়ছেন না।

একবার বললেন, যোগেনবাবু চাঁদ কখন উঠবে?

যোগেনবাবু বললেন, ঘণ্টাখানেক দেরি আছে বোধ হয়।

বিভূতিবাবু বললেন, চাঁদ উঠুক। আমি দেখব, সে জোছনায় এ দৃশ্য কেমন লাগে।

সামনের অন্ধকারে বাধা পেয়ে বোধ হয় বিভূতিবাবুর দৃষ্টি অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির মাঝে ফিরে গেল।

ছোট ছোট, জীবনের একএকটা ঘটনা।

নিপুণ চিত্রকরের মত সামান্য তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। সব কিছু জোড়া দিয়ে তুললেই কি "পথের পাঁচালী।"

শেষে চাঁদকে উঠতেই হোল। জ্যোৎস্নার প্লাবন। সমস্ত অঞ্চল যেন গলানো রূপোর ছোপ লেগে চোখের সামনে এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধরূপ নিয়ে ধরা দিল।

ফেরার পথে বিভূতিবাবু যেন টলছেন।

এক ঘরেই শোয়া।

গল্প গল্প গল্প।

মাঝে মাঝে উঠে বিভূতিবাবু বাহিরে চলে যান।

অস্ফুটে যেন সংস্কৃতের স্তব ভেসে আসে কানে।

আবার ফিরে আসেন।

আবার গল্প।

একবার বলে উঠলেন, এ কি ? এত রাত্রে পাখী কেন ডাকে ?

টর্চের আলোয় দেখা গেল ভোর চারটে।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৩। খুব ভোরেই ওঁরা দুজনে ঝাড়গ্রাম যাত্রা করবেন।

[এর পর লিপুকোচা ক্যাম্পের কথা]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ চর ইসমাইল থেকে গোলপার্ক

ফণিভূষণ আচার্য

গায়ে ধবধবে ফর্সা পাঞ্জাবীর ওপরে কালো জহর কোট। মাথায় ঝাঁকড়া চুল পেছনে ওলটানো। ফর্সা রং। চওড়া কপাল। তীক্ষ্ণ নাক, তীব্র দৃষ্টি। ডানদিকে অধরোষ্ঠ একটু চাপা। সব মিলে দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা। কিন্তু গলার স্বর মিহি বলা যায়, একটু মেয়েলি ধরণের। কিন্তু তা দিয়েই উনি সারা বাংলা দেশকে জয় করেছিলেন। হ্যাঁ, সারা বাংলা দেশকেই। পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা—এই কৃত্রিম ভেদরেখা তাঁর ভূগোলে ছিল না।

তখন ১৯৫২ সাল। থার্ড ইয়ারে পড়ি। বাংলায় অনার্স। সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের তখন খুব সুনাম। ক্লাসে যত ছাত্র, তার চেয়ে বেশিজন ক্লাসে বসে। এক একদিন বসার জায়গা হয়না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনে অনেকে। অন্য কলেজের বহু ছেলে কখনো অনুমতি নিয়ে, কখনো বিনানুমতিতে ক্লাস করে যেত।

একদিন আমার এক বন্ধুর পাশে একটি নতুন মুখ দেখলাম। বন্ধুকে নবাগতের পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। শুনলাম, সে ঢাকা থেকে এসেছে। ওর পুব বাংলার বন্ধু। সে ঢাকায় শুনেছে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তৃতার কথা! কলকাতায় এসে নারায়ণবাবুর বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। ঔপন্যাসিক নারারণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরও পুব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মাঝখানে কোন কণ্টকিত সীমান্ত ছিল না।

তখন আমরা তাঁর উপনিবেশ পড়ে ফেলেছি। চর ইসমাইল আমাদের তরুণ মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। কিন্তু চর ইসমাইলের দুর্দান্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমরা তার স্রষ্টাকে কিছুতেই মেলাতে পারতাম না! না চেহারায় না স্বভাবে। এমন সময় পড়লাম তাঁর 'টোপ' গল্পটি। এখানেও সভ্যতার যে ক্রূর নিষ্ঠুর রূপ তিনি এঁকেছেন, তার সঙ্গে এই মার্জিত মানুষটির মিল কোথায়? বরং সব দিক দিয়ে তাঁকে বড় বেশি উদার, বড় বেশি উদাসীন এবং বড় বেশি সংবেদনশীলই দেখেছি। একবার পূজোর ছুটিতে তিনি দিল্লী

আগ্রা ঘুরে এলেন। ছুটির পর ক্লাসে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করিলাম—দিল্লী আগ্রা কেমন লাগলো আপনার ?

সংক্ষেপে জবাব দিলেন—ভালো।

তখন 'বলাকার' শাজাহান কবিতাটি পড়ছি আমরা। কথায় কথায় তাজমহলের প্রসঙ্গ তুললাম।

—'তাজমহল কেমন লাগলো আপনার ?'

হাস্যমুখর নারায়ণবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন —'আমরা তাজমহল দেখি এবং মুগ্ধ হই। এই মুগ্ধতার কারণ অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথ। তাজমহল দেখলেই 'কপোল-তলে একবিন্দু নয়নের জল' 'শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহল' আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঝাউয়ের শাখায় আমরা শুধু বিরহী সম্রাট শাজাহানের দীর্ঘশ্বাস শুনি। আমিও দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছি। কিন্তু তা সম্রাট শাজাহানের নয়। বাংলা এবং গুজরাটের লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য প্রজার।

আমরা সবাই ঝুঁকে বসলাম। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝে উঠতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম—'তার মানে ?

নারায়ণবাবু মিহি গলায় আবেগের স্পর্শ। তিনি বলে চললেন—'যখন তাজমহল তৈরী হচ্ছিল, তখন বাংলা দেশে আর গুজরাটে দুর্ভিক্ষ। অসহায় প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও তাজমহলের কড়ি যোগাবার জন্যে তারা খাজনার হাত থেকে রেহাই পায়নি। খাজনা দিতে না পারার অপরাধ অনেকের পিঠে চাবুক পড়েছে, রক্ত ঝরেছে। তাজমহল দেখতে গিয়ে আমি তাদের করুণ মুখগুলোই দেখেছি, তাদের কান্নাই শুনেছি।

আমরা তখন প্রেম ট্রেম বিষয়ে খুব পড়াশুনো করছি। সেই সঙ্গে সৌন্দর্য তত্ত্ব। প্রশ্ন করলাম—'কিন্তু প্রেমিক কবি শাহজানের প্রেমেরও একটা দিক আছে, সৌন্দর্যেরও তো একটা বিষয় আছে। তাজমহলে কি সে সব কিছুই দেখেন নি আপনি ?

উত্তরে নারায়ণবাবু বললেন—'শাজাহান মমতাজের প্রেমের একটা কাহিনী তাজমহলের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু শাজাহানের বেগম মহলে মমতাজই একমাত্র বেগম ছিলেন না। হারেমে অন্যান্য সুন্দরীরাও ছিলেন। যাদের অনেকের পিঠে সামান্য অবিশ্বাসের সন্দেহে খোজা সিপাহীদের হাতের চাবুক পড়েছে। তাদের অন্ধকার গহ্বরে থামের সঙ্গে বেঁধে খোজা

সিপাহীরা চাবুক মেরেছে যে পর্যন্ত তাদের মৃত্যু না হয়। আমি তাদেরও কান্না শুনেছি তাজমহলের প্রাঙ্গণে ঝাউগাছের শাখায় শাখায়।'

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—'তবে মমতাজ সৌভাগ্যবতী। পানপাত্র নিঃশেষিত হলে পাত্রটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলাই মোগল রীতি। কিন্তু মমতাজের ক্ষেত্রে পানপাত্র নিঃশেষিত হবার পূর্বেই মমতাজ গতায়ু হয়েছিলেন। সম্ভবত সেই জন্যেই মমতাজকে নিয়ে শাজাহান একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন।

বুঝলাম, তাজমহল নারায়ণবাবুর ভালো লাগেনি। কিন্তু এ যে তাজমহলের অতি আধুনিক প্রগতিশীল ভাষ্য। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে আমরা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন দর্শনেরও সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সব আলোর পিছনেই অন্ধকার থাকে; সব সৌন্দর্যের পিছনে নিষ্ঠুরতা, তাজমহল তার ব্যতিক্রম নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সামনে চোখ ধাঁধানো আলোয় বিভ্রান্ত না হয়ে পিছনের অন্ধকারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাফল্যও এই পথে। এই বিশিষ্টতার জন্যেই তিনি উত্তরকালের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সম্প্রতি কিছুকাল যাবত তিনি ভালো লিখতে পারছিলেন না। প্রচুর লিখেছেন তিনি। লেখার সুযোগ পেয়েছেন ততোধিক। কিন্তু তাঁর স্বীকৃতিই হলো—'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।' না। আমরা তাঁর সব রচনা সম্পর্কে একথা বলতে পারিনা। গত পুজোর কয়েকদিন আগে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর পঞ্চাননতলা লেনের বাড়ীতে এই আমার প্রথম যাওয়া। অস্বীকার করে লাভ নেই, বাড়িটাকে আমার আদৌ ভালো লাগেনি। খুব ফ্যাকাশে অসমাপ্ত এবং শ্রীহীন। তাঁর বাড়ির পাশেই একটি জলের কল। সেখানে জলের এবং স্নানের জন্যে নারী পুরুষ শিশুর একটি নাতি বৃহৎ ভিড় জমে উঠেছে। পারস্পরিক শ্রুতিকর সংলাপ তদনুপাতিক। এর চেয়ে বৈঠকখানা রোডের বাড়ি, এমনকি, পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের অন্ধকার বিশ্রী বাড়িটাও সুন্দর ছিল। বাইরের ঘরে সামনা সামনি বসলাম। নারায়ণবাবুর চেহারাটা ভীষণ ভেঙে গিয়েছিল। প্রথমে তাই স্বাস্থ্যের কথাই উঠলো। উত্তরে তিনি বললেন 'প্রায় দশ বছর তিনি ডায়বেটিস নিয়ে ঘর করছেন। কাজেই ও বিষয়ে আমি আর ভাবি না।'

বললাম—'একটু সাবধানে থাকবেন, স্যার। শরীরের যত্ন নেবেন—'

হেসে বললেন—'ডাক্তাররা যা বলেন, সব মানতে গেলে বাঁচাটাই হয় না। কাজেই, কিছু না মেনে যতদিন বেঁচে থাকা যায়।'

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ছিলাম। প্রথমে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, পরে সাহিত্য। তারপর ঘুরে ফিরে এসে পড়লো তাঁর নতুন বাড়ির কথা। জিজ্ঞেস করলাম—'শেষে এই বাড়িটাই কিনলেন, স্যার ?

—'কেন, খারাপ কি ?'

—'না, ভালোই। আপনার ডায়লগের অভাব হবে না।'

পঞ্চাননতলা বস্তির প্রান্ত-সীমানা এবং জলের কলের সান্নিধ্য সত্ত্বেও তিনি বললেন—'এখানে আমি বেশ ভালোই আছি।'

হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল—'আপনি সমস্ত কিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে বসে আছেন স্যার। আগে কিন্তু—'

মনে পড়লো, পটলডাঙা স্ট্রীটের বাড়িতে বসে একদিন তিনি বলেছিলেন —'দক্ষিণ কলকাতায় কোনদিন বাড়ি করবোনা। বেঁচে থাক আমার উত্তর কলকাতা। এখানে পাশের বাড়ি থেকে চাল ধার করে এনে ভাত রেঁধে খাওয়া যায়

তিনি সে শপথও ভেঙ্গেছেন। কম্প্রোমাইজ করেছেন পুরোপুরি। তিনি অবশ্য সেদিন নানা কথায় আমার মন্তব্যটাকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, তিনি বাইরে কম্প্রোমাইজ করলেও ভিতরে কম্প্রোমাইজ করতে পারেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কতকগুলো অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার ফলে আর কম্প্রোমাইজ করার কোন পথ ছিল না। সদাহাস্যময় মানুষটির ভিতর ছিল একটি সদা-বিষণ্ণ মানুষ। বাইরে টেনিদার গল্পের প্যালারাম, কিন্তু ভিতরে কমনম্যান্ [?] সুনন্দ। সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাই বেশ কিছুদিন যাবত হারিয়ে গিয়েছিলেন। প্যালারাম দলে ভিড়ে হৈ-চৈ করেছে, কিন্তু নিঃসঙ্গ সুনন্দ তার নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে নিজের ভিতর থেকে একটি অধ্যাপককে টেনে বের করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গকেই সুনন্দ হাতিয়ার করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা সময়ের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে উঠতে পারেননি। টেনিদার গল্পের 'ফান'—সে ঐ অন্তঃশীল বেদনার হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতির একটা কিশোর প্রয়াস। কিন্তু অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সবার উপরে। মৃত্যুর তিনদিন আগেও তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে দাঁড়িয়েছেন প্রায় দিগ্বিজয়ীর মতো। তাঁর মতো সফল শিক্ষক বাংলাদেশে আর একজনও অবশিষ্ট রইলেন না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে বললেন—'সুনন্দ মারা গেলেন ? ভদ্রলোক লিখতেন কিন্তু চমৎকার !' একটু থেমে বললেন—'এবার সুনন্দের জার্নাল কে লিখবেন ?' বললাম—'সুনন্দ একবারই জন্মায়। সুনন্দর জার্নাল সুনন্দ ছাড়া আর কে লিখতে পারে ?' ভদ্রলোক মুখ নামিয়ে বসে রইলেন।

সেদিন বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। বন্ধুর আট বছরের ছেলেটি টেনিদার ভীষণ ভক্ত। আমি একটু সাহিত্য-টাহিত্য করি, সে জানে। গায়ের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সে বললো—'জানো কাকু, পটলডাঙার প্যালারাম মারা গেল।

বললাম—'জানি।'

দু'চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো—'তাহলে টেনিদার গল্প কে লিখবে ?'

আমি মুশকিলে পড়লাম। কী জবাব দিই ? না, জবাব আর দিতে হলো না। কোন কথা না শুনে এবং কোন কথা না বলে বন্ধুপুত্র ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

=ইতিহাস কথা কয়=

দ্বিতীয় পর্ব

অজিত চট্টোপাধ্যায়

=নয়=

একদা পূর্বদেশ থেকে জ্ঞানী লোকেরা নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ঈশ্বরের পুত্রকে দর্শন করবেন বলে পাড়ি দিলেন দুর্গম, বন্ধুর পথ। সেদিন আকাশের বুকে একটি উজ্জ্বল তারকা দেখা দিয়েছিল। সেই নক্ষত্রটিই অভিযাত্রী দলকে পথ দেখাল, নিয়ে এল বেথেল হেমের পর্ণকুটিরে।

অজন্তার দ্বিতীয় পর্যায়ের গুহাগুলি বহুদিনের; প্রায় দেড় দুহাজার বৎসরের পুরাতন। অনুমান করা হয় যে খৃষ্টের জন্মের কাছাকাছি কোনো সময় এই গুহাগুলির রচনা শুরু হয়। তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয় শতাব্দীকাল ধরে এর নির্মাণকার্য চলে। শুধু ছেনী ও হাতুড়ির কাজ নয়, নিপুণ স্থপতি ও কুশলী ভাস্করের হাতে পাথর কেটে গুহা রচনা এবং থামের গায়ে খোদাই করে বিচিত্র কারু কার্য ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও আরো কিছু চারুকলা এই গুহাগুলিতে রয়েছে। সেগুলি অন্য কিছু নয়,—অজন্তার বিখ্যাত চিত্রাবলী। বস্তুত ষোল এবং সতেরো নম্বর গুহায় এমন কয়েকটি ছবি আছে, যা শুধু অজন্তা গুহার নয়, পৃথিবীর সেরা চিত্রকলা হিসেবে গুণীজনের কাছে সমাদৃত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এই গুহাগুলি সংখ্যায় ছয়। ক্রমিক নম্বর চৌদ্দ থেকে উনিশ। আগেই বলেছি চৌদ্দ নম্বর গুহা একটি অসম্পূর্ণ বৌদ্ধ বিহার। এটি তের নম্বর গুহার কিছু উপরে। বলা বাহুল্য, এই বিহারটি চিত্রকলা বর্জিত। এমন কি ভাস্কর্যের ছিটে ফোঁটা কোথাও চোখে পড়ে না। সম্ভবত প্রথম শতাব্দীতে এটির নির্মাণ কার্য চলে এবং কোনো বিশেষ কারণে অজন্তার এই গিরিগুহাটি আর সম্পূর্ণ করা যায় নি। অনুমান করা যেতে পারে যে, পাথরের বুকে চিড় বা ফাটল ধরার আশংকা ছিল বলেই স্থপতিরা আর অগ্রসর হতে সাহসী হয় নি।

চৌদ্দ নম্বর গুহার ঠিক বাঁ দিকে পনের নম্বর গুহাটির অবস্থান। সম্ভবত এর নির্মাণকার্য দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এটিও বৌদ্ধ বিহার,—তবে আয়তনে বড় নয়। বরং একটু ছোট। এর বারান্দাটি প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা, ছ ফুট চওড়া এবং মাথার ছাদ দশ ফুটের মত উঁচু। বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি ঘর। ভিতরের হল ঘরটি প্রায় বর্গাকার। একটি দিক কম-বেশী চৌত্রিশ ফুটের মত হবে। ঘরে ঢুকবার দরজার দুপাশে আশ্চর্য খোদাইয়ের কাজ। প্রবেশ পথের ঠিক বিপরীত দিকে বুদ্ধদেবের একটি প্রস্তর মূর্তি। সম্ভবত বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাসগৃহে ভগবান তথাগতের মূর্তিস্থাপনের এটিই প্রথম প্রয়াস।

একদা এই গুহাটির সিলিঙে, দেওয়ালগাত্রে নানা বর্ণ সমন্বিত অপরূপ চিত্রকলা শিল্পীর নরম তুলির টানে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছিল। আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু সিলিঙের বুকে কোনো কোনো স্থানে চিত্রকলার ছোটখাটো ভগ্নাংশ দর্শককে সেই বহুদূর অতীতের শিল্পীদের কথা এক-আধবার নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দেবে।

গাইড বলল,—'বাবুজী, ষোল আর সতেরো নম্বর গুহা দুটি ভালো করে দেখবেন। অজন্তার এই দুটি গুহাতে যে ছবি আঁকা হয়েছিল, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই।'

ইতিহাসের পাতায় অজন্তা গুহার দু-একটি আশ্চর্য ছবির কথা আমরা পড়েছি। কলকাতা থেকে বেরোবার সময় দু-একজন বন্ধুবান্ধবও কিছু বলেছিল। গাইডকে শুধোলাম,—'আচ্ছা ডাইং প্রিন্সেসের ছবিটা কোথায়?'

—ষোল নম্বর গুহায় বাবুজী? সে হেসে উত্তর দিল। বলল,—'এই দুটো গুহাতে কত সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। এখন অনেক নষ্ট হয়ে গেছে'।

কথাটা নির্মম সত্য। অজন্তার এই দুটি গুহা এবং তার বিচিত্র চিত্রাবলী সম্ভবত দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীর রচনা। দীর্ঘকাল ধরে এগুলি সংরক্ষিত করবার তেমন কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নি। বরং অজন্তার এই আশ্চর্য সুন্দর গুহাগুলি আবিষ্কৃত হবার পর একদল নির্বোধ ব্রিটিশ আমলা এই বিখ্যাত চিত্রকলার উপর একপ্রকার বার্নিশ লেপে দেয়। তারা ভেবেছিল বার্নিশ লাগানোর পর চিত্রগুলি আরো স্পষ্ট, উজ্জ্বল, এবং দর্শনীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। বার্নিশ দেবার পরই অজন্তার এই অপরূপ চিত্রগুলি তাদের রঙ, উজ্জ্বলতা এবং বর্ণবৈচিত্র্য হারিয়ে কেমন কালো হয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও ছবিগুলির পূর্বসুষমা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

ষোল নম্বর গুহার বারান্দাটি আয়তনে বিশাল। প্রায় পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা এবং বারো ফুট চওড়া। সিলিঙের উপর বিচিত্র চিত্রকলা, মনোরম অলংকরণ। তার বেশ কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে কিছু অংশ কোনোমতে টিঁকে আছে।

হলঘরটি নিঃসন্দেহে বড়। একদা এই বিহারটিতে কত শ্রমণ যে বাস করতেন, তা এর বিশাল আয়তন থেকেই কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রবেশ পথের ঠিক বিপরীত দিকে ভগবান তথাগতের এক বিরাট প্রস্তর মূর্তি। একটি পাথরের আসনের উপর বুদ্ধ উপবিষ্ট। তার পা দুটি নীচে ছড়ানো, প্রশান্ত মুখ,······স্মিত হাসি। হাত দুটি উপরে তুলে শিক্ষাদানের ভঙ্গিমায় বুদ্ধ বসে আছেন। এগারো নম্বর গুহার মত, এখানেও বুদ্ধমূর্তিটি দেয়াল ঘেঁষে নেই। ইচ্ছে করলে ভক্তজনেরা এই মহামানবের মূর্তিটি পরিক্রমা করে অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে।

ষোল নম্বর গুহায় অজন্তার শিল্পীদের কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের দেখা পাওয়া যায়। বাঁ দিকের দেয়ালে বিয়োগবিধুরা রাজবধূর ছবি। শিল্পীর তুলির আঁচড়ে, সূক্ষ্ম টানে ছবি যে এমন জীবন্ত হতে পারে তা বুঝি অতীতে একমাত্র অজন্তার চিত্রকরের হাতেই সম্ভব হয়েছিল। বিখ্যাত ডাইং প্রিন্সেস ছাড়াও গাইড আমাদের আরো কয়েকটি ছবি দেখাল। কোনোটি কালের নিষ্ঠুর চাপে, কিম্বা অপরিণামদর্শী আমলাদের বার্ণিশের ফলে অস্পষ্ট বা অনুজ্জ্বল হয়ে এসেছে। একটি ছবিতে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে বসে রয়েছেন। তাঁর চারপাশে নতজানু নৃপতিবৃন্দ এবং বহু ধনী ব্যক্তি। সম্ভবত মহাজ্ঞানী তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন,—'এই পৃথিবীতে কামনাই দুঃখকষ্টের মূল। মানুষ কামনা বাসনাকে জয় করতে না পারলে তার জীবনে যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী এবং দুঃখ অনিবার্য।'

পিছনের দেয়ালে একটি শোভাযাত্রার ছবি। হাতীর পিঠে চড়ে রাজা-মহারাজারা চলেছেন। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে শোভাযাত্রার বিচিত্র সুর, অনুচরেরা পুরোভাগে এবং চারপাশে রয়েছে। সৈনিকদের হাতে উন্মুক্ত অসি। গাঢ় নীলবর্ণ বাঁটগুলি কি বিচিত্র মনে হয়। ডানদিকের দেয়ালে সিদ্ধার্থের শৈশবকালের কয়েকটি চিত্র সযতনে অঙ্কিত। একটি ছবিতে তপস্বী অসিতা-মুনি শিশু বুদ্ধকে হাতে করে তুলে ধরেছেন। আক্ষেপ করে ইনি বলেছিলেন, —'ভবিষ্যতে শিশু সিদ্ধার্থ মহাজ্ঞানী রূপে জগতে খ্যাত হবে।' তাঁর দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে ততদিনে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। মহাজ্ঞানীর পায়ের কাছে বসে শিক্ষালাভ করা তাঁর জীবনে ঘটল না। আর

একটি চিত্রে বালক সিদ্ধার্থ অস্ত্র শিক্ষা লাভ করছেন। তাঁর হাতে ধনুক, শর আরোপ করে সিদ্ধার্থ তীর নিক্ষেপ করা শিখছেন।

অজন্তার এই গিরিগুহার চারপাশে নির্জন বন—পাহাড়, বিহঙ্গের সুমিষ্ট কলতান, বৃক্ষশাখা এবং ঘন সন্নিবদ্ধ পাতার ফাঁকে রৌদ্রকিরণের বিচিত্র লুকোচুরি। শত শত বৎসর আগে অসংখ্য বৌদ্ধ শ্রমণ, স্থপতি, ভাস্কর এবং নিপুণ চিত্রশিল্পীর দল, এখানে দিনের পর দিন গভীর সাধনায় কালাতিপাত করেছেন। ষোল নম্বর গুহার সামনেই কূপের মত একটি ক্ষুদ্র জলাধার। এখনও সেটিতে জল রয়েছে। কাছেই একটি ভগ্ন ঘরের মধ্যে নাগরাজের ভাঙাচোরা মূর্তি। সর্প সিংহাসনে নাগরাজ বসে আছেন। এবং পাঁচটি সাপের ফণা ঠিক আচ্ছাদনের মত তার মুকুটের উপর বিরাজ করছে।

একদা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ষোল নম্বর গুহার বারান্দা পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি তৈরি হয়েছিল। পাহাড়ের নীচে, সিঁড়িতে উঠবার মুখে দুটি বৃহৎ মাতঙ্গের প্রস্তর মূর্তি রচিত হয়। ঐ হাতী দুটির কথা যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'My pilgrimages to Ajanta and Bagh'-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—'Suddenly I came to what looked like two very huge pieces of rock, but they were large elephants of dark stone, almost life-size. I recognised them at once. They were the two famous elephants at the great ancient stairway leading to the Buddhist monastery, mentioned in a book over a thousand years old, written by one of the great Chinese pilgrims of the sixteen century A. D.'

(ক্রমশঃ)

।। সাহিত্যের খবর ।।

ষষ্ঠীধর গুপ্ত

।। হোয়াই আর ইণ্ডিয়ান নভেলস্ সো……? ।।

সম্প্রতি 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'-তে তামিল, ইংরাজী, জর্মান এবং সুইডিশ ভাষার লেখিকা এস. রাজ্ঞী ভারতীয় উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনাটি কিছু সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে—

ভারতীয় উপন্যাস, ভারতীয় চলচ্চিত্রের মতো অতো জনপ্রিয় নয়। অধিকাংশ উপন্যাসিক-ই চলচ্চিত্রধর্মী নন যদি-ও প্রায় ভারতীয় উপন্যাসিক-ই রোমান্টিক ঘটনার সন্নিবেশ এবং কাহিনী বিন্যাসে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। আর তাই যদি একটা প্রশ্ন করা যায়, অবশ্য যদি তা' করা সম্ভবপর হয়, যে 'ভারতীয় উপন্যাস কেন এত মাঝারি ধরণের?' পৃথিবীর সর্বত্র-ই খারাপ উপন্যাস লেখা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কোনও একটা অঞ্চলে সাহিত্যে নবজাগরণের পর একই সময়ে এত সাধারণ উপন্যাস আর লেখা হয়নি।

অবশ্য এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন যে মাঝারি আর খারাপের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে কেন? এই বিভিন্নতা কি অনেকটা কৃত্রিম হয়ে দাঁড়াবে না? আমি কিন্তু এই দুই রকম শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন বলে মনে করি, কেননা খারাপের থেকেও মাঝারির প্রভাব বেশী অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। খারাপ-কে সহজেই আলাদা করে ফেলা যায় এবং তাকে অবজ্ঞা-ও করা চলে কিন্তু মাঝারি-কে মাঝারির হিসাবে দেখা যায় না বা তার থেকে দূরে-ও সরে থাকা সম্ভব নয়। মাঝারিরা প্রায়ই এমন এক ছদ্মবেশ পরে থাকেন যে, মনে হয় যেন সেই কালটিতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ কথাকার—ফলে সাহিত্য আলোচনা ও বিচারের ক্ষেত্রে এক দারুণ ক্ষতি হয়ে যায়।

ভারতীয় উপন্যাসের সুরুটাই হয়েছে বড় খারাপ ভাবে—রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। "এঁদের দু'জন বাঙালী ও একজন হিন্দুস্থানী—আর এই দুই ভাষাই অন্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় সংকীর্ণ (অবশ্য একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় কেবল তামিল ভাষার ক্ষেত্রে)। বাংলা ও হিন্দী ভাষা সমৃদ্ধ না হলেও এঁরা সবাই সাফল্য লাভ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে শুধু কবি হিসাবেই নন্ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসিক হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে যদিও আমি সেসব ইংরাজীতেই পড়েছি।

কিন্তু কবি হিসাবে যতই সুনাম থাকুনা কেন উপন্যাসিক হিসাবে তাঁর দান নগন্য—অস্পষ্ট, বাঙালী ভাবুকতা, সরল গদ্য-র প্রাচুর্য (মানে অনুবাদে আমি যে রকম পড়েছি) এবং সর্বোপরি এক অবোধ্য চিন্তায় ভরা সুন্দর উপন্যাস যাতে কোন-ও শিল্প কৌশল বা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র দু'জনেই সেইসময়ে রবীন্দ্রনাথের মতোই যথেষ্ঠ সফলতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্যিকগুণ ছাড়াও অন্য অনেক কারণ ছিল তার পিছনে। ভাবপ্রবণতা ও পাঠকদের সাধারণ বুদ্ধির অভাবের সুযোগে তাঁদের অকৌশলী রচনা নাম কিনেছে। যার ফলে অতি উচ্চ প্রশংসিত তারাশঙ্করের'গণদেবতা' পড়ার পরও পাঠক কোনও মানবিক উৎকর্ষের অনু-পস্থিতির দরুণ অপ্রতিভ হয়ে যান।

পশ্চিমের অতি সাধারণ সাহিত্য কলাবিদ্‌রাও (যেমন গ্রাহামগ্রীন, সমারসেট মম্, জন গলস্‌ওয়ার্দী বা আইভি কম্পটম-বার্নেট) মানবিক গুণাবলী প্রকাশ করেছেন যার অভাব ভারতীয় উপন্যাসে দেখা যায়। মানবিক উৎকর্ষতা প্রকাশ ছাড়া একটা উপন্যাসে কি করে উপন্যাস, সাহিত্যশৈলী বা কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়? সুন্দর গল্প, চিন্তা, বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র, ঘটনা বিন্যাস, কিছুটা বাস্তবতা, সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সবকিছুই ভারতীয় উপন্যাসে দেখা যাবে কিন্তু কখন-ই তাতে কোনও বুদ্ধিদীপ্ত মনের প্রকাশ, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যা নাকি চিরন্তন স্বীকার যোগ্য, তারই দেখা পাওয়া যায় না। সমস্ত উপন্যাসিককে আলডাস হাক্সলি বা ইভলীন ওয়াগ হতে হবে না কিন্তু নিশ্চয়ই করে ভারতীয় উপন্যাসিকদের আগের থেকে কিছুটা ভাল করা উচিত, যাতে করে অন্ততঃ সার্থক স্বীকারযোগ্য উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

এটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য যে আমাদের প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কিছু লেখক রয়েছেন যাঁদের 'মন' রয়েছে এবং এই 'মন' তাঁদের লেখার গঠন ও কাহিনীকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের অনেকেই উপন্যাসিক হিসাবে বেশী পরিচিতি লাভ করতে পারেন নি। সাম্প্রতিক কালে মালয়ালম উপন্যাসিকদের মধ্যে তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছেন কিন্তু মহম্মদ বশীরের রচনার যে ক্ষুদ্র অংশের সংগে

আমি পরিচিতি লাভ করেছি তা' থেকে বলা যেতে পারে যে তাঁর অধিকতর কুশলী এক মন রয়েছে। তা'ছাড়া তাঁর উপন্যাসে রয়েছে অনেক বেশী শিল্পনৈপুণ্য যা' নাকি তাকাষির রচনায় অনুপস্থিত।

তাকাষি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকরা যেমন খাজা আহম্মদ আব্বাস, কিষণ চন্দর প্রভৃতির রয়েছে এক প্রগতিশীল, সুরুচিসম্পন্ন মনের প্রকাশ চেষ্টা কিন্তু সে চেষ্টা সামাজিকরূপে সার্থক হ'লেও সাহিত্যরূপে সার্থক হয়নি। আর যেখানে তাকাষি 'চেম্মিনে'র পথ ধরেছেন সেখানে তাঁর সাহিত্য-শিল্প উল্লেখযোগ্য নয়।

আমার কোনও অপ্রগতিবাদী ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নেই। জৈনেন্দ্র কুমারের ছোট বই 'ত্যাগপত্র'র প্রথম পঞ্চাশ পাতায় আমি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। এটা খুব ভাল বই, এতই ভাল যে তুর্গনেভ বা বালজাকের রচনার সংগেই তার সার্থক তুলনা করা চলতে পারে। কিন্তু এর পরেই উপন্যাসটি এমনভাবে নীতিকথার জলাভূমিতে নেমে গিয়েছে যে তা' প্রগতিবাদিতার মতোই অমার্জনীয় বলাই সংগত। অবশ্য তবুও আমি 'ত্যাগ পত্র'-কে সন্দেহাতীত ভাবে একটি শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস বলব।

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় লেখকদের ইংরাজী উপন্যাসের কথা কিছু লিখিনি। যেখানে প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষার লেখকদের রচনা অধ্যবসায়ী পাঠকদের হাতে আসেনা সেখানে প্রায় অধিকাংশ ইংরাজী উপন্যাসই পাঠকরা পেয়ে থাকেন। আর এই পাঠকদের অধিকাংশই ইংরাজীতে সুশিক্ষিত। এখানে রয়েছে সেই সাহিত্য ঐতিহ্য—এ. মাধবীয়া থেকে আর. কে. নারায়ণ পর্যন্ত—যা' নাকি ১৯ শতকের ইংরাজী উপন্যাস থেকে উদ্ভূত। ফলে এতে সামাজিক পরিহাসের এক ছদ্ম আবরণও রয়ে গিয়েছে। এই ঐতিহ্যই আর. কে. নারায়ণ বা নয়নতারা সেহগলের মতো লেখককে সাধারণ পর্যায়ে ফেলেছে—আর একজন নিশ্চয়ই অনুভব করবেন যে, তাঁরা সাধারণের থেকে বেশী কিছু করেননি।

মাধবীয়ার 'তিল্লাই গোবিন্দন' বিগত শতক থেকে এক উচ্চমানের স্বাক্ষর রেখেছে, কিন্তু আর. কে. নারায়ণ বা নয়নতারা সেহগলের রচনায় আমরা তেমন ভাবে নিশ্চিত নই যে সেই 'মনে'র পরিচয় পাব। এই ভাবপ্রকাশ এখন বাস্তব থেকে আপাত-সত্যে, বিশ্বাসের পরিবর্তে মানুষের শিল্প সৌন্দর্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির অনুজ্জ্বল এক চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতীয় ভাবুকতার রূপকার হিসাবে কমলা মার্কণ্ডেয়, ভবানী ভট্টাচার্য, মুলুকরাজ আনন্দ এবং

অন্যান্যদের রচনা সম্পর্কে আমরা সতর্ক রয়েছি। একটি ব্যতিক্রম অবশ্য রাজা রাও, তিনি কোনও ধারাবাহিকতার লেখক নন, তাঁর রচনা কেবল বৈদান্তিক আদর্শেই পূর্ণ। তাঁর লিখনভঙ্গী ও কাহিনীর বিন্যাস প্রণালী একদমই অন্-উপন্যাসিক। ভারতের প্রতিটি ভাষাতেই কম করেও 'ডজন' খানেক উপন্যাসিক রয়েছেন যাঁরা সম্পূর্ণ মাঝারি ধরণের। অবশ্য এঁদেরই অনেকে সরকারী অনুগ্রহে পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারের সাংস্কৃতিক মূল্য না থাকলেও সরকারী মূল্য যথেষ্ট রয়েছে। তাঁরা যে কেবলমাত্র উপলব্ধি করতে পারছেন না যে ভারতীয় উপন্যাসকলার কী ক্ষতি করছেন, উপরন্তু তাঁরা শিল্পকলার সূক্ষ্মনৈপুণ্য বা সাহিত্য-কলার প্রতিও মনোযোগী নন।

পরিশেষে আমি তাঁদের কিছু বলতে চাই যাঁরা ভারতীয় উপন্যাস সম্পর্কে আগ্রহী। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের একজন সুন্দর পরিচালক হ'তে পারেন, আমি অবশ্য জানিনা কেননা আমি চলচ্চিত্রে আগ্রহী নই। কিন্তু he has definitely killed a fine—the finest Indian novel –'Pather Panchali' as a novel. এমন কি ইউনেস্কো-কৃত অনুবাদটিও চলচ্চিত্র অনুযায়ী। A novel which was not mediocre was made to suffer at the hands of mediocrities—in the name of UNESCO. এটা স্পষ্টভাবে একটা অন্যায় কাজ কিন্তু সাধারণ মানুষ সে ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

॥ কবি-র সম্মাননা ॥

বিশিষ্ট কবি ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে সম্প্রতি নিউয়র্কের নিউ প্যাল্‌জ স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজে ইউনিভার্সিটি প্রফেসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। স্টেট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি এবং চ্যান্সেলার শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান দিয়ে থাকেন ডঃ চক্রবর্তীকে এই অধ্যাপক পদে নিয়োগ তাদেরই অন্যতম। যে সমস্ত বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন শিক্ষা ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকেন এবং যাঁদের এই কৃতিত্ব ও সাফল্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে, তাঁদেরই এই পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

ডঃ চক্রবর্তী ১৯৬৭ থেকে নিউ প্যাল্‌জ কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনা করছেন।

॥ Kavita-র কথা ॥

'আরও কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের পক্ষে সৎ কাব্য সাহিত্য পাঠের প্রতি সাধারণ পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য তরুণ কবি শ্রীসুপ্রিয় বাগচী সম্পাদিত 'Kavita' পত্রিকাটি দীর্ঘদিন সার্থক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পত্রিকাটির ২৩-তম সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

এই সংখ্যার কবিদের মধ্যে রয়েছেন—জীবনানন্দ, কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, আলোক সরকার, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শম্ভু রক্ষিত, তারাপদ রায়, সুপ্রিয় বাগচী এবং আরো কয়েকজন।

বর্ষীয়ান কবি কালিদাস রায়ের 'দেশের গতি' কবিতাটি পাঠকদেরও অভিভূত করে তুলবে—

(১)

দেশের কথা বলো না, আর, এ দেশের কি হবে গতি?
আমার কদর বুঝলে নাক দেশের যত মূঢ়মতি।
জন্মালে হায় অন্য দেশে যেতাম নাক হেলায় ভেসে,
কাঁধে কাঁধেই নাচতে হতো, হতাম একটা মহারথী।

(৩)

পাখোয়াজের কদর বুঝে বিজ্ঞে যাহার ঢাকে ঢোলে?
বুঝবে দাঁতের মর্যাদাটা অবোধ এ দেশ ফোক্‌লা হ'লে।
হারা'ল বায় হেলায় রতন, মিল্‌বে না আর আমার মতন,
আমার তা'তে ব'য়েই গেল, অবোধ দেশের কেবল ক্ষতি।

॥ সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা ॥

গত ১৯. ১২. ১৯৭০ তারিখে বুদ্ধদেব বসু-র উপন্যাস 'রাত ভোর বৃষ্টি' ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা (অশ্লীলতা) অনুসারে ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এইচ, এস, বাড়রি রায়দান প্রসঙ্গে বলেন যে, 'লেখক পাঠকদের যৌন বিকারের সুযোগ নিয়ে তাদের মনে যৌন লিপ্সা ও কামোদ্দীপনা জাগাবার চেষ্টা করেছেন।'

এই মামলায় প্রকাশক শ্রীসুপ্রিয় সরকার ও মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়েরও ১০০ টাকা হিসাবে জরিমানা অনাদায়ে একমাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারা অনুসারে এঁদের বিচার হলেও, এর

জন্য পৃথক দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়নি। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে দণ্ডাদেশের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট উপন্যাসের সমস্ত কপি এবং পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে ফেলারও আদেশ দিয়েছেন। অবশ্য আসামী পক্ষের আবেদনে গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ তিনমাস স্থগিত রাখা হয়েছে।

শ্রীনীলাদ্রি গুহ-র অভিযোগে এই মামলার সূত্রপাত হয়। তিনি বলেন যে, উপন্যাসটি পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, যেসব তরুণ মনে খারাপ প্রভাব সহজেই পড়তে পারে বইটি যে শুধু তাদেরই নৈতিক অধঃপতন ঘটাবে তাই নয়, এর দ্বারা সমস্ত সমাজ ও সংস্কৃতির অধঃপতনের আশঙ্কা রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, অনেক বছর আগে বুদ্ধদেব বসুর 'এরা আর ওরা' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' এবং প্রবোধকুমার সান্যালের 'দুই আর দুয়ে চার' নিয়ে আপত্তি উঠেছিল কিন্তু সেবার মামলায় বুদ্ধদেব বসু-কে মুচলেকা দিতে হয়েছিল।

আর মাত্র সেদিন ১১. ১২. ১৯৬৮ তারিখে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিসট্রেট শ্রীকুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত তাঁর রায়ে সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাসটিকে অশ্লীলতার দায়ে ২০১ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দু মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। সমরেশ বসু-র পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহ।

বিচারক সেদিন রায় দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি লেখক হিসাবে সমরেশ বসুর শক্তিমত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু উপন্যাসটি বারবার পড়ার পর তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার জন্য যেভাবে ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যে সব চরিত্র আনা হয়েছে এবং যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সব মিলিয়ে উপন্যাসটির প্রবণতা অশ্লীলতার দিকে। যে সমস্ত পাঠকের মন যথেষ্ট রুচিশীল নয়, যাদের মন সহজেই দুর্নীতির দিকে যেতে পারে এই ধরণের রচনা তাদের হাতে পড়লে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যাবে। তা'ছাড়া উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বইটির অনেক অংশ লেখা হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন পঞ্চাশ বছর পর এই বইখানিই হয়তো একটা নৈতিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হবে। সে কথার উল্লেখ করে বিচারক বলেন, "পঞ্চাশ বছর পর দেশের সামাজিক অবস্থা কি হবে সে কথা কারো পক্ষেই বলা সম্ভবপর নয়। আর তাই বর্তমান কালের বিচারেই এই সব

রচনার বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান কালের পক্ষে এই গ্রন্থ অশালীন। লেখকের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে। তাঁর স্বাধীনতা যেমন বিরাট তাঁর দায়িত্ব-ও তেমনি বিরাট। সমাজের ক্ষতিকারক কোনও রচনা তাঁর তাই লেখা উচিত নয়।

বুদ্ধদেব বসু ও নরেশগুহ বুদ্ধিজীবী ও অভিজ্ঞ পাঠক তাই ওঁরা সে-বইয়ের শুধু শিল্পরসেরই সন্ধান করবেন—শ্লীল-অশ্লীলের বিচার করবেন না। কিন্তু যে সমস্ত পাঠক শিল্প-রস গ্রহণে অক্ষম তারা এই রকম রচনার ভাষা ও বর্ণনা পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

"আইনে অশ্লীলতার কোনও সংজ্ঞা নেই ঠিকই কিন্তু গত একশো বছর ধরে যে নীতির দ্বারা বিচার নির্দিষ্ট হচ্ছে, তা'হল এই যে, যে জিনিসকে অশ্লীল বলা হবে, দেখতে হবে তার প্রবণতা কোন্ দিকে। সুনীতি বা শোভনতা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলেও, অশ্লীলতার এই পরীক্ষাটি এখনও অচল হয়ে যায় নি।"

অন্যতম প্রখ্যাত লেখকের এই রাজদণ্ড ভোগে শুধুমাত্র পাঠক মহলেই নয় বিশিষ্ট লেখক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর এবং বিমল মিত্র তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন। অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, এঁরা কেউই 'রাত ভোর বৃষ্টি' পড়েন নি, এবং বই সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেন নি।

তারাশঙ্কর বলেছেন, "কাউকে খুশীমত লিখতে দেওয়া যায় না। পাঠকের মনে নোংরা যৌনাকাঙ্খা উদ্রেক করার জন্য যখন ইচ্ছে করে সাহিত্যে অশ্লীলতা সূচনা করা হয়, তখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। পৃথিবীতে এ'নিয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য মামলা হয়েছে। ভারতেও যদি সরকার অনুরূপ ক্ষমতা গ্রহণ করেন আমি তা অসঙ্গত মনে করিনে।"

অন্নদাশঙ্কর বলেছেন, মানুষের জীবন যা তার চিত্রায়নই লেখক তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তা দেখেন না। যদি তিনি সত্যিকার শিল্পী হন, পয়সা ও কুখ্যাতির জন্য যদি তিনি প্রলুব্ধ না হন, তাঁকে সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশে সৎ প্রচেষ্টার জন্য অপরাধীর কোঠায় ফেলা যায় না। সাহিত্য যদি শিল্পসম্মত হয় এবং রসের বিচারে উত্তীর্ণ হয় তবে তা সাহিত্য হিসাবে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। দণ্ড তাকে স্পর্শ করবে না।"

বিমল মিত্র বলেন, "সাহিত্যে কোনও রকম বাধা নিষেধ অন্যায়। আজ

যা অশ্লীল কাল তা গ্রাহ্য হতে পারে। সাহিত্য কখনও অশ্লীলতার গজকাঠিতে মাপা হতে পারে না। তবে দেখতে হবে যে তা' সাহিত্য হয়েছে না অসাহিত্য। সাহিত্য হলে তা' কখনও অশ্লীল হতে পারে না। অসাহিত্যই আপত্তিকর।"

আত্মোন্নতি সাধনের পথপরিদর্শনের পরিবর্তে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দুর্বল মানবমনের উপর কুপ্রভাব বিস্তারের জন্য সাহিত্য সৃষ্টিকে কাজে লাগান হ'লে সে রচনাকে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

মানবজীবনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ সাহিত্যে প্রকাশে আমাদেরও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু দেখা প্রয়োজন যে, সে প্রকাশের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন কোনখানে? রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যত্র যে নিষিদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু মূল কাহিনীর উচ্চ আদর্শ-ই পাঠক মনে অনুরণিত হয়। বিশেষ উত্তেজক ঘটনাগুলি নয়। এখানেই তার চিরন্তন আবেদন রয়েছে এবং সেসব যথার্থ সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ বিদেশে নববর্ষের সম্মাননা ॥

ইংরেজী নববর্ষের সূচনায় ইংলণ্ডেশ্বরী যাঁদের খেতাব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মরিফবাওরা এবং আগাথা ক্রিষ্টি-ও রয়েছেন।

● ● ●

সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ৭০ সংখ্যায় পঞ্চাশোর্দ্ধের জীবিত কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তাতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল মিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন আশিস মজুমদার।

....

ভ্রম-সংশোধন

আমাদের কার্ত্তিক সংখ্যায় ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের শিরোনামা বাংলায় এইরূপ হইবে "এমিলি ব্রন্টে ও উদ্‌রিং হাইট্‌স্"। ইংরাজী wuthering শব্দটিরও মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

এর নাম সংসার — বিমল মিত্র

চৌরঙ্গী — শংকর

পাড়ি — জরাসন্ধ

জগদ্দল — সমরেশ

নতুন তুলির টান — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বরপক্ষ — প্রবোধকুমার সান্যাল

শুধু কথা — চাণক

পৌষ ফাগুনের পালা — গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আপন জন — ইন্দ্র মিত্র

নিশিপদ্ম — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কুয়াশা — প্রেমেন্দ্র

দ্বিতীয় অন্তর — শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিক লাল — বন

রাত তখন দশটা — দেবজ দেববর্মা

আবৃত আকাশ — দীপক চৌধুরী